বদরুদ্দীন উমর

পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি

দ্বিতীয় খণ্ড

১৯৭২

মাওলা ব্রাদার্স। বাংলাবাজার ঢাকা-এক

পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড)। প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন, তেরোশ বিরাশী। প্রকাশক: আহমেদ মাহফুজুল হক। মাওলা ব্রাদার্স ৩৯, বাংলা বাজার ঢাকা-এক। মুদ্রাকর: এম, আলম, ইডেন প্রেস, ৪২/এ হাটখোলা রোড। ঢাকা-তিন। প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী।

PURBA BANGLAR BHASA AONDALAN O TANTKALIN RAJNITI (Language movement & Comtemporary Politics in East Bengal) by Badruddin Umar. First Published : September, Nineteen seventy five. Published by Ahmed Mahfuzul Haq from Mowla Brothers 39, Bangla Bazar. Dacca-One. Printer: Mr. M. Alam, Eden Press, 42/A, Hatkhola Road, Dacca-Three. Cover-design by Qayyum Chowdhury.

মুখবন্ধ

'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির' দ্বিতীয় খণ্ডে তৎকালীন রাজনীতির যে পটভূমিকায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিলো তারই একাংশ বিবৃত করা হলো। ইচ্ছে ছিলো ১৯৫১ সালের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের ঠিক পূর্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ পটভূমিকার আলোচনা এই খণ্ডেই সমাপ্ত করে তৃতীয় খণ্ডে কেবলমাত্র ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলীর বিবরণসহ পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির বিস্তৃত পর্যালোচনা করবো। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের কলেবর বৃদ্ধি হতে দেখে সে পরিকল্পনা বাতিল করতে হলো। এর ফলে তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনের সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের এবং সাধারণভাবে সংগঠিত রাজনীতির বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডের পরিবর্তে তৃতীয় খণ্ডেই সংযোজিত হবে।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন যে সীমিত এলাকায় ঘটেছিলো এবং আন্দোলন তখন ছাত্র শিক্ষকসহ বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে যেভাবে সীমাবদ্ধ ছিলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সেইভাবে সীমাবদ্ধ থাকে নি। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ না থেকে তা শ্রমিক কৃষক ছাত্র বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তের এক ব্যাপক গণ প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে সমগ্র পূর্ব বাঙলায় এক অদৃষ্টপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। ১৯৪৮ সালের আন্দোলনের সাথে ১৯৫২ সালের আন্দোলনের এই পার্থক্যকে বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে হলে এই অন্তবর্তীকালীন সময়ে পূর্ব বাঙলার ব্যাপক জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যা কিছু ঘটেছিলো এবং তার ফলে যে পরিবর্তন সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তা ভালভাবে জানা দরকার। পরিস্থিতির এই বিবরণের সাথে পরিচিত হলে দেখা যাবে যে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন মুষ্টিমেয় ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবীর আন্দোলন ছিলো না, তা শুধু শিক্ষাগত অথবা সাংস্কৃতিক আন্দোলনও ছিলো না। বস্তুতঃপক্ষে তা ছিলো পূর্ব বাঙলার ওপর সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার পাকিস্তানী শাসক শোষক শ্রেণীর জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক বিরাট ও ব্যাপক গণআন্দোলন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে কৃষক আন্দোলনের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে সানেশ্বর এবং নাচোলের কৃষক আন্দোলনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এ বইয়ের প্রথম খণ্ডে এই দুই আন্দোলনের কিছুটা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ছিলো। কিন্তু তৎকালীন কৃষক আন্দোলনের ঘটনাবলী একত্রে আলোচনার জন্যে উপরোক্ত অংশ দুটি দ্বিতীয় খণ্ডে কৃষক আন্দোলন সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এজন্যে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে এই অংশের কোন বিবরণ আর থাকবে না এবং তার পরিবর্তে কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত সাধারণ বিবরণ সেখানে সংযোজিত হবে।

এই খণ্ডের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্বশেষ পর্যায়ে পূর্ব বাঙলার কৃষকদের অবস্থা প্রসঙ্গতঃ বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনার সাথে আমার 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক' এর বিবরণ ও আলোচনার একটা ধারাবাহিকতা আছে। এজন্যে এই তিনটি পরিচ্ছেদকে উপরোক্ত বইটির দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

আমার কাছে লিখিত নোট পাঠিয়ে যাঁরা এই বইটি রচনায় আমাকে সাহায্য করেছেন এবং যাঁদের সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে সাক্ষাৎ আলোচনার সুযোগ আমার হয়েছে তাঁদের নামের একটি তালিকা বইয়ের শেষ দিকে সংযোজিত হলো। তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। যে সমস্ত তথ্য লিখিত নোট ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলির পশ্চাদটিকায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম নির্দেশ করা হয়েছে।

তথ্য নির্দেশের উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রে প্যারার শেষে ক্রমিক নম্বর দেওয়া আছে। এসব ক্ষেত্রে পুরো প্যারার তথ্যই একই সুত্র থেকে প্রাপ্ত বলে ধরে নিতে হবে।

ঢাকা | বদরুদ্দীন উমর

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ: পূর্ব বাঙলায় দুর্ভিক্ষ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পূর্ব বাঙলা জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: পূর্ব বাঙলায় কৃষক আন্দোলন

পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব বাঙলায় দুর্ভিক্ষ

১

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি

১৯৪৭ সালের গোড়া থেকেই বাঙলাদেশে খাদ্যশস্যের, বিশেষতঃ চালের, মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। মার্চ মাসের প্রথম দিকে বাঙলা সরকারের খাদ্য বিভাগের কমিশনার এস, এন, রায় খাদ্য পরিস্থিতির ওপর একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন[১] যে, দুর্ভিক্ষের আশু সম্ভাবনা সম্পর্কে নানা মতলবপূর্ণ প্রচারণার ফলে গ্রামাঞ্চলে লোকে খাদ্যশস্য বিক্রী না করে নিজেদের ঘরে আটক রাখছে এবং তার ফলে বাজারে ধান চালের আমদানী অনেক কমে গেছে। আমদানী এইভাবে কমে যাওয়ার ফলে বাজারে শস্যের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও তিনি জানান। প্রতিবেশী প্রদেশ বিহারে এই সময় চালের মন তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকায় ওঠে এবং বাঙলাদেশ থেকে বিহারে চাল অনেকে চালান দিতে শুরু করে। এটাকেও খাদ্য কমিশনার বাঙলাদেশে চালের মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের প্রচারণা এবং খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' এই সময় 'বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি' নামে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন:

> বাঙলায় কয়েকটি জেলায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে চমকাইয়া উঠে। তাই পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ বিভীষিকায় ভীত দেশবাসীর চিত্ত চাউলের মূল্য বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।
>
> রাজনৈতিক মতলববাজদের বৈঠকাদি ও তাঁহাদের সংবাদ পত্রাদিতে যে ভাবে চাউলের মূল্যবৃদ্ধির কথা ফলাও করিয়া প্রচার করা হইতেছে এবং যে ভাবে খাদ্য পরিস্থিতির নিদারুণ চিত্র দিনের পর দিন দেশবাসীর সম্মুখে তাঁহারা চিত্রিত করিয়া তুলিয়া ধরিতেছেন তাহাতে বাস্তবিকই শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কোন কোন জেলায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে বটে। কেন যে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং

কিভাবে চেষ্টা করিলে ইহা রোধ করা যায় রাজনৈতিক মতলববাজরা তাহা জানেন। কিন্তু অভাব পরিত্রাণের বিষয়, মূল্যবৃদ্ধি হ্রাসের প্রচেষ্টায় অগ্রসর না হইয়া উল্টা পথে তাঁহারা পা বাড়াইয়াছেন। রাজনৈতিক ফায়দা উঠানোর মতলবে অনাহারক্লিষ্ট দেশবাসীর সহিত নির্মম খেলা শুরু করিয়াছেন। বিরামহীন প্রচারণা চলিতেছে, 'এবার আর রক্ষা নাই, পঞ্চাশের মন্বন্তরের চাইতেও ভয়াবহ মন্বন্তর আসন্ন।'

তাঁহাদের এই প্রচারণা দেশের খাদ্য পরিস্থিতির উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া শুরু করিয়াছে। রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানোর জন্যে মানুষ নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু এমন ঘৃণ্য ও সর্বনাশা কৌশল যে কোনো মানুষ অবলম্বন করিতে পারে, ইহা ধারণা করাও কষ্টসাধ্য।[২]

মিল্লাতের এই সম্পাদকীয়তে শুধু 'রাজনৈতিক ফায়দার' কথা উল্লেখ করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, বিশেষতঃ কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাকে এ ব্যাপারে দোষারোপ করার একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা আছে। কিন্তু এই প্রচারণার জন্য দায়ী এবং তার থেকে মুনাফার ভাগীদার কেবলমাত্র 'হিন্দু কংগ্রেস', হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি রাজনৈতিক দলগুলিই ছিলো না। মুসলিম লীগ এবং তার ভেতরে বাইরে অবস্থিত জোতদার, আড়তদাররাও তার ভাগীদার ছিলো। শোষক শ্রেণীভুক্ত হিন্দু মুসলমান এ ক্ষেত্রে মিলিতভাবে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছিলো। তারা আর একবার প্রমাণ করেছিলো যে দুর্ভিক্ষ 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ' নয়, শোষক শ্রেণীভুক্ত মানুষেরই অন্যতম অনাসৃষ্টি।

১৯৪৭ এর গোড়া থেকে খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি হতে শুরু করার পর অগাষ্ট মাসে উত্তর এবং পূর্ব বাঙলায় তা রীতিমতো ভয়াবহ আকার ধারণ করে।[৩] এই ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির একটি চিত্র পাওয়া যায় ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমার ওপর কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতায়' প্রকাশিত ননী ভৌমিকের নিম্নোক্ত রিপোর্ট[৪] থেকে:

খুট, খুট, খুট। নৌকোটি যখন খালের বাঁকে এসে পৌঁছালো তখন এই একঘেয়ে শব্দ আমার কানে বাজতে লাগলো। সকলে কথা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে হঠাৎ একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো। তারা সকলেই স্থানীয় লোক। তারা জানে এর অর্থ কি। অনেকক্ষণ

চুপ করে থেকে তাদের মধ্যে একজন ভাঙ্গা গলায় ফিস ফিস করে বললো: "তারা ঘর ভেঙে ফেলছে। তারাও চলে যাচ্ছে...."। ঢাকার বিক্রমপুরের মানুষ তাদের ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করছে। কাদাটে ধানীজমি ও ঘন সবুজ গাছ গাছড়ার মধ্যে এই সমস্ত ঘর বাড়ী একদিন হাস্য ও আনন্দ মুখরিত মানুষে ভর্তি থাকতো। কিন্তু এখন সেগুলি সব নিস্তব্ধ। গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

আবার সেই দুর্ভিক্ষ। যারা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সাথে যুদ্ধ করে ভিটে আঁকড়ে পড়ে ছিলো, যারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়ে পরে আবার ফিরে এসেছিলো, তারা নিজেদের ঘরবাড়ী আজ পরিত্যাগ করছে। চালের মূল্য মনপ্রতি ৩২ টাকা উঠেছে। মানুষ বাঁচার আশা করবে কি ভাবে?

বন্ধকী কারবারী ও মহাজনরা সেই দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজেদের উদরপূর্তি করছিলো সে সম্পর্কে রিপোর্টটিতে বলা হয়:

কাজুর পাগলাইএ একজন বড়ো স্বর্ণকারের সাথে আমার দেখা হলো। প্রাচুর্যের আবেশে চোখ দুটি অর্ধমুদ্রিত রেখে সে বললো: "মধ্য-শ্রেণীর মধ্যে দারিদ্র খুবই প্রকট। গত কয়েক বছরে আমি এত বেশী বন্ধক দিতে কখনো দেখি নি।" ৪৩ সালে তারা অনেক কিছু বিক্রী করেছিলো। এবার সব কিছুই তারা বন্ধক দিচ্ছে। মুসলমান কারিগর ও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা নিজেদের সব কিছু বন্ধকী দোকানে নিয়ে আসছে। সোনা খুব অল্পই। প্রধানতঃ রূপো এবং কাঁসার জিনিসপত্র। সোনা কারো কাছে নেই।"

মধ্যশ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্টটিতে আরও বলা হয়:

লৌহজঙ্গে কনট্রোল দরে কিছু চাল পাওয়া যায়। প্রায় ৪00 জনের মতো যথেষ্ট থাকলেও সেখানে প্রতিদিন জড়ো হয় ১৫00 মানুষ। এদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক। এমনকি মধ্যশ্রেণীর মেয়েরা পর্যন্ত সারি দিয়ে বসে থাকে। একজন হিন্দু প্রাথমিক শিক্ষক মুখে অদ্ভুত এক হাসি টেনে বললেন, "আমরা দুমাসে চার মণ আলু খেয়েছি। বাচচারা এটা আর সহ্য করতে পারছে না। মধ্যশ্রেণী এখন মিষ্টি আলু খেয়েই বেঁচে আছে।"

মধ্যশ্রেণীর থেকেও অবস্থা খারাপ দাঁড়ায় কারিগরদের। এ প্রসঙ্গে ননী ভৌমিক তাঁর রিপোর্টে লেখেন:

কিন্তু শুধু মধ্যশ্রেণীরা একাই নয়। মধ্যশ্রেণীপ্রধান গ্রামগুলির চারিপাশে যে সমস্ত কারিগররা বসবাস করে তাদের পাড়াতে এই সঙ্কট আরও অনেক গভীর। সেখানে মানুষ আরও সহায়হীন। বিগত দুর্ভিক্ষে তাদের জীবিকার উপায় নষ্ট হয়েছে, তাদের মৃতদেহই সে সময় দেখা গেছে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকতে। তাদের কারও কোন জমি নেই, অনেকের নিজেদের বলতে কোন ঘরবাড়ীও নেই।

কালাচাঁদ পোদ্দারের বাড়ী। সে তিন মাস পূর্বে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। এখানে তার বউ এবং তিন সন্তান থাকতো। সে কথা দিয়েছিলো তাদেরকে টাকা পাঠানোর। তিন মাসে এসেছে মাত্র দশ টাকা। একটা কাঁসার বাসন বিক্রী করা হয়েছে। তারপর একটা কানের দুল। কিন্তু এখন? আমার সঙ্গী জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদেরকে কি উপোস থাকতে হয়?" কালাচাঁদের বউ দরজার খুঁটি ধরে ঘোমটা দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর ধীরে ধীরে বললো, "তাছাড়া আর কি?"

বীরভূম, বাঁকুড়ায় আমি চিরদুর্ভিক্ষাবস্থা দেখেছি। সেখানে নিম্ন-শ্রেণীর মানুষেরা বাঁচার চেষ্টা পর্যন্ত করে না। তারা সোজা মরে যায়। এখানে কিন্তু অবস্থা অন্য রকম। এখানে মানুষ শেষ পর্যন্ত লড়াই করে। কিন্তু এবার তাদের লড়াই পর্যন্ত বৃথা হচ্ছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরদের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্টটিতে ননী ভৌমিক বলেন:

"ঋষি" শ্রেণী গোয়াজিবন্দায় বাস করে। তারা চর্মকার। সেখানে ষাটটি পরিবারের বসবাস। গত দুর্ভিক্ষে সাতাত্তরজন সেখানে মারা গেছে। চামড়ার কাজের জন্য কোন চামড়া আজ নেই। জমির ওপর চাপ আজ বেড়েছে। কেউ কেউ ঝুড়ি তৈরী করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক বেলার বেশী আহার তাদের জোটে না। অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও সেই এক কথা। জেলে, তাঁতী, কৃষক, হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই এক ভাগ্য—মৃত্যু।

বাণীগাঁও এ তাঁতীদের পাড়া। এখানে তের হাজার মানুষ বাস করে। সাতষট্টি পরিবার অর্ধ উপবাসের মধ্যে আছে, দুটি পরিবার উপোষ করছে।

ইব্রাহিম এবং ওমর আলী দুই ভাই। একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ

ছয়জন। পাঁচ গজ জায়গায় একটা টিনের ঘরের মধ্যে তারা থাকে। তাঁত এখন নিস্তব্ধ এবং তাদের কোন খাদ্য নেই। তারা বললো, "আমরা উপোস করছি। সুতো কোথায়? আমরা কনট্রোলের থেকে কিছু পাই—কিন্তু কার্ড মহাজনের কাছে জমা দেওয়া আছে।* সে কখনো সখনো দুই এক টাকা দেয়।" শুধু কার্ড নয়, এই ছয় জনের জীবনই মহাজনের কাছে বন্ধক দেওয়া আছে।

মেদনীমণ্ডা গ্রামে ১২০টি জেলে পরিবার ছিল। দুর্ভিক্ষের (১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ—ব. উ.) পর সেখানে আছে ৭০টি পরিবার। এখন তাদের মধ্যে ৪০টি অর্ধাহারে জীবন কাটাচ্ছে। বিক্রমপুরের কারিগররা ধ্বংসের মুখোমুখী।

সব থেকে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কথা কেউ বলছে না। রিলিফ দাবী করার কথা কেউ চিন্তা করছে না। এই দুর্ভিক্ষাবস্থাতেও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির প্রসঙ্গে রিপোর্টে বলা হয়:

হিন্দু ভদ্রলোকরা বলছে: সকলেই চলে যাচ্ছে। আমাদের মনে হয়, আমাদেরও চলে যাওয়া দরকার। তারা কয়েকদিনের পুরানো খবরের কাগজে সিন্ধের ঘটনাবলীর কথা, অন্য কোন জায়গায় স্ত্রীলোক অপহরণের কথা পড়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। চালের মূল্য কমবে কিনা তারা সেটা জিজ্ঞেস করে না। তারা জানতে চায়, "আমাদের পক্ষে কি এখানে থাকা সম্ভব হবে?"

শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। তারা সর্বত্র জোর গুজব কান পেতে শোনে। মধ্যবিত্তেরা চলে যাচ্ছে। তারাও সস্তা খাদ্য পাবে কিনা জিজ্ঞেস করে না। হতাশায় তারা চীৎকার করে ওঠে: তারা সকলে চলে যাচ্ছে। আমরা কিভাবে থাকবো, কার কাছে আমরা কাজ করবো এসব কথা চিন্তার কোন পরোয়া তারা করে না।"

পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে। মুসলমানরা আশা করে যে দ্রব্যমূল্য এখন কমে আসবে। তারাও এখন বিশেষভাবে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কোন চিন্তা করে না। তারা পালিয়ে যাচ্ছে না; তারা আশার এই সামান্য আলোক ধরে থেকে যাচ্ছে। ভেতরে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি

* মহাজন কনট্রোলের এই রেশন কার্ড নিজের কাছে রেখে সেটা দিয়ে সুতো কেনে এবং চড়া দরে অন্যের কাছে বিক্রী করে অতিরিক্ত মুনাফা কামায় (ব. উ)

এবং অসহায় প্রতীক্ষা। এই সব উপবাসী মুসলমানরা নিজেদের নেতাদের দিকে বিরাট আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে।

কুকুটিয়া ইউনিয়নের অবস্থা সম্পর্কে ননী ভৌমিক লেখেন:

কুকুটিয়া ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে প্রায় ৫০ জন স্ত্রীলোক জড়ো হয়েছে। তারা শুনেছে যে, তাদেরকে বিনা পয়সায় চাল দেওয়া হবে। তারা নিজেদের রেশন কার্ড সাথে করে এসেছে। হিন্দু মুসলমান কারো কার্ডেই কোন জমা নেই। জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত একদানা চালও তারা পায়নি।

প্রত্যেককে চার সের করে খুদ দেওয়ার কথা। তাও আবার সকলকে দেওয়ার মতো যথেষ্ট নেই। কিন্তু তবু তারা এসেছে। ভাঙ্গা-ফুটো নৌকায় চড়ে মেয়েরা এসেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সাঁতরে নদী পার হয়েছে।

তাদের মধ্যে ছিলো রাজুবালা। সে বেশ কয়েকদিন ধরে উপোস করছিলো। কখনো তিন দিন বুক পর্যন্ত জল পার হয়ে, কখনো সাঁতরে এসে সে "কনট্রোলে" চাল পাওয়ার চেষ্টা করছে। কিসারা বেওয়া নামে একটি অন্ধ বৃদ্ধা মেয়েও এসেছিলো। বাড়ীতে সে রেখে এসেছিল তার বউ এবং তিনটি নাতিকে। নর্তন বিবি, সুরবালা, কাহিরণ এবং আরও অনেকে। তারা সকলেই এসেছে এবং তাদের সকলের চোখে মুখে সেই একই মর্মান্তিক কাহিনী লেখা আছে। দুর্ভিক্ষের কথা বলায় তারা সকলে এক সাথে বিড়বিড় করে বলে: "আকাল—হায় আল্লা। আমরা পাটশাক সিদ্ধ খেয়ে থেকেছি, ঢাকায় গেছি আর ফেনের জন্য চীৎকার করেছি। সেই আকাল আবার আসছে।"

একটি কুঁজো মুসলমান বৃদ্ধা এক কোণে চুপচাপ বসেছিলো। সে ফিসফিস করে বললো: "গতবারে আমি বাড়ীতে ছিলাম, কিন্তু এবারে আমাকেও বাইরে আসতে হয়েছে।"

এই ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি এবং দুর্ভিক্ষাবস্থা সম্পর্কে সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে ননী ভৌমিক কুকুটিয়া ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের সাথে নিম্নলিখিত কথোপকথনের বর্ণনা দেন:

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে আমি জিজ্ঞেস করলাম "এখানকার

দুস্থ লোকদের সংখ্যা কত তার কোন হিসেব কি আপনি তৈরী করেছেন?" "না।"

"আপনি কি জানেন কখন আপনি রিলিফের জন্যে আরও চাল পাবেন?"

"না।"

"কর্তৃপক্ষেরা কি আপনার প্রয়োজন সম্পর্কে আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি?"

পূর্বের মতোই অবিচল থেকে তিনি বললেন, "না। আসুন আমরা যা পেয়েছি সেটাই বিলি করে শেষ করে দি। আমাদের কাজ এখানেই খতম।

ননী ভৌমিকের এই রিপোর্ট ছাড়াও ত্রিপুরার ওপর আনন্দ পালের আর একটি পৃথক রিপোর্ট কমিউনিষ্ট পার্টির ইংরেজী সাপ্তাহিক মুখপত্র 'পিপল্‌স্ এজ' এ ছাপা হয়।* তাতে আনন্দ পাল বলেন:

সমগ্র ত্রিপুরা জেলা নিদারুণ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়েছে। আউষ ফসল হয়নি এবং জনসংখ্যার শতকরা নিরানব্বই জনকে তাদের চালের জন্য বাজারের ওপর নির্ভর করতে হয়। চালের দর প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ তা বিক্রি হচ্ছে মণপ্রতি ৩৫ টাকায়।

এর ফলে অধিকাংশ লোক তিন চার দিনে একবার মাত্র ভাত খেতে পায়। অন্যান্য দিনে তারা আলুসেদ্ধ বা 'আরবী' খেয়ে থাকে। দু মাস আগে যখন পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে শুরু করলো তখন স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টি এবং কৃষক সভা সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সমূহে কতকগুলি অন্নছত্র খোলে। এখন প্রত্যেকদিন শত শত মানুষ—হিন্দু, মুসলমান, পুরুষ, নারী, শিশু সেই সমস্ত অন্নছত্রে এসে হাজির হচ্ছে।

লাকসাম থানার বিজনিয়াবাজার এলাকায় এই ধরনের একটি অন্নছত্রে আমি প্রায় ৪০০ হিন্দু মুসলমান কৃষককে দেখলাম। পুরানো টোল খাওয়া মগ এবং মাটির বাসন নিয়ে খিচুড়ির আশায় তাদের বসে থাকা—সে এক করুণা উদ্রেককারী দৃশ্য।

তাদের মধ্যে অধিকাংশই নয় থেকে আঠারো বিঘে জমির মালিক ছিলো। বকেয়া খাজনা এবং ক্রমাগত বাড়তি ঋণের দায়ে তাদের

জমি চলে গেছে। কপর্দকহীন হয়ে তারা রাস্তায় দাঁড়িয়েছে এবং পরিণত হয়েছে ভিক্ষুকে।

৫৫ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ আবদুর রহমানের ভাগ্যেও তাই ঘটেছে। সে নিজের দুটি নাতিকে সাথে করে পাশের গ্রাম থেকে এসেছে। দ্বারকানাথেরও সেই এক কাহিনী। পাঁচজন পোষ্য সহ গোপাল দাসও আজ ভিখারী।

এক হাঁড়ি খিঁচুড়ী নিয়ে বসে থাকা অবস্থায় কাসেম আলীর কুঞ্চিত গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো: "একদিন আমার আঠার বিঘে জমি ছিলো। আমি অনেক গরীব মানুষকে নিজেই খাবার দিয়েছি। আর এখন, আমি নিজেই হলাম একজন ভিখারী।"

এই এলাকার ৩৭টি গ্রামের থেকে প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৫০০ জন খাদ্যের জন্যে এখানে আসে। প্রায় ৪০ জনকে বিনা পয়সায় চাল দেওয়া হয়।

চান্দিনা থানার দেওরা ইউনিয়নে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং কৃষক সভা যৌথভাবে এই অন্নছত্র চালাচ্ছে। এখানে প্রতিদিন ৫০০ এর বেশী হিন্দু মুসলমান কৃষক খাদ্য পায়।

ঐ একই এলাকায় ভাউকসার গ্রামে আর একটি অন্নছত্রও চালু আছে। এখানে ২২৫ জন হিন্দু-মুসলমান দুস্থকে খেতে দেওয়া নতুবা তাদেরকে বিনামূল্যে চাল দেওয়া হয়।

বর্তমান অন্নছত্র গুলিতে মানুষ যত দলে দলে এসে হাজির হচ্ছে ততই অবস্থার অবনতি ঘটছে এবং রিলিফের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণের রিলিফ কমিটি রিলিফের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে অর্থের আবেদন জানিয়েছে।

২
পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার মন্ত্রীদের কাছে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার খোলা চিঠি

১৫ই অগাষ্ট, ১৯৪৭ অর্থাৎ ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিকতার অবসান এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান ও ভারতের প্রতিষ্ঠা দিবসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার মন্ত্রীদের কাছে একটি খোলা চিঠিতে সমগ্র খাদ্য পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে তাঁদেরকে তৎক্ষণাৎ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্যে আহ্বান জানান।[১]

পূর্ব বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রথমে তাঁরা বলেন:

ঠিক এই মুহূর্তে যখন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছে তখন এক ভয়াবহ খাদ্য সঙ্কট সমগ্র বাঙলাদেশকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। এই সঙ্কটের চরিত্র অবশ্য দুই বাঙলাতে স্বতন্ত্র।

পূর্ব বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি খুবই খারাপ। চালের মূল্য ৩০ টাকার উপরে উঠে গেছে। কেবলমাত্র ছয় লক্ষ লোকের জন্যে রেশনিং চালু হয়েছে এবং সেখানেও রেশন দোকানগুলিতে প্রায়ই সরবরাহ বন্ধ থাকে। গ্রামাঞ্চলে কোন কোন ঘাটতি এলাকায় যে আংশিক রেশনিং চালু করা হয়েছিলো তাও অনেক আগেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। রিলিফ বিতরণ অথবা মূল্য কমিয়ে আনার জন্যেও খাদ্য সরবরাহ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

এর ফলে হিন্দু মুসলমান সকলকেই আজ পাইকারীহারে উপবাস থাকতে হচ্ছে। ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে যে বেসরকারী অন্নছত্রগুলি খোলা হয়েছে সেগুলি আমাদেরকে ১৯৪৩ সালের ভয়ানক দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অনাহারে মৃত্যুর খবর ক্রমাগতই আসছে। বিশালভাবে গ্রাম পরিত্যাগ করে মানুষ দলে দলে শহরের দিকে পাড়ি জমাচ্ছে। পূর্ব বাঙলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এখন সত্যিকার দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে।

পশ্চিম বাঙলার পরিস্থিতি সম্পর্কে কৃষক সভার এই দলিলটিতে নিম্নোক্ত বিবরণ দেওয়া হয়:

পশ্চিম বাঙলায় কলকাতা এবং বিভিন্ন জেলায় ষাট লক্ষ, অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মানুষ রেশন প্রথার অধীনে আছে। এ জন্যেই এখানে চালের মূল্য পূর্ব বাঙলার মতো এতো উঁচুতে উঠতে পারেনি। গ্রামাঞ্চলে চাল ১৮ থেকে ২৫ টাকা দরে বিক্রী হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষক শ্রমিকদের পক্ষে এই দরেও কেনা সম্ভব হচ্ছে না এবং তাদের অধিকাংশই উপবাসী থাকছে।

যে সমস্ত জায়গায় রেশন প্রথা আছে সেখানে দৈনিক রেশন হিসেবে মাত্র পাঁচ ছটাক দেওয়ার ফলে তারা অন্ততঃ অর্ধ উপবাসী অবস্থায় থাকছে। গত ১৪ই জুলাই থেকে মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলাতে রেশন প্রথা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এমনকি কলকাতা

শহরেও রেশন দোকানগুলিতে সরবরাহ খুব অনিয়মিত হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে যে সরকারী মজুদ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেছে। মানুষ পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছে: মাদ্রাজের মতো এখানেও কি দৈনিক রেশন আরও কমিয়ে দেওয়া হবে? না রেশনিং ব্যবস্থা পুরোপুরিই ভেঙ্গে পড়বে?

প্রকৃত খাদ্য ঘাটতির কথা অস্বীকার করে কৃষক সভায় এই চিঠিতে বলা হয় যে সেই ধরণের সঙ্কটময় খাদ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ ছিলো না। সরকারী হিসেব মতো বিচার করলেও এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। খাদ্য কমিশনার এস, কে, চ্যাটার্জীর ৬ই মার্চ, ১৯৪৭, তারিখের বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁরা বলেন যে পূর্ববর্তী শীতে ৮৫ লক্ষ টন আমন চাল উৎপন্ন হয়েছে এবং পরবর্তী শরতে ২৩ লক্ষ টন আউষ আশা করা যাচ্ছে। অর্থাৎ খাদ্য বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে ১০৫ লক্ষ টন প্রয়োজনের তুলনায় উৎপন্ন হচ্ছে ১০৮ লক্ষ টন। যাই হোক চিঠিতে তাঁরা বলেন যে এই সব হিসেবের মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও জুলাই মাসে কোন খাদ্য ঘাটতির প্রশ্ন উঠতে পারে না। কাজেই বাঙলাদেশের ট্রাজেডী হলো—"খাদ্যের প্রাচুর্যের মধ্যে দুর্ভিক্ষ।"

সরকার খাদ্য সংগ্রহ করতে কেন ব্যর্থ হয়েছেন সে সম্পর্কে কৃষক সভা এই চিঠিতে বিস্তারিতভাবে নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখ করেন:

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর থেকে বাঙলা সরকারের অনুসৃত খাদ্য নীতির সারাংশ হলো: 'জনগণকে খাদ্য দানের জন্য জোতদার ও কালোবাজারীদের ওপর আস্থা রাখো।'

প্রধান প্রধান এজেন্সীগুলি এ বছর তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমলাতন্ত্র দাবী করছে যে তারা এখন সরাসরি সরকারী সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু করেছে। এখন আমাদের খাদ্য বিভাগের বিভিন্ন প্রক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

(১) খাদ্য সংগ্রহ:

সংগ্রহ বিভাগের নির্দেশসমূহ জনগণের জন্যে মহা গোপন ব্যাপার। আমরা কেবল তার প্রয়োগ সম্পর্কেই জানতে পারি। শুধু সরকারের জন্যে ধান চাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ধানকলগুলিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। ধান চালের ব্যবসার জন্যে ব্যক্তিগতভাবেও অনেককে

লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাদের দ্বারা ক্রীত সমগ্র মজুদ সরকারের কাছে বিক্রীর কোন রকম বাধ্যবাধকতা নেই।
বড়ো বড়ো খাস জমির মালিকদের জন্যেও লাইসেন্স নেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তারাও তাদের উদ্বৃত্ত মজুদের সমগ্র অথবা কিছু অংশ সরকারের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য নয়। কাজেই সরকারের কাছে বিক্রীর জন্যে ব্যবসায়ী অথবা জোতদার কারো কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

(২) মূল্য নির্দিষ্ট নেই:

ধান কল থেকে সরকারের কাছে ধান চাল বিক্রীর দর খুব কম নির্ধারণ করা হয়েছে—ধান ৬ টাকা ৪ আনা মণ এবং চাল ১০ টাকা ১৪ আনা মণ। কিন্তু ব্যবসায়ী অথবা জোতদারদের দ্বারা অন্যত্র বিক্রীর ক্ষেত্রে কোন দর নির্ধারিত হয় নি।
ধান চাল চলাচলের ব্যাপারে তাদেরকে কতকগুলো বিধিনিষেধ মেনে চলতে হলেও এর ফলে সরকারের খাদ্য নীতি অনুসারে সরকার ছাড়া অন্যদের কাছে যে কোন দরে বিক্রীর জন্যে আড়তদার ও জোতদাররা স্বাধীনতা পায়।

(৩) কর্ডন ও বিধিনিষেধ:

বিশেষ বিশেষ এলাকার চতুর্দিকে কর্ডন আছে এবং তার বাইরে চলাচল নিষিদ্ধ। কর্ডনের মধ্যে এক কালে ২০ মণ পর্যন্ত চলাচল করতে দেওয়া হয়। চলাচলের উপর এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞা এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অধীনস্থ পেট্রোল পার্টির দ্বারা বলবৎ রাখার কথা।

(৪) খাদ্য বিভাগে দুর্নীতি:

এখানেই আমরা দেখতে পাই বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের সংগ্রহ, এনফোর্সমেন্ট, মজুত ও বিতরণ ইত্যাদি সকল শাখায় প্রচলিত দারুণ দুর্নীতির। আইন তৈরী হয় আড়তদার অথবা জোতদারদের হাত বাঁধার জন্য নয়, ডিপার্টমেন্টের লোকদের ঘুষ খাওয়ার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য।

(৫) জনগণের সহযোগিতার ওপর নিষেধাজ্ঞা:

সর্বশেষে, এই খাদ্যনীতির প্রয়োগ কিভাবে হচ্ছে জনগণের পক্ষ থেকে তা দেখা শোনার কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। সংগ্রহ এবং

এনফোর্সমেন্ট বিভাগ জনগণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বিতরণ দেখা-শোনার জন্য খাদ্য কমিটিসমূহ গঠিত হয়েছিলো কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এখন সেগুলির বিলোপ সাধন করা হয়েছে। এইভাবে খাদ্যনীতি জনগণের খাদ্যকে নিরাপদে জোতদার ও চোরাকারবারীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সংগ্রহের কাজ বানচাল করে জনগণের জন্য দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করছে।

এর থেকেই বোঝা যায় এ বৎসর জুন মাসের শেষ পর্যন্ত সরকার ৩'৫৮ লক্ষ টনের বেশী কেন সংগ্রহ করতে পারেন নি। গত বৎসরের থেকে এই অঙ্ক মাত্র ২৫ হাজার টন বেশী। উৎপন্ন খাদ্যের একটা বিরাট অংশ জোতদারদের কাছে মজুত আছে এবং ইতিমধ্যেই তারা তার একটা অংশ চোরাকারবারী ব্যবসায়ীদের কাছে হস্তান্তর করেছে। একদিকে কৃষক জনতার ক্রমাগত দারিদ্র বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে খাস জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এই হলো যুদ্ধকালীন বৎসরগুলিতে গ্রাম্য অর্থ-নীতির পরিবর্তনের ধারা। খোদ কৃষকের শতকরা একচল্লিশ ভাগই আজ ভাগচাষী (অধ্যাপক এ, ঘোষ, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউট)। হিসেব অনুসারে ১ কোটি ২০ লক্ষ একরের বেশী জমি বর্গা-প্রথায় চাষ আবাদ হয়। এই বর্গা প্রথার মাধ্যমেই বিক্রয়যোগ্য অতিরিক্ত চাল মাত্র অল্পসংখ্যক জোতদারের হাতে একচেটিয়াভাবে চলে যায়। কাজেই প্রয়োজন ও সরবরাহের নিয়ম নয়, একচেটিয়া কর্তৃত্বের নিয়মই ধান চালের মূল্য নির্ধারণ করে।

সরকারের খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যর্থতার উপরোক্ত কারণগুলি উল্লেখের পর খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে কৃষক সভার পক্ষ থেকে এখানে বলা হয় যে প্রচলিত খাদ্য নীতির বিলোপই লক্ষ লক্ষ মৃত্যুপথ যাত্রী মানুষের দাবী। খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে জনগণের ওপর আস্থাই নোতুন সরকারের খাদ্যনীতির মূল ভিত্তি হওয়া উচিত বলেও তাঁরা উল্লেখ করেন। এ পর্যন্ত খাদ্যনীতির কাহিনী হচ্ছে জোতদার ও চোরাকার-বারীদের সাথে আঁতাত এবং তাদের ওপর ক্রমবর্ধমান আস্থার কাহিনী। এর পরিবর্তে নোতুন খাদ্যনীতির যুগ হওয়া উচিত খাদ্য উৎপাদক কৃষক ও সাধারণ মানুষের সাথে মৈত্রী এবং তাদের ওপর আস্থার যুগ। এই নীতির ওপর ভিত্তি করে বঙ্গীয় কৃষক সভা দুই বাঙলার মন্ত্রীসভার কাছে নিম্নোক্ত খাদ্য পরিকল্পনার সুপারিশ করেন:

(ক) দুই বাঙলাতেই খাদ্য আছে

এই বৎসরের কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য পশ্চিম বাঙলায় আরও তিন লক্ষ টন এবং পূর্ব বাঙলায় সাড়ে তিন লক্ষ টনের প্রয়োজন হবে। নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি জরুরী আইন প্রণয়ন করা দরকার :—

(১) ২৫ বিঘা অথবা তার অধিক জমির মালিকদেরকে একটা নির্দিষ্ট উচিত মূল্য দিয়ে তাদের থেকে সমস্ত অতিরিক্ত মজুত বাধ্যতামূলক-ভাবে রিকুইজিশন। আউষ ধান সংগ্রহের কাজ শুরু করা।

(২) ধান কল ও কারবারীদেরকে প্রদত্ত সমস্ত লাইসেন্স বাতিল করে লাইসেন্সের মাধ্যমে তাদের সমস্ত মজুত শস্য নির্দিষ্ট উচিত মূল্যে সরকার কর্তৃক ক্রয়।

(৩) যে সমস্ত ধানকলগুলি সরকারের খাদ্য পরিকল্পনা বানচাল করার চেষ্টা করছে সেগুলি রিকুইজিশন করে সরকারী নিয়ন্ত্রণে চালু করা।

(৪) জনগণের সহযোগিতায় ২৫ বিঘা অথবা তদোর্ধ খাস জমির মালিকদের অতিরিক্ত মজুতের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করা। এই সংগ্রহ ও মজুত বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য আইন অনুযায়ী অথবা আইনের দ্বারা স্বীকৃত জনগণের যে কমিটিগুলি গঠিত হবে সেগুলির নির্বাচনে ২৫ বিঘা অথবা তদোর্ধ জমির মালিকদের অংশ গ্রহণ করতে না দেওয়া অত্যাবশ্যক।

(৫) সারা বৎসরের জন্যে ধানের মূল্য ৮ টাকায় নির্দিষ্ট রাখা এবং উচ্চতর মূল্যে ক্রয় অথবা বিক্রী দণ্ডনীয় করা উচিত।

(৬) চাষীর দখলভুক্ত জমি থেকে তার উচ্ছেদ রহিত করা উচিত।

(৭) খাদ্য ও রিলিফ বিতরণ জনগণের কর্তৃত্বে রাখা উচিত।

(৮) উপরোক্ত জরুরী ব্যবস্থাসমূহ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে এখনই কিছু সরবরাহের ব্যবস্থা করা উচিত।

(খ) সংগ্রহ ও বিতরণের সাধারণ নীতি

সাধারণ সংগ্রহ নীতিকে নিম্নোক্ত নীতিগুলির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা উচিত :

(১) রেশনিং : কৃষি অর্থনীতি পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমানে যে সমস্ত এলাকায় রেশনিং চালু আছে সেখানে তা চালু রাখা এবং

সমস্ত শহর ও ঘাটতি এলাকায় তা সম্প্রসারণ করা। বর্তমান রেশনিং আইনের মেয়াদ ছয় মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং একটি নোতুন রেশনিং আইন পাশ করা উচিত। নিম্নতম দৈনন্দিন রেশন হওয়া উচিত মাথাপিছু আধ সের।

(২) উৎপাদক-ক্রেতা সমবায়: উৎপাদক-ক্রেতা সমবায় গঠনের জন্য একটি নোতুন আইন পাশ করা উচিত। এই সমবায়গুলিকে সমবায় বিভাগের অধীনে না রেখে উপরোক্ত আইনে বিশেষভাবে গঠিত জনগণের খাদ্য কমিটির নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বে (Supervision) রাখা উচিত।

(ক) এই সমবায়গুলির মাধ্যমেই সমস্ত খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করা উচিত।

(খ) এই সমবায়গুলির মাধ্যমে সমস্ত অতিরিক্ত খাদ্য বাধ্যতামূলকভাবে সংগ্রহ করা উচিত। নিদারুণ খাদ্য সঙ্কটের পুনরাবৃত্তি যাতে ঘটতে না পারে তার জন্য ধান চালের ব্যক্তিগত ব্যবসা বেআইনী করে সরকার কর্তৃক একচেটিয়াভাবে সমস্ত অতিরিক্ত মজুত সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু করা উচিত।

(গ) এই সমবায়গুলির মাধ্যমে উৎপাদনকারীরা যাতে নিজেদের জিনিস বিক্রীর জন্যে উৎসাহ বোধ করেন সেই উদ্দেশ্যে কৃষকদের বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিম্নতম চাহিদা মেটানোর জন্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদেরকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া উচিত।

(৩) জনগণের খাদ্য কমিটি: ন্যায়সঙ্গত বিতরণের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনগণের খাদ্য কমিটিকে নোতুনভাবে গঠন করা উচিত।

(গ) খাদ্য উৎপাদন:

খাদ্য সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান প্রচুর খাদ্য উৎপাদনের মধ্যেই নিহিত এবং তা সম্ভব একমাত্র ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে। বাঙলাদেশের জমিদারী ব্যবস্থাই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। জমিদারী ব্যবস্থার থেকে উদ্ভূত জোতদারী ও আধি কৃষিকার্যের সাথে সম্পর্কহীন মাত্র অল্প কয়েকজন মালিকের হাতে জমি এবং শস্য কেন্দ্রীভূত

করেছে। সেজন্যেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য এখনই নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন:

(১) নোতুন আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত চাষীকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা স্থগিত রাখতে হবে;

(২) কয়েকজন বড় জোতদারের হাতে ক্রমবর্ধমান হারে খাদ্য মজুত বন্ধ করতে হবে। ভাগচাষীকে ফসলের এমন একটা নিম্নতম ভাগের (দুই তৃতীয়াংশ) নিশ্চয়তা দিতে হবে যা তার উৎপাদন ও জীবন ধারণের খরচ যোটাতে পারে। দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে তে-ভাগার দাবী খুবই ন্যায় সঙ্গত এবং তাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এখনই একটা জরুরী আইন পাশ করা উচিত;

(৩) তোলায় খাজনা (Rent in kind) এখনই বিলোপ করতে হবে;

(৪) সমস্ত পতিত জমি এখনই চাষের জন্য গরীব কৃষক ও ভূমি-হীন শ্রমিকদের হাতে তুলে দিতে হবে;

(৫) জমিদারী উচ্ছেদের জন্য এখনই একটি বিল পেশ করে এক বৎসরের মধ্যে তাকে আইনে পরিণত করতে হবে। এই আইন খাস দখলে ৭৫ বিঘার উপর সমস্ত জমি গরীব কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণের এবং কৃষিকার্যের সাথে সম্পর্কহীন যে সমস্ত দুস্থ পরিবারের জমি রাষ্ট্র নিয়ে নেবে তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ব্যবস্থা থাকবে;

(৬) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জনগণের সহযোগিতা ও রাষ্ট্রীয় সাহায্যের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করা উচিত; শস্য ব্যাঙ্কের মাধ্যমে চাষীদেরকে নগদ অর্থ এবং সস্তায় ধান কর্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার;

(৭) নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর মাধ্যমে ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যে-কার বিবাদ মীমাংসার জন্য একটি আইন করা উচিত;

(৮) খাদ্য সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাধারণ খাদ্য-নীতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে উভয় রাষ্ট্রের জন্য একটি যুক্ত খাদ্য কাউন্সিল থাকা উচিত।

কৃষক সভার এই খাদ্য সংগ্রহের সুপারিশ মালাবারে প্রচলিত ব্যবস্থার অনুরূপ বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া যুক্ত প্রদেশ ও

মাদ্রাজে আইনের দ্বারা কৃষক উচ্ছেদ বন্ধের এবং জমি সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্যে মাদ্রাজে একটি পৃথক আইন প্রণয়নের কথাও তাঁরা উল্লেখ করেন।

এর পর উভয় বাঙলার মন্ত্রীসভা জনপ্রিয় খাদ্যনীতির মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসবেন এই মর্মে আশা প্রকাশ করে এবং এ ক্ষেত্রে কৃষক সভার পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তাঁরা বলেন:

> হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের মিলিত গণসংগঠন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই এবং বাঙলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করছে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় স্বাধীন, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য পূর্ণ সহযোগিতার জন্য তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে।

এর পর দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নির্যাতন বন্ধের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে কৃষক সভার পক্ষ থেকে সমস্ত নির্যাতনমূলক আদেশ প্রত্যাহার করে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান হয়:

> আজকের পরিস্থিতিতে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সাফল্যের সাথে লড়াই করতে হলে নাগরিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সকল রাজনৈতিক বন্দীকে সাধারণভাবে মুক্তিদান অবশ্য প্রয়োজনীয়। খাদ্য সঙ্কটের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন পরিচালনার জন্য নির্যাতন প্রত্যাহার করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতেই হবে।
>
> কৃষকরা বুঝুক যে তাদের নিজেদের নেতারাই ক্ষমতায় এসেছে: দেশকে তারা কখনো নিরাশ করবে না।

বলাই বাহুল্য কৃষক সভার এই সমস্ত সুপারিশ অনুযায়ী দুই বাঙলার কোন অংশেই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কোন প্রচেষ্টা হয়নি। পশ্চিম বাঙলার কলকাতা এবং অন্যান্য অঞ্চলে রেশনিং ব্যবস্থা অনেকখানি বেশী এলাকা জুড়ে চালু থাকায় পূর্ব বাঙলার তুলনায় সেখানে খাদ্য সঙ্কট এতো তীব্র আকার ধারণ করে নি। তবে পূর্ব বাঙলার বিস্তৃত এলাকায়, বিশেষতঃ ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, সিলেট ইত্যাদি জেলায় ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং সেই অবস্থাকে আয়ত্বে আনার জন্যে সরকারী উদ্যোগ খুব সীমিত থাকে। এরপর সেপ্টেম্বর মাসে বুরো ফসল ওঠার পর বাজারে ধানচাল পূর্বাপেক্ষা বেশী আমদানীর

ফলে এবং সরকারী গুদাম থেকে বিভিন্ন ঘাটতি এলাকায় কিছু পরিমাণ চাল পাঠানোর ফলে ১৯৪৭ এর শেষের দিকে খাদ্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। কিন্তু এই সাময়িক উন্নতির পর ১৯৪৮ এর প্রথম থেকেই খাদ্য সঙ্কট আবার বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় তা ব্যাপক আকার ধারণ করে।

৩

কর্ডন প্রথা উদ্ভূত পরিস্থিতি

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় থেকেই বাঙলাদেশের বিহার সীমান্তে কর্ডন প্রথা চালু হয়। কারণ বাঙলায় তখন দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় বিহার থেকে খাদ্য শস্য বাঙলাদেশে চলে আসছিলো এবং তাতে বিহারেও খাদ্যাভাব ঘটার সম্ভাবনা ছিলো। এই সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্যে তৎকালীন বৃটিশ ভারত সরকার বাঙলা-বিহার সীমান্তে কর্ডন প্রথা চালু করেন।

১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মাসে দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাঙলায় যে কর্ডন প্রথা চালু করা হয় তার মূল উদ্দেশ্য ছিলো আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ। পূর্ব বাঙলা সরকার মনে করেছিলেন যে সতেরোটি জেলার মধ্যে আটটি উদ্বৃত্ত জেলার ধান চাল সংগ্রহ করে তাঁরা ঘাটতি এলাকাগুলিতে নিয়ে যাবেন। এর ফলে ঘাটতি এলাকার ঘাটতি যেমন একদিকে পূরণ হবে, অন্যদিকে তেমনি সাধারণভাবে চালের মূল্যও হ্রাস পাবে।

যে সমস্ত জেলাতে* তখন কর্ডন ছিলো সেগুলির বাইরে কোন ধান চাল বেসরকারীভাবে জেলার বাইরে যাওয়া ছিলো নিষিদ্ধ। কেউ যাতে বেআইনীভাবে ধান চাল কর্ডন এলাকার বাইরে নিয়ে যেতে না পারে তার জন্যে জেলার চারিদিকে তখন সরকারী পাহারার ব্যবস্থা ছিলো। জেলা কর্ডনিং অফিসাররা এই পাহারার দায়িত্বে ছিলেন এবং স্থলপথ ও জলপথে চোরাচালান বন্ধের জন্যে তাঁদের অধীনে তখন যে সমস্ত পেট্রোল পার্টি থাকতো তারা নৌকা, স্পীড বোট, এবং অন্যান্য যানবাহনের সাহায্যে

* ময়মনসিং জেলা উদ্বৃত্ত হিসেবে সেখানে কর্ডন থাকলেও সেই জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমা ঘাটতি এলাকা হওয়ার সেখানে ঐ সময় কর্ডন ছিলো না। শুধু মহকুমাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ থানা এলাকার জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা চালু ছিলো।

জেলাগুলির সীমান্ত পাহারা দিতো। বরিশাল ও খুলনা জেলা সমুদ্রের ধারে অবস্থিত থাকায় এই দুই জেলা থেকে সমুদ্রপথে চোরাচালানীরা ধান চাল পাচার করতো। এজন্যে এই দুই জেলায় সমুদ্রগামী লঞ্চও কর্ডনিং অফিসারদেরকে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু এত সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও সরকারের দ্বারা চোরাচালান বন্ধ করা ঠিকমতো সম্ভব হতো না।

কোন চোরাচালানকারী মালসহ সরকারী পেট্রোল পার্টির হাতে ধরা পড়লে আইনতঃ তার সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত করার নিয়ম ছিলো। কিন্তু চোরাচালান ব্যতীত বেচা কেনার ব্যাপারে অন্য কোন বেআইনী কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়লে নিয়ম ছিলো তাদের সমস্ত মাল শাস্তিমূলক দরে কিনে নেওয়া। এই ধরনের বেআইনী কাজ যে শুধু ব্যবসায়ীরাই করতো তাই নয়, সে সময়কার অনেক গণ্যমান্য এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিও অনেক সময় ধান চাল কেনা বেচার ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকতেন।

এই ধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।[১] খুলনা বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার সীমান্তে মাথিভাঙা নামে ফরিদপুরের মোহন মিঞাদের একটি চর এলাকা ছিলো। সেখানে তাঁরা নিজেদের তত্ত্বাবধানে ধান চাল বেচা কেনার একটি কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সে সময়ে এ ধরনের কোন বিক্রয় কেন্দ্র আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিলো এবং সেই হিসেবে সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোনরকম বেচাকেনা আইনতঃ ছিলো দণ্ডনীয়। মাথীভাঙায় ধান চালের বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে বরিশাল জেলার কর্ডনিং অফিসার নিজেদের লোকজন এবং নৌকো লঞ্চ ইত্যাদি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। মাথিভাঙায় তখন মোহন মিঞা* এবং তাঁর ভাই তারা মিঞার সরাসরি তত্ত্বাবধানে ধান চাল বিক্রির ব্যবস্থা চলছিলো। ধানচাল বোঝাই শত শত নৌকা সেখানে সারি সারি দাঁড়িয়েছিলো। জেলা কর্ডনিং অফিসার সেখানকার বিক্রয় কেন্দ্রকে বেআইনী ঘোষণা করে ধানচাল বোঝাই নৌকাগুলিকে বরিশাল সদরের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাঁদের নিজেদের তত্ত্বাবধানেই সেগুলিকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। নৌকোগুলি সহ মোহন মিঞা এবং তারা মিঞাও কর্ডনিং অফিসারের সাথে বরিশাল গেলেন। তাঁদেরকে জানিয়ে দেওয়া

* মোহন মিঞা তখন হাবিবুল্লাহ বাহারের স্থানে সাময়িকভাবে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকের কাজ করছিলেন। এর পর তিনি প্রাদেশিক লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন।

হলো যে সরকারী অনুমতি ব্যতীত ঝাথিভাঙায় ধানচালের বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা করে তাঁরা বেআইনী কাজ করেছেন এবং ঐ বিক্রয়কেন্দ্র আর বসতে দেওয়া হবে না। যে সমস্ত ধান চাল ঝাথিভাঙা থেকে বরিশাল নিয়ে আসা হয়েছিলো সেগুলো শাস্তিমূলক দরে সরকারের পক্ষ থেকে কিনে নেওয়া হবে বলেও তাঁদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো। যে নৌকা-গুলি ধরে আনা হয়েছিলো তাদের সংখ্যা ছিলো তিন চারশো এবং তাতে ধান চাল মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার মণ খাদ্য শস্য ছিলো। বরিশাল কর্ডনিং বিভাগের লোকেরা প্রত্যেক নৌকার মাল পৃথক পৃথকভাবে ওজন করিয়ে তাদের মালিকদেরকে রশিদ দিলেন এবং পরে এসে তাদেরকে টাকা নিয়ে যাওয়ার নির্দেশও দান করলেন।

ঝাথিভাঙা বিক্রয় কেন্দ্রের মতো খোলা বাজার বসানোর প্রচেষ্টা কোন সাধারণ ব্যবসায়ী অথবা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিন্তু সেটা না হলেও এই ধরনের বেআইনী বেচাকেনা মোটামুটিভাবে কর্ডনভুক্ত উদ্বৃত্ত জেলাগুলি থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে লব্ধ ধানচালেরই বিক্রয় কেন্দ্র ছিলো এবং প্রত্যক্ষভাবেই তা চোরাচালানকে উৎসাহ প্রদান করতো। অবশ্য চোরাকারবারীরা চোরাই মাল শুধু যে এই ধরনের খোলা বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতেই বিক্রি করতো তাই নয়। তাদের মূল বিক্রির বাজার থাকতো ঘাটতি জেলাগুলির অভ্যন্তরে। তারা সেই সময় উদ্বৃত্ত জেলাগুলি থেকে খাদ্য শস্য ভারতেও পাচার করতো।

কর্ডন প্রথা চালু করা সত্ত্বেও বস্তুতঃপক্ষে দেখা গেল যে ধান চাল উদ্বৃত্ত এলাকার সংগ্রহ করে ঘাটতি এলাকায় তাড়াতাড়ি চালান দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সরকারের নেই। এর জন্যে প্রশাসনিক অব্যবস্থা এবং যানবাহন ও পথঘাটের দুরবস্থাই মূলতঃ দায়ী। সরকারী গুদাম ঘরে ধান চাল জমা হলেও এর ফলে ধান চাল ঘাটতি এলাকায় পৌঁছাতো খুব কম এবং গুদামগুলির অব্যবস্থার জন্যে সেগুলি পচে নষ্ট হয়ে যেতো অথবা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হতো। এই সমস্ত পচা চাল আবার বিতরণ করা হতো রেশনিং এলাকাগুলিতে।

উদ্বৃত্ত এলাকাগুলি থেকে খাদ্যশস্য ঘাটতি এলাকায় সরবরাহ করার ক্ষেত্রে এই সরকারী ব্যর্থতা ব্যবসায়ীদের দ্বারা ধানচাল বেচা কেনা নিষিদ্ধ থাকার সাথে যুক্ত হয়ে খাদ্য পরিস্থিতিকে আরও জটিল এবং ভয়াবহ করে তোলে। এর ফলে ঘাটতি এলাকায় সরবরাহ প্রায় অচলাবস্থায় পৌঁছে

যায় এবং চোরাচালানীরা উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে পাচারকৃত খাদ্যশস্য অত্যধিক মূল্যে সেখানে বিক্রি করে অতিরিক্ত মুনাফা সংগ্রহ করতে থাকে।

বরিশাল, খুলনা, সিলেট ইত্যাদি জেলায় ফসলের মৌসুমে বাইরে থেকে, বিশেষতঃ ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালি থেকে দাওয়াল* নামে এক শ্রেণীর ভূমিহীন ক্ষেতমজুরেরা ফসল বোনা থেকে শুরু করে ধান কাটা পর্যন্ত সমস্ত প্রকার কৃষিকাজ করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা ধান কাটার কাজই করে এবং নিজেদের মজুরী টাকা পয়সায় না নিয়ে ফসলের একাংশ হিসেবে নেয়।** কর্ডন প্রথা চালু হওয়ার পূর্বে তারা নিজেদের প্রাপ্য ধান হিসেব করে বাড়ী আনতে পারতো এবং তার থেকেই তাদের বৎসরের পুরো অথবা আংশিক খোরাকী চলে যেতো। কিন্তু কর্ডন প্রথা চালু হওয়ার ফলে এই দাওয়ালেরা এক সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

এ সময় যারা বাইরে থেকে কর্ডনভুক্ত জেলাগুলিতে কাজ করতে যেতো তাদেরকে সেই কাজের জন্যে এ্যাসিষ্ট্যান্ট রিজিওন্যাল কনট্রোলার অব প্রকিওরমেন্ট (A.R.C.P.) এর থেকে পারমিট নিতে হতো। যাদের জমিতে এই কৃষি শ্রমিকরা কাজ করতো অনেক ক্ষেত্রে তারাই এদের পক্ষ থেকে এই সরকারী অনুমতি সংগ্রহ করতো। এই অনুমতির অবশ্য তেমন বেশী কিছু ফায়দা ছিলো না। কারণ উপার্জনকৃত পুরো ধান দাওয়ালেরা কোনমতেই নিজেদের এলাকায় নিয়ে যেতে পারতো না। কর্ডন এলাকার বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা মাত্র বিশ মনের অনুমতি পেতো এবং এই ধানটুকু নেওয়ার জন্যেই তাদের পারমিটের প্রয়োজন হতো। পারিশ্রমিক বাবদ মোট যে পরিমাণ ধান তারা পেতো তার থেকে বিশ মন বাদে বাকীটুকু তাদেরকে কর্ডন এলাকার মধ্যেই বিক্রি করতে হতো। এই ভাবে নিজেদের সারা বৎসরের উপার্জিত ধান উদ্বৃত্ত এলাকার অল্প মূল্যে বিক্রি করে যে টাকা তারা পেতো তা দিয়ে নিজেদের এলাকায় সমপরিমাণ ধান কেনা তাদের দ্বারা সম্ভব হতো না। এ ভাবে ঘাটতি এলাকা থেকে জীবিকার সন্ধানে উদ্বৃত্ত এলাকায় যাওয়া হাজার হাজার দাওয়াল কর্ডন প্রথার দ্বারা তাদের উপার্জিত ধান থেকে

* সিলেট জেলায় এদেরকে ভাগালু বলা হয়।

** এই সব এলাকায় অনেক ক্ষেত্রে বাইরের গৃহ শিক্ষক ও মৌলভীরাও টাকার পরিবর্তে ধান নিতেন পারিশ্রমিক হিসেবে।

বঞ্চিত হয়ে অনাহার অর্দ্ধাহার অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হতো। এই অবস্থার অবসানের জন্যে এ সময় পূর্ব বাঙলার কোন কোন অঞ্চলে ধান কাটা শ্রমিক ইউনিয়ন নামে কৃষি শ্রমিকদের ইউনিয়নও গঠিত হয়েছিলো।[২] এদের মূল দাবী ছিলো কর্ডন প্রথার বিলোপ।

দাওয়ালেরা তাদের পরিশ্রমলব্ধ ধান নিজেদের এলাকায় নিয়ে যেতে না পারলেও চোরাচালানকারীরা শুধু যে পূর্ব বাঙলার ঘাটতি এলাকাগুলিতেই ধান চাল নিয়ে যেতো তাই নয়। ভারতীয় সীমান্তে অবস্থিত কর্ডনভুক্ত উদ্বৃত্ত এলাকাগুলি থেকেও তারা বিপুল পরিমাণ ধান চাল ভারতে পাচার করতো। এর কারণ উদ্বৃত্ত ধান সরকার মন প্রতি ৮ টাকা দরে কেনার বন্দোবস্ত করেন কিন্তু ভারতে সেই ধানের দর তখন ছিলো তার থেকে অনেক বেশী। কাজেই জোতদার, মীরাসদার এবং অন্যান্য মজুতদাররা নিজেদের উদ্বৃত্ত অথবা মজুত ধান অধিক মূল্যের বিনিময়ে চোরাচালানকারীদের কাছে পাচারের জন্যে বিক্রি করতো।

এই সমস্ত কারণ একত্রিত হয়ে পূর্ব বাঙলার ঘাটতি এলাকাগুলির খাদ্য পরিস্থিতি তখন এমন অবস্থায় পৌঁছেছিলো যে, ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ থেকে পর্যন্ত লোক দলে দলে খাদ্যের সন্ধানে আসাম চলে যাচ্ছিলো। এই দেশত্যাগীরা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে অসংখ্য মুসলমানও ছিলেন।[৩]

খাদ্য ঘাটতি এ সময় দুর্ভিক্ষের অবস্থায় পৌঁছে যায় এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে এই সময় কর্ডনের বিরুদ্ধে সারা পূর্ব বাঙলায় একটি আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে।

এই আন্দোলনের কোন ব্যাপক সাংগঠনিক চরিত্র না থাকলেও ঢাকা এবং অন্যান্য কয়েকটি এলাকায় তা কিছুটা সংগঠিত হয়েছিলো ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে অবস্থিত ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীদের দ্বারা। এ ছাড়া তৎকালীন ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্যেরাও এই আন্দোলনে কিছুটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে খয়রাত হোসেন, তফজ্জল আলী, মহম্মদ আলী, আবদুল মালেক, আনোয়ারা খাতুন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য কোন অংশ গ্রহণ না করলেও কংগ্রেস দলভুক্ত বিরোধীদলীয় সদস্যেরা সকলেই এ সময়ে কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁদের কার্যকলাপ মোটামুটি ব্যবস্থা পরিষদে বক্তৃতা বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো।

কর্ডন বিরোধী এই আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান কিষাণ সভা অংশ গ্রহণ করে নি। উপরন্তু তারা এই আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলো। কমিউনিষ্ট পার্টি এ সময়ে ছিলো কর্ডন প্রথা চালু রাখার পক্ষে। এ সম্পর্কে তাজ-উদ্দীন আহমদ তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরীতে উল্লেখ করেছেন যে—বাঙলা-দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি নিয়ন্ত্রণ রাখার সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।[৪] এ বিষয়ে পরদিন মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি অবশ্য আরও বলেছেন যে নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে কমিউনিষ্ট পার্টির এই প্রস্তাব সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে ভেঙে ফেলে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয়।[৫]

তবে ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীরা যে কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে এ সময় দেশব্যাপী কোন বিরাট গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন তা নয়। তবে যেটুকু সংগঠিত আন্দোলন সে সময় কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে হয়েছিলো সেটার নেতৃত্বে তাঁরাই ছিলেন। এই কর্মীদের মধ্যে কারও তখন দেশব্যাপী কোন পরিচয় ছিলো না। তবু শামসুল হক, কমরুদ্দীন আহমদ, শেখ মুজিবর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ প্রভৃতি কর্মীরা নিজেদের এলাকায় গিয়ে খোঁজ খবর নেন এবং ঢাকায় কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে সভাসমিতি সংগঠিত করেন।[৬]

রাজনৈতিক কর্মী এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের এই ধরনের দুটি সভার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭] ১৯৪৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর বেলা ১২-৩০মিঃ কমরুদ্দীন আহমদ, শেখ মুজিব, শওকত আলী, মহম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দীন আহমদ প্রভৃতি কমরুদ্দীন আহমদের বাসায় মিলিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ ও জেলা কর্ডন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ঐ দিনই বলিয়াদি হাউসে ৩-৩০ মিঃ বিরোধীপক্ষের কয়েকজন পরিষদ সদস্যের একটি সভা হয়। তাতে উপস্থিত থাকেন মহম্মদ আলী, তফজ্জল আলী, ডক্টর মালেক এবং অন্য ১৬ জন সদস্য। এ ছাড়া কমরুদ্দীন আহমদ, শেখ মুজিব, শওকত আলী, শামসুজ্জোহা, আলমাস, আউয়াল, আজিজ আহমদ, মহিউদ্দীন, আতাউর রহমান, কফিলুদ্দীন চৌধুরী, কাদের সর্দার এবং মতি সর্দারও এই সভায় উপস্থিত থাকেন। সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই সভায় খাদ্য সমস্যা, পাট সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হয়। পরদিন সরকারী কর্তৃপক্ষের সাথে খাদ্য সমস্যা নিয়ে বৈঠকের বিষয়েও এই সভায় তাঁরা আলোচনা করেন।

এই বৈঠক বসে ২১শে ডিসেম্বর বিকেল ৪টায়। এতে উপস্থিত

থাকেন অন্যান্যদের মধ্যে কমরুদ্দীন আহমদ, শওকত আলী, অলি আহাদ, শেখ মুজিব ও তাজউদ্দীন আহমদ।[৮]

এঁরা প্রথমে খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ মহম্মদ আফজলের সাথে কর্ডন তোলার ব্যাপারে আলাপ করেন। মন্ত্রী তাঁদেরকে জানান যে, কর্ডনিং এর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের এবং সে ব্যাপারে তাঁদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। এর পর ১৯৪৭ এর শেষের দিকে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী পীরজাদা আবদুস সাত্তার ঢাকা আসেন।[৯] তাঁর সাথে ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীদের কোন বৈঠক হয়নি। তবে পীরজাদা এই সময় একটি সভায় যোগদানের জন্যে কার্জন হলে উপস্থিত হলে তাঁরা তাঁকে ঘেরাও করে কর্ডনের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ধ্বনি তোলেন এবং তাঁর সাথে বিক্ষোভকারীদের একটা ধাকাধাক্কিও বাধে।[১০]

প্রাদেশিক খাদ্যমন্ত্রী আফজল এই সময় কর্ডন প্রথা তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কর্ডনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মুখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীরজাদা আবদুস সাত্তার পূর্ব বাঙলায় এই সফরে এসে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সদস্য এবং আমলাদের সাথে খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। অবশেষে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির একটি কমিটির ওপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মন্ত্রী এবং অন্যান্যেরা কয়েকটি এলাকায় কর্ডন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১১] এর ফলে বরিশাল, ময়মনসিংহ এবং সিলেট এই তিনটি জেলায় কর্ডন উঠিয়ে নেওয়া হয়।

১৯৪৮ এর জানুয়ারী মাসের দিকে উপরোক্ত জেলাগুলি থেকে কর্ডন তুলে নিলেও সরকার স্থির করলেন যে, এক একটি উদ্বৃত্ত জেলা থেকে পার্শ্ববর্তী এক অথবা একাধিক ঘাটতি জেলাতে খাদ্য সরবরাহ করা হবে। এবং উদ্বৃত্ত এলাকাগুলো হতে শুধু সেই নির্দিষ্ট ঘাটতি এলাকাগুলোতেই ধানচাল যেতে পারবে, তার বাইরে নয়। অর্থাৎ এর পর জেলা কর্ডন উঠে গেলেও কর্ডন প্রথা অন্যভাবে চালু থাকলো।

কর্ডনিং উঠে যাওয়ার পর ব্যবসায়ীরা ব্যাপক আকারে ধানচাল কিনে গুদামজাত করতে ব্যস্ত হলো। এর ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের আমদানী তেমন বৃদ্ধি পেলো না। এ ছাড়া আবার কর্ডনিং প্রথা চালু হওয়া এবং খাদ্য আমদানীর ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেওয়ার আশঙ্কায় মোটামুটি সম্পন্ন পরিবারের লোকেরাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান চাল কেনা শুরু করলো।

ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত ক্রয়ের সাথে সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারের অতিরিক্ত ক্রয়ের ফলে ঘাটতি এলাকায় বাজারে আমদানী বৃদ্ধি এবং মূল্য হ্রাস হলো না। কাজেই কর্ডন প্রথা রহিত করার ফলে ঘাটতি এলাকায় অল্প সময়ের জন্যে ধানচালের দাম কিছুটা কমলেও অতি শীঘ্র আবার তা ওপরের দিকে উঠে খাদ্য পরিস্থিতির অধিকতর অবনতি ঘটালো।

এর ফলে যে শুধু ঘাটতি এলাকাগুলিতেই অবস্থার অবনতি ঘটলো তাই নয়, উদ্বৃত্ত এলাকাগুলিতেও খাদ্য শস্যের দর কর্ডন তুলে নেওয়ার পর মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি লাভ করে সেখানেও সঙ্কটকে ছড়িয়ে দিলো।

কাজেই কর্ডন তুলে দেওয়ার ফলে যে সুফল পাওয়া যাবে বলে ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীরা আশা করেছিলেন বস্তুতঃপক্ষে সে সুফল পাওয়া যায় নি।

৪

১৯৪৮ সালে একটি উদ্বৃত্ত জেলায় খাদ্য পরিস্থিতি

পূর্ব বাঙলায় খাদ্য সঙ্কট প্রকৃতপক্ষে একটা গুরুতর আকার ধারণ করতে থাকে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের দিকে।* এ সময়ে সিলেট জেলার ধর্মপাশা, বানিয়াচুঙ্গ ও সুনামগঞ্জ মহকুমার জগন্নাথপুর এলাকায় চালের দর চব্বিশ পঁচিশ টাকায় ওঠে এবং দরিদ্র কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জনগণের মধ্যে অন্নাভাব দেখা দেয়।[১] সিলেট জেলার রসুলগঞ্জে এই সময় আসন্ন দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করে আহূত এক জনসভায় সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট কনট্রোলার সমবেত জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাঁদেরকে বলেন[২] যে, যাদের ঘরে মজুদ খাদ্য আছে তাঁরা যেন তিন মাসের উপযুক্ত খাদ্য রেখে বাকী খাদ্য শস্য জনগণের কাছে কনট্রোল দরে বিক্রি করে জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

জেলা কনট্রোলারের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, সে সময় খাদ্য সঙ্কটের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে সরকারের কোন নির্দিষ্ট নীতি ছিলো

* ১৯৪৮ সালের ২৯শে জানুয়ারী সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নওবেলাল পত্রিকার "খাদ্য সমস্যা" শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে আসন্ন খাদ্য সংকটের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সংকট সেখানে তখনো পর্যন্ত তীব্র আকার ধারণ না করায় সে বিষয়ে কোন বিস্তৃত বিবরণ তাতে পাওয়া যায় না।

না। কিন্তু তা না থাকলেও সেই সভায় সভাপতি সুনামগঞ্জের মহকুমা হাকিম জনগণকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে রাস্তাঘাটের অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁরা সুনামগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন স্থান থেকে নৌকাযোগে ধান এনে শিবগঞ্জ ও জগদীশপুরের দুটি গুদামে রাখবেন এবং সেখান থেকে বিতরণের ব্যবস্থা করবেন।

ওপরে যে সমস্ত এলাকার উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে জগন্নাথপুর থানার সঙ্কটই সব থেকে তীব্র আকার ধারণ করেছিলো। এজন্যে সিলেট জেলার যুব সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে "নিরন্ন ভাই-বোনদের সাহায্যে মুক্ত হস্তে দান করুন" এই মর্মে একটি আবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।* তাতে বলা হয় যে, জগন্নাথপুর থানার খালীস গ্রামস্থ জনৈকা বিধবা নারী পুত্র কন্যার আহার যোগাতে অক্ষম হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। খাদ্যাভাবে সমগ্র জগন্নাথপুর থানাব্যাপী এক ভীষণ হাহাকারের কথাও তাঁরা উল্লেখ করেন।

১১ই মার্চ "আসন্ন দুর্ভিক্ষ" নামে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে নওবেলাল জগন্নাথপুর থানার দুর্গত এলাকায় অতি সত্বর খাদ্য সরবরাহ ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। সরকারের থেকে আশানুরূপ কোন সাহায্য না পাওয়ার কথা উল্লেখ করে তাঁরা বলেন যে, দুর্ভিক্ষের আনুসঙ্গিক হিসেবে ইতিমধ্যেই সেখানে কলেরা দেখা দিয়েছে।

সিলেট জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি আবেদন পত্রেও কলেরার উল্লেখ দেখা যায়। "দুর্ভিক্ষের কবলে জগন্নাথপুর" নামে এই আবেদন পত্রটিতে তাঁরা বলেন:

> সম্প্রতি সমগ্র জগন্নাথপুর থানা এবং সুনামগঞ্জ ও ছাতক থানার কয়েকটি সার্কেলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। এই বৎসর আমন ফসল সমূলে বিনষ্ট হওয়ায় এই ভয়াবহ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। প্রায় এক লক্ষ লোক অন্নাভাবে করাল মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কলেরা ও গো মড়ক ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। লোকের দুরবস্থার কথা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।
>
> দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের সাহায্যের জন্য মুসলিম লীগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে রিলিফ বা সাহায্য দান আরম্ভ হইয়াছে। এই কার্য সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। এখনই উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য না পাঠাইলে বহু লোকের প্রাণ-নাশের

আশঙ্কা রহিয়াছে। দেশবাসী ভাই ভগিনীদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, আর্তের সাহায্যের জন্য আপনারা যথাসাধ্য দান করিয়া বিপন্ন নর-নারীকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করুন।[৪]

এটিতে স্বাক্ষর করেন মুনাওয়ার আলী, এম.এল.এ; আবদুল বারী চৌধুরী, সভাপতি জেলা মুসলিম লীগ, মো: মফিজ চৌধুরী এম.এল.এ, সম্পাদক জেলা মুসলিম লীগ; নগেন্দ্র নাথ দত্ত, সভাপতি কংগ্রেস কমিটি; এবং চন্দ্র বিনোদ দাস, সভাপতি কিষাণ সভা।

এই আবেদন পত্রটির স্বাক্ষরকারীদের পরিচয় থেকে বোঝা যায় যে দুর্ভিক্ষের অবস্থা ১৯৪৮ এর মার্চ মাসের মধ্যেই সিলেট জেলার রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিলো। মুসলিম লীগ, কংগ্রেস ও কিষাণ সভার নেতাদের এই যৌথ আবেদন থেকে পরিস্থিতির গুরুত্বও ভালভাবে বোঝা যায়।

জগন্নাথপুর থানা রিলিফ কমিটির সম্পাদক শরিয়তউদ্দীন আহমদ এ সময় অভিযোগ করেন যে, প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী এবং সিলেটের ডেপুটি কমিশনারের কাছে সেই এলাকার অবস্থা বারবার জানানো সত্বেও তাঁদের থেকে কোন সাড়া তাঁরা পান নি। দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতিটিতে তিনি বলেন:

> বর্তমানে অবস্থা এতই ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে সচক্ষে না দেখিলে তার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে। চতুর্দিকেই হাহাকারের রোল উঠিয়াছে। খাদ্য নাই, বস্ত্র নাই এবং এগুলি ক্রয় করিবার মত সামর্থও নাই। জমি জমাও কেহ ক্রয় করে না। তাই গৃহস্থেরা হালের বলদসমূহ বিক্রী করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। বীজ ধান্য ও হালের গরুর অভাবে আগামী আমন ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। তজ্জন্য ভয় হইতেছে আগামী বৎসর অবস্থা আরও ভয়াবহ হইতে পারে।[৫]

প্রায় এক মাস পর শরিয়তউদ্দীনের অপর একটি বিবৃতিতে[৬] বলা হয় রিলিফ কমিটির উদ্যোগে প্রাথমিক অবস্থায় সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই খাদ্যশস্য বিতরণের যে ব্যবস্থা করা হয় তার ফলে অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটে। জগন্নাথপুরে দুর্ভিক্ষের অবসান হতে চলেছে বলেও উক্ত বিবৃতিটিতে আশা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তার পরই শিলাবৃষ্টির ফলে বুরো ফসলের বিস্তৃত ক্ষয়ক্ষতির ফলে অবস্থার আবার অবনতি ঘটে।[৭]

জুন মাসের দিকে অগ্রহায়নী ফসল ভাল না হওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় বিশেষতঃ সিলেটের বৃহত্তম গ্রাম বাণিয়াচুঙ্গে খাদ্য সঙ্কট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে পরিণত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।[৮] এ সময়ে সিলেটের ফুলবাড়ী নামক একটি গ্রামে পাঁচ ছয় দিন অনাহারের পর একটি ছেলের মৃত্যু ঘটে। এ অঞ্চলে তখন মীরাসদারদের* সপক্ষে সরকার ১৪৪ ধারা জারী করার ফলে একদিকে কিছু ফসল পানির নীচে পচে বিনষ্ট হয় এবং বাকী ফসল মীরাসদারদের ঘরে তোলা হয়। নানকার প্রজাদেরকে এইভাবে তাদের প্রাপ্য শস্য থেকে বঞ্চিত করাই এই এলাকায় খাদ্য সঙ্কটকে তীব্রতর করে।[৯]

ফুলবাড়ী অঞ্চলে অনাহারে মৃত্যু এবং সেখানকার সাধারণ খাদ্য সঙ্কটের সংবাদ পেয়ে প্রকৃত অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্যে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভূতপূর্ব সম্পাদক মাহমুদ আলী, উত্তর সিলেট জেলা লীগের সহকারী সভাপতি আবু জাফর আবদুল্লাহ, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য নুরুর রহমান, উত্তর সিলেট জেলা লীগের সম্পাদক আবদুর রহিম এবং উত্তর সিলেট জেলা লীগের কার্যকরী সমিতির সদস্য মতসির আলী ১১ই জুলাই সেখানে যান। এর পর সেই এলাকার অবস্থার ওপর তাঁরা সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন।[১০] বিবৃতিটির শেষে তাঁরা বলেন:

> অবস্থা দৃষ্টে আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই অঞ্চলের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। মৃত্যুর করাল ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে এবং অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকার না করিলে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য।

নিজেদের বিবৃতিতে তাঁরা উল্লেখ করেন যে ফুলবাড়ীতে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা সত্য হওয়া সত্ত্বেও জনৈক সরকারী কর্মচারী ঘটনাটি মিথ্যা বলে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছেন। ফুলবাড়ীর খাদ্য পরিস্থিতির সম্পর্কে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টটির কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হলো:

> গোপালগঞ্জ থানার এক মাইলের মধ্যে এই বিরাট গ্রামটি অবস্থিত। এখানে প্রায় ১২০০ ঘর লোকের বাস যাহার আনুমানিক লোক সংখ্যা

* সিলেটে স্থানীয় নানকার প্রজাদের ওপর বিবিধ রকম নির্যাতনকারী ভূমিমালিকদের মীরাসদার বলা হয়।

৬ হাজার হইবে। এই ১২০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২২ ঘর গিরাস- দার। বাকী দরিদ্র চাষী এবং দিন মজুর। ইহাদের মূল জীবিকা গৃহস্থি। মুখী এবং কচুর মুড়ার ক্ষেতই ইহাদের আয়ের উপায়। ইহাদের কেহ কেহ মাটির বাসন ইত্যাদি বিক্রয়ের ব্যবসা করে এবং কেহ টিকির ব্যবসাও করিয়া থাকে। হেমন্তকালে গ্রামের অনেক লোক মাটির কাজে বা ইট দেওয়া ইত্যাদিতে মজুর খাটিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিয়া থাকে।

আমরা সর্বমোট ৩৪টি পরিবারের অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি। মৃত ছেলের পিতা ইসইকে আমরা পাই নাই। কিন্তু তাহার মাতা এবং অন্যান্য ছেলে মেয়েকে দেখিয়াছি। ইসইর স্ত্রী এবং পাড়ার অন্যান্য লোককে জেরা করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম যে, ঐদিন সে গরু রাখিতে গিয়াছিল। মাঠ হইতে ফিরিয়া খাবার কিছু না পাইয়া জল খায়—এবং সেই হইতে পেটের বেদনায় অস্থিরতা প্রকাশ করিতে থাকে। ৫।৬ ঘন্টা অনবরত চীৎকারের পর তাহার মৃত্যু ঘটে। ঘটনার বহুদিন পূর্ব হইতেই এই পরিবার ৬-৭ বেলায় অর্থাৎ দুই দিন আড়াই দিনে এক এক বেলা কোনমতে আহার করিতে পাইত। এখনও পরিবারের এই অবস্থাই রহিয়াছে। আমরা ইসইর তিন সন্তান তসনু (৮) রথকুল (৪) মন্তকিল (২)কে দেখিয়া আসিয়াছি। অনাহারক্লিষ্ট এই পরিবারের উপর যে মৃত্যুর বিভীষিকা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে সরকারের বেতন ভোগী কর্মচারীদের চোখে তাহা না পড়িলেও আমাদের চক্ষুকে এড়াইয়া যায় নাই।

আমরা ৩৪টি পরিবারের মধ্যে ৯টি পরিবারকেই পূর্বদিন খাইতে পায় নাই দেখিলাম। ইহাদের মধ্যে কোন কোন পরিবারের ২।৩ দিনের মধ্যে খাদ্য জোটে নাই।

প্রায় প্রত্যেক পরিবারই এক বেলা খাইয়া রোজা রাখিয়াছে। ৩০টি পরিবারের ঐ দিনকার মত খাওয়ার কোন সংস্থান নাই বলিয়া আমরা প্রমাণ পাইয়াছি।

আমরা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের কোনও সন্ধান পাই নাই। আমাদের অতর্কিত আগমনে পূর্ব প্ল্যান মতো ধান চাউল যে কেহ সরাইয়া রাখিবে, তাহারও কোন সুবিধা ছিল না। অতএব আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হইতে হইয়াছে যে সত্য সত্যই এই সকল পরিবার সংস্থান-হীন অবস্থায় দিন গোজরান করিতেছে।

আমরা রাকইর স্ত্রীর জবানবন্দী গ্রহণ করিলাম। মেয়েটি তাহার কাহিনী বলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার স্বামী হাইলাকান্দিতে কাজে গিয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত টাকা পয়সা পাঠায় নাই। ৩০ জনের পরিবারকে স্ত্রীলোকটি দুঃখ মেহনত করিয়া খাইয়াইতেছে। মনাই, সোনাই দুই বিবস্ত্র শিশু সন্তানকে দেখিলেই বুঝা যায় অনাহার-মৃত্যুর করাল ছায়া ইহাদের চেহারায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আলিমের জবানবন্দীতে জানিলাম—তাহার ৭ জন খানেওয়ালা কিন্তু একা রোজগার করিয়া কিছুতেই কুলাইতে পারে না, ইহার উপর এখন সম্পূর্ণ বেকার। লোকটি বলিল—তাহার ছেলে সলমানকে খাইতে দিতে পারে নাই। উপবাস এবং অর্ধ উপবাসে ৪।৫ বৎসরের শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহার কন্যা সারইকে আমরা দেখিয়াছি এবং ইহারও যে দিন ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা বিশ্বাস করিয়াছি।

দক্ষিণ পাড়ার খোটাইর অবস্থা দেখিয়া আমাদের ধৈর্য ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। নিজের কুড়েখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু ইহার মেরামত করিবার ক্ষমতা তাহার নাই: সে তইমের ঢেকিশালে আশ্রয় লইয়াছে। এই ঢেকিশাল ঘরের বারান্দার সহিত (অনুমান ২ হাত) তিন হাতি একচালি মাথার প্রান্তভাগ মাত্র ২।। হাত উচচ। তাহার পরিবারে ৪ জন লোক—রোজগারের কোন ব্যবস্থা নাই। কচুসিদ্ধই যে তাহাদের ঐ দিনকার খোরাক, তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি।

মফিজ আলীর ৭ জন পোষ্য--রোজগারী সে একা। দৈনিক টাকার উর্ধে রোজী করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সে বলিল—গতকল্য শুধু চা খাইয়া রোজা রাখিয়াছি—আজ রোজী করিয়াছি মাত্র চার আনা ; চাউল বিক্রয় হইতেছে নয় আনা সেরে—আমার চলে কেমন করিয়া ?

৬৪ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ মজমিলকে দেখিলাম, তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইতে বসিয়াছে। ৭ জন পোষ্য লইয়া রোজার আগের দিন এক পোয়া খোদ খাইয়াছিল। তাহার পর আর আহার জোটে নাই। ৬ বেলা উপবাস থাকার পর ১০।৭।৪৮ তারিখ রাত্রে ছোট ময়না:

নামীয় এক প্রতিবেশী এক সের চাউল দিয়াছিল, তাহা খাইয়াছে; কিন্তু আমাদের উপস্থিতি পর্যন্ত তাহাদের ঐদিনকার কোন বন্দোবস্ত দেখি নাই।

মজমিলের ১৫ বৎসর বয়স্কা কন্যা ছায়িরা ও অন্যান্য ছেলেমেয়েকে দেখিলাম। ইহারা আজরাইলের নোটিশ প্রাপ্ত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বড় ছেলে মাখনকে (১২।১৩ বৎসর বয়সের) আমরা দেখিতে পাই। চেহারা দেখিয়াই ইহাকে 'খানির-মরা' বলিয়া ধারণা হয়। তাহাকে আমরা জিজ্ঞেস করি সে খাইয়াছি কিনা। উত্তরে ছেলেটি কাঁদিতে থাকে।

পূর্ব বাঙলা পরিষদে খাদ্য পরিস্থিতির ওপর আলোচনা

বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী নূরুল আমীন ১১ই জুন, ১৯৪৮, পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে খাদ্য পরিস্থিতির ওপর একটি বিবৃতি দেন।

জুন মাসের প্রথম দিকে চালের অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন[১] যে, বৎসরের সেই সময়ে দর বৃদ্ধি কোন নোতুন ব্যাপার নয়। প্রতি বৎসরই আমন ধান ওঠার সাথে সাথে চালের দর নীচের দিকে নামতে থাকে এবং এপ্রিলের শেষ থেকে তা ধীরে ধীরে আবার ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে। এই ঊর্ধ্বগতি সেপ্টেম্বরে আউস ধান ওঠার আগে পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সেবার কিন্তু মে মাসেই চালের দর অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালের থেকে চড়া পর্যায়ে দাঁড়ায়। অবশ্য মার্চের প্রথম দিক পর্যন্ত এই দর ১৯৫৭ সালের ঐ সময়কার দরেরই সমপর্যায়ে ছিলো বলে তিনি উল্লেখ করেন। ১৯৪৮ এর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সমগ্র প্রদেশে চালের গড় পড়তা দর মণ প্রতি ২৬-২৯ টাকা এবং সর্বনিম্ন দর ২০-২৩ টাকা বলে নূরুল আমীন পরিষদকে জানান।

চালের দর বৃদ্ধির মূল কারণগুলি সম্পর্কে তিনি তাঁর বিবৃতিতে বলেন:

আমার মনে হয় সাধারণভাবে চালের দরবৃদ্ধির মূল কারণ হলো পাটের প্রচলিত চড়া দর; বরিশাল, ময়মনসিংহ ও সিলেট এই তিনটি

উদ্বৃত্ত জেলার কর্ডন প্রথা তুলে নেওয়ার ফলে প্রদেশের বিস্তৃত এলাকায় কনট্রোল ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়া ; মজুতদারী এবং বর্ষা ও কীট ইত্যাদি আরও কতকগুলি কারণ। আপনাদের হয়তো মনে থাকবে যে পরীক্ষামূলকভাবে পার্শ্ববর্তী ঘাটতি জেলাসমূহের স্বার্থে কর্ডন প্রথা তুলে নেওয়া হয়েছিলো। একথা সত্য যে পূর্বোল্লিখিত উদ্বৃত্ত জেলা-সমূহের কর্ডন উঠিয়ে নেওয়ার ঠিক পর পরই পাশ্ববর্তী ঘাটতি এলাকা-সমূহের দর নীচে নেমে এসেছিলো কিন্তু শীঘ্রই উদ্বৃত্ত এবং ঘাটতি উভয় এলাকাতেই দর আবার চড়তে শুরু করে। আশা করা গিয়ে-ছিলো যে ব্যবসায়ীরা ব্যবসার নিয়ম মেনে চলবে এবং যুক্তিসঙ্গত মুনাফা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্যবসায়কে সর্বাধিক স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগের ফলে যে কোন লোক ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছে তাকেই আমরা মুক্ত হস্তে লাইসেন্স দিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে যে বহু সংখ্যক লোক অযৌক্তিকভাবে উচচ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে এই ব্যবসাতে ঢুকে পড়েছে।[২]

ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে এই বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে যে কথাটি নুরুল আমীন উহ্য রেখেছেন তা হলো এই যে, উল্লিখিত উচচ মুনাফা শিকারী ভুঁইফোড় ব্যবসায়ীরা আসলে মুসলিম লীগ এবং তৎকালীন সরকারের সাথে সম্পর্কিত পারমিটধারীর দল।

পরিষদকে আশ্বাস দিতে গিয়ে নুরুল আমীন তাঁর বিবৃতিতে সরকারের হাতে তখন পর্যন্ত যথেষ্ট চাল থাকার কথা জানান এবং ইতিমধ্যেই তাঁরা কতকগুলি সঙ্কটগ্রস্থ এলাকায় বিক্রির জন্যে সরকারী গুদাম থেকে বিপুল পরিমাণ চাল হস্তান্তর করেছেন বলে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া যে সমস্ত জায়গায় দর খুব বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে কিছুটা পরিবর্তিত আকারে রেশনিং চালু করা হবে এ কথাও তিনি জানান।[৩]

নুরুল আমীন তাঁর বিবৃতি প্রসঙ্গে দাবী করেন যে, কতকগুলি জেলাতে মূল্যের উর্ধগতি শুধু যে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্য ইতিমধ্যেই হ্রাস পেতে শুরু করেছে।[৪] কুষ্টিয়া সদর মহকুমায় ৫ই মে ১৯৪৮, চালের দর ছিলো মণ প্রতি ২৭ টাকা। ১২ই মে সেখানে দর বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৭ টাকা। কিন্তু ১৯শে মে সেই দর আবার নামিয়ে আনা হয় ৩২৷৷৹ আনায়। ২রা জুন, ১৯৪৮, দর আরও নেমে এসে দাঁড়ায় ৩১ টাকায়। পাবনা জেলাতেও তাই ঘটে। সেখানকার গড়পড়তা

দর ১৯শে মে ছিলো ২৯৷৷৩। ২৬শে মে তা চড়ে ৩০ টাকায়। ২রা জুন আবার তাকে নামিয়ে আনা হয় ২৭৷৷০ আনায়।

খুলনা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে বলতে গিয়ে তিনি জানান যে, জেলা হিসেবে খুলনা উদ্বৃত্ত হলেও তার মধ্যেই কতকগুলি ঘাটতি এলাকা আছে। খুলনা শহর এই ধরণের একটি এলাকা। সেখানকার সরবরাহ আসে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো থেকে। উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে খুলনা শহরে চাল না নিয়ে এলে ঘাটতি এলাকায় ঘাটতি এবং দর আরও বৃদ্ধি পায়। খুলনা জেলার সদর মহকুমায় ১৯শে মে, ১৯৪৮, চালের দর ছিলো মণ প্রতি ২৩ টাকা। ২৬শে মে সেই দর উঠে দাঁড়ায় ৩০ টাকায়। এই পর্যায়ে সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন এবং তার ফলে ২রা জুন দর ২৩ টাকায় নেমে আসে। নূরুল আমীন নিজে ৩রা জুন খুলনা সদরে যান এবং সেইদিন দর দাঁড়ায় মণ প্রতি ২৫৷ আনা। তিনি বলেন যে খুলনায় বেসরকারী ব্যক্তিরা তাঁকে জানান যে, সরকার যে প্রচেষ্টা শুরু করেছেন তার ফলে দর আরও কমতির দিকে যাবে। তিরিশ টাকা থেকে দর এত তাড়াতাড়ি ২৫৷ আনায় কমে আসার কথা উল্লেখ করে নূরুল আমীন দাবী করেন যে চালের দরবৃদ্ধি চাহিদা-সরবরাহের সাধারণ অর্থনৈতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, সেটা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা শিকারের প্রচেষ্টার দ্বারা।

এই সময়ে পূর্ব বাঙলায় রেশন এলাকার মোট লোক সংখ্যা ছিলো ৮,৩২,২৭০।[৪] এই রেশন এলাকাগুলিতে চাল সরবরাহ করাই সরকারের প্রথম দায়িত্ব হিসেবে নূরুল আমীন উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, সরকারের হাতে চালের হিসেবে ৫৭০০০ টন ধান ও চালের মধ্যে এই সমস্ত এলাকায় পাঠাতে হয় ৭,৫০০ টন। তাঁদের দ্বিতীয় দায়িত্ব পূর্ব বাঙলা রেলওয়ে, ষ্টীমার কোম্পানী, কাপড়ের কল এবং চিনি কল ইত্যাদি বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মেটানো। এদের মাসিক প্রয়োজন প্রায় ৪০০০ টন। গ্রামাঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ করাকে তিনি সরকারের পরবর্তী দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করেন। এর জন্যে মাসিক প্রায় ১০,০০০ টন চাল সরকারী গুদাম থেকে ছাড়া দরকার। কাজেই বিভিন্ন ঘাটতি এলাকায় জুন, জুলাই এবং অগাষ্ট মাস পর্যন্ত সরবরাহের জন্যে তাঁদের হাতে যথেষ্ট চাল আছে বলে তিনি পরিষদকে জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সেপ্টেম্বর মাসে আউস ধান ওঠার পর স্বাভাবিকভাবেই খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে।[৫]

এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে নুরুল আমীন বলেন যে, খাদ্যশস্যের ব্যবসাকে পূর্ব বাঙলার মতো খাদ্য ঘাটতি এলাকায় কিছুতেই স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া যেতে পারে না। ব্যবসাদারদের ওপর খাদ্য বিতরণের দায়িত্ব অর্পণ করলে সেটা আত্মহত্যারই শামিল হবে। ব্যবসায়ীদের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা এবং এর জন্যে তারা উদ্বৃত্ত এলাকাসমূহ থেকে ঘাটতি এলাকাসমূহে খাদ্য শস্য নিয়ে যাবে ঠিক কিন্তু সেটা তারা বাজারে ছাড়বে নিজেদের নির্ধারিত দরে। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন শ্রেণীর লোকেরা সেই দরে চাল কিনতে পারলেও গরীবদের পক্ষে তা সম্ভব হবে না, এবং গরীবরাই হলো সংখ্যায় গরিষ্ঠ। তাদেরকে এর ফলে উপোস থাকতে হবে।[৭]

এর পর কর্ডন প্রথা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নুরুল আমীন বলেন যে, ১৯৪৮ এর প্রথম দিকে জনগণের একাংশের পক্ষ থেকে বারবার খাদ্য-শস্যের নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার দাবী উঠতে থাকে। তিনি বলেন যে, তাদের সেই দাবী না মেনে তাঁরা ভালই করেছিলেন। যে তিনটি জেলায় কর্ডন তুলে নেওয়া হয়েছিলো সেখানে ব্যবসায়ীদেরকে ইচ্ছে মতো ব্যবসা করতে দেওয়াকে তিনি একটি দুঃখজনক ব্যাপার বলে উল্লেখ করেন। কয়েকটি উদ্বৃত্ত এলাকার কর্ডন তুলে নেওয়ার ফলে অন্যান্য সংগ্রহ এলাকার ওপর একটা বিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বলেও তিনি পরিষদকে জানান এবং বলেন যে, ঐ সমস্ত এলাকায় কর্ডন উঠিয়ে না নিলে সরকারের খাদ্য মজুত আরও সন্তোষজনক হতো।[৮]

খাদ্য ব্যবসায়ীরা এই সময় খাদ্য সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে যেভাবে অতিরিক্ত মুনাফা সংগ্রহের ব্যাপারে নিযুক্ত হয়েছিলো সরকার যে সে বিষয়ে উপযুক্তভাবে অবহিত ছিলেন সেটা নুরুল আমীনের উপরোক্ত পরিষদ বক্তৃতা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও খাদ্য সরবরাহের জন্যে সরকারকে ব্যবসায়ীদের ওপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভরশীল না থেকে উপায় ছিলো না। এর প্রধান কারণ সরকারী প্রশাসন যন্ত্র, যানবাহন এবং পথ ঘাটের অবস্থা। সে সময় সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের নানান অব্যবস্থা এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যানবাহন ও পথঘাটের শোচনীয় দুরবস্থার ফলে সরকারের পক্ষে সরবরাহ ব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণাধীনে চালান অসম্ভব ছিলো। শুধু তাই নয়, যেটুকু সরবরাহের দায়িত্ব সরকারের হাতে তখন ছিলো সে দায়িত্বও সুষ্ঠুভাবে পালনের কোন ক্ষমতা সরকারের ছিলো না। এর ফলে উদ্বৃত্ত এলাকার খাদ্য সংগ্রহ

কিছুটা সম্ভব হলেও সেই খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকার বহুলাংশে ব্যর্থ হতো। আবার এই ব্যর্থতার ফলে একদিকে যেমন সরবরাহের অভাবে ঘাটতি এলাকায় ধান চালের দর বৃদ্ধি পেতো তেমনি অন্যদিকে সরকারী গুদামে খাদ্যশস্য বিপুল পরিমাণে পচে গিয়ে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়তো।

খাদ্য সমস্যা সম্পর্কিত এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে ১৪ই জুন, ১৯৪৮, পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে একটি দীর্ঘ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ বিতর্ক শুরু হওয়ার সময় দেখা যায় যে সরকার পক্ষীয় সদস্যদের আসন বিপুল সংখ্যায় শূন্য।[৯]

বিতর্কের প্রথমদিকে মনোরঞ্জন ধর সরকারকে বলেন যে, তাঁদের খাদ্য-নীতি যাই হোক তাকে জনপ্রিয় হতে হবে। এজন্যে সরকার যদি নিয়ন্ত্রণ ও কর্ডন প্রথা রাখতে চান তাহলে জনগণকে তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে।[১০]

কর্ডন প্রথা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শরফুদ্দীন আহমদ বলেন[১১] যে, সে বৎসরের প্রথম দিকে যখন তাঁরা কর্ডন তুলে দেওয়ার কথা বলেছিলেন তখন ঘাটতি এলাকাগুলিতে চালের দর ছিলো ৪০ থেকে ৫০ টাকা অথচ উদ্বৃত্ত এলাকায় তার দর ছিলো মাত্র ৫ টাকা ৬ টাকা অথবা ৬।০ আনা। এদিক দিয়ে বিচার করলে অবস্থা নিতান্তই অসহ্য ছিলো এবং সেই হিসেবে কর্ডন তুলে দেওয়ার প্রস্তাব, বিশেষতঃ জেলার মধ্যে এবং অন্তর জেলা কর্ডন তুলে দেওয়ার প্রস্তাব, খুবই যুক্তিসঙ্গত ছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সময় এইভাবে কর্ডন তুলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিলো তখন একথা কেউ ভাবেনি যে চালের দর এখন যতখানি উঠেছে ততখানি উঠবে।

শরফুদ্দীন আহমদ চোরাচালানের উল্লেখ করে বলেন যে, সে সময়ে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে কর্ডন জোরদার করার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন যাতে করে খাদ্যশস্য ভারতে পাচার না হতে পারে। খাদ্য মন্ত্রী নূরুল আমীন বলেছেন যে, সে ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তার ফলে কোন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যই ভারতে চালান হয়নি। তা যদি হয় তাহলে খাদ্যশস্যের এতখানি ঘাটতি হলো কেন? খোলা বাজারে ধান চাল যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে কিন্তু তার দর খুব বেশী। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কোন গুরুতর ঘাটতি এদেশে নেই। চোরাকারবারী এবং মজুতদাররা ইচ্ছেমতোভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে

অতিরিক্ত মুনাফা কামাতে ব্যস্ত হওয়ার ফলেই খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

শরফুদ্দীন আহমদ সরকারী গুদামে খাদ্যশস্য পচে বিনষ্ট হওয়ার উল্লেখ করে দেশের এই দুর্দিনে খাদ্য অপচয়ের জন্যে সরকারী প্রশাসনযন্ত্রকে দায়ী করেন।

চিনি এবং আটার দুষ্প্রাপ্যতার উল্লেখও শরফুদ্দীন আহমদ তাঁর এই পরিষদ বক্তৃতায় করেন। তিনি বলেন যে, সংবাদপত্র এবং বেতারের মাধ্যমে সরকার জনগণকে বলছেন যে বিভিন্ন জেলায় চিনি সরবরাহ করা হচ্ছে অথচ জনগণ কোন চিনির দেখা পাচ্ছেন না। পূর্বে লোকে গুড় ব্যবহার করতো কিন্তু এখন গুড়ও বাজার থেকে উধাও হয়েছে।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর[১২] বক্তৃতায় বলেন যে, দেশে দুর্ভিক্ষ এসে গেছে অথচ সরকার এই সঙ্কটকে দুর্ভিক্ষ হিসেবে স্বীকার করতে চান না। সংগ্রহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে তিনি সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার দুর্নীতির উল্লেখ করেন। খুলনা জেলার সংগ্রহের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে প্রকিওর-মেন্ট অফিসার গ্রামে গিয়ে গৃহস্তের বাড়ীতে উঠলে গৃহস্ত বলে তার ধান আছে ৫০ মণ, কিন্তু অফিসার বলে তার ধান আছে ১০০ মণ। এর পর ঘুষ না দিয়ে গৃহস্তের উপায় থাকে না। এ ধরণের সংগ্রহকে ধীরেন দত্ত 'ডাকাতি' বলে বর্ণনা করেন।

রেশনিং প্রথা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, শহরের ৮ লক্ষ মানুষের জন্যে যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু আছে তার কোন মূল্য নেই। প্রকৃতপক্ষে দেশে যদি খাদ্য ঘাটতি থাকে তাহলে ৪ কোটি লোকের জন্যে রেশনিং চালু করা হোক। সরকার যদি তা না পারেন তাহলে শুধুমাত্র শহরে লোকদের জন্যে রেশনিং চালু না রেখে তাকে সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়া হোক। কর্ডন প্রথাও সম্পূর্ণভাবে রহিত করার জন্যে তিনি সুপারিশ করেন।

চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের[১৩] চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক ঘূর্ণিবাত্যার উল্লেখ করে বলেন যে, তার ফলে সেখানকার অবস্থার দারুন অবনতি ঘটেছে। কলকাতার ইংরেজী দৈনিক ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের বরাত দিয়ে তিনি জানান যে, কক্সবাজার থেকে দশ হাজার গরীব মানুষ আকিয়াব সীমান্তে খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। ধানচাল কেনার মতো ক্ষমতা না থাকায় নিরুপায় হয়ে তাদেরকে এইভাবে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে। সরকার প্রথমে সস্তা দরে খাদ্যশস্য বিক্রীর যে কেন্দ্রগুলো স্থাপন করেছিলেন

সেগুলিও তুলে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং ঘূর্ণিবাত্যা ও বন্যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের জন্যে আবার সেগুলি চালু করতে সরকারকে অনুরোধ জানান।

ফজলুল কাদের তাঁর বক্তৃতায় জানান যে, তাঁর কাছে সংবাদ এসেছে যে প্রায় এক হাজার মাঝি চাল কেনার জন্যে আরাকান সীমান্তে গিয়েছিলো। তাদেরকে সেখানে গ্রেফতার করে তাদের নৌকাগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং তাদের টাকা কড়িও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে তদন্ত করার জন্যে তিনি দাবী জানান।

গণেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে গিয়ে বলেন:

> এই চালের দর বেশী বেড়েছে তার জন্য দায়ী সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টও। তাঁরা বলছেন পাটের দর বেড়েছে সেইজন্য সিমপ্যাথেটিক রাইজ হয়েছে। চালের দর বাড়বার কারণ গভর্ণমেন্ট অন্যান্য সকল জিনিসের দর বৃদ্ধি বলেছেন। এই সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে গভর্ণমেন্ট কাপড়ের দাম প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। একসেস সেলস্ ট্যাক্স ২৫ পারসেন্ট হয়েছে। একেত সিমপ্যাথেটিক রাইজ বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। সিমপ্যাথেটিক রাইজ কি করে হতে পারে? গভর্ণমেন্ট সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন, সেই টাকা চালের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। চালের দর বেড়ে যাচ্ছে। দোষ দেওয়া হচ্ছে হোর্ডারদের। আমি বলি Government is the worst hoarder। গভর্ণমেন্ট লক্ষ লক্ষ মণ চাউল গোডাউনে নষ্ট করে দিচ্ছেন। হোর্ডাররা যা হোর্ড করে তার একটি দানা তারা নষ্ট হতে দেয় না। আজাদ পত্রিকায় বের হয়েছে খুলনার সাতক্ষীরা মহকুমায় যথেষ্ট চাউল নষ্ট হয়েছে। আপনারা গেলে দেখতে পাবেন প্রত্যেক গভর্ণমেন্ট গুদামে চাল নষ্ট হচ্ছে।[১৪]

এই চাল নষ্ট হওয়ার কথায় সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী নুরুল আমীন আপত্তি জানিয়ে বলেন যে, সে বিষয়ে প্রশ্ন আছে। তার জবাবে গণেন্দ্র ভট্টাচার্য আবার বলেন যে প্রশ্ন তাঁর থাকতে পারে কিন্তু এই সমস্ত খাদ্যশস্য অসাধু কর্মচারীদের দোষেই নষ্ট হচ্ছে। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সিভিল সাপ্লাইয়ের পুলিশ ঘুষ নিচ্ছে। এবং তার ফলেই দর বাড়ছে।

পরিশেষে তিনি কর্ডনিং এবং সেই সাথে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এছাড়া রেশনিং এলাকার বাইরে কোটি কোটি লোকের দুরবস্থার উল্লেখ করে তিনি রেশনিং তুলে দেওয়ার জন্যেও সরকারের কাছে দাবী জানান।[১৫]

নেলী সেনগুপ্তা[১৬] চট্টগ্রামের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, বৎসরের প্রথম দিকে সেখানে মাছ এবং তরিকতরকারী সস্তায় পাওয়া যাচ্ছিলো। এমনকি অল্প কিছুদিন পর্যন্ত চালের দরও অযৌক্তিক রকম বেশী ছিলো না। কিন্তু কোন কারণ ছাড়াই চালের দর আবার সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। চিনি, আটা, কেরোসিন তেলের অভাবের কথা এবং সরষের তেলের দর সের প্রতি ৩৲ হওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

নেলী সেনগুপ্তা রেশনের পচা চাল সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তাঁর বাড়ীতে রেশনের পচা চাল নিয়ে এলে সেটা দোকানে ফেরৎ পাঠান। দোকানদার তার পরিবর্তে ভাল চাল দেয় এবং তাঁর কাছে সেই পচা চাল পাঠানোর জন্যে তার দোকানের যে কর্মচারী দায়ী ছিলো তাকে ধমক দেয়। পরে তিনি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করেন, সে কর্মচারীটিকে ধমক দিয়েছে কেন। যে চাল রেশনে সকলের প্রাপ্য সেই চাল নির্বিচারে প্রত্যেককে দেওয়া উচিৎ। এর জবাবে দোকানদার জানায় যে, তার এ ব্যাপারে করার কিছু নেই। তার প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেই চাল রেশনের চাল হিসেবে বিক্রির জন্যে দেওয়া হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে, যেমন করে হোক সেই চাল রেশনে বিক্রি করে দিতে।

ফকির আবদুল মান্নান[১৭] খাদ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের বক্তৃতায় পাটের উচচ মূল্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন যে, পাটের দর বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত টাকা গৃহস্থেরা পায়নি, পেয়েছে পাটের দালালেরা। গৃহস্থেরা পাট বিক্রি করে যা পেয়েছে সেটা সঙ্গে সঙ্গে খরচা করে দিয়েছে। কাজেই পাটের দর বৃদ্ধির ফলে ধান চালের দর বৃদ্ধি হয়েছে এ যুক্তি তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন না।

খুলনা জেলার খাদ্য সংগ্রহ সম্পর্কে গোবিন্দলাল ব্যানার্জী বলেন:
গভর্ণমেন্ট ভাল করে প্রকিওরমেন্ট করবেন এই ভরসা করলেন। রিপার্সদের* টিকিট্ সিস্টেম করলেন। এই টিকিট এমনি দুর্বোধ্য

---

* দাওয়ালদের

যে ফলে খুলনা শহরে ৩ সপ্তাহ ধরে ১০ হাজার ১৫ হাজার লোক প্যারেড করে বেড়িয়েছে। রাত্রি ১২টায় ১টায় মিটিং হয়েছে। ১৪৪ ধারা থাকতেও তারা মিটিং করবে আইন ভঙ্গ করবে। আমি নূরুল আমিন সাহেবের নিকট চিঠি লিখেছিলাম, উত্তর পাইনি। ৩।৪ হাজার ধানের নৌকা আটকান হয়েছিলো—গুলিও চলেছিলো—কিছুই ফল হ'লনা। ১৫ হাজার চাষী যদি নাড়া দেয় সমস্ত জেলায় প্রকিওরমেন্টের অসুবিধা হবে—রিএকশন অন্য জেলায় যাবে। এন, এম, খান সাহেব ছিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তাঁকে আমি বলি আপনি আই, সি, এস, মানুষ, পাবলিক মিটিং-এ বক্তৃতা করুন। এই যে হাজার হাজার লোক শহর কাঁপিয়ে চলেছে তাদের সামনে আপনার বক্তব্য পেশ করুন, তিনি বক্তৃতা করলেন না। তাঁর কাছ থেকে ২ লক্ষ মন ধান নেওয়া হয়। মাত্র ৮০ হাজার মন ধান নাকি গুদামে উঠেছে। আমার মনে হয় এর ফলে সমস্ত জেলায় প্রকিওরমেন্ট নষ্ট হয়েছে। গভর্ণমেন্ট সেই সময় ধান কিনবার যে রেট ধার্য্য করেছিলেন ৮॥, সেই সময় আমরা বলেছিলাম এটা ফেয়ার প্রাইস। গভর্ণমেন্টকে প্রকিওরমেন্টে সাহায্য করবার জন্য আমি প্রকিওরমেন্টে সেন্টারে সেন্টারে গিয়েছি। অনেক জায়গায় চাল ছিলো কিন্তু টাকার অভাবে প্রকিওরমেন্ট হয় নি। মিষ্টার এন, এম, খানকে বলেছিলাম, টাকার ব্যবস্থা করুন। তারপর আর এক ডিফিকাল্টি টাকা ট্রেজারীতে উপস্থিত হলে। শুনলে অবাক হবেন যেখানে ৩০ হাজার মন সহজে প্রকিওরমেন্ট হত—কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ লীডাররা এবং জনসাধারণ সর্বান্তকরণে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল—ডিপার্টমেন্টাল অফিসারদের bungling এর জন্য সেখানে ৭ হাজার মন ধান প্রকিওরমেন্ট হয়েছে। আমার মনে হয় এজন্য whole department should be prosecuted।[১৮]

বক্তৃতার শেষে গোবিন্দলাল ব্যাণার্জী কনট্রোল এবং রেশনিং তুলে দেওয়ার দাবী জানান।

সিলেটের চা বাগানের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত বলেন যে, পূর্ব বাঙলা সরকার সিলেটকে একটি উদ্বৃত্ত জেলা হিসেবে ধরে নিয়ে ভুল করেছেন। সিলেট কোনদিনও উদ্বৃত্ত এলাকা

ছিলো না। প্রথমে বর্মা থেকে এবং পরে আসাম থেকে সিলেটের চা বাগান গুলির জন্যে দেড় লক্ষ মন চাল আসতো। দেশ ভাগের পর সেই চাল আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু এই ঘাটতি পূরণের কোন ব্যবস্থা হয় নি।[১৯]

তিনি বলেন যে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী নিজের বিবৃতিতে পূর্ব বাঙলা রেলওয়েকে চাল সরবরাহের কথা বলেছেন কিন্তু সিলেটের চা বাগানগুলি সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি। চা বাগান শ্রমিকদের অবস্থা উল্লেখ করে তিনি বলেন:

> চা বাগানের শ্রমিকদিগকে চাউল সরবরাহের সঙ্গে উহাদের মজুরীর একটা সম্পর্ক আছে। আগে বাগান কর্ত্তৃপক্ষেরা যে দরেই চাল ক্রয় করুক না কেন শ্রমিকেরা ৫৲ টাকা মন দরে চাল পেত। চালের এই দরের উপর উহাদের মজুরী নির্দ্ধারিত আছে। সরকার বাগান-গুলিকে চাল না দেওয়াতে এবং বাগান কর্ত্তৃপক্ষও চাল খরিদ করিতে না পারায়, শ্রমিকদিগকে বাজার হইতে চাউল খরিদ করিতে হয়। এখন বাজারে সে চালের দাম হচ্ছে ৩০৲ টাকা। ৫৲ টাকার স্থলে ৩০৲ টাকা হারে চাউল কিনিতে হওয়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মজুরী বৃদ্ধি না হওয়ায় শ্রমিকদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমাদের অনেক কষ্ট করে বাগানগুলিতে Strike বন্ধ করতে হয়। সরকার সে দিকে দৃষ্টি না দিলে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হবে।[২০]

বিরোধী দলের নেতা বসন্তকুমার দাস কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির পক্ষ থেকে খাদ্য পরিস্থিতির ওপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে "এই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ আসতে দেব না" এই মর্মে খাদ্য মন্ত্রী নূরুল আমীনের আশ্বাস এবং পূর্ব-বর্তী বৎসরের মতো এবারও "দৃঢ়ভাবে" দুর্ভিক্ষ দমনের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে বলেন:

> আমি জিজ্ঞাসা করি যে গত বৎসর যে অবস্থায় দুর্ভিক্ষের ছায়া দেখা দিয়েছিল এবার কি ঠিক সেই অবস্থায় দুর্ভিক্ষের ছায়া এসেছে, না অবস্থার কোন বৈষম্য হয়েছে? গেল বৎসর যখন দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়ে তখন দেখেছিলাম পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে যে বাণিজ্য-সূত্র তা ছিন্ন হয়নি—আজ এই প্রদেশে যে অর্থনৈতিক সমস্যা এসেছে তা তখন ছিলনা—তখন দুর্নীতিপরায়ণ গভর্ণমেন্ট কর্মচারী দেখিনি—তখন আমরা কালবাজারী, মুনাফাখোর পাইনি। কিন্তু এই কয়েক-

মাসের মধ্যে এই প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কি পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তা চিন্তা করে দেখুন। খাদ্য পরিস্থিতি বর্তমান আর্থিক অবস্থার একটা অংশ। এই যে ধান চালের দাম বেড়েছে এটা তার একটা দিক মাত্র। একটা দিক আমরা আলোচনা করছি—সমগ্র আর্থিক অবস্থা আলোচনা করছি না। আমরা কেবল খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনা করছি এবং অন্যান্য যে সকল কারণে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা আলোচনা করছি না।[২১]

এরপর বসন্তকুমার দাস কনট্রোল, কর্ডনিং এবং রেশনিং সম্পর্কে বলেন:

বর্তমান খাদ্য সংকটের জন্য সমস্ত দোষ চাপান হয় চোরাকারবারী এবং মুনাফাখোরের উপর। আপনাদের আজ চিন্তা করতে হবে এই যে চোরাকারবারী, মুনাফাখোর এদের সৃষ্টি করেছে কে। সৃষ্টি করেছে এই রেশনিং এবং কনট্রোল। যদি এই রেশনিং না থাকত, যদি এই কনট্রোল না থাকত এই চোরাকারবারী আমরা দেখতে পেতাম না। রেশন করা হয়েছে ৮ লক্ষ লোকের জন্য। একটা বরাদ্দ করা হয়েছে—সেটা প্রয়োজনের চাইতে কম—তাই নিয়ে প্রয়োজন মেটাতে হবে। লোক অন্যায়ভাবে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহের চেষ্টা করে। যারা ব্যবসায়ী তারা তার সুযোগ নেয় এবং বেশী মূল্যে জিনিষ বিক্রী করে। ফলে, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরের সৃষ্টি হয়। এই অশুরকে দমন করতে হবে। গভর্ণমেন্ট বলছেন তাঁরা চেষ্টা করছেন দমন হচ্ছে না। ২ শত কেস prosecution হচ্ছে। চোরাকারবারী ধ্বংশ করতেই হবে—মুনাফাখোরদের ধ্বংশ করতেই হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতিপরায়ন গভর্ণমেন্ট কর্ম্মচারী যাঁরা আছেন তাঁদেরও দমন করতে হবে। যদি রেশনিং কর্ডনিং এবং কনট্রোল রাখেন—তবে তার ভেতর দিয়ে চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরের সৃষ্টি হবে। একদিক দিয়ে দমন করছেন অন্য দিক দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে। ভগবান লীলা করেন সৃষ্টির মধ্যে। গভর্ণমেন্টও একটা লীলা করছেন। তাঁরা কর্ডন কনট্রোল রেশনিং অসুরকে একদিকে মারছেন অন্যদিকে সৃষ্টি করছেন। আমরা গভর্ণমেন্টকে বলছি যে কর্ডনিং তুলে দিন। তাঁরা বলেন যে cordoning তুলে দিয়ে দেখা গেছে সেই সেই অঞ্চলে দাম হহু করে

বেড়ে গিয়েছে। কর্ডনিং করলেও বিপদ উঠিয়ে দিলেও বিপদ এইত অবস্থা। প্রদেশের ভিতর প্রকিওরমেন্ট-এও একটা দাম বাড়বার কারণ। প্রদেশের ভিতর সংগ্রহের ব্যবস্থা রহিত করুন। এই ব্যবস্থা থাকলে দুর্নীতি চলবে। যদি প্রকিওরমেন্ট দরকার হয় বাহির থেকে আনুন। ডেপুটি লীডার বলেছেন পাকিস্তানে খাদ্য শস্যের অভাব নাই। করাচী থেকে ১২ লক্ষ মন চাল আসবে, হুইট এবং হুইট প্রডাক্টস আসবে। কবে যে আসবে তা আমরা জানি না। চিনি নাই ৭ মাস হতে চলল তাঁদের কোন দৃষ্টি নাই। বাহির হইতে খাদ্য শস্য আমদানী করুন এবং ঘাটতি এলাকায় গভর্ণমেন্ট গুদামে তা রাখুন।——লোকের মন থেকে ভীতি দূরীভূত হবে এবং যে সব ব্যবসায়ী বেশী দামে জিনিষ বিক্রী করতে চায় তারাও দমন হবে। আমরা বলতে চাই কন্টোল, রেশনিং দ্বারা অনিষ্ট হচ্ছে। এ সমস্ত রহিত করে আমরা যে ব্যবস্থা বলছি তাই গ্রহণ করুন দেশে অচিরে সুখ শান্তি ফিরে আসবে।[২২]

পূর্ব বাঙলা পরিষদে খাদ্য পরিস্থিতির ওপর উপরোক্ত বিতর্কের শেষে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী নূরুল আমীন একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনাসমূহের একের পর এক জবাব দেন। এগুলির মধ্যে কতকগুলি এখানে উল্লেখযোগ্য।

কেবলমাত্র শহরের লোকের জন্যেই রেশনিং প্রথা চালু রাখা হয়েছে এবং সেই হিসেবে রেশনিং পূর্ব বাঙলার সর্বত্র তুলে দেওয়া হোক এই বক্তব্য প্রসঙ্গে নূরুল আমীন বলেন যে, শুধু শহরের জন্যে রেশনিং প্রবর্ত্তন করা এবং চালু রাখা হয়েছে একথা মোটেই ঠিক নয়। রেশনিং প্রথা শহর এবং গ্রামের সমগ্র জনগণের উপকারের জন্যেই প্রবর্ত্তিত হয়েছে। বস্তুতঃ পক্ষে গ্রামের সরবরাহের সাথে শহরের রেশনিং-এর প্রশ্ন খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কারণ, যে সমস্ত জায়গা ঘাটতি এলাকা এবং যেখানে বহু লোকের একত্র বাসবাস একমাত্র সেই সমস্ত এলাকাতেই রেশনিং প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। তিনি বলেন যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি শহরে রেশনিং যদি তুলে নেওয়া হয় তাহলে বাইরে থেকে এই সব অঞ্চলে বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী হবে এবং তার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধান চালের দাম গ্রামাঞ্চলে ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এ জন্যে যে সমস্ত

ঘাটতি অঞ্চলে বহু লোকের বাস এবং যেখানে লোকেরা অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যেও খাদ্য কিনতে পারে সেই সব অঞ্চলে সরবরাহের ভার সরকার নিজের হাতে নিয়ে মূল্যকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছেন। ঢাকায় যদি রেশনিং না থাকতো তাহলে মফস্বলে যে চাল এখন ৩৫্ থেকে ৪০্ টাকায় বিক্রী হচ্ছে সেই চালের দর বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াতো ৫০্ থেকে ৬০্ টাকায়। নূরুল আমীন বলেন যে, রেশনিং প্রথার চীনা প্রাচীরের জন্যেই তা হচ্ছে না এবং রেশনিং তুলে নিলে গ্রামাঞ্চলের গরীবদের জীবনে ধান চালের হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি আরও অনেক বেশী সর্বনাশ ডেকে আনবে।[২৩]

ভারতে ধান চাল পাচার এবং বর্ডার মিলিশিয়াদের দুর্নীতি সম্পর্কে কয়েকজন পরিষদ সদস্যের বক্তব্যকে খণ্ডন করতে গিয়ে নূরুল আমীন বলেন যে, যাঁরা ভারতে খাদ্যশস্য পাচারের কথা বলছেন তাঁরাই আবার বলছেন যে, পূর্বে বাঙলার থেকে পশ্চিম বাঙলায় ধান চালের দর কম। পশ্চিম বাঙলায় ধান চালের অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের কথা স্বীকার করে খাদ্যমন্ত্রী বলেন যে, সেই অবস্থায় পূর্ব বাঙলা থেকে ধান চাল পাচার হওয়া কিভাবে সম্ভব? কাজেই তাঁর মতে চোরাচালানের প্রশ্নকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে হবে। দুই দেশের মধ্যে খাদ্যশস্যের আপেক্ষিক মূল্যই পূর্ব বাঙলা থেকে পশ্চিম বাঙলায় চোরাচালান না হওয়ার স্বাভাবিক কারণ। বর্ডার মিলিশিয়া চোরাচালানের কাজে লিপ্ত থেকে দুর্নীতি করছে এই অভিযোগকেও নূরুল আমীন ভিত্তিহীন ব্যাপার বলে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন।[২৪]

কনট্রোল প্রথা সম্পর্কে নূরুল আমীন বলেন যে, তা বহাল রাখা অথবা রহিত করা সম্পর্কে পরিষদ সদস্যদের মধ্যে কোন মতৈক্য নেই। তিনি বলেন যে, তিনি নিজে একজন বিশেষজ্ঞ নন তবে যে ব্যবস্থা তাঁরা রেখেছেন সেটা অন্য দেশের উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়েই রেখেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে পশ্চিম বাঙলা এবং ভারতের কথা উল্লেখ করেন। কলকাতায় তখনো খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণ ছিলো। সে দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে কলকাতায় ঢাকার থেকে বেশী সংখ্যক বিশেষজ্ঞ আছেন এবং তাঁরা নিশ্চয় সেখানে অকারণে কনট্রোল প্রথা রাখছেন না। তাঁরা কাপড়ের কনট্রোল তুলে নিয়েছেন। তার পরিণতি কি হয়েছে তা সকলেরই জানা। কাজেই তাঁরা আবার কাপড়ের কনট্রোল প্রবর্তনের চিন্তা করছেন। সেখানে কনট্রোল তুলে নেওয়ার পরীক্ষা

করতে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে। তাছাড়া ভারতের অন্যান্য বহু জায়গাতেও এখন খাদ্যশস্যের কনট্রোল চালু আছে। নূরুল আমীন বলেন যে, তাঁরাও পূর্ব বাঙলায় কনট্রোল তুলে দেওয়ার পরীক্ষা করেছেন এবং সে পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই কনট্রোল তুলে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। একথা সকলেই জানে যে, যেখানে যে জিনিষের ঘাটতি সেখানে সেই জিনিষের কনট্রোল দরকার। অন্যথায় যাদের বেশী দাম দিয়ে বেশী কেনার ক্ষমতা তারা বেশী বেশী করে কিনে সেই জিনিষের দাম সাধারণ ভাবে অনেক বাড়িয়ে দেয় এবং তার ফলে গরীব এবং অল্পবিত্ত মানুষেরাই বিপদগ্রস্থ হন।[২৫]

বিরোধী দলের ডেপুটি লীডার ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্য—অকার্যকর নিয়ন্ত্রণ, সংগ্রহ ও বিতরণের থেকে একেবারে কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ, সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা না রাখা।[২৬] —এই বিষয় উল্লেখ করে নূরুল আমীন বলেন যে তার অর্থ হলো এই যে, হয় আমাদের একটা প্রথম শ্রেণীর প্রশাসন ব্যবস্থা থাকা দরকার নয়তো কোন প্রশাসন ব্যবস্থা থাকারই দরকার নেই। কিন্তু কোন সরকারই এই উপদেশ মেনে নিতে পারেন না। কারণ প্রথম শ্রেণীর প্রশাসন ব্যবস্থার অভাবে তাঁরা যদি সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে বসেন তাহলে সারা দেশব্যাপী নৈরাজ্য দেখা দেবে। কাজেই সরকারকে সব সময় একটা আদর্শ সামনে রেখে মাঝামাঝি ধরণের প্রশাসন যন্ত্র দিয়েই কাজ চালাতে হবে।[২৭]

সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রসঙ্গে বিভাগীয় মন্ত্রী নূরুল আমীন বলেন যে, দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নি। ভাল অফিসারদের সম্পর্কে কেউ কথা না বলে ঢালাও-ভাবে শুধু দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের কথা বলেই সকলে ক্ষান্ত হচ্ছেন। এ কথা ঠিক যে সকল অফিসারই সৎ নয়। কিন্তু তাই বলে সকল অফি-সারকে দুর্নীতিপরায়ন্ন বলে সাধারণভাবে অভিযোগ উত্থাপনেরও কোন ভিত্তি নেই। তিনি পরিষদ সদস্যদের কাছে অনুরোধ করেন তাঁরা যেন অফিসারদের বিরুদ্ধে বিশেষ বিশেষ অভিযোগ এনে দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে সরকারের সাথে সহযোগিতা করেন।[২৮]

আভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহের প্রসঙ্গে নূরুল আমীন বলেন যে, সরকার যে সন্তোষজনকভাবে এই সংগ্রহ করতে পারেন নি এ কথা সরকার নিজেই স্বীকার করেন। পূর্ববর্তী ডিসেম্বর—জানুয়ারী মাসের কনট্রোল

বিরোধী আন্দোলনের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে সারা পূর্ব বাঙলাব্যাপী তখন কর্ডন তুলে নেওয়ার জন্যে জোর আওয়াজ তোলা হয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা তখন হাজার হাজার লোকের সভায় কনট্রোলের বিপক্ষে এবং কনট্রোল প্রথা উঠিয়ে দেওয়ার আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়ান। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা নিজেদের বিশেষজ্ঞদের সাথে একত্রে বসে সে সময় স্থির করেন যে তৎকালীন অবস্থায় কনট্রোল তুলে নিলে জনগণের পক্ষে তার পরণতি মারাত্মক হবে। কাজেই কনট্রোল রাখারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে তিনটি জেলায় কর্ডন উঠিয়ে দিয়ে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ এলাকায় সংগ্রহকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু এইভাবে কয়েকটি জেলায় কর্ডন তুলে নেওয়ার ফল অন্যান্য কর্ডনভুক্ত এলাকার পক্ষে খুব খারাপ দাঁড়ায়। সেখানকার লোকে নিজেদের এলাকাতেও কর্ডন উঠিয়ে নেওয়ার জোর দাবী তুলে সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানারকম বাধা সৃষ্টি করে। সংগ্রহের পক্ষে সব থেকে উপযুক্ত মাস জানুয়ারী এই ভাবে কনট্রোল রাখা না রাখার গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে নষ্ট হয়।[২৯]

কর্ডন থাকা অবস্থায় বলা হতো যে, কর্ডনিং অফিসাররা ঘুষ খেয়ে ধান চালের দর বৃদ্ধি করছে। নূরুল আমীন পরিষদকে জিজ্ঞাসা করেন বরিশাল ময়মনসিংহে কর্ডন তুলে নেওয়ার পর দর কমছে না কেন? এখন তো কর্ডনিং অফিসাররা নেই। তবে তাদের স্থানে এখন কারা এই দর বৃদ্ধি করছে? এর জবাবে তিনিই বলেন যে, তারা হচ্ছে ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেউই নয়। এরাই উদ্বৃত্ত জেলাগুলি থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য খরিদ করে ধান চালের দর বাড়িয়ে দিচ্ছে। এদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে নূরুল আমীন নিজের দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করেন।[৩০]

খাদ্য সমস্যার ওপর এই পরিষদ বিতর্কে খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন, আলী আহমদ খান প্রভৃতি বিরোধী দলীয় সদস্যেরা কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। বিরোধীদলের মধ্যে শুধু কংগ্রেস সদস্যেরাই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সমালোচনাও কতকগুলি বিশেষ কারণে তেমন জোরালো অথবা সুফলপ্রসূ হয় নি।

এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় পৃথকভাবে উল্লেখ করা দরকার। প্রথমটি হচ্ছে প্রকিওরমেন্ট বা সংগ্রহের প্রশ্নে কংগ্রেস সদস্যদের মতামত ও বক্তব্য। একথা খুবই সত্য যে, সরকারী সংগ্রহ নীতির মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি

ও দুর্নীতি ছিলো কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সংগ্রহ নীতি পূর্ব বাঙলার তৎকালীন সংকটাপন্ন অবস্থায় নীতি হিসেবে ভুল ছিলো। কিন্তু এই কথাটিই কংগ্রেস সদস্যরা বারবার করে তাঁদের বক্তৃতায় বলছিলেন। তাঁদের মুখ থেকে আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ উঠিয়ে নেওয়ার কথাটা একটা দাবী হিসেবেই বারংবার উচ্চারিত হচ্ছিলো।

তাঁদের এই দাবীর কারণ ছিলো এই যে, যাদের থেকে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতির মাধ্যমে সরকার নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কিনে নিচ্ছিলেন তারা অনেকেই ছিলো জমিদার, জোতদার ও মহাজন শ্রেণীর লোক। এবং তখনো পর্যন্ত এই শ্রেণীভুক্ত লোকদের মধ্যে ছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। আভ্যন্তরীণ সংগ্রহের ফলে মজুত খাদ্যশস্য এরা উচ্চ হারে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতে না পারার ফলে তাদের স্বার্থহানি হচ্ছিলো। পূর্ব বাঙলা পরিষদে কংগ্রেস সদস্যেরা নিজেরা ছিলেন এই জমিদার জোতদার শ্রেণীভুক্ত। তাছাড়া সাধারণভাবে এই শ্রেণীর স্বার্থেরও তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করতেন। এ জন্যেই ঢালাওভাবে সংগ্রহনীতি প্রত্যাহার করার সপক্ষে ছিলো তাঁদের ঐক্যবদ্ধ দাবী।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, রেশনিং সম্পর্কে কংগ্রেস সদস্যদের বক্তব্য এবং দাবী। এই দাবী একদিকে ছিলো যেমন তাৎপর্যপূর্ণ অন্যদিকে তেমনি বিস্ময়কর। তবে এই দাবীর তাৎপর্য উপলব্ধি করলে বিস্ময়ের অবসান ঘটতে দেরী হয় না।

রেশনিং তুলে না দেওয়ার সপক্ষে নূরুল আমীন যে যুক্তি প্রদান করে-ছিলেন তা যথার্থ। কারণ জনবহুল এবং অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকদের এলাকা বড়ো বড়ো শহরগুলিতে রেশনিং চালু না রাখলে ব্যবসায়ীরা সেই সব জায়গায় ইচ্ছেমতো সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে শুধু যে শহরেই খাদ্যশস্যের দাম বাড়িয়ে দিতো তাই নয়, গ্রামাঞ্চলেও তার দাম সব রকম নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যেতো। একথা এত সহজ এবং সাধারণভাবে সকলের জানা যে প্রথম দৃষ্টিতে কংগ্রেসের রেশনিং তুলে দেওয়ার দাবী সত্যিই বিস্ময়-কর এক ধাঁধার মতো মনে হয়।

কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সংগ্রহ নীতি বাতিল করার দাবীর মতো রেশনিং তুলে নেওয়ার দাবীও তাঁদের নিজেদের শ্রেণী চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত। এই শ্রেণী চরিত্রের আবার একটা বিশেষ সাম্প্রদায়িক দিকও ছিলো।

ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ইত্যাদি বড় বড় রেশনিং এলাকাভুক্ত শহরগুলিতে খাদ্য সরবরাহ সাধারণতঃ হ'তো তাদের নিকটবর্তী কতকগুলি ধান চালের ব্যবসা কেন্দ্র থেকে। এই ব্যবসাকে বলা হতো রাখীর ব্যবসা। ঢাকা ও নারায়নগঞ্জের সরবরাহ রেশনিং প্রবর্ত্তনের পূর্ব পর্যন্ত হতো মীরকাদিম, নরসিংদী, নন্দনগঞ্জ প্রভৃতি এলাকা থেকে। রেশনিং প্রবর্তিত হওয়ার পর এই সব এলাকার রাখীর ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পূর্বে শহরাঞ্চলে খাদ্যশস্য সরবরাহ করে তারা যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করতো সেটা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

এই রাখীর ব্যব্যসায়ীদের প্রায় সকলেই ছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এবং এদের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই পূর্ব বাঙলা পরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্যেরা রেশনিং এর সুবিধা বঞ্চিত পূর্ব বাঙলার চার কোটি দরিদ্র জনগণের দোহাই পেড়ে দেশ থেকে রেশনিং উঠিয়ে নেওয়ার দাবী জানাচ্ছিলেন।

খাদ্য সমস্যার ক্ষেত্রে কংগ্রেস সদস্যদের এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যেই কর্ডন বিরোধী আন্দোলন এবং সাধারণভাবে তৎকালীন খাদ্য আন্দোলনে ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁদের সাথে একত্রে কাজ করতে অসমর্থ হন।[৩১] রেশনিং এর ক্ষেত্রে ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের লোকেদের দাবী ছিলো বরাদ্দ খ্যাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং পচা চাল আটা ইত্যাদি সরবরাহ বন্ধ করা। কাজেই কংগ্রেস সদস্যদের রেশনিং সম্পূর্ণভাবে উঠিয়ে নেওয়ার দাবীর সাথে তাঁদের একেবারেই কোন ঐক্যমত ছিলো না।

প্রকিওরমেন্ট ও রেশনিং এর ক্ষেত্রে একদিকে প্রশাসনিক যন্ত্রের অব্যবস্থা এবং অন্যদিকে আমলাদের দুর্নীতিই খাদ্য পরিস্থিতিকে জটিল করেছিলো। মজুতদার ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের সাথে জমিদার জোতদারদের আঁতাতও পরিস্থিতির অবনতি ঘটার অন্যতম প্রধান কারণ ছিলো। পূর্ব বাঙলা পরিষদের সদস্যরা অধিকাংশই কোন না কোন সূত্রে এই সমস্ত সমাজ বিরোধী স্বার্থের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। এজন্যে একদিকে যেমন তাঁদের সাথে খাদ্য আন্দোলনের কোন উল্লেখযোগ্য যোগ থাকে নি অন্যদিকে তেমনি তাঁরা সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠনের কোন প্রশ্নও তোলেন নি। বিতর্ক কালে নিজেদের সংকীর্ণ বক্তব্য পেশ করেই তাঁরা ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে খাদ্য সংকটের ক্ষেত্রে নিজেদের "পবিত্র" দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৬

১৯৪৯ সালে বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্য পরিস্থিতি

খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমা খাদ্যশস্যের দিক দিয়ে একটা উদ্বৃত্ত অঞ্চল। কিন্তু এই অঞ্চলেও খাদ্য সঙ্কট ১৯৪৭ এর নভেম্বর মাসে কি পর্যায়ে উপনীত হয় সেটা নিম্নলিখিত রিপোর্ট থেকে বোঝা যাবে:

> বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ, কচুয়া, মোল্লাহাট প্রভৃতি অঞ্চলে এবার এক মণ ধান ৫০্ টাকা দিয়েও কিনতে হচ্ছে। শত শত লোক এই বাগেরহাটে খাদ্যাভাবে অকাল মৃত্যুর কবলে চলে গেছে। মফস্বলের বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ লেগে গেছে ৩।৪ মাস আগে থেকেই। যার ফলে মোরেলগঞ্জ, মোল্লাহাট ফকিরহাট হতে সহস্র সহস্র লোক ঘরবাড়ী ছেড়ে শহরের দিকে দুমুঠো অন্নের সন্ধানে চলেছে ছেলেমেয়েদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে এই আশ্বাসে। এবং এই সকল অঞ্চলে ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে ও সহরে ভিড় করছে। বর্তমানেও ধান চালের দাম এত চড়া যা জনসাধারণের ক্রয় শক্তির বাইরে। এত গেল খাদ্য শস্যের অবস্থা—এদিকে সরিষার তেলের সের ৫ টাকা। তাও খাঁটি নয়। পেটের পীড়া সৃষ্টিকারী ভেজাল বাদাম তেল।....
>
> বর্তমানে বাগেরহাটে এত ভিক্ষুক বেড়েছে যে ৫০ সনের দুর্ভিক্ষের আমলকেও ছাড়িয়া গেছে। ওদিকে শহরের চারিদিকে গায়ে খাটা মজুরদের অবস্থা ভয়ানক করুণ।....
>
> জনসাধারণ কনট্রোল ও চোরাবাজারের দৌরাত্ম্যে নাজেহাল হয়ে পড়েছে। জনসাধারণ যেখানেই এই সকল সমাজবিরোধী ও দুর্নীতি- পরায়ণ কার্যের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হচ্ছে সেখানেই বাগের-হাটের সরকারী কর্তৃপক্ষ পুলিস দিয়ে তাদের ছলে-কৌশলে লাঞ্ছনা দিচ্ছে। হাজতে আটকিয়ে জামিনের আশ্বাস দিয়ে আনসার বাহিনীর নাম নিয়ে জুলুম করে টাকা আদায় করছে।[১]

১৯৪৮ এর নভেম্বরের দিকে* ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় চালের দর দাঁড়ায় ৪২ থেকে ৫৩ টাকা। সেই তুলনায় সেখানে পাটের দর থাকে মণ প্রতি ২৮-২৯ টাকা।[২] রংপুরে নোতুন আমন চাল ২৯-৩০ টাকা এবং অন্যান্য চাল ৩৪-৩৫ টাকা মণ দরে বেচাকেনা হয়। নোয়াখালীতে দুর্ভিক্ষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে এই মর্মে রিপোর্টও এই সময় দেখা যায়।[৩]

১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে খাদ্য পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। সংবাদপত্রে এ সময়ে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকার খাদ্য মূল্যের সম্পর্কে যে রিপোর্টসমূহ প্রকাশিত হতে থাকে তার থেকে দেখা যায় যে সর্বত্র চালের দর দ্রুতগতিতে অস্বাভাবিকরকম বৃদ্ধি পাচ্ছে। জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চালের দর দাঁড়ায় মণ প্রতি ৪০-৪২ টাকা, চাঁদপুরে ৩৬-৩৭ টাকা, সিরাজগঞ্জে ৪০ টাকা।[৪] প্রদেশের অন্যত্রও চালের মূল্য প্রায় ঐ রকমই থাকে।

এ সম্পর্কে দৈনিক আজাদে ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৯, তারিখে "খাদ্য সমস্যার প্রতিকার" নামক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই সম্পাদকীয়টির নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে তৎকালীন খাদ্য পরিস্থিতির একটা চিত্র পাওয়া যাবে:

> মাঘ মাস হইতে চাউলের মূল্য চল্লিশ টাকা এবং ধানের মূল্য ছাব্বিশ টাকায় উঠিবার যে কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সরবরাহ বিভাগ এখনও খুলিয়া বলিতেছেন না কেন? গত বৎসর এ সময়ে চাউলের দাম পঁচিশ টাকা এবং ধানের দাম ষোল-সতেরো টাকার মধ্যে ছিল বলিয়াই আমাদের মনে পড়ে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে উহা বাড়িয়া চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকায় উঠে। এবারকার আমন ফসল উঠিবার বহু পূর্বেই সরকার তাঁহাদের নূতন খাদ্য পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি। বাড়তি এলাকায় যাহাদের

---

* বেসামরিক সরবাহ বিভাগের একটি হিসেব মত পূর্ব বাঙলার কতকগুলি ঘাটতি অঞ্চলে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ এবং জানুয়ারী ১৯৪৯ এ চালের দর ছিলো নিম্নরূপ:

ঢাকা সদর-৪৫৲, নারায়ণগঞ্জ-৪৫৲, মাণিকগঞ্জ ৪৫৲, মুন্সীগঞ্জ-৪৩৲, ফরিদপুর সদর-৩৩ ।০, গোয়ালন্দ-৩৭৲, মাদারীপুর-৪১৲, গোপালগঞ্জ (২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯)-৩৪৲, চট্টগ্রাম সদর-২২ ।০ কক্সবাজার-২১৲, ত্রিপুরা (সদর উত্তর)-৩৬ ।০, ত্রিপুরা (সদর দক্ষিণ)-২৭ ।।০, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪৪৲, চাঁদপুর ৩৪ ।।০, নোয়াখালী-৩০৷০, ফেণী ২২ ।।০। (East Bengla Legislative Assembly Proceedings, Vol. IV-No; I. P. I4; I4-II 1949)

তিরিশ বিঘার বেশী ধানের জমি আছে তাহাদের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে ধান্য ক্রয় করিবার নীতি সরকার ধান উঠিবার বহু পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আমরা একথাও শুনিয়াছিলাম যে, এজন্য আমলা ফায়লা নিযুক্তি করণের কার্যটা বহু পূর্বেই সরকার সারিয়া ফেলিয়াছিলেন। সব কাজেরই সাফল্য যাহারা কাজ করে তাহাদেরই উপরে নির্ভর করে বলিয়া এবং পদস্থ সরকারী আমলাদের অতীত কার্যকলাপ আমাদের জানা আছে গতিকে আমরা যদিও সরকারের উপরোক্ত ক্রয় নীতির সাফল্য সম্বন্ধে কোন দিনই খুব বেশী উচচাশা পোষণ করি নাই, তবু অন্ততঃ এতটুকু বিশ্বাস আমাদের ছিল যে আমলারা অন্ততঃ অবস্থাটাকে গতবারের চাইতে খারাপ করিয়া তুলিবেন না। আমরা এরূপ আশাও করিয়াছিলাম যে, বাড়তি এলাকা হইতে সরকার যে ধান-চাউল ক্রয় করিবেন, তাহা কালবিলম্ব না করিয়া ঘাটতি এলাকাতে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং মফস্বলের প্রত্যেকটি অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিলি করিতে সমর্থ হইবেন। যদি সরকার তাহাতে সমর্থ হইতেন, তবে যে এলাকাতে বর্তমানে ধান চাউলের এরূপ অগ্নিমূল্য হইত না, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সরকারী যন্ত্র তাহা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়াছেই, উপরন্তু আমরা দায়িত্বশীল মহল হইতে এরূপ সংবাদও পাইতেছি যে, অনেক বাড়তি এলাকায় সরকার এখন পর্যন্ত ক্রয়ও আরম্ভ করেন নাই; আর করিয়া থাকিলেও তাহা ঘাটতি এলাকায় প্রেরণ করিবার কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে সমর্থ হন নাই। এদিকে সরকারী কড়াকড়ির ফলে ব্যবসায়ীগণও বাড়তি এলাকায় ধান চাউল ক্রয় করিয়া ঘাটতি এলাকায় প্রেরণ করিতে পারিতেছেন না। আর পারিলেও তজ্জন্য তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই যথেষ্ট সেলামী কোথাও কোথাও দিতে হইতেছে। এই অবস্থার পুরাপুরি সুযোগ লইতেছেন ঘাটতি এলাকার ব্যবসায়ীরা। করিৎকর্মা সরকারী আমলাদের "গুণাগুণ" সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই ওয়াকেফহাল থাকাতে ঘাটতি এলাকার ব্যবসায়ীগণ একথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন যে এবার তাঁহাদের এলাকায় খাদ্য সমস্যা গত বৎসর অপেক্ষাও সঙ্কটজনক হইয়া উঠিবে। সুতরাং ভবিষ্যতে আশানুরূপ মুনাফা করিয়া লাল হইয়া উঠিবার আশায় ঘাটতি এলাকার

এই সকল ব্যবসায়ীরা নিজেদের এলাকার ধান-চাউল কৃষকদিগকে বেশী মূল্যের লোভ দেখাইয়া সমানে ক্রয় করিতেছেন। ইহারই ফলে ঘাটতি এলাকাগুলিতে ধান চাউলের দাম প্রতিদিনই এরূপভাবে বাড়িতেছে।

উপরোক্ত 'আজাদ' সম্পাদকীয় থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় পূর্ব বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে কোন পর্যায়ে ছিলো। সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের শৈথিল্য, অকর্মণ্যতা এবং কর্মচারীদের অসাধুতা এই সময় সাধারণভাবে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের বিরুদ্ধে জনগণকে ভয়ানকভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই বিক্ষোভের প্রমাণ সংবাদপত্রের পাতা থেকে শুরু করে সভা-সমিতি, বক্তৃতা বিবৃতি এবং ব্যবস্থা পরিষদের বিতর্কের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

ধানকাটা মজুর বা দাওয়ালদের অবস্থা এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলা থেকে যে সমস্ত ধানকাটা মজুরেরা বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি জেলায় ধান কাটার জন্যে ১৯৪৮ এর শেষের দিকে গিয়েছিলো তারা কর্ডন প্রথার জন্যে ধান কাটার পর নিজেদের প্রাপ্য ধান নৌকায় তুলতে পারে নাই। এই সময় সরবরাহ বিভাগ ব্যবস্থা করেছিলো যে দাওয়ালদের ধান সংগ্রহ করে তারা সেই ধানের পরিবর্তে তাদেরকে টিকিট দেবে এবং সেই টিকিট দেখিয়ে নিজেদের এলাকায় স্থানীয় সরকারী গুদাম থেকে তারা সমপরিমাণ ধান পাবে। এর জন্যে দাওয়ালদেরকে বরিশাল ও খুলনা জেলাস্থ সরকারী গুদামে ধান জমা দিতে হতো। সেই ধান জমা দেওয়ার পর নিজেদের এলাকায় ধান ফেরৎ পেতে তাদের যে দীর্ঘ সময় লাগতো তার মধ্যে এই দাওয়ালদেরকে বাধ্য হয়ে ৩৫ টাকা থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত মণ দরে চাল কিনে খেতে হতো। তাছাড়া বরিশাল ও খুলনায় ভাল জাতের চাল সরকারী গুদামে তুলে দিয়ে তার পরিবর্তে তাদেরকে যে চাল ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিলো তা ছিলো নিতান্তই নিকৃষ্ট জাতের। এই সমস্ত দুর্ভোগের ওপর সরকারী ধান ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের হাতে তাদের লাঞ্ছনা তাদের দুর্দশাকে আরও বাড়িয়ে তুলতো।*

* ধানকাটা মজুরদের এই দুর্দশার উল্লেখ করে ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কয়েকজন সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করেন (আজাদ। ২০শে জানুয়ারী ১৯৪৯)

এই কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তখন অনেক রিপোর্ট আসতে শুরু করায় ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯, তারিখে দৈনিক আজাদ 'ধানকাটা মজদুর' নামে একটি সম্পাদকীয়তে বলেন:

> বরিশাল, শ্রীহট্ট, খুলনা এবং অন্যান্য বাড়তি জেলাগুলিতে ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালী প্রভৃতি ঘাটতি জেলা হতে যে সকল ধান কাটা মজুর ধান কাটিতে এবার অগ্রাণ মাসের প্রারম্ভে গিয়াছিল, তাহারা সরল বিশ্বাসে উপরোক্ত সরকারী কুপন লইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। এই সকল কুপন লইয়া তাহারা যখন তাহাদের এলাকার সরকারী গুদামে কর্তাদের কাছে ধান আনিতে গেল, তখন ধান আর তাহারা পাইল না—পাইল প্রতিশ্রুতি, অর্থাৎ কথা। ঘাটতি জেলার সরকারী গুদামগুলিতে এখনও নাকি এক ছটাক ধানও আসিয়া পেঁৗছে নাই, সরকারী সংগ্রহ বিভাগের এমনই মহিমা। কাজেই এই মজুরেরা আর ধান কোথায় পাইবে। তাহাদিগকে বলা হইয়াছে, যখন ধান গুদামে আসিবে, তখন কুপনে উল্লিখিত ধান শোধ দেওয়া হইবে। সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের বুঝা দরকার যে ধানকাটা মজুরেরা জোতদার নহে যে তাহারা প্রতিশ্রুতির অপেক্ষা করিতে পারে, মাসে মাসে বেতন পায় না যে, তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে।

ধান কাটা মজুরদের অবস্থা এইভাবে বর্ণনা করার পর 'দৈনিক আজাদ' এর সম্পাদকীয়টিতে সরকারকে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা খুবই উল্লেখ-যোগ্য। সরকারী কর্ডন নীতি এই দাওয়াল কৃষকদের মনে সরকার বিরোধী যে মনোভাব প্রচণ্ডভাবে জাগ্রত করেছিলো তারই পরিপ্রেক্ষিতে এতে বলা হয়:

> ঘাটতি এলাকায় এই মাঘ মাসেও চালের দর চল্লিশ টাকা। কাজেই এই দরিদ্র কৃষি মজুরেরা নিজেদের ন্যায্য পাওনা সময়মত না পাইয়া সংঘবদ্ধ হইয়া কোনরূপ অবাঞ্ছিত কিছু করিবার পূর্বে সরকার ইহাদের প্রাপ্য ধান মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করিবেন আমরা এই আশাই করি।

কৃষকদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ সম্পর্কে মুসলিম লীগ সমর্থক এই পত্রিকা-টির আতঙ্ক থেকে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনেকখানি অনুমান করা যায়।

ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জে খাদ্য পরিস্থিতি জানুয়ারীর শেষ দিকে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। লৌহজঙ্গ থানার অবস্থাই দাঁড়ায় সব থেকে খারাপ।

সেখানে খাদ্যাভাবে কয়েকজনের মৃত্যু ঘটার সংবাদও প্রকাশিত হয়।[৫] ত্রিপুরা জেলাতে এই সময় চালের মূল্য ৩০-৪০ টাকায় দাঁড়ায়। সেখানকার অবস্থার অবনতি ঘটার ফলে চাঁদপুরে শর্ষিণার পীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে চাঁদপুরের চারজন পরিষদ সদস্যকে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে করে তাঁরা যেন তৎকালীন মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভাকে সমর্থন দান থেকে বিরত থাকেন। এই সংবাদ উদ্ধৃত করে "বিবিধ প্রসঙ্গ" শীর্ষক একটি আধা সম্পাদকীয় কলামে দৈনিক আজাদ সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেন, "সময় থাকিতে মন্ত্রীসভা এখনো সতর্ক হোন।"[৬]

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে খাদ্যাভাবের নানান রিপোর্ট প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময় নেত্রকোণার খাদ্য সঙ্কট সম্পর্কে মহকুমা লীগ সম্পাদক একটি বিবৃতিও সংবাদপত্রে প্রদান করেন।[৭]

১৯৪৯ এর মার্চ মাসে কিশোরগঞ্জে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর দুরবস্থা চরমে ওঠে। আগের বছর যেখানে ২০-২২ টাকায় চাল পাওয়া যেতো সেখানে এই সময় চালের দর দাঁড়ায় ৪০-৪৫ টাকা। সরবরাহের অবস্থা এমন সঙ্কটজনক হয়ে দাঁড়ায় যে তিন মাস আগে থেকে সেখানে রেশন দোকানগুলি থেকে চাল দেওয়া বন্ধ হয়।[৮]

মার্চ মাসের দিকে ফরিদপুর জেলার দুর্ভিক্ষের অবস্থা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট থেকে কিছুটা বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়:

> ফরিদপুর জেলার দুঃখ-দুর্দশা আজ চরমে পৌঁছেছে। গোপালগঞ্জ মহকুমার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ লোক "দাওয়াল" বা ভূমিহীন কিষাণ। এরা বছরের ছ' মাসের খোরাক বরিশাল ও খুলনা থেকে জোগাড় করে থাকে। কিন্তু এই বছর তাদেরকে খুলনা ও বরিশাল থেকে তাদের এই মজুরীর ধান আনতে দেওয়া হয়নি। সীমান্তের সরকারী কর্মচারীরা চোরাকারবার ধরার অজুহাতে এদের কাছ থেকে জুলুম করে সেই ধান কেড়ে নিয়েছে। এর ফলে গোপালগঞ্জ মহকুমায় অবিলম্বে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা না করলে এই এলাকায় দুর্ভিক্ষ অনিবার্য। মাদারীপুরের অবস্থা আরও শোচনীয়। গোপালগঞ্জের মতো এই মহকুমার প্রায় অর্ধেক লোক 'দাওয়াল'। বরিশাল থেকে ধান আনতে না দেওয়ায় এখানকার এই দাওয়ালদের অবস্থা অত্যন্ত

শোচনীয়। বরিশাল ও খুলনা জিলার সীমানা পাড়ি দেওয়ার সময় সরকারী কর্মচারীরা ফরিদপুরের দাওয়ালদের কাছ থেকে আনুমানিক তিন লাখ মণ ধান আটক করেছে।

রাজবাড়ী সদরেও ব্যাপকভাবে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। ধান চাউলের দর গরীব জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। শোনা যাচ্ছে, সরকার নাকি ফরিদপুর জিলার এই খাদ্যাভাব দূর করার জন্য ছাব্বিশ হাজার মণ ধান বিতরণ করতে সিদ্ধান্ত করেছেন। ফরিদপুর জেলার পনের বিশ লাখ আকালগ্রস্থ জীবনের প্রতি এর চেয়ে নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে।

পাকিস্তান হওয়ার পর গরীব কিষাণ প্রজাদের দুর্দশা ষোলকলায় পূর্ণ করার জন্য গোয়ালন্দ থেকে তারপাশা পর্যন্ত পদ্মায় যে নতুন চর উঠেছে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক জমিদার মোহন মিয়া (এম. এল.এ.) কে সরকার তার সবটুকুরই মালিক করে দিয়েছে। চরগুলো নদীগর্ভে যতদিন ছিলো ততদিন সরকারের খাজনা জুগিয়েছে —মোহন মিয়া নয়—গরীব প্রজারা। তাদের আশা ছিল চর উঠলে তারাই হবে জমির মালিক। তাছাড়া সরকারের জমিদারী উচ্ছেদ বিলের কথা তাদের এই আশাকে আরও দৃঢ় করেছিলো। জমিদারী উচ্ছেদের নামে একজন জমিদার এম.এল.এর নতুন করে জমিদারী বৃদ্ধিতে জনসাধারণের সরকারের ন্যায় বিচারের প্রতি আস্থা নষ্ট হচ্ছে। পদ্মার এই চর মোহন মিয়ার হাতে যাওয়ায় আজ প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ।[৯]

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, চালের দর সে সময় অনেকখানি কমতির দিকে ছিলো।[১০] কিন্তু এর পর মে মাসের প্রথম সপ্তাহের দিক থেকে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি এবং চালের পুনরায় মূল্য বৃদ্ধির খবর গুণবতী, সৈয়দপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, নোয়াখালী, ঢাকা, ত্রিপুরা ইত্যাদি থেকে আসতে শুরু করে।[১১]

এই অবস্থায় ৮ই মে, ১৯৪৯, দৈনিক আজাদ পত্রিকায় 'প্রদেশের খাদ্যাবস্থা' নামক একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

বৈশাখ মাসের ১লা তারিখ হইতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সর্বত্র প্রবল বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইয়াছে। আজ পঁচিশে বৈশাখ। এ পর্যন্ত দুই

একদিন ছাড়া ইহার বিরাম নাই। এই বৃষ্টিপাতের ফলে মাঠ-ঘাট খাল-বিল পানিতে ভরিয়া গিয়াছে। অন্ততঃ ছয় আনা বোরো ধান নষ্ট হইয়াছে। আগয় আউস ফসল প্রায় সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। নীচু ভূমির আগামী আমন ফসলেরও একই অবস্থা। এদিকে পাট ফসলের অবস্থাও অতি শোচনীয়। অনেক জায়গায় এখন পর্যন্ত বীজ বপন সম্ভব হয় নাই। যে সব জায়গায় বীজ বপন করা হইয়াছে সে সকল এলাকায় পাট ক্ষেতও অবিরাম বৃষ্টিপাতের দরুণ নিড়ান সম্ভব হয় নাই; কাজেই চারা একরকম নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলা চলে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে চলতি বাঙ্গালা বৎসরের মধ্যভাগ হইতেই যে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ নানাদিক হইতে দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হইবে, তাহা একরকম অনিবার্য। বিশেষভাবে, খাদ্যশস্যের অভাব এবং পাট ফসল আংশিকভাবে ধ্বংস হওয়ার দরুণ নগদ টাকার অপ্রাচুর্যের সম্মুখীন এই প্রদেশের জনসাধারণকে হইতে হইবে।

অতিবৃষ্টির কারণে এই ক্ষয়ক্ষতির ফলে ত্রিপুরায় খাদ্যাবস্থার অবনতি সম্পর্কে এই সময় ত্রিপুরা জেলা মুসলিম লীগ সম্পাদক একটি দীর্ঘ বিবৃতি দান করেন।[১২] ১৬ই মে তারিখে ঢাকাতে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী পীরজাদা আবদুস সাত্তার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারের সাথে আলোচনা করেন। এই আলোচনার শেষে যে সরকারী প্রেস নোটটি প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয় যে, সামপ্রতিক অতি বৃষ্টির ফলে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শস্যের ক্ষতি হওয়ায় প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের কাছে অতিরিক্ত ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন চাল দাবী করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবী পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টার এবং এই দাবীকৃত পরিমাণের মধ্যে ৭০ হাজার টন খাদ্যশস্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[১৩]

এর পর কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী পীরজাদা ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য সংগ্রহ নীতি সম্পর্কে বলেন:

> বাধ্যতামূলক খাদ্য সংগ্রহ নীতি সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করাই পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায়। কিন্তু উক্ত নীতি সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করিতে হইলে উদ্বৃত্ত শস্যের সঠিক পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত শস্যের উপর লেভী নির্ধারণ করার উপরই উক্ত নীতির সাফল্য নির্ভর করে।[১৪]

এই দিনই একটি বেতার বক্তৃতায় পীরজাদা পূর্ব বাঙলার জনগণকে আশ্বাস দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলেন:

> আমি পূর্ববঙ্গবাসীকে আশ্বাস দিতেছি যে সাম্প্রতিক অতি বৃষ্টির ফলে উদ্ভূত যে কোন জরুরী অবস্থার মোকাবেলা করিতে পাকিস্তান সরকার সর্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছেন। সরকার খাদ্য বরাদ্দ করিতে কার্পণ্য করিবেন না।[১৫]

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পূর্ব বাঙলা সফর এবং খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে করাচীর 'ডন' পত্রিকা একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে[১৬] বলেন যে, খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাঙলাকে প্রভূত সাহায্য করা সত্ত্বেও সেখানে খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য এখনও গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। খাদ্যমন্ত্রীর পূর্ব বাঙলা সফরের ফলে অবস্থার কোন উন্নতি হবে বলে আশান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই বলেও তাতে মন্তব্য করা হয়। এরপর পূর্ব বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে পত্রিকাটিতে আরও বলা হয়:

> বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে যেরূপ উচ্চমূল্যে চাউল বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে মাঝামাঝি উপার্জনকারী সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে পুষ্টির অভাব দেখা দিতে বাধ্য। পূর্ব পাকিস্তানে ঘি প্রায় পাওয়াই যায় না; ইহা এখন ধনী লোকদের অন্যতম মহার্ঘ বিলাসদ্রব্যে পরিণত হইয়াছে এবং খুব কম লোকেরই উহা কিনিবার সামর্থ আছে। সরিষার তৈল যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা সমস্তই ভেজাল মিশ্রিত। উহারও মূল্য সের প্রতি ২.৫০ টাকা হইতে ৩ টাকা পর্যন্ত। খাসীর গোস্তও অনুরূপ উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। মাছ যদি ভারতে চালান দেওয়ার অনুমতি দেওয়া না হইত, তবে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ আরও অনেক বেশী মাছ খাইতে পারিত। কিন্তু মাছ অবাধে ভারতে চালান দিতে দেওয়া হয়। ডিম ভারত ও বর্মায় রপ্তানী করা হয়।....
>
> পূর্ব পাকিস্তান সরকার নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, প্রদেশে কিরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতি আজ বিরাজ করিতেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সঙ্কটের অবসানের জন্য কোন ব্যাপক প্রচেষ্টার কথা শুনা যায় নাই। তবে পূর্ব পাকিস্তান সরকার সর্বপ্রকার খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করিতেছেন।

মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে চাঁদপুর থেকে স্থানীয় লোকদের আসাম অঞ্চলে চলে যাওয়ার ওপর একটি রিপোর্ট[১৭] প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট-

টিতে বলা হয় যে, প্রত্যহ চাঁদপুর এলাকার শত শত পাকিস্তানী মুসলমান ট্রেন ও ষ্টীমার যোগে কাজ ও খাবারের সন্ধানে ভারতের আসাম অঞ্চলে চলে যাচ্ছে। এরা সকলেই কৃষক ও মজুর। অতি বৃষ্টির দরুণ এদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়েছে এবং তারা কোন কাজ পাচ্ছে না। গত এক বৎসরের ওপর তিরিশ চল্লিশ টাকা মণ দরে চাল কিনে খাওয়ার ফলে এরা সর্বশান্ত হয়ে পড়েছে। আগামী এক বৎসরের মধ্যে ফসল লাভের কোন সম্ভাবনা নেই দেখে এই কৃষক মজুররা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে।

শুধু চাঁদপুরেই নয় পূর্ব বাঙলার অন্যান্য এলাকা থেকেও এই সময় দলে দলে কৃষকদের আসামের দিকে যাওয়ার খবর বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায়। কি ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুই বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে পূর্ব বাঙলার মুসলমান অধিবাসীরা ভারতের পথে খাদ্যের সন্ধানে দেশত্যাগ করতে পারেন সেটা সহজেই অনুমেয়। ১৯৪৯ এর জুন মাসের দিকে অনুষ্ঠিত ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। বস্তুতঃ পক্ষে এই সময় অনেক এলাকা থেকে দেশত্যাগের সংবাদ সরকারী মহল এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট পত্র পত্রিকাতে পর্যন্ত যথেষ্ট উদ্বেগের সৃষ্টি করে। 'আসামে হিজরত' নামে দৈনিক আজাদের নিম্নোদ্ধৃত সম্পাদকীয়টিতে এই উদ্বেগের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়:

> ঢাকা জেলা মোছলেম লীগ কাউন্সিলের সাম্প্রতিক অধিবেশনে অন্যান্য বিষয়ের সহিত ঢাকা জেলার চরম খাদ্য সঙ্কটের কথাও আলোচিত হইয়াছে। চরম আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়া বহু মুসলমান আসামে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া উপরোক্ত কাউন্সিলের এক প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কাউন্সিল এরূপ হিজরত যাহাতে না হইতে পারে, তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য পূর্ব পাক সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।
>
> খাদ্যের ব্যাপারে ঢাকা জেলা বহুকালের ঘাটতি এলাকা, কারণ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে এরূপ ঘন-বসতিপূর্ণ জেলা আর নাই।....পূর্বে ব্রহ্মদেশ ও বরিশালের চাউল এই জেলার প্রয়োজন মিটাইত। বর্তমানে ব্রহ্মদেশের সহিত অবাধ বাণিজ্য ব্যাহত; এবং কর্ডনিং প্রথার জন্য বরিশাল হইতেও ধান-চাউল আসিতে পারে না। কাজেই জেলার

কৃষি মজুর এবং অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা যদি বাধ্য হইয়া আহারান্বেষণে প্রদেশ ছাড়িয়া অন্যত্র হিজরত করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে তবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।
অবশ্য খাদ্য সঙ্কটের সম্মুখীন একমাত্র ঢাকা জেলার লোকেরাই হয় নাই। প্রত্যেকটি ঘাটতি জেলাই এই সমস্যার সম্মুখীন কাজেই ঢাকা জেলার দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের অনুরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া থাকিলে সম্ভবতঃ অন্যান্য জেলার কিছু কিছু লোকও জন্মভুমি ছাড়িয়া অন্যত্র হিজরত করিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবে। এমতাবস্থায় ঢাকা জেলা মোসলেম লীগ কাউন্সিল এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সময়োচিত কাজই করিয়াছেন। বস্তুতঃ আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া পাকি-স্তানীরা হিজরত করিয়া চলিয়া যাইবে, এই অবস্থা কোন আত্মসম্মান-জ্ঞানী পাকিস্তানী বরদাশত করিতে পারে না। আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান সরকার এখন পর্যন্ত নীরব কেন? ঢাকা জেলা লীগ-কাউন্সিলের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে আজ কয়েকদিন হইল। জেলা লীগের তরফ হইতে যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা কতখানি সত্য এবং সত্য হইয়া থাকিলে পূর্ব পাকিস্তানের মুছলমানদের এরূপ দলে দলে হিন্দুস্থানে হিজরত বন্ধ করিবার কি ব্যবস্থা স্থানীয় সরকার অবলম্বন করিতেছেন বা করিয়া-ছেন, তাহা জানিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রত্যেক পাকিস্তানবাসীরই আছে বলিয়া আমরা মনে করি।
জেলা লীগ এরূপ অবাঞ্ছিত হিজরত বন্ধ করিবার উপায় হিসাবে সমগ্র জেলায় রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করিবার ছোপারেশ করিয়াছেন।.... আসামে হিজরতের প্রতিকারার্থে সরকার জেলা লীগ কাউন্সিলের উপরোক্ত প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন কিনা, আমরা জানি না। মোটের উপর বল প্রয়োগ ছাড়া অন্য সর্বপ্রকার কল্যাণকর উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানের দরিদ্র মুসলমানদের আসামে হিজরত বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করা, আমরা স্থানীয় সরকারের আশু ও অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি।[১৮]

পূর্ব বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিম পাকি-স্তানের বিভিন্ন মহল ও পত্র-পত্রিকার বিশেষ কোন উদ্বেগ ছিলো না। এদিক দিয়ে করাচী থেকে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ফ্রিডমকে' অন্যতম

ব্যতিক্রম বলা চলে। এই পত্রিকাটিতে ১০ই জুলাই, ১৯৪৯, এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে[১৯] পূর্ব বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে যা বলা হয় সেটা উল্লেখযোগ্য :

> জনসাধারণকে সাহায্য দান হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান সরকার যাহা করিয়াছেন সেখানকার কোটি কোটি বুভুক্ষু বাসিন্দার কাছে তাহার মূল্যই নাই—৪৩ এর সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর অতি সামান্য পরিবর্তনই তাহাদের জীবনে দেখা দিয়াছে—ইহার সঙ্গে আসিয়া যোগ দিয়াছে রোগ, মহামারী আর বেকার সমস্যা।
>
> ইহা একটি দুর্বোধ্য রহস্য যে পাকিস্তানের এক অংশে যখন প্রচুর খাদ্য রহিয়াছে এবং শুধু তাই নয়, সেই খাদ্য হইতে কিছু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী করাও সম্ভব হইতেছে—পাকিস্তানের অন্য অংশে তখন দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়া দুর্ভিক্ষ ঘনাইয়া আসিতেছে। বলা হইয়া থাকে যে, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে আমাদের যে ৭৫ কোটি টাকা লাভ হইয়াছে তার অধিকাংশই আসিয়াছে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ভারতে প্রেরিত খাদ্য শস্য হইতে। আমরা কি আমাদের ভাই, বোন ও সন্তানদের মৃতদেহের উপর পাকিস্তানের সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিতে চলিয়াছি? আমাদের সব চাইতে মূল্যবান রপ্তানীদ্রব্য পাটের জন্য যারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া দেহপাত করে তারা কি পূর্ব পাকিস্তানেরই বাসিন্দা নয়?

বস্তুতঃপক্ষে পূর্ব বাঙলার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রশ্নটিকে খাদ্য সমস্যা প্রসঙ্গে এখানে যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে পূর্ব বাঙলার পত্র পত্রিকাসমূহে, এমনকি বিরোধীদলীয় পত্রিকাসমূহেও, সেইভাবে উপস্থিত করা হয় নাই। তাদের সমালোচনার কেন্দ্রস্থল সে সময় ছিলো প্রাদেশিক সরকার, তার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ এবং সাধারণভাবে প্রাদেশিক আমলাতন্ত্র।

১৯৪৯ এর জুলাই মাসে যশোর ও খুলনায় চালের দর দাঁড়ায় ৪০-৪২ টাকায়। সেই তুলনায় বরিশাল, চাঁদপুর, নোয়াখালী ইত্যাদি জায়গাতে চালের দাম ছিলো অপেক্ষাকৃত কম—মণ প্রতি ২৫ টাকা। কিন্তু এই অল্পমূল্য সত্ত্বেও ক্রয় ক্ষমতার নিদারুণ অভাবের জন্যে সেই সমস্ত এলাকাতেও খাদ্য সঙ্কট এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে। চাঁদপুর সম্পর্কে নীচে উদ্ধৃত রিপোর্টটি উল্লেখযোগ্য :

চাঁদপুর ষ্টেশনেই এক করুণ দৃশ্য দেখলাম—শত শত গ্রাম্য লোক স্ত্রী পুরুষ ছেলে মেয়ে ষ্টেশনে গোডাউনের ছিদ্র দিয়ে ছিটকে পড়া ধান-চাউল কাঁকর পাথরের ভেতর থেকে বিরাট পাহাড় কেটে স্বর্ণ রেণু আহরণ করার মত খুঁটে নিচ্ছে। প্রতিটি দেহের চামড়া ফুড়ে উঠেছে—শক্ত, বিক্ষুব্ধ হাড়গুলি, প্রতিটি চেহারায় ভেসে উঠেছে,—দুর্ভিক্ষ-মৃত্যুর চরম পরোয়ানা। ২৫ টাকায় তো দাম কমে এসেছে, কিন্তু কিনবার টাকা কোথায়? সামর্থ কোথায়?[২০]

এর প্রায় দুই সপ্তাহ পর চাঁদপুর ষ্টেশনের কাছে স্থানীয় এক ব্যক্তি প্রাণ ত্যাগ করে। এই অনাহার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঁদপুর শহরে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।[২১] অগাষ্ট মাসের দিকে শত শত নরনারী ও শিশু গ্রামাঞ্চলে খাদ্যের সংস্থান অভাবে দলে দলে চাঁদপুর শহরে এসে ভীড় করতে থাকে।[২২]

সেপ্টেম্বর মাসে নোয়াখালী জেলার রামগতি দ্বীপের অবস্থার ওপর একটি রিপোর্টে সেখানকার পরিস্থিতির কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। রিপোর্টটির কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হলো:

রামগতি দ্বীপ (উত্তর হাতিয়া) নোয়াখালী জেলার একটি শস্য-সমৃদ্ধ অঞ্চল। সম্ভবতঃ ইহাই এই জেলার প্রধান বাড়তি এলাকা। তাহা ছাড়া এই দ্বীপ প্রধানতঃ গৃহস্থ ও কৃষি বহুল। ধান, পাট, মরিচ, কুমড়া, তিল, মেটে আলু প্রভৃতি কৃষি শস্যের উপর এই দ্বীপের বাসিন্দাদের সম্পূর্ণভাবে জীবনধারণ করতে হয়। কিন্তু এই বৎসর বৈশাখ মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত অতি বৃষ্টির ফলে উপরোক্ত যাবতীয় শস্য বিনষ্ট হইয়া যায়। ধান ক্ষেতে কৃষকগণ আর কাঁচি বসাইতে পারে নাই। মরিচ পচিয়া ক্ষেতের পানি লাল হইয়া যায়। নিড়ানির অভাবে পাটও বিনষ্ট হইয়া যায়।

দিন মজুর ও কৃষকদিগকে গৃহস্থদের ক্ষেতের কাজের ওপর জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। কিন্তু এই বৎসর পানিতে ক্ষেত ডুবাইয়া যাওয়ায় অজন্মা ও শস্যহানির দরুণ গৃহস্থদের নিকট হইতে তাহারা কোন কাজ পায় নাই। ফলে বর্তমানে তাহাদের জীবন ধারণের খড়-কুটো অবলম্বন পর্যন্ত নাই। ওই দিকে খাদ্য শস্যের দাম উত্তরোত্তর হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। ধানের দাম বর্তমানে ২৫ টাকা হইতে উপরের দিকে উঠিতেছে। প্রতি মণ চাউল ৪০ টাকায় বিক্রয়

হইতেছে। এমতাবস্থায় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে দ্বীপের বিরাট এলাকা চর ফলকন ইউনিয়ন। এই অঞ্চলে পানি খুব বেশী জমিয়া যাওয়ায় শস্য রক্ষা করা মোটেই সম্ভব হয় নাই। চর জাংগালিয়ার পৌণে ষোল আনা লোকের আশু ধান্য ক্ষেতেই পচিয়া গিয়াছে। ফলে এই ইউনিয়নের ৫০ হাজার লোক বর্তমানে জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চারিদিকে উপোসের পালা শুরু হইয়াছে। গরীব দিন মজুররা কচু সিদ্ধ, শাক সিদ্ধ খাইয়া কোন রকমে এখনও বাঁচিয়া আছে। গ্রামে গ্রামে গরু চুরি ও অন্যান্য চুরি ডাকাতির উপদ্রব বাড়িয়া গিয়াছে। ভিখারীর সংখ্যাও দিন দিন বিপুলভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু অবস্থা আজ এই রকম যে এক মুঠো ভিক্ষা দেওয়ার সংস্থানও জনসাধারণের নাই।

এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের একমাত্র কারণ এই এলাকায় জল-নিকাশের কোন বন্দোবস্ত নাই। ফলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হইলেই জল দাঁড়াইয়া যায় এবং বিপুল শস্য হানি ঘটায়। মাত্র একটি খালের অভাবে বহু বৎসর ধরিয়া জনসাধারণ এইরূপে সর্বনাশা দুর্গতি ভোগ করিতেছে। এই বৃহৎ অঞ্চলের হাজার হাজার বাসিন্দাকে এই মৌসুমী দুর্গতির কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে চর জাংগালিয়ায় অবিলম্বে সরকারী সাহায্যে একটি খাল খনন করিয়া হাজিরহাট হইতে মেঘনায় পতিত সংকীর্ণ খালটির সংস্কার সাধন করতঃ উভয় খালের সংযোগ স্থাপন বিশেষ জরুরী প্রয়োজন। আর অবিলম্বে বিপর্যস্ত এলাকাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়া সর্বাত্মক রিলিফের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমরা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অন্যথায়, এই দ্বীপের বারো আনা লোককে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করা মোটেই সম্ভব হইবে না।[২৩]

উত্তর বাঙলায় চালের দর সম্পর্কে একটি রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯, চালের দর রংপুরে ৪০-৪২ টাকা, দিনাজপুরে ৩০-৩৫ টাকা, গাইবান্ধায় ৪৫-৫০ টাকা, এবং বগুড়ায় ৪০-৪২ টাকা। এ ছাড়া ময়মনসিংহের জামালপুর মহকুমায় চালের দর এই সময় দাঁড়ায় ৫৩-৫৪ টাকায়।[২৪]

অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে সিলেটের খাদ্য পরিস্থিতির নিদারুণ অবনতি ঘটে। সিলেট শহরের বস্তি অঞ্চলে, সদর ও সুনামগঞ্জের পাহাড়তলী এলাকায়, গোলাপগঞ্জ, বালাগঞ্জ ও বিশ্বনাথ থানায় অন্নাভাব ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করে। কিন্তু অবস্থার সব থেকে বেশী অবনতি ঘটে গোয়াইনঘাট থানা এলাকায়। এই এলাকার অবস্থার ওপর উত্তর সিলেট জেলা মুসলিম লীগের দুইজন কর্মকর্তা সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। সেই বিবৃতিতে তাঁরা বলেন:

> গৃহস্থেরা জমি ও হালের গরু বিক্রী করিয়া অর্ধাহারে কোনরূপ এতদিন চালাইয়াছিলেন, বর্তমানে তাহাও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তদুপরি ক্রয় করিবার মত ধান্যও পাওয়া যাইতেছে না। গোয়াইনঘাটের গোদামে সরকারী ধান্য যাহা ছিল তাহার পরিমাণ এতই অল্প ছিলো যে উহা বহু পূর্বেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে ধান্যের আশায় গোয়াইনঘাটে গিয়া বহু ক্রেতাকেই একান্ত নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। ছেলেমেয়েদের ক্রন্দন দেখিয়া ক্ষুধার্ত পিতা-মাতা বর্তমানে নিজেদের মৃত্যু কামনা করিতেছেন। কয়েকটি ঘটনা আমরা সচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি।....অর্ধাহার, অনাহার ও মৃত্যু এবং সঙ্গে সঙ্গে মহামারী যদি দুর্ভিক্ষের Definition হয় তবে ইহাকে দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে।[৬৫]

এইসব অঞ্চলে তৎক্ষণাৎ রিলিফের ব্যবস্থা করার জন্যে তাঁরা তাঁদের এই বিবৃতির মাধ্যমে সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

বরিশাল বরাবরকার একটি উদ্বৃত্ত এলাকা। যে কয়টি উদ্বৃত্ত জেলায় সরকার কর্ডন প্রথা প্রবর্তন করেন তার মধ্যে বরিশালই ছিলো সর্বপ্রধান। কিন্তু অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে সেই বরিশাল জেলাতেও খাদ্য পরিস্থিতি ভয়ানক আকার ধারণ করে। বরিশাল জেলা মুসলিম লীগের তৎকালীন সম্পাদক মহীউদ্দীন আহমদ এ সম্পর্কে বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি দীর্ঘ পত্র দেন। এই পত্রে তিনি বরিশালের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন:

> আমি সম্প্রতি রাজাপুর ও নলছিটি থানার কয়েকটি সফর করিয়া সুপারীর মূল্য অস্বাভাবিকভাবে কমিয়া যাওয়ায় সুপারী উৎপাদনকারী চাটিওয়ালা ও খুদে ব্যবসায়ীদের দুর্দশা দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছি। গ্রামে বর্তমানে অধিকাংশ কৃষকই অনাহার ও অর্দ্ধাহারে কালাতিপাত

করিতেছে। গত কিছুদিন পূর্বে বন্যায় জেলার কতিপয় স্থানের রবিশস্য নষ্ট হওয়াতে আমি মন্ত্রী সাহেবানদের নিকট রিলিফের আবেদন জানাইলে প্রকাশ আপনি এ জেলায় রিলিফের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়াছেন। বহু কষ্টে যদিও অল্প কিছু টাকা এ জিলায় বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং যদিও প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশে রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়া আছে তথাপি জানিনা কেন আপনি উক্ত কমিটির সভাপতি হিসাবে রিলিফের কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না বা কমিটির মিটিংয়ের সুযোগ দিতেছেন না। অথচ এই মুহূর্তেই রিলিফের ব্যবস্থা না করিলে গ্রাম্য জনসাধারণের সমূহ বিপদ। আশ্চর্য হই ঠিক সেই সময় আপনি মহিলা কলেজ স্থাপনের জন্য প্রতি ইউনিয়ন হইতে চাঁদা তুলিবার নির্দেশ দিয়াছেন।[২৬]

অক্টোবরের শেষের দিকে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটি গ্রাম এলাকা সফর করে সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার তাঁর বিবরণে বলেন :

শতকরা প্রায় ৭৫ জন লোক এই অঞ্চলে অনাহারে অর্ধাহারে অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়া মরণের প্রতীক্ষা করিতেছে। অনেকে কচুপাতা খাইয়া কোনমতে এতদিন টিকিয়াছিল—এখন তাহা আর পাওয়া যাইতেছে না। কিছুদিন ধরিয়া গভর্ণমেন্ট কন্টোলে আটা সরবরাহ করিতেছে—তাহা প্রায় অবিক্রিত রহিয়া যাইতেছে। কারণ সস্তায়ও ক্রয় করার টাকা এদের কারো হাতে নাই।...ঢাকার পাঁচগাঁও ইউ-নিয়নের প্রেসিডেন্ট বড় দুঃখের সহিত বলিলেন: এবারের আকাল ৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের চাইতেও বহুগুণ মারাত্মক—গত বন্যায় অনেক ধান পাট নষ্ট হইয়া গিয়াছে এজন্য ভবিষ্যতের অবস্থা আরো খারাপ হইবে। পাট ১০।১২ টাকায় নামিয়াছে, তাহাও কেনার লোক নাই। ....চারিদিকে তাই ঘরবাড়ী ও জমি বিক্রীর হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে, অনেকে বাস্তভিটা জলের দরে বিক্রী করিয়া ফরিদপুর চলিয়া যাইতেছে।[২৭]

৭
সরকারের নোতুন কর্ডন নীতি

কর্ডন প্রথা সম্পর্কে সরকারী অথবা বেসরকারী মহল কোন ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ঐক্যমত ছিলো না। বিভিন্ন জেলাতেও এই প্রথা সম্পর্কে মতামত ছিলো ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এদিক দিয়ে ঘাটতি অথবা উদ্বৃত্ত এলাকা

বলে কোন কথা ছিলো না। এক উদ্বৃত্ত এলাকায় সাধারণভাবে লোকে কর্ডনের বিরোধী (বরিশাল) আবার অন্য উদ্বৃত্ত এলাকায় লোকে সাধারণভাবে তার সপক্ষে (সিলেট)। সরকার-বিরোধী মহলের মধ্যে সাধারণভাবে কর্ডন উঠিয়ে নেওয়ার পক্ষে মত খুব শক্তিশালী থাকলেও সেখানে পরিপূর্ণ ঐক্যমত ছিলো না। কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি লেভীর অব্যবস্থা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও তারা ঢালাওভাবে কর্ডনপ্রথার বিরোধী ছিলো না। কিন্তু কংগ্রেস সংসদীয় দল পুরোপুরি কর্ডনের বিরুদ্ধে ছিলো। ঢাকার ১৫০ নং মোগলটুলীর ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীরাও ছিলেন কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে। পরে অবশ্য কর্ডন প্রথা তিনটি উদ্বৃত্ত জেলা থেকে উঠিয়ে নেওয়ার পর অবস্থার আরও অবনতি ঘটলে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কর্ডন প্রথার বিরোধিতা থেকে বিরত হন।

মুসলিম লীগ মহলে প্রথম দিকে কর্ডন প্রথার সপক্ষে সমর্থন থাকলেও ব্যাপকভাবে জনগণ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ফলে তাঁরাও শেষে কর্ডন, বিশেষতঃ থানা ও মহকুমা কর্ডন, তুলে নেওয়ার পক্ষপাতী হন। ১৯-২০ ২১শে জুন, ১৯৪৯, তারিখে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে থানা ও মহকুমা কর্ডনিং তুলে নিয়ে জেলা ও প্রাদেশিক কর্ডনিং দৃঢ়তর করার জন্যে প্রাদেশিক সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। সরবরাহ বিভাগ উঠিয়ে নেওয়ার জন্যেও তাঁরা সরকারকে পরামর্শ দেন।[১]

কিন্তু প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এই সুপারিশ প্রকৃতপক্ষে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়। খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ আফজল ৬ই জুলাই, ১৯৪৯, ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে[২] জেলা কর্ডনিং রহিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় তিনি বলেন যে, উদ্বৃত্ত জেলাগুলির মধ্যে যে কর্ডন ব্যবস্থা চালু আছে তার স্থানে ঘাটতি জেলা ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম নিয়ে একটা ব্লক করে তার চারিদিকে কর্ডন ব্যবস্থা নোতুনভাবে প্রবর্তন করা হবে। এর ফলে সিলেট, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা এবং বরিশাল জেলা নিয়ে গঠিত অপর ব্লকের মধ্যে অবাধে খাদ্য চলাচল করতে পারবে। এই নোতুন কর্ডন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার পনেরো দিনের মধ্যে দেশের খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হবেন বলেও তিনি দাবী করেন।

সরবরাহ বিভাগ তুলে দেওয়ার প্রসঙ্গে মন্ত্রী আফজল বলেন যে, এই বিভাগের ব্যয়ভার দেশের বৃহত্তর জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। তা কেবলমাত্র দশ বারো লক্ষ রেশনিং এলাকাভুক্ত লোকের ব্যয় বৃদ্ধি করে।

খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ আফজলের এই সাংবাদিক সম্মেলনের পর প্রাদেশিক লীগ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) একটি বিবৃতি দেন।[৩] তাতে তিনি বলেন যে, খাদ্যাবস্থার আশু সমাধান না হলে দেশে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। দুঃস্থ জনগণের সাহায্যের জন্যে তিনি সর্বত্র রিলিফ কমিটি গঠন করার জন্যে আবেদন জানান।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য মাহমুদ আলী খাদ্য মন্ত্রীর ঘোষণায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে সরকারের এই সিদ্ধান্ত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সরকার মুসলিম লীগকে পরিহাস করেছেন। পনেরো দিনের মধ্যে খাদ্যাবস্থার উন্নতি ঘটবে মন্ত্রীর এই ভবিষ্যৎ বাণী প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, অবস্থার কোন উন্নতি তো ঘটবেই না উপরন্তু তা মুনাফাখোর ও মজুতদারদের কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। মুসলিম লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাব মুসলিম লীগ সরকারের মন্ত্রীর দ্বারা এইভাবে সরাসরি উপেক্ষিত হওয়ার ঘটনার প্রতিও তিনি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৪]

কিন্তু প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সুপারিশ প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার ব্যাপারে কোন বক্তব্যই লীগ সম্পাদক মোহন মিয়া অথবা অন্য কোন উচ্চপদস্থ মুসলিম লীগ নেতার পক্ষ থেকে খোলাখুলিভাবে উপস্থিত করা হয়নি।

৮
দুর্ভিক্ষ রিলিফ কমিটি

১৯৪৮-৪৯ সালে পূর্ব বাঙলায় যে ব্যাপক খাদ্য সঙ্কট ও দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা গেল সেই অবস্থাকে প্রতিরোধ করার কোন সুসংগঠিত ব্যবস্থা হয় নি। এদিক দিয়ে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের অবস্থার সাথে এই দুর্ভিক্ষের অবস্থার একটা মস্ত তফাৎ। একথা অবশ্য সত্য যে ১৯৪৮-৪৯ এর দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের মতো ব্যাপক ও ভয়াবহ ছিলো না। কিন্তু তা না হলেও এ দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সঙ্কট জনগণের জীবনে ব্যাপকভাবে যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছিলো তাকেও ছোট করে দেখা চলে না।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়কার সর্বদলীয় রিলিফ কমিটির মতো কোন কমিটি এই সময় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় হয়নি। প্রথম দিকে সিলেট জেলায় মুসলিম লীগ, কংগ্রেস ও কিষাণ সভার মিলিত উদ্যোগে একটি রিলিফ কমিটি অল্প কিছুদিন সক্রিয় থাকলেও পরে তা নানান কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং রিলিফের কাজ সেখানে আর অগ্রসর হয় না। এদিক থেকে সরকারী উদ্যোগেরও যথেষ্ট অভাব ছিলো। মুসলিম লীগ সরকার প্রাদেশিক লীগের সুপারিশক্রমে ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে একটা রিলিফ কমিটি গঠন করেছিলেন। কিন্তু সেই কমিটির কোন তৎপরতা কোন স্থানেই ছিলো না। এ সম্পর্কে সিলেটের নওবেলাল পত্রিকা স্থানীয় রিলিফ কমিটির অবস্থা সম্পর্কে 'খাদ্যাভাব' নামে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন:

> প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অনুরোধক্রমে পূর্ব পাক সরকার প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় মুসলিম লীগের সহযোগে রিলিফ কমিটি গঠন করিয়াছেন। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি উত্তর সিলেটেও অনুরূপ একটি রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছিল। সিলেট জেলায় বিতরণের জন্য সরকার কিছু টাকাও বরাদ্দ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু এই রিলিফ কমিটির কোন সভা আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত হই নাই। এই কমিটিকে যদি অকেজো করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে নাম-কা-ওয়াস্তে এক রিলিফ কমিটি রাখার যুক্তিযুক্ততা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

রিলিফ কমিটির এই নিষ্ক্রিয়তা শুধু সিলেট জেলাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরিশাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বরিশাল জেলা মুসলিম লীগ সম্পাদক মহীউদ্দীন আহমদের পূর্বোক্ত পত্র থেকেও রিলিফ কমিটির নিষ্ক্রিয়তার কথা জানা যায়। শুধু রিলিফের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তাই নয়, বস্তুতঃপক্ষে সরকারী আমলা কর্তৃক রিলিফের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার ব্যাপারটাই সেখানে বড়ো হয়ে দেখা দেয়। প্রত্যেক জেলাতেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে এই সমস্ত রিলিফ কমিটি গঠিত হয়েছিলো এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই সমস্ত আমলা সভাপতিদের ইচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তার ফলেই রিলিফ কমিটিগুলি পুরোপুরিভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে রিলিফের ক্ষেত্রে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সভা ইত্যাদি মিলিতভাবে রিলিফ কমিটিতে কাজ

করতো। পূর্ব বাঙলার ১৯৪৮-৪৯ সালের দুর্ভিক্ষে কংগ্রেস বহুলাংশে সাম্প্রদায়িক কারণে নিজেদের কাজ পূর্ব বাঙলা পরিষদের চৌহদ্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বাইরে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। কমিউনিষ্ট পার্টি এই সময় সশস্ত্র আন্দোলনে নামার ফলে তার এবং কৃষক সভার ওপর সরকারী নির্যাতন ও নানা প্রকার নিষেধাজ্ঞার জন্যে তারা খোলাখুলিভাবে রিলিফ কমিটিতে যোগদান করতে পারে নি। তাদের এই অনুপস্থিতিই এই কমিটিগুলির নিষ্ক্রিয়তার মুখ্য কারণ ছিলো। ১৯৪৩ সালের অভিজ্ঞতা থেকেই একথা প্রমাণিত হয়। কারণ সে সময় কমিউনিষ্ট পার্টি এবং কৃষক সভাই ছিলো সারা বাঙলাব্যাপী রিলিফ সংক্রান্ত কাজের পুরোভাগে। এইভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষকসভা এবং কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে রিলিফ কমিটিগুলি মুসলিম লীগের সদস্যদের দ্বারাই মোটামুটিভাবে গঠিত ছিলো। এই সমস্ত মুসলিম লীগ ওয়ালারা রিলিফের কাজে নিজেরা তেমন উৎসাহী না থাকার ফলে আমলাদের নিজেদের উদ্যোগে সেই সমস্ত কমিটিকে সক্রিয় করার প্রশ্ন ওঠেনি। যে সমস্ত স্থানে স্থানীয়ভাবে মুসলিম লীগাররা রিলিফ কমিটিকে তৎপর করার চেষ্টা করেছিলেন সেখানেও প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে রিলিফ কমিটিকে উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট শৈথিল্য আমলাদেরকে সক্রিয় করে তোলার পথে হয়ে দাঁড়ায় মস্ত বাধা স্বরূপ।

উপরোক্ত কারণগুলি মিলিত হয়ে এই পর্যায়ে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলনে জনগণকে সংগঠিত করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এবং জনগণকে সংগঠিত করতে না পারার ফলে রাজনীতিগতভাবে দুর্ভিক্ষ প্রশ্ন যতখানি খোলাখুলি সামনে আসা দরকার ছিলো ততখানি আসেনি।

৯

সরকারী লেভী ব্যবস্থা

আভ্যন্তরীণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাঙলা সরকার উদ্বৃত্ত এলাকা গুলিতে জমির মালিকদের ওপর বাধ্যতামূলক বিক্রয় বা লেভী ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী স্থির হয় যে, নির্দিষ্ট মূল্যে সরকার কৃষক এবং অন্যান্য ভূমি মালিকদের উদ্বৃত্ত ধান ক্রয় করবেন। সরকার নির্ধারিত এই নির্দিষ্ট মূল্য ছিলো প্রচলিত বাজার দরের থেকে অনেক কম।

দ্বিতীয়তঃ, লেভী ধার্য করার সময় সরকারী কর্মচারীরা অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক প্রয়োজনের কথা বিবেচনা না করে অর্থাৎ প্রকৃত পারিবারিক উদ্বৃত্তের প্রতি কোন রূপ লক্ষ্য না রেখে বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ নির্ধারণ করতো। ফলে কৃষকরা সারা বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন করলেও তার থেকে তারা বঞ্চিত হতো এবং অনাহার অর্ধাহারের সম্মুখীন হতো। এই কারণে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় কৃষকরা ব্যাপকভাবে লেভী ব্যবস্থা, বিশেষতঃ সেই ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারী আমলাদের অবিবেচনার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

লেভী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জোতদার এবং বড়ো বড়ো ভূমি মালিকরাও এই সময় খুব সোচচার হয়ে ওঠে। তাদের বিক্ষোভের মূল কারণ ছিলো এই যে, তাদের সমস্ত উদ্বৃত্ত সরকার অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কিনে নেওয়ার ফলে তারা একটা বিরাট আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলো। এই সময় অনেক জোতদার ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারীদের সাথে যোগাযোগ রাখতো এবং তাদের কাছে উচচমূল্যে ধান বিক্রি করতো। সরকারী লেভী ব্যবস্থা সেদিক দিয়ে তাদের এই উচচ মুনাফা অর্জনের পথে একটা বিরাট অন্তরায় ছিলো।

খাদ্য পরিস্থিতির ওপর পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে ১৪ই জুন, ১৯৪৮, যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তাতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টি আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ উঠিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করে। পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা বসন্ত কুমার দাস, ডেপুটি নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অন্যান্য বক্তারা সকলেই লেভী ব্যবস্থার নানা ভুল ত্রুটির কথা উল্লেখ করে লেভীকেই খাদ্য সঙ্কট বাড়িয়ে তোলার জন্যে অনেকাংশে দায়ী করেন এবং তা সম্পূর্ণ-ভাবে বাতিল করার ওপর যথেষ্ট জোর দেন। বস্তুতঃপক্ষে তাঁরা প্রত্যেকেই কর্ডন, রেশনিং এবং লেভী সব কিছুই উঠিয়ে দেওয়ার দাবী জানান।

লেভীর বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ ১৯৪৯ সালে অনেক বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে বিভিন্ন স্থানে লেভী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত সভা সমিতিতে সরকারের স্বেচ্ছাচারমূলক সংগ্রহ নীতির বিরুদ্ধে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী লেভীকৃত ধান কৃষকদেরকে নিজ খরচে সরকারী গুদামে পৌঁছে দিতে হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত গুদামের দূরত্ব কৃষকদের বাড়ী থেকে অনেকখানি হতো। কাজেই কৃষকগণ তাদের উপর এই নির্দেশ

জারীর ফলে স্বভাবতঃই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাছাড়া সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের প্রশ্নটিও ছিলো এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সরকার যদি উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কৃষকদের ধান কিনতেন তাহলে তাঁদের বলার বিশেষ কিছু থাকতো না। কিন্তু সে দিক থেকেও কৃষকরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কারণ সরকার কৃষকদের ওপর লেভীকৃত ধানের দর বেঁধে দিয়েছিলেন মণ প্রতি ৭৷৷০ আনা হিসেবে। এই দর ছিলো প্রচলিত বাজার দরের থেকে অনেক কম। যাদের কোন সত্যকার উদ্বৃত্ত ছিলো না তারা তো এর ফলে বিপদ গ্রস্ত হচ্ছিলোই উপরন্তু যাদের ধান প্রকৃত-পক্ষে উদ্বৃত্ত ছিলো তাদেরও বিপদের অবধি ছিলো না। কারণ উদ্বৃত্ত ধান বিক্রি করেই তারা সংসারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতো এবং সব রকম খরচ চালাতো। দেশব্যাপী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মুখে এত স্বল্প মূল্যে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারের কাছে ধান বিক্রি করে তারা এদিক দিয়ে রীতিমতো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলো।

এ সম্পর্কে দৈনিক আজাদ ২৮শে জানুয়ারী তারিখে 'সংগ্রহ ও বিতরণ নীতি' নামক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়ঃ

> সরকারী খাদ্য সংগ্রহ নীতি ও পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতি জেলাগুলির খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। ইদানিং এ সম্বন্ধে আমরা জেলাগুলি হইতে যে সকল সাংবাদাদি পাইতেছি। তাহাতে একথা পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে যে, সরকারের খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ নীতিতে গুরুতর গলদ রহিয়াছে। প্রথমতঃ বাড়তি জেলাগুলিতে যাহাদের মোট তিরিশ বিঘার বেশী ধান-জমি আছে, তাহাদের উপর নির্দেশ হইয়াছেঃ একর প্রতি সতেরো মণ ধান সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। অত্যন্ত স্বাভাবিক-ভাবেই এই নির্দেশের বিরুদ্ধে বাড়তি জেলাগুলি হইতে প্রবল প্রতিবাদ উঠিয়াছে। কারণ পূর্ব বাঙ্গলার মাটির উর্বরাশক্তি সম্বন্ধে যাঁহারা সম্যক অবগত আছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, গড়ে একর প্রতি সতেরো মণ ধান এখানে উৎপন্ন হয় না। অবশ্য স্থানে স্থানে ইহার ব্যতিক্রম যে না হয়, তাহা নহে। কিন্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কোন কোন অঞ্চলে একর প্রতি পঁচিশ মণ পর্যন্ত উৎপন্ন হইলেও উহার উপর নির্ভর করিয়া গড় করিলে মারাত্মক ভুল করা হইবে। তাহা ছাড়া, এ সম্পর্কে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সরকারের

খাদ্য সংগ্রহ নীতির সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে ধান্য উৎপন্নকারী জনসাধারণের সহযোগিতার উপর। সাধারণের সহযোগিতা পাইয়া সরকার যদি বাড়তি এলাকার জোতদারদের নিকট হইতে একর প্রতি গড়ে তেরো চৌদ্দ মণও সংগ্রহ করিতে পারেন, তবু সরকারের সংগ্রহ অভিযান সাফল্য লাভ করিবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।...

ঘাটতি এলাকায় বাড়তি এলাকা হইতে বেসরকারীভাবে ধানচাল আনা বন্ধ করিবার পূর্বে সরকারের উচিত ছিলো: ঘাটতি এলাকার সরকার নিযুক্ত এজেন্ট ছাড়া আর সকল ধান চাউল ব্যবসায়ীর লাইসেন্স বাতিল করিয়া দেওয়া এবং ঘাটতি এলাকার সকল মোকামে ধান-চাউলের পাইকারী ক্রয় বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া। তাহা হইলে ঘাটতি এলাকার মুনাফাভোগী ব্যবসায়ীরা ধান চাউল গোলা-জাত করিবার সুযোগ পাইত না। এখনও সরকার ইচ্ছা করিলে ঘাটতি এলাকার মওজুদদারদের গোলা অধিকার করিয়া লইতে পারেন।

ঐ একই দিনে অর্থাৎ ২৮শে জানুয়ারী আজাদে ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগ কর্তৃক সরকারী খাদ্য সংগ্রহ নীতির সমালোচনাও প্রকাশিত হয়। খুব সম্ভবতঃ আজাদের উপরোক্ত সম্পাদকীয়টি এই সমালোচনার দ্বারাই প্রভাবিত। ময়মনসিংহ জেলা লীগের ওয়ার্কিং কমিটি নিজেদের একটি সভায় লেভী সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার পর একটি প্রস্তাবে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে, সরকার প্রতি একর জমিতে ১৭ মণ ধান উৎপাদন হয় বলে যে হিসেব নির্ধারণ করেছেন সেটা কমিয়ে এনে একর প্রতি ১৩ মণ হিসেবে নির্ধারণ করা উচিত। কৃষকদের থেকে ধান ও চাল যথাক্রমে ৭৷৷০ টাকা এবং ১২৷৷০ টাকায় ক্রয় করার যে সিদ্ধান্ত সরকার করেছেন সেটা পরিবর্তন করে ধান ও চাল মণ প্রতি যথাক্রমে ১০ টাকা এবং ১৮ টাকা নির্ধারণ করার জন্যেও সরকারের কাছে তাঁরা অনুরোধ জানান।

ময়মনসিংহ জেলা লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এই সভায় নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের ভাটি এলাকায় অবিলম্বে প্রচুর খাদ্যশস্য পাঠানোর জন্যেও অনুরোধ জানানো হয়। অন্যথায় বহুলোক এই অঞ্চলে খাদ্যের অভাবে প্রাণত্যাগ করতে পারে বলেও তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

লেভী এবং সাধারণভাবে সরকারের খাদ্য সংগ্রহ নীতি সম্পর্কে সারা পূর্ব বাঙলাব্যাপী বিক্ষোভ, আলাপ আলোচনা ইত্যাদি সম্পর্কে এ সময়ে

সংবাদপত্রে নানা রকম রিপোর্ট প্রকাশিত হতে থাকে। এই অবস্থায় পূর্ব বাঙলা সরকার নিজেদের খাদ্য নীতিকে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সংবাদপত্রে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয় :

> সরকার সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত এমন কতকগুলি বিবৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন যাহাতে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, চলতি বৎসরে সরকারের খাদ্য সংগ্রহ নীতির সম্বন্ধে কিছুটা অনিশ্চয়তা আছে।
>
> যাহাতে জনসাধারণের মনে কোন রকম ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হইতে পারে সেইজন্য ইহা পুনরায় বিশেষভাবে ঘোষণা করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রথমতঃ ধান এবং চাউল সংগ্রহ মূল্যের কোন পরিবর্তন হইবে না; দ্বিতীয়তঃ কর্ডন আদেশ কোনরূপেই শিথিল করা হইবে না এবং আইন অমান্যকারীদিগকে কোন দয়া প্রদর্শন না করিয়া এবং তাহাদের বয়স ও সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে গুরুতরভাবে শাস্তি দেওয়া হইবে। তৃতীয়তঃ সর্বশেষ যে সংগ্রহ তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না।
>
> স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন গুজব ছড়াইয়া কৃষকদিগকে বিপথে চালিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সরকার বর্তমান খাদ্য সংগ্রহ নীতি কার্যকরী করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ব্যক্তিগতভাবে ধান চাউল মওজুদ শুধু ক্ষতির কারণই হইবে না, ইহা একটি সমাজবিরোধী কাজ এবং এই অপরাধ কিছুতেই সহ্য করা হইবে না।[১]

এই প্রেস নোটটি প্রকাশিত হওয়ার পর ১৩ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে[২] বেসামরিক সরবরাহ সচিব সৈয়দ মহম্মদ আফজল বলেন যে, জানুয়ারী মাসে নানা অসুবিধার জন্যে সরকার মাত্র ৮১ হাজার মণের বেশী ধান সংগ্রহ করতে পারেন নি। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যেই মোট ১ লক্ষ ৩৫ হাজার মণ ধান ও চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পূর্ব বাঙলা সরকারের পরিকল্পিত বাধ্যতামূলক খাদ্য সংগ্রহ নীতি কার্যকরী হলে পরবর্তী জুন মাসের মধ্যেই ৫৪ লক্ষ মণ ধান সংগৃহীত হবে। তিনি আরও বলেন যে, আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ সুষ্ঠুভাবে চললে এবং বাইরে থেকে আশানুরূপ সরবরাহ পেলে এক মাসের মধ্যেই চালের গড়পড়তা দর মণ প্রতি ২০ টকায় নেমে আসবে।

সরবরাহ সচিবের এই 'আশা' যে বাস্তবের সাথে কতখানি সম্পর্কহীন ছিলো সেটা পরবর্তী কয়েক মাসে খাদ্য শস্যের উচচ মূল্য থেকেই বোঝা যাবে। সমস্ত সরকারী ঘোষণা সত্বেও সরকারী খাদ্য ও সংগ্রহ নীতি যে এই সময় খাদ্য পরিস্থিতির মোকাবেলা করার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলো ফেব্রুয়ারীর পরবর্তী মাসগুলিতে খাদ্য পরিস্থিতির ভয়াবহতাই তার প্রমাণ।

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯, 'সংগ্রহ নীতি' নামক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সরকারী খাদ্য নীতি সম্পর্কে সাপ্তাহিক নও বেলাল বলেন:

> সরকারের বাধ্যতামূলক ধান্য সংগ্রহনীতির বিরুদ্ধে আজ দেশ জুড়িয়া প্রতিবাদ উঠিয়াছে। এই প্রতিবাদের অর্থ এই নয় যে, যেখানে বা যাহাদের কাছে উদ্বৃত্ত আছে তাহা গোদামজাত করিয়া ব্যক্তিগত মোনাফার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইবে আর ঘাটতি এলাকার লোক অনাহারে অর্ধাহারে কলাতিপাত করিবে। যে সব মহল থেকে প্রতিবাদ উঠিতেছে তাহাদের এই প্রকার কোন অভিসন্ধি যে নাই তাহা নিশ্চিত করিয়াই বলা চলে।

সংগ্রহ নীতির ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিতে গিয়ে সম্পাদকীয়টিতে আরও বলা হয় যে, সরকার যদি দেশের খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি কামনা করেন তাহলে তাঁদের উচিত বর্তমান সংগ্রহনীতি পরিত্যাগ করে অন্যান্য দ্রব্যমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধান চালের দর বেঁধে দেওয়া। তার ফলে প্রয়োজনবোধে সকলেই সরকারের কাছে তাদের উদ্বৃত্ত বিক্রি করে অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করবে এবং দেশব্যাপী যে অসন্তোষ জেগে উঠছে সেটাও কমে আসবে।

১লা এপ্রিল, ১৯৪৯, পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।• এই বিতর্কের প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ পরিকল্পনার সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল। বৎসরের গোড়ার দিকেই চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন পাটের অধিক মূল্য: ময়মনসিংহ, সিলেট ও বরিশাল থেকে ঘাটতি এলাকায় চাল সরবরাহে বাধা এবং ব্যবসায়ী ও গৃহস্থ কর্তৃক প্রয়োজনাতিরিক্ত মওজুদ। প্রদেশে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধিকেও নূরুল আমীন মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

লেভী সম্পর্কে নূরুল আমীন তাঁর এই পরিষদ বক্তৃতায় বলেন যে, অনেক জেলাতেই দেয় ধানের পরিমাণ খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে নির্ধারণ করায় তার মধ্যে হয়তো কিছু কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে বড়ো চাষীদের অসাধুতার ফলে দেয় ধানের পরিমাণ সঠিকভাবে স্থির করা হয়নি, অল্প পরিমাণে স্থির করা হয়েছে। অপর পক্ষে অল্প কয়েক ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে কোনরকম তদন্ত না করার বা কোন রকম আপীল না শোনার ফলে বড়ো চাষীদের দেয় ধানের পরিমাণ অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, ধার্য ধানের পরিমাণের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার আপীল শোনার জন্যে বহু দরখাস্ত করা হয়েছে। তবে খাদ্য সংগ্রহের কাজ প্রায় আধা আধি হয়ে আসার ফলে সেই অবস্থায় দেয় ধানের পরিমাণ সম্পর্কে দ্বিতীয় দফা আপীল শোনার সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। কারণ পুনরায় আপীল শোনার ব্যবস্থা করলে খাদ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত সমস্ত পরিকল্পনা ও মূলনীতি ধ্বসে পড়বে। এবং এর ফলে প্রয়োজনীয় ধান সংগ্রহ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না।

সরকারকে দেয় ধানের পরিমাণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, উৎপন্ন ফসলের মধ্যে খাওয়া খরচ মাথা পিছু ৫ মণ ও চাষের খরচ বাবদ একটা ন্যায্য পরিমাণ ধান বাদ দিয়ে যে ধান উদ্বৃত্ত থাকবে তারই তিন চতুর্থাংশ সরকারী গোলায় জমা দিতে হবে। চাষীরা এই ধানের মূল্য পাবে মণ প্রতি ৭।।০ টাকা।

পরিষদের ও বিরোধীদলের নেতাসহ এই খাদ্য বিতর্কে তেইশ জন সদস্য অংশ গ্রহণ করেন। বিরোধী দলের নেতা বসন্ত কুমার দাস বলেন যে, বিরোধী দলের সদস্যগণের মতে লেভী প্রথা দরিদ্র কৃষক শ্রেণীকে সমূলে ধ্বংস করবে। অতএব লেভী প্রথা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা বাঞ্ছনীয়। বর্তমান সরকারী ক্রয় মূল্য কৃষকদের পক্ষে সমূহ ক্ষতির কারণ বলে তিনি মনে করেন। কারণ কৃষির উৎপাদন খরচ খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই কৃষকের স্বার্থে ক্রয় মূল্য বৃদ্ধি করা সরকারের কর্তব্য বলে তিনি পরামর্শ দেন। তাঁদের এই পরামর্শ সরকার গ্রহণ করলে তাঁরা খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে সরকারের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বলে তিনি আশ্বাস দান করেন।

খাদ্য বিতর্কের জবাবে নূরুল আমীন ঐ দিনই পরিষদে আর এক দফা বক্তৃতা করেন। তাতে তিনি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কর্ডন তুলে

দেওয়া, বাধ্যতামূলক ধান সংগ্রহনীতি পরিত্যাগ করা এবং সরকারী খাদ্য ক্রয় মূল্য বৃদ্ধি করার যে তিনটি প্রস্তাব দেওয়া হয় তার উল্লেখ করে বলেন যে, উক্ত তিনটি প্রস্তাবই জনস্বার্থের বিরোধী। কনট্রোল প্রথা তুলে দেওয়ার দাবী প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, যে অবস্থায় কর্ডন প্রথা চালু করতে হয়েছিলো সে অবস্থার অবসান হয়নি। তাছাড়া ১৯৪৮ সালে কয়েকটি জেলায় কর্ডন প্রত্যাহার করার ফল নিদারুণ ক্ষতিকর হয়েছিলো। কাজেই দেশের বর্তমান অবস্থায় লেভী প্রথা প্রত্যাহারের ফল ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে। বিদেশের মুখাপেক্ষী না হয়ে আভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহে অধিকতর মনোযোগ দিলে সমস্যা সমাধান সহজতর হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, সরকারী ক্রয় মূল্য বাড়ানো উচিত হবে না। কারণ ক্রয় মূল্য বাড়ালে বাধ্য হয়ে বিক্রয় মূল্যও সরকারকে বাড়াতে হবে। এর ফলে সেই বর্ধিত মূল্য জনসাধারণের এক বিরাট অংশের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে।

মে মাসে যুক্তরাজ্যের খাদ্য বিশেষজ্ঞ স্যার হ্যাচিসন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পূর্ব বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রদান করেন।[৪] এই রিপোর্টে তিনি বিনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। লেভী প্রথা সম্পর্কে তিনি বলেন যে শুধু উদ্বৃত্ত এলাকাতেই নয়, এমনকি ঘাটতি এলাকাতেও লেভী প্রবর্তন করা উচিত। সরকার কর্তৃক বিক্রিত খাদ্যশস্যে মুনাফা রাখা এবং বিপুল পরিমাণ শস্য গুদামজাত করে রাখাকেও তিনি মনে করেন অনুচিত। সরবরাহ বিভাগ উঠিয়ে না দিয়ে তাকে অন্ততঃ আরও কিছুদিন রাখার জন্যে তিনি সুপারিশ করেন।

লেভী সম্পর্কে নানা প্রকার সমালোচনার পর সরকার এই ব্যবস্থাকে একটা নোতুন ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। পূর্বে ভূমি মালিক পরিবারের সদস্যদের মাথা পিছু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত ধান চাল সংগ্রহ করার যে ব্যবস্থা ছিলো তা পরিবর্তন করে সরকার জমির পরিমাণের ওপর লেভী ধার্য করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত ১৯৪৯ এর আগষ্ট মাসে ঘোষণা করা হয়।[৫] এই ঘোষণা অনুযায়ী স্থির হয় যে, ১০ একর হতে ২০ একর জমির মালিকের জন্যে একর প্রতি এক মণ হিসেবে, ২১ হতে ৫০ দুই মণ হিসেবে, ৫১ হতে ১০০ তিন মণ হিসেবে এবং ১০০ একরের বেশী জমির মালিকের জন্যে চার মণ হিসেবে লেভী ধার্য করা হবে।

এই নোতুন সরকারী সিদ্ধান্ত লেভী ব্যবস্থাকে আরও সুষ্ঠুভিত্তির ওপর দাঁড় না করিয়ে প্রকৃতপক্ষে সমস্যাকে আরও অনেক বেশী জটিল করে তোলে। কারণ এতে একদিকে প্রত্যেক পরিবারের লোকসংখ্যাকে হিসেবের বাইরে রাখা হয় এবং অন্যদিকে জমির উৎপাদনের তারতম্যকে লেভীর ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয় না।

লেভী সংক্রান্ত এই নোতুন নীতি সম্পর্কে সাপ্তাহিক নওবেলাল "খাদ্য সমস্যা" নামে একটি সম্পাদকীয়তে বলেন:

> আমরা পূর্বেও অনেকবার বলিয়াছি যে, জমির পরিমাণের ভিত্তিতে কোন লেভী নীতি ত্রুটীশূণ্য হইতে পারে না। আমাদের দেশের অবস্থা এইরূপ পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কেনা জমির মালিক হইলেই ফসল উপভোগ করা যায় না। অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ত আছেই তদুপরি মহাজন মিরাশদারদের পাওনা মিটাইয়া কৃষকের যাহা বাকী থাকে তাহা দ্বারা জমির পরিমাণ অনুযায়ী লেভীকৃত ধান্য আদায় অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাই আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ মওজুদ ফসলের উপর লেভী ধার্য করিলে ইহা কেবলমাত্র সার্থকই হইবে না ন্যায়-নীতির দিক দিয়াও নিতান্ত সমীচীন হইবে।[৬]

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯, তারিখের দৈনিক আজাদ পত্রিকায় 'লেভীর অনাচার' নামে একটি সংবাদে ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৫নং সাধুরপাড়া ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়:

> গত ২২শে অক্টোবরে বকসীগঞ্জে লেভী এডভাইজারী কমিটির এক সভায় নিরপেক্ষভাবে দশজনের নামে লেভী ধার্য করা হয়; কিন্তু এস. এস. আর এর ছুটি গ্রহণ করার পর বিনা তদন্তেই আরো ১৬ জনের নামে "গ" ধারা মতে নোটিশ জারী হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকের ৫।৭ বিঘার বেশী আমন ফসলের জমি নাই, এমনকি কাহারও কাহারও লাঙ্গল পর্যন্ত নাই।[৭]

'ধান্য লেভী সমস্যা' নামক একটি প্রবন্ধে[৮] জনৈক মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী* লেভীর নির্যাতন সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেন। তাতে তিনি বলেন যে, পূর্ববর্তী বৎসরে প্রকিউরমেন্ট বিভাগের এক শ্রেণীর

---

* ইনি নিজেকে একজন গ্রামবাসী এবং প্রকিওরমেন্ট বিভাগের তালিকাভুক্ত একজন বড়চাষী বলে অভিহিত করেন।

কর্মচারী ও মধ্যবর্তী দালালদের অনাচার ও অবিবেচনামূলক কার্যের ফলে কৃষক সমাজে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, এই লেভী ভীতির ফলে সরকারের অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এর আগের বৎসর প্রচলিত বাজার দরের থেকে অল্প দরে সরকার তাদের ধান কিনে নেওয়ায় কৃষকদের মন ভেঙে গিয়েছিলো। লেভী পদ্ধতির অবিবেচনামূলক প্রয়োগকেই তিনি চলতি বৎসরে ফসল হ্রাস পাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

চলতি বৎসর ও পূর্ববর্তী বৎসরে ধান লেভীর মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে উপরোক্ত নিবন্ধে তিনি বলেন:

> গত বৎসরের ধান্য লেভী পদ্ধতি ও এ বৎসরের পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। গত বৎসর পরিবারের প্রত্যেক লোকের মাথা পিছু ৭।।০ সাড়ে সাত মণ বাৎসরিক হিসাব করিয়া ধান্য ধরা হইয়াছিল। এই হিসাবের বিরুদ্ধে দেশের চারিদিকে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার ফলে লেভী বিভাগ (Procuremet Department) পূর্ব পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। এই বৎসর পূর্বের ন্যায় পরিবারের লোকসংখ্যা ও জমির পরিমাণ ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া এই বৎসর কেবল জমির পরিমাণের উপর লেভী করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রত্যেক চাষী,—যাহার ১০ একর বা ৩২ কেদার বা ইহার অধিক জমি থাকিবে তাহারই উপর ধান্য লেভী করা হইবে। যিনি পরিশ্রম করিয়া ফসল জন্মাইলেন, তাঁহার স্ত্রী-পুত্র ও সন্তানাদির জন্য বাৎসরিক খোরাক আছে কিনা তৎপ্রতি কোন বিবেচনা না করিয়া, তাহার ঘরে খোরাক থাক না থাক, কেবল জমির পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া ধান্য দিতে হইবে। এই লেভী পদ্ধতি পরিবর্তনের ফলে গত বৎসর যাহারা লেভীর দায় হইতে কোন প্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন, এইরূপ বহু চাষীকে এই বৎসর ধান্য দিতে হইবে। এই লেভীর ধান্য তাঁহারা কোথা হইতে দিবেন এই চিন্তায় অনেক কৃষক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন।

ধান চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাস্তবতঃ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার ফলে ১৯৫০ এর ফেব্রুয়ারী মাসে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির[৯] মাধ্যমে সরকার জানান যে, ১৯৪৯ সালের ধান্যশস্য সংগ্রহবিধি অনুযায়ী সংগ্রহের যে

পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে তাঁরা তা পুনর্বিবেচনা করছেন। বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বিভিন্ন স্থানে শস্য হানির ফলে উৎপাদন ব্যাহত হওয়াই তাঁদের এই সিদ্ধান্তের কারণ বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

এই পুনর্বিবেচনার আবেদন যাতে যথার্থ ব্যক্তির থেকে আসে তার জন্যে ব্যবস্থা করা হয় যে, বড়ো বড়ো উৎপাদনকারীকে আবেদনপত্রের সাথে ৭।।০ টাকার ট্রেজারী চালান এবং পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণের এক তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে। এই সব দরখাস্তের শুনানী যাতে শীঘ্রই সমাপ্ত হয় তার জন্যে আঞ্চলিক প্রকিওরমেন্ট কনট্রোলার ও ডেপুটি কনট্রোলারকে তো ক্ষমতা দেওয়া হয়ই, তাছাড়া রাজশাহী রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ (সদর, নেত্রকোণা ও জামালপুর মহকুমা), নোয়াখালী ও সিলেটের এ্যাসিষ্ট্যান্ট প্রকিওরমেন্ট কনট্রোলারকে এবং পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ (টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ) সিভিল সাপ্লাইয়ের ডিষ্ট্রিক্ট কনট্রোলারকেও ক্ষমতা দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষমতা দেওয়া হয় এ্যাডিশানাল ডিষ্ট্রিক্ট কনট্রোলারকে।

জমির পরিমাণের ওপর নির্ধারিত লেভী বজায় রেখে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ আদায় মওকুফ করার জন্যে সরকার ওপরে যে ব্যবস্থার বিধান দিয়েছিলেন তাতে অপেক্ষাকৃত অল্প বিত্তের কৃষকদের তেমন কোন সুবিধা হওয়ার কথা নয়। যাদের জমি পরিমাণে বেশী তারাই সরকারী আমলাদের কাছে নিয়ম মাফিক আবেদন নিবেদন ও দরবার করে কিছু মওকুফ পেতে পারতো। এই ব্যবস্থার ফলে প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর ভূমি মালিকেরাই লাভবান হয়েছিলো। এর দ্বারা গরীব ও মধ্য কৃষকদের কোন উপকার হয় নি। সংগ্রহ বিভাগের অফিসাররা এই সমস্ত কৃষকদের ওপর নির্বিচারে ধান লেভী করে যেতো। কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদনের যে পদ্ধতি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছিলো সে পদ্ধতি অনুসরণ অশিক্ষিত এবং অল্প বিত্তের কৃষকদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাছাড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ভূমি মালিকরা সরকারী আমলাদের কাছে সুপারিশ করে যে সুফল পেতেন কৃষকদের পক্ষে সে ফল পাওয়া নানা কারণে সম্ভব ছিলো না। এই শ্রেণীভুক্ত কৃষকেরা লেভীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিশেষ বিশেষ এলাকায় আন্দোলন

করেছিলেন। এই আন্দোলন অনেক সময় সশস্ত্র সংগ্রামের রূপও পরিগ্রহ করেছিলো।*

১০

অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি

১৯৪৮-৪৯ সালে এবং তার পরবর্তী সময়েও মূল্যবৃদ্ধি যে কেবলমাত্র খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলো তা নয়। অন্যান্য কতকগুলি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যও এই সময়ে ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই দ্রব্য-গুলির মধ্যে কাপড়, কেরাসিন, চিনি, সরিষার তেল, নারকেল তেল, কয়লা ইত্যাদিই প্রধান।

নওবেলাল পত্রিকায় এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯৪৮ এর ১৩ই মে 'বাঁচিবার পথ' নামক একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপে এবং বিভাগের জন্য পাকিস্তানের আর্থিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা সাধারণভাবে নীচে নামিয়া আসিতেছে, এবং দ্রব্যমূল্য দ্রুত বাড়িতে থাকিয়া দেশ জুড়িয়া এক অবিশ্বাস, ভয়, সন্দেহ এবং অসন্তোষের বিষ ছড়াইতেছে। এই অবস্থাকে অধিক দিন চলিতে দিলে দেশের অসন্তুষ্টি আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য—হয়তবা গণবিপ্লবের পর্যায়েও নামিয়া আসিতে পারে।

এরপর এই পত্রিকা সম্পাদকীয়তে দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে আরও বলা হয়:

যে অবস্থা স্বাভাবিকভাবে আমাদের উপর চাপিয়া আসিতেছে তাহার প্রতিরোধের জন্য সরকার কতখানি অগ্রসর হইয়াছেন তাহা অবশ্যই বিচার্য। আন্ত ডোমিনিয়ন সম্মেলনে মাছ, ডিম, তরকারী এবং অনুরূপ অন্যান্য কাঁচামাল পাকিস্তান হইতে অবাধে ভারতীয় ইউনিয়নে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অথচ ভারত হইতে পাকিস্তানে ডাল, তৈল ইত্যাদি দ্রব্যের আমদানিকে সহজ করা হয় নাই। যাহার ফলে শিলংএ মাছ ও ডিমের মূল্য স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়া আসিলেও

* লেভীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের বিবরণ এ বইয়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে (পূর্ব বাঙলায় কৃষক আন্দোলন) দ্রষ্টব্য।

সিলেটে তৈল বা ডালের মূল্য স্বাভাবিক ভাবেই বাড়িয়া উঠিতেছে। সিলেট হইতে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে ভারতীয় করিমগঞ্জে সরিষার তৈলের মূল্য মণকরা ৭০ টাকা এবং সিলেটে তাহার দাম ১১০ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। ইহা শত শত নজীরের একটি মাত্র। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থায় এই অবস্থাকে কাটাইয়া উঠিবার কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে কিনা তাহা এখনও অনুভব করা যাইতেছে না।

এই সকল অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য প্রচার নীতি সাধারণভাবে দুইটা পথ অবলম্বন করিয়াছে। প্রথমতঃ শিশু রাষ্ট্রের দোহাই, দ্বিতীয়তঃ কমিউনিষ্টভীতি প্রচার।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ফরিয়াদ' পত্রিকার ২৫শে জুন, ১৯৪৯, সংখ্যায় ১৯৩৮ এবং ১৯৪৮ সালের একটি তুলনামূলক বাজার দর প্রকাশিত হয়।[১] বাজারদর সম্পর্কে তখনকার এই হিসেবটি নীচে উদ্ধৃত করা হলো :

১৯৩৮ সালের বাজার		
চাউল (উৎকৃষ্ট)	মণ	৪৲—৫৲
ঐ (মোটা)	,,	২৷৷০—৩৲
কয়লা	.	৵০
ডাইল	সের	৵০—৵১০
আলু	,,	⁄১০—৵০
সরিষার তৈল	,,	৷৵০
মাছ (পোনা)	,,	৷৵০—৷৷০
ছাগ মাংস	,,	৷৷০
শাড়ী (ভাল)	জোড়া	৩৷৷০—৪৲
ঐ (সাধারণ)	,,	২৷৷০—৩৲
ধুতি ,,	,,	২৲
লুঙ্গি	,,	২৲—২৷৷০
ডিম	,,	৫১৫
দেয়াশালাই	,,	৫৫
জুতা	১ জোড়া	৩৲
গামছা	১টা	৶০—৶১০
বিড়ি	বাণ্ডিল	৫১৫

১৯৪৮ সালের বাজার		
চাউল (কনট্রোল)	মণ	২১৲
কয়লা ,,	,,	১৷৷⁄০
ডাইল	সের	৸৵০—১৷০
আলু	,,	৷৷০—৷৷৵০
সরিষার তৈল	,,	৩৷৷০—২৸০
মাছ (পোনা)	,,	৩৷৷০
ছাগ মাংস	,,	২৲—৩৲
শাড়ী (ভাল)	জোড়া	২৫৲
ঐ (সাধারণ)	,,	১৪৲—১৬৲
ধুতি ,,	,,	১৪৲—১৬৲
ডিম ,,	,,	৶৯—৷০
জুতা	১ জোড়া	১৬৲—২০৲
লুঙ্গি	১টা	৭৲—৮৲
গামছা	,,	১৷৷০—১৸০
দেশলাই	,,	⁄১০—৵০
বিড়ি	বাণ্ডিল	৷০

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে দ্রব্যমূল্য যে পর্যায়ে ছিল যুদ্ধকালীন অথবা তার পরবর্তী কোন সময়েই তা সে পর্যায়ে নেমে আসেনি। তবে এই তুলনামূলক হিসেব থেকে দশ বৎসরের ব্যবধানে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির একটা সাধারণ চিত্র পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের এই বাজার দর খুব সম্ভবতঃ জিঞ্জিরা বাজার থেকে গৃহীত ঢাকার বাজার দর।

জুলাই মাসের শেষের দিকে সিলেটের জগন্নাথপুর থানার অবস্থার ওপর একটি রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে সেখানে চালের দর মণপ্রতি বিশ বাইশ টাকা হলেও সেই দরে লোকের খাদ্যশস্য কেনার মতো কোন সামর্থ নেই।[২] আট দশ মাস ধরে সেই অঞ্চলে কোন কাপড় না আসায় সাধারণ লোকেরা খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হয়। লাইসেন্সদাররা তাদের কোটার কাপড় না আনার প্রধান কারণ পুরাতন লাইসেন্সদারদের বদল করে নোতুন লোকদেরকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং তারা বেশীর ভাগ কাপড়ই চোরাকারবার করে।

অন্যান্য বাজার দর সম্পর্কে রিপোর্টটিতে বলা হয়:

> কেরাসিন তৈল নাই বলিলেই চলে। সরিষার তৈলের সের ৩/৩৷৷০ টাকা, ডাইলের সের খাসারী ৷৷৵০—৸০ এবং মুসুরী ১৷০—১৷৷০, কিছুদিন আগে একটা দিয়াশলাইর দাম ছিল ⁄০ বর্তমানে ৵০। এমন কি বর্তমানে এতদঅঞ্চলে মাছের অভাব অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দিয়াছে ও মাছের দাম আগুনের মত বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার উপর অসংখ্য ট্যাক্সের বোঝা জনসাধারণের জীবনকে আরও দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে। এই উপর্যোপরি সঙ্কটের চাপে সমস্ত সমাজ জীবন ভাংগনের মুখে। গ্রামের স্কুলগুলি তৈলহীন মাটির প্রদীপের মত নিবিয়া যাইতেছে। বর্তমান সমাজে, আর্থিক অবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপা ক্রোধ বারুদের ন্যায় ফাটিয়া পড়িতেছে।

দ্রব্যমূল্যের এই অবস্থা যে উপরোক্ত এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো তা নয়। পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন বিতর্ক এবং উত্থাপিত প্রশ্নসমূহ থেকে পূর্ব বাঙলায় এই সময় ব্যাপকভাবে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে পূর্ব বাঙলায় বস্ত্র সঙ্কট দারুণ আকার ধারণ করে। এই সঙ্কট সমাধানের উদ্দেশ্যে ২রা এপ্রিল, ১৯৪৮, তারিখে

পূর্ব বাঙলা পরিষদে মনোরঞ্জন ধর ব্যাপকভাবে চরখা প্রবর্তন ও প্রচলনের প্রস্তাব করেন।[৬] এই প্রস্তাব উত্থাপনকালে তিনি বলেন:

বর্তমান বাজেট উপস্থিত হবার পর দিনের পর দিন অর্থসচিব ও অন্যান্য মন্ত্রিবরদের বিভিন্ন বিবৃতি ও আলোচনা থেকে যে সব তথ্য পেয়েছি তাতে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে এক নিদারুণ বস্ত্র সঙ্কটের কথা। অচিরে শিল্প প্রসারের যে তেমন সম্ভাবনা নাই তার উপর অর্থসচিব মহাশয় জোর দিয়ে উক্তি করেছেন একাধিকবার। এদিকে বস্ত্র সঙ্কট যে কি নিদারুণ আকার ধারণ করেছে তার প্রমাণ আমরা নিত্য নিয়তই পাই। আজ আমাদের মা বোনদের লজ্জা নিবারণের কোন সংস্থান নাই, আমি জানি অনেক মেয়ে ঘরের বাইরে আসতে পারে না কাপড়ের অভাবে। অনেক মা, বোন আত্মহত্যা করে তাদের দুঃখের অবসান ঘটিয়েছে লজ্জা নিবারণ করতে না পেরে।[৭]

৯ই এপ্রিল মনোরঞ্জন ধরের প্রস্তাবটি আলোচনার সময় পরিষদ সদস্যেরা বস্ত্র সমস্যার কিছুটা স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে দলনিরপেক্ষভাবে চরখা প্রবর্তনের সপক্ষে নিজেদের মত প্রকাশ করেন। আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ ও তফজ্জল আলী এর বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে মনোরঞ্জন ধরের প্রস্তাবটিকে মন্ত্রী সৈয়দ মহম্মদ আফজল তাঁদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেন। কাজেই প্রস্তাবটি পরিষদে গৃহীত হয়।[৮]

১৯৪৮ এর ৮ই জুন পরিষদে বস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনার সময় মনোরঞ্জন ধরের একটি প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন তাঁকে জানান যে, উপরোক্ত প্রস্তাবটি পরিষদে গৃহীত হওয়ার পর পাকিস্তান সরকার এই বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করেছেন। এ ছাড়া একটা প্রাদেশিক বোর্ডও তাঁরা গঠন করতে যাচ্ছেন। তিনি আশা করেন যে, বিভিন্ন জেলা ও মহকুমাগুলিতে এই বোর্ডের শাখাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে চরখা প্রবর্তিত হবে। তাঁর সরকার পূর্ব বাঙলায় আড়াই লক্ষ চরখা বিতরণ করার ব্যবস্থা করছে বলেও তিনি পরিষদকে জানান।[৯]

বস্ত্র পরিস্থিতি সম্পর্কে এই বিতর্কের সময় অন্য একটি প্রশ্নের জবাবে নূরুল আমীন জানান যে মাথাপিছু দশগজ হিসেবে পূর্ব বাঙলায় বস্ত্রের মাসিক চাহিদা ২৩,০০০ বেল। কিন্তু কনট্রোল প্রথা চালু হওয়ার পরবর্তী

(১)

সন ১৯৪৯ ইং আগষ্ট মাস, লাউতা বাহাদুরপুর কৃষক আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে দমন করার জন্য পাকিস্তান সরকার [illegible] উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, যেখানে কৃষকেরা শান্তিতে এক বাড়ীও বাস করিতে পারিতেছেন, মাঠে জঙ্গলে তাহাদের জীবন যাপন করিতে হইতেছে, এই সুযোগে সরকারী পুলিশ গ্রামে গ্রামে ঢুকিয়া ধরপকড় তল্লাসী করিয়া ঘটিবাটি যাহাই পাইল—তছনছ করিয়া নষ্ট করিয়া দিতেছে। কৃষক পুরুষেরা বাড়ীতে না থাকায় শিশু ও মহিলাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন আরম্ভ করিয়াছে, মহিলাদের ইজ্জত রক্ষা হইতেছে না, এই অবস্থায় গ্রামের লোকেরা ঠিক করিল আর গ্রামে পুলিশ ঢুকিতে দিবেনা।

১২ই আগষ্ট—১৯৪৯ ইং বিকালের দিকে একটি লাঠি পুলিশী লোকেরা গ্রামের দিকে আসিতেছিল, তখন দলবদ্ধ ভাবে কিছু সংখ্যক লোক তাহাদিগকে তাড়া করায় তাহারা আর গ্রামে নামিতে সাহস পায় নাই। তাহারা সিলেট ফিরিয়া গিয়া রিপোর্ট করে উক্ত গ্রামবাসী তাহাদিগকে আক্রমণ—বিদ্রোহ ঘোষণা। সশস্ত্র বাহিনী তাহাদিগকে ... প্রবেশ করিতে পারে নাই, করায় তাহারা আর এই গ্রামে ... ১৯৪৯ ইং। সেই দিন তারপর ১৭ই আগষ্ট ১৯৪৯ ইং। ... দুর্গাদেবীর পূজা হইতেছে, সোনাগেল লাউতার ... সিলেটের D.C; S.P. এবং S.D.P. বহু সংখ্যক Armed Police নিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এই গ্রাম

11.2.50

Rise: 7 A.m. Study: nil

Returned to Hall from Zindabahar at 8 A.m.

~~Class at 12 with K.C.M. not held~~

A meeting was held in Varsity Premises for maintenance of peace. Hardly any inclination of majority students. To DFO's Office at 3-30 p.m. Met DFO at 4-30 p.m. & talked upto 5-30 p.m. He told me he would enquire about the grievances put forward by the people of my locality. Talked to him regarding difficulties of Ijaradars especially in regard to renewal of C.O's. He assured me of seeing to these. Returned to Hall 6 p.m.

Bed 8 p.m.

Weather: Strong wind blew whole day. Sky clear in the day and night. Biting cold due to this wind blowing. Today's cold surpassed even that of normal winter.

The origin of the present disturbances lay certainly in their counterparts in Indian Union specially in West Bengal. It is certainly the repercussions of the happenings upon the Muslims in Calcutta during the last week specially. The situation was aggravated by the impolitic move, if not designed one, of the MLA's representing minority in East Bengal Assembly. Their decision of not participating in the session of the Assembly & to move UNO for the "protection" of minority in East Bengal was much to be resented by the Muslims of this province. Even the most liberals had grumbling against though not a pinion in their move whatever might that had been in good faith & from a pure sense of civic right. Spark of flame was given to the full loaded store of highly inflammable powder by another ill-calculated move of the clerks of the Secretariat who hailed from Indian Republic when they brought out a procession to demonstrate their feeling before Mr. S. Sen, Chief Secy, W. Bengal who was here in a meeting with our Chief Secy & before Indian High Commission. The situation was exploited by the Refugees, specially Biharis, who were longing eagerly for such an opportunity of taking revenge. I'd now

12.2.50

Rise: at 7 A.M. Study: nil

To varsity at 12 noon. No class held.

Meeting of the professors and students held at about 1-30 p.m. Dr. Shahidullah, Dr. Nurul Huda, Mirza Nazimul Karim, AKM Mahmood and Kibria, Abdul Awal etc spoke. Kazi Motaher Hussain presided. No definite plan could be made to establish peace and save the minorities. Meeting dissolved at about 3-30 p.m.

Did not get out of the Hall premises whole day.

In common room from 4-30 p.m. to 5-30 P.m.

Wrote a statement for Moulana A. Majid concerning Jamiatul-Ulema at night.

Bed at 11 P.m.

Weather: Clear-ally. But very severe cold. Sunshine could not affect the cold even in mid day. Temperature must be very low.

---

leaders with their ardent desire to move constitutionally failed absolutely to hold control over the mob that gathered round them & that was constituted mostly by the Refugees. The result was mob violence upon the minority property first & then persons.

The killing continued with increasing vigour. The shops being already plundered the whole attention of the miscreants fell upon life of the Hindus. As the report goes some families have been completely ruined. Stray cases of assault are enormous in number. In train compartments in or running trains murders are reported to have been committed.

Govt. have arranged centres for accomodating isolated Hindu families. Main roads are under military Control. Curfew hours have been increased to 5 P.m. to 8 A.m. Inspite of all these murder is being committed right and left. None dare open the mouth against the miscreants to help Govt. Policy.

Violence on life has been going on since 10.2.50. No sign of subsidal is visible though the mob rowdism is less.

তাজউদ্দীনের ডায়েরী ১১-২-৫০/ ১২-২-৫০ পৃষ্ঠা ৩২৫-৩২৭ ।

How Humanity Attacked Under

Liakat-Nurul Amin Regime ?

Below is the statement of Sm. ILA MITRA made before the court at Rajshahi with regard to inhuman treatment meted out to a lady, only because she holds a political opinion other than that of Liakat-Nurul, Amin Feudal class :—

Sm. Ila Mitra in her statement pleading 'not guilty' to the charges said,

I know nothing about the case. On 7-1-50 last I was arrested in Rohanpur and taken to Nachole the next day. The police guards assaulted me on the way and thereafter I was taken inside a cell. The S. I. threatened to make me naked if I did not confess everthing about the murder. As I had nothing to say, all my garment were taken away and I was imprisoned inside the cell in stark naked condition.

No food was given to me, not even a drop of water. The same day in the evening the sepoys began to beat me on the head with butt ends of their guns, in the presence of the S.I. I was profusely bleeding through the nose. Afterwards my garments were returned to me, and at about 12 midnight I was taken out of the cell and lead possibly to the quarters of the S. I., but I was not certain.

In that room where I was taken they tried brutal methods to bring out confession. My legs were pressed between two sticks, and the people around I was being administered a 'Pakistani injection.' When this torture was going on they tied my mouth with a napkin. They also pulled off my hairs, but as they could not force me to say anything. I was taken back to the cell carried by the sepoys, as after the torture it was not possible for me to walk.

Inside the cell again the S. I. ordered the sepoys to bring four hot eggs, and said, now she will talk. Thereafter four or five sepoys forced me to lie down on my back, and one pushed a hot egg through my private parts. I was feeling like being burnt with fire, and became unconscious.

When I came back to my senses in the morning of 9-1-50, the S. I. and some sepoys came into my cell and began to kick me on the belly with boots on. Thereafter a nail was pierced through my right heel. I was then lying half conscious, and heard the S.I. muttering: we are coming again at night, and if you do not confess, one by one the sepoys will ravish you. At dead of night, the S. I. and his sepoys came back and the threat was repeated. But as I still refused to say anything, three or four men got hold of me, and a sepoy actually began to rape me. Shortly afterwards I became unconscious.

Next day on 10.1.50 when I became conscious again, I found that I was profusely bleeding and my cloth was drenched in blood. I was in that state taken to Nawabganj from Nachole. The sepoys in Nawabganj jail gate recived me with smart blows.

I was at that time in a prostate condition and the Court Inspector and some sepoys carried me to a cell. I had high fever then and I was still bleeding. A doctor, possibly from the Govt. Hospital at Nawabganj had noted the temperature of my body to be 105°. When he heard from me of the profuse bleeding I had he assured me, I would be treated with the help of a women nurse. I was also given some medicines and two pieces of rugs.

On 11.1.50 the women nurse of the Govt. Hospital examined me. I do not know what report she gave about my condition. After she came, the blood strained piece of cloth I was wearing was changed for a clean one. During all this time, I was in a cell of the Nawabganj P. S. under the treatment of a doctor. I had high fever and profuse bleeding, and was unconscious from time to time.

On 16. 1. 50 a stretcher was brought before my cell in the evening and I was told that I would have to go elsewhere for examination, on my protest that I was too ill to move about, I was struck with a stick and forced to get on the stretcher after which I was carried on it to another house. I told nothing there, but the sepoys forced me a sign a blank paper. I was at time in a semi-conscious state with high fever. As my condition was going worse. I was next day transferred to the Nawabganj Govt. Hospital, and on 21. 1. 50 when the state of my health was still very precarious, I was brought from Nawabganj to Rajshahi Central Jail, and was admitted to the jail hospital.

I had not under any circumstances said anything to the police, and I have nothing more to say than I have stated above.

ইলা মিত্রের জবানবন্দী। এই জবানবন্দীই ইস্তাহার আকারে পূর্ব বাংলার সর্বত্রই ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে বিলি করা হয়। পৃষ্ঠা ২৯২-৯৪।

হিসেব থেকে দেখা গেছে যে পূর্ব বাঙলায় মাসে ১৩,০০০ বেল কাপড়ও বিক্রি হয় না।[৭]

নিদারুণ বস্ত্র সঙ্কট সত্ত্বেও কনট্রোলের মাধ্যমে কাপড় খরিদ করার সামর্থও এই সময় মানুষের ছিলো না। এর থেকে বোঝা যায় সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতা তখন কোন পর্যায়ে ছিলো।

কনট্রোলের মাধ্যমে যে কাপড় ডিলারদের কাছে পাঠানো হয় তার অধিকাংশই ভারত থেকে আমদানীকৃত। এই আমদানীকৃত কাপড়ের ওপর ভারত এবং পাকিস্তান দুই অংশেই রপ্তানী ও আমদানী কর ধার্যের ফলে তার মূল্য অনেক বেশী দাঁড়ায়।[৮] কনট্রোলের মাধ্যমে কাপড় দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করলেও এ জন্যেই সেই কাপড় সাধারণ লোকের পক্ষে কেনা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে পরিষদে একটি প্রশ্নের জবাবে সরবরাহ মন্ত্রী সৈয়দ আফজল স্বীকার করেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ডিলাররা তাদের মজুত কাপড় বিক্রি করতে অসুবিধা বোধ করছে। এবং অনেক আগেকার মজুত কাপড় সময়মতো বিক্রি করে উঠতে না পারার জন্যে সরকারী গুদাম থেকে পরবর্তী কোটার কাপড় তুলতে দেরী করছে।[৯]

রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমায় কেরোসিন তেল এবং চিনির কোটা নষ্ট হওয়া সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জবাবে সরবরাহ বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেল ও ষ্টীমার কোম্পানী সময়মতো পরিবহনের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম না হওয়াতেই কেরোসিন তেলের কোটা নষ্ট হয়। চিনির ক্ষেত্রে অবশ্য অন্য ব্যাপার। চিনির পাইকারী ডিলাররা কল থেকে চিনি তোলার জন্যে যথেষ্ট সংখ্যায় এগিয়ে না আসার ফলেই প্রধানতঃ চিনির কোটা নষ্ট হয়ে যায়।[১০]

ঢাকায় কয়লার অভাব এবং কয়লার কোটা নষ্ট হওয়া সম্পর্কেও পূর্ব বাঙলা পরিষদে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এর জবাবে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ঢাকার জন্যে ১৯৪৯ এর ফেব্রুয়ারী মাসে নির্দিষ্ট ২৬ ওয়াগন কয়লার মধ্যে মাত্র দুই ওয়াগন কয়লা ভারত থেকে ঢাকা এসেছে এবং বাকী কোটা নষ্ট হয়ে গেছে।[১১]

সরকার ঢাকাতে কয়লার রেশনিং চালু করার কোন ব্যবস্থা করেছেন কিনা তার জবাবে বলা হয় যে, কয়লার মাসিক কোটা নিয়মিত সরবরাহের কোন নিশ্চয়তা না থাকার ফলে ঢাকায় কয়লার রেশনিং চালু করা সম্ভব নয়।[১২]

সরবরাহের এই অনিশ্চিত অবস্থার জন্যে ঢাকায় এবং পূর্ব বাঙলার অন্যান্য শহরে এই সময় অন্যান্য দ্রব্যের সাথে কয়লারও দারুণ অভাব ঘটে এবং তার মূল্য বৃদ্ধি হয়।

১৯৫০ সালে চাল এবং অন্যান্য দ্রব্যমূল্য অনেকখানি কমে এলেও ১৯৫১ সালে চালের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য জিনিসপত্রের মূল্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত দৈনিক আজাদের একটি বিবরণে বলা হয় :

> সম্প্রতি কিছুদিন হইতে সাধারণভাবে সমগ্র প্রদেশে এবং বিশেষ করিয়া ঢাকা শহরে জীবন ধারণের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, মধ্যবিত্ত ও দিনমজুরদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে।...
>
> গত বৎসরের তুলনায় চাউলের মূল্য হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা ঢাকার বাজারে বর্তমানে প্রতি মণ ২৫ টাকা হইতে ২৮ টাকা মূল্যে মাঝারি রকমের চাউল বিক্রয় হইতেছে।
>
> মাছ মাংসের মত শাক সব্জী ও তরীতরকারীও সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সের প্রতি বেগুণ বার আনা, আলু ১ টাকা, কাঁচা লঙ্কা ৩ টাকা, সরিষার তৈল (অবশ্য খাঁটি নয়) ৪ টাকা, নারিকেল তৈল ৭৷৷ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।
>
> আরও শোনা যাইতেছে, বাজারে সরিষার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এমনকি কয়েকটি সরিষার তৈলের কলও বন্ধ হইবার জোগাড় হইয়াছে। অচিরেই যদি সরিষার আমদানী না করা হয়, তাহা হইলে সরিষার তৈলের মূল্য ১০ টাকা সের দরে বিক্রয় হইতে পারে বলিয়া অনেকে এখন হইতেই আশঙ্কা করিতেছেন।[১৩]

১১

খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯, পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক বক্তৃতায় বলেন যে, সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবে শস্য হানি হওয়ায় তাঁরা আন্তর্জাতিক খাদ্য পরিষদের কাছে খাদ্যের জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই কিছু পরিমাণ

খাদ্য শষ্য বিদেশ থেকে এসেছে এবং আরও আসছে। এছাড়া চলতি বৎসরে পশ্চিম পাকিস্তানে ফসল ভাল হয়েছে কাজেই সেখানকার গম বাজারে এনে খাদ্য সংকট দূর হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।[১]

এরপর ৯ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহে আর একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, দেশের স্থানে স্থানে ধান চালের মূল্য দরিদ্র জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এ সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে সরকার উপলব্ধি করেছেন যে ঘাটতি এলাকায় সরবরাহের ভার ব্যবসায়ীদের হাতে ন্যস্ত করা যায় না। জনসাধারণকে ন্যায্য দামে খাদ্য শস্য সরবরাহের জন্যে সরকার লেভী ও কর্ডনিং এর ব্যবস্থা করেছেন। গত বৎসর কর্ডনিং এর কড়াকড়ি হ্রাস করার ফল ভাল হয় নাই, কাজেই সরকারের দ্বারা অনুসৃত খাদ্য সংগ্রহ নীতিই শ্রেয়।[১]

ফেব্রুয়ারী মাসে খাজা নাজিমুদ্দীনের এই সব বক্তব্যের পরও অবস্থার কোন প্রকার উন্নতি না হয়ে বরং খাদ্য পরিস্থিতির অধিকতর অবনতি ঘটে। এর ফলে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় সরকারী দল মুসলিম লীগও সরকারী খাদ্য নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

১৪ই জুন ১৯৪৯, গিয়াসউদ্দীন পাঠানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ময়মনসিংহ মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী এবং বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রীর কাছে এক প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুসলিম লীগের এই সভায় প্রচলিত লেভী প্রথার সমালোচনার প্রসঙ্গে বিভিন্ন জেলায়, বিশেষতঃ নেত্রকোনায়, এ ব্যাপারে তাঁরা কৃষকদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ করেন। এই সম্পর্কে সরকারী এবং বেসরকারী সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি দ্বারা তদন্তের দাবীও জানান হয়। এই সংক্রান্ত প্রস্তাবে আরও দাবী করা হয় যে, প্রস্তাবিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ না করা পর্যন্ত যেন প্রচলিত লেভী কার্যকর করা না হয়। এইসভায় গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে সরকারী গুদামে প্রদত্ত ধানের ওজন, মূল্য বাকী ফেলা ইত্যাদি বিষয় অনাচারের তীব্র নিন্দা করা হয়। নানা স্থানে স্বল্প পরিমাণ ধান আটক করে গ্রাম্য চাষীদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলা হচ্ছে বলে সভায় অভিযোগ করে এই ব্যবস্থা রহিত করার দাবী জানানো হয়। সরকারী ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্যে তারতম্য অর্থাৎ সরকারের অতিরিক্ত মুনাফা সম্পর্কেও এই প্রস্তাবে তাঁরা উল্লেখ করেন।[৩]

এই সময় ঢাকা জেলা মুসলিম লীগও খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৭ই জুন তারিখে ঢাকা জেলা বোর্ডের মিলনায়তনে নওয়াব হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ কাউন্সিলের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১১৪ জন কাউন্সিলের মধ্যে ৭৫ জন তাতে যোগদান করেন। এই সভায় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁরা নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন: (ক) খাদ্যনীতি পুনর্বিবেচনা করা হোক, (খ) প্রাদেশিক কর্ডন প্রথা, দৃঢ়তর করা হোক, (গ) জেলা কর্ডন প্রথা উঠিয়ে নেওয়া হোক, (ঘ) লেভী প্রথা সম্পর্কিত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করা হোক, (ঙ) বাড়তি এবং ঘাটতি এলাকার ধান ও চালের বর্তমান মূল্য সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করা হোক, (চ) খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও বণ্টনের মধ্যে সরকার আরও কম মুনাফা করুক, (ছ) ঘাটতি এলাকায় তৎপরতার সাথে খাদ্য শস্য পাঠানো হোক, (জ) ঘাটতি এলাকার গ্রামগুলিতে সম্পূর্ণ রেশনিং প্রবর্তন করা হোক এবং (ঝ) খাদ্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে স্থানীয় মুসলিম লীগের সাহায্য গ্রহণ করা হোক।[৪]

ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এই শেষোক্ত সুপারিশটি থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে পূর্ব বাঙলা সরকার খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে এ সময়ে সরকারী কর্মচারীদের ওপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম লীগ সংগঠনের সাথে তাঁদের কোন সহযোগিতার সম্পর্ক ছিলো না।

১৮, ১৯ ও ২০শে জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৫] সেই অধিবেশনে তাঁরা খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন; খাদ্য বিলি ব্যবস্থা ও খাদ্য বিক্রয় সম্পর্কে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এ ছাড়া সাধারণভাবে সরকারী আমলাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, স্বাধীনতা লাভ করার পর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব জনগণের ওপর ন্যস্ত হয়েছে কারণ তারাই রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক। কিন্তু এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা তাদের পুরাতন নীতি অপরিবর্তিত রেখে জনগণের সাথে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। এই সমস্ত কর্মচারীরা যাতে জনগণের প্রতি ভদ্রোচিত ব্যবহার করে তার জন্যে মুসলিম লীগ কাউন্সিল মন্ত্রীসভাকে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দান করেন।

সামগ্রিকভাবে খাদ্য পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে, প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় সর্বত্র দারুণ অসন্তোষের উদ্ভব হয়েছে। খাদ্য সমস্যা সম্পর্কিত সরকারী ঔদাসীন্যের ওপর কতকগুলি তথ্য পেশ করে কাউন্সিল অভিমত প্রকাশ করেন যে, বেসামরিক সরবরাহ দফতরের অক্ষমতা ও অথর্বতার অনেক প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে এবং এই দফতর কর্তৃক জনগণের কোন উপকারই সাধিত হচ্ছে না। ফলে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে শুধু মুসলিম লীগ সরকারই নয়, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানেরও দারুণ দুর্নাম হচ্ছে।

তাঁরা এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, সংগ্রহ (প্রকিওরমেণ্ট), বিতরণ (ডিষ্ট্রিবিউশন) ও চলাচল (মুভমেণ্ট) সরবরাহ দফতরের এই তিনটি বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে বিভিন্ন জেলার খাদ্য ব্যবস্থা পরিচালনা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। খাদ্য সংগ্রহ নীতির বিধি ব্যবস্থা সরকার যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে না পারায় সন্তোষজনকভাবে কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং তার ফলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সরকারের মুনাফাখোরী সম্পর্কে তাঁদের অভিযোগে বলা হয় যে, সিন্ধু এবং অন্যান্য স্থান থেকে যথাক্রমে ১৲ ও ৫।০ টাকা মণ দরে ভাঙা চাল কিনে সরকারী সরবরাহ বিভাগ পূর্ব পাকিস্তানে তা ২২।।০ টাকা দরে বিক্রি করছে।

উপরোক্ত তথ্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রদেশের খাদ্য সমস্যার উন্নতি বিধান কল্পে সরকারের নীতি পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে কাউন্সিল নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করেন :

(ক) আন্তঃথানা ও আন্তঃ মহকুমা কর্ডন প্রথা রহিত করিয়া জেলা ও প্রাদেশিক কর্ডন প্রথাকে অধিকতর কঠোরতার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে। (খ) ধান্য উৎপাদনকারীদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সম্প্রতি প্রবর্তিত শস্য ক্রোক প্রথা রহিত করিয়া খাদ্য সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করা উচিত। (গ) সরকারকে লাভের আকাঙ্খা ত্যাগ করিয়া ধান চাউল ও অন্যান্য খাদ্য শস্যের দাম অবিলম্বে কমাইয়া ফেলিতে হইবে। (ঘ) প্রকিওরমেণ্ট, ডিষ্ট্রিবিউশন ও মুভমেণ্ট এই তিনটি বিভাগের কার্যপরিচালনার ভার তিনজন জেলা অফিসারের পরিবর্তে একজনের হাতে ন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে সর-

কারকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য কাউন্সিল নির্দেশ দিয়াছেন। তিনজন জেলা অফিসার নিজেদের জেদ ও রেষারেষি বজায় রাখিবার জন্য বহুক্ষেত্রে সরকারী কাজে গাফলতি করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সরবরাহ দফতর উঠাইয়া দেবার মানসে এখন হইতেই ব্যাপক আকারে কর্মচারী ছাঁটাই করা শুরু করিবার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (ঙ) খাদ্য সমস্যার প্রকৃত সমাধানের উদ্দেশ্যে সরকারকে মোছলেম লীগের সহিত সহযোগিতা করিতে বলা হইয়াছে। (চ) ঘাটতি এলাকার খাদ্য সরবরাহ করিবার জন্য সরকারকে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (ছ) সরবরাহ দফতরকে আরও কার্যতৎপর ও নিপুণতার সহিত কার্য পরিচালনা করিতে হইবে। (জ) কাউন্সিল বন্যাবিধ্বস্ত ও ঘাটতি এলাকায় রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছে।[৬]

ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলা লীগ এবং প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের উপরোল্লিখিত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, ময়মনসিংহ কাউন্সিলের প্রস্তাবে কর্ডন প্রথা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই, ঢাকা কাউন্সিলের প্রস্তাবে জেলা কর্ডন তুলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং প্রাদেশিক কাউন্সিল জেলা কর্ডন জোরদার করার কথা বলেছেন। ময়মনসিংহ কাউন্সিলে লেভীর নির্যাতন সম্পর্কে বিশদভাবে উল্লেখ করে সেই নির্যাতন বন্ধ করা এবং সে বিষয়ে তদন্ত করার সুপারিশ জানানো হয়েছে। ঢাকা কাউন্সিলে নির্যাতন সম্পর্কে বিশদ উল্লেখ অথবা অভিযোগ না করে নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাদেশিক কাউন্সিল কিন্তু লেভীর নির্যাতন সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয়নি। তাঁরা শুধু বলেছেন, 'সম্প্রতি প্রবর্তিত শস্য ক্রোক প্রথা রহিত করিয়া খাদ্য সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করা উচিত'। উপরোক্ত তিনটি কাউন্সিলের প্রস্তাবেই অবশ্য সরবরাহ বিভাগের অতিরিক্ত মুনাফা আদায়ের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখিত হয়েছে। ঢাকা জেলা এবং প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রস্তাবে খাদ্য সম্পর্কিত বিষয়ে মুসলিম লীগের সাথে সরকারের সহযোগিতার অভাব এবং প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। প্রাদেশিক কাউন্সিলের সভায় 'নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি' এবং মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা হানি ও দুর্নাম সম্পর্কে সরাসরি উল্লেখ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৮ই জুলাই, ১৯৪৯, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিঞা) খাদ্য সঙ্কট সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন।[৭] তাতে তিনি বলেন:

> পূর্ব পাকিস্তান আজ গভীর খাদ্য সঙ্কটের সম্মুখীন। এখানকার ইতিহাসে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব আর কখনও হয় নাই। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে খাদ্য শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় খাদ্য সঙ্কটের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতিদিনই পরিস্থিতির অবনতি ঘটিতেছে।...... জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে আমি বহু মর্মন্তুদ সংবাদ পাইয়াছি। যথাশীঘ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করা হইলে ১৯৪৩ সালের ভয়বাহ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি।

এরপর তিনি বলেন যে, সরকার সমস্ত জেলা, মহকুমা ও ইউনিয়নে রিলিফ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু সরকারের ঐ ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রাদেশিক মুসলিম লীগ একটা নিজস্ব রিলিফ কমিটি গঠন করবে। এই কমিটির কাজ সম্পর্কে তিনি বলেন:

> বিভিন্ন জেলা মহকুমা ও ইউনিয়নে আমাদের রিলিফ কমিটির শাখা থাকিবে। ইউনিট রিলিফ কমিটিগুলি গ্রামে গ্রামে যাইয়া জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য গ্রহণ করিবেন এবং যাহাতে সঠিকভাবে দুর্গতির প্রতিকার হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।... দেশে যে ভীতি ও অনিরাপত্তার আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূরীভূত করিয়া তাঁহাদিগকে জনসাধারণের মনে আশা ও সাহসের সঞ্চার করিতে হইবে।

মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক রিলিফ কমিটি গঠনের ব্যবস্থা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে একটি পৃথক রিলিফ কমিটি গঠন করার এই প্রস্তাব খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর দ্বারা বস্তুতঃপক্ষে মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের অনাস্থা প্রকাশ পায়।

কিন্তু প্রাদেশিক লীগ সম্পাদকের এই বিবৃতি সত্ত্বেও ১৮ জুলাই, ১৯৪৯, তারিখে বর্ধমান হাউসে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির একটি সভায় রিলিফ কমিটি সম্পর্কে সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবে জেলা এবং মহকুমা রিলিফ কমিটিগুলিকে ৫ জন মুসলিম

লীগ, ২জন সংখ্যা লঘু এবং ৩ জন সরকারী প্রতিনিধি সর্বমোট ১০ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে গঠন করার অনুরোধ জানানো হয়। সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের নির্বাচনের দায়িত্ব তাঁরা ঐ একই প্রস্তাবে প্রাদেশিক গভর্ণ-রের ওপর অর্পণ করেন। কাজেই এই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে ৫ জন মুসলিম লীগ এবং ৫ জন সরকারী প্রতিনিধি নিয়ে প্রত্যেক জেলা ও মহকুমার রিলিফ কমিটি গঠনের যে কথা বলা হয় তাতে সরকারবিরোধী দল সমূহকে সম্পূর্ণভাবে রিলিফ কমিটির আওতার বাইরে রাখা হয়। রিলিফের প্রতি এই দৃষ্টি ভঙ্গী এবং রিলিফ কমিটিগুলির এই চরিত্রের জন্যেই সেগুলি নামমাত্র রিলিফ কমিটিতে পর্যবসিত হয়ে অচিরেই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

১২

১৯৫১ সালের খাদ্য সংকট

১৯৪৮-৪৯ এর নিদারুণ খাদ্য সঙ্কট ১৯৪৯ এর শেষ ভাগে এবং ১৯৫০ সালে অনেকখানি হ্রাস হয়ে দুভিক্ষ অবস্থার অবসান ঘটায়। কিন্তু ১৯৫১ সালের প্রথম দিক থেকেই আবার খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটিতে থাকে এবং কয়েকটি জেলায়, বিশেষতঃ খুলনায়, বন্যার ফলে তা এক মারাত্মক দুভিক্ষের সৃষ্টি করে।

এপ্রিল মাসে খুলনার দক্ষিণ অঞ্চলে শ্যামনগর, কালীগঞ্জ, আশাসুনী, পাইক গাছা এবং অন্যান্য এলাকায় খাদ্য সঙ্কটের তীব্রতা ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পায়। ভাতের অভাবে ঐ সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা চালকুমড়া, সজনের ডাঁটা ইত্যাদি খাওয়াতে ব্যাপক হারে পেটের অসুখ দেখা দেয় এবং তার ফলে অনেকের মৃত্যুও ঘটে। কোনরকমে জীবন রক্ষার জন্যে গরীব কৃষকেরা নিজেদের জমি বিক্রি করতে শুরু করলেও জমির দাম তারা মোটেই পাচ্ছিলো না। কয়েক মাস পূর্বেও যে জমি ৪০০ টাকা বিঘা বিক্রি হতো তার দাম এই সময়ে দাঁড়ায় বিঘা প্রতি ৪০ টাকা। এইসব অঞ্চলে ধান চাল সরকারীভাবে নিষিদ্ধ হওয়ায় অবস্থার আরও অব-নতি ঘটে।[১]

ঠিক এই সময়ে (৫ই এপ্রিল) বরিশালের সুতিয়াকাটিতে এক জনসভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী সৈয়দ আফজল হোসেন বলেন

যে, পূর্ব বাঙলায় খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটার অথবা খাদ্য সম্পর্কে কোন সমস্যা দেখা দেওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সরকারী গুদামে ৫ লক্ষ মণ মজুদ চালের উল্লেখ করে বলেন যে, প্রয়োজনমতো যে কোন জায়গায় সে চাল পাঠানো হবে।[২]

এর এক মাস পর পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীনও তাঁর মাসিক বেতার বক্তৃতায় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন:

> আমাদের প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতি বর্তমানে সন্তোষজনক। সরকারের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্য মওজুদ আছে। সুতরাং প্রদেশবাসীদের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নাই।[৩]

সরবরাহ মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর এই সব সরকারী বক্তব্য সত্ত্বেও খুলনা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক আবদুল হামিদ এই সময় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করেন:

> গত কয়েক মাসে খুলনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে খাদ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, সরকার উহার প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেন নাই। ইহা অদৃষ্টের পরিণাম বই কি। খুলনা জেলা উদ্বৃত্ত খাদ্য এলাকা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু গত বন্যার ফলে পাইকগাছা, সারণখোলা, মোল্লাহাট, তেরোখাদা, ডুমুরিয়া, শ্যামনগর, আসাশুনি, কালীগঞ্জ, দাকোপ, সাতক্ষীরা, তালা থানার যথেষ্ট শস্যহানি হইয়াছে। প্রাদেশিক মোছলেম লীগের অধিবেশনে এ সম্পর্কে প্রথম আলোচনা হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রে খুলনার খাদ্যসঙ্কটের খবর প্রকাশিত হয় এবং প্রাদেশিক সরকারের নিকট সাহায্যের আবেদন করা হয়। কিন্তু সরকার পরিস্থিতি সম্পর্কে যথোচিতরূপে অবহিত হন নাই। অতীব দু:খের বিষয় যে আজ পর্যন্ত কোনও মন্ত্রী খুলনায় যাইয়া পরিস্থিতির গুরুত্ব প্রত্যক্ষ করেন নাই। বর্তমানে খাদ্য সঙ্কট চরম পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। যে সব লোক বৎসরের পর বৎসর অপরের মুখের গ্রাস যোগাইত আজ তাহারা ঘাস ও গাছের পাতা খাইয়া দিনের পর দিন মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে।[৪]

মুসলিম লীগ সরকারের মন্ত্রী এবং আমলাবর্গের সাথে মুসলিম লীগের প্রাদেশিক ও জেলা মহকুমা পর্যায়ের নেতাদের একটা অংশের যে বহুক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব, মতবিরোধ এবং সংঘাত ছিলো খুলনা জেলা লীগ

সম্পাদকের এই বিবৃতিটি তারই অন্যতম উদাহরণ। ঠিক এই সময় আবার প্রাদেশিক সাহায্য মন্ত্রী মফিজউদ্দীন খুলনায় খাদ্য পরিস্থিতিকে শোচনীয় বলে বর্ণনা করেন। এর থেকে বোঝা যায় সরকারী মহলে, এমনকি মন্ত্রীদের নিজেদের মধ্যেও, খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য এবং মতামত বিনিময়ের কতখানি অভাব ছিলো।

১০ই মে, ১৯৫১, সাপ্তাহিক সৈনিক 'খুলনায় দুর্ভিক্ষ' নামে একটি সম্পাদকীয়তে বলেন যে, খুলনার একটি বড়ো অংশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। সরকার সাধারণতঃ কোন অবস্থাকেই সহজে গুরুতর বলে স্বীকার করেন না, কিন্তু খুলনার বর্তমান অবস্থা যে শোচনীয় সে কথা প্রাদেশিক সাহায্য মন্ত্রী মফিজউদ্দীন আহমদও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রপীড়িত অঞ্চলকে অবিলম্বে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানিয়ে সম্পাদকীয়টিতে দুর্ভিক্ষ নিবারণে এগিয়ে আসার জন্যে সরকার ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। তাতে আরও বলা হয় যে, প্রাদেশিক মন্ত্রী প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন যে, একা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে সেই দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত পাঞ্জাবের বন্যার সময় তাঁরা যেভাবে সেখানে বিপুলভাবে সাহায্য দিয়েছিলেন সেইভাবে পূর্ব বাঙলার এই বিপদের সময় এগিয়ে আসা।

খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ময়মনসিংহ এবং উত্তর বাংলা থেকে প্রাপ্ত সংবাদ খুব উদ্বেগজনক বলে সম্পাদকীয়টিতে উল্লেখ করা হয়। অনাবৃষ্টির ফলে ফসলের অবস্থা সেখানে ভয়ানক খারাপ দাঁড়ায়। অবস্থা যাতে আয়ত্তের বাইরে না যায় তার জন্যে সরকারকে তৎপর ও সচেষ্ট হওয়ার জন্যে এতে অনুরোধ জানানো হয়।

২৭শে ও ২৮শে মে তারিখে ঢাকা জেলার নরসিংদীতে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের সংগঠন কাউন্সিলের অধিবেশনে ফরিদপুর ও যশোরের বাত্যাপীড়িত এবং খুলনায় বন্যা প্রপীড়িত অঞ্চলের জনগণের সেবার জন্যে নিয়োজিত সরকারী বা অন্য কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়।[৫]

১৭ই জুন ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এক বেতার বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন বলেন যে, ঘূর্ণিবাত্যা, ঝড়, শিলাবৃষ্টি ও বন্যায় গত কয়মাসে পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর, যশোর, সিলেট, ময়মনসিংহ, খুলনা, রাজশাহী

দিনাজপুর, বরিশাল, ঢাকা ইত্যাদি জেলায় কতকগুলি এলাকা বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। দুর্গত এলাকাসমূহের আয়তন প্রায় ৩ হাজার বর্গ মাইল এবং তাঁর হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ছয় লক্ষাধিক। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, সরকার দুর্গতদের সাহায্যের জন্য ব্যাপক কর্মপন্থা অবলম্বন করছেন। এজন্যে 'প্রধানমন্ত্রীর জরুরী সাহায্য তহবিল' নামে একটা তহবিল খোলার কথা উল্লেখ করে তাতে মুক্তহস্তে দান করার জন্যে তিনি সহৃদয় ব্যক্তিদের প্রতি আবেদন জানান।[৬]

যুবলীগ সমর্থক পত্রিকা নওবেলাল নূরুল আমীনের এই বক্তৃতার পর অভিযোগ করেন যে, নরসিংদীতে সেবাকার্যে সহযোগিতা প্রদানে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও নূরুল আমীন সরকার যুব লীগের সহযোগিতা লাভের কোন প্রচেষ্টা করেন নি।[৭]

বাগেরহাট তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে মহম্মদ আশরফ কর্তৃক প্রেরিত একটি রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫১ সালের জুন মাসে খুলনা জেলার শুধু সাতক্ষীরা ও সদর মহকুমাই নয়, বাগেরহাট মহকুমার দক্ষিণ এবং পূর্ব অঞ্চলেও প্রায় দু মাস থেকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষাবস্থা শুরু হয়েছে।[৮] চৈত্র মাস থেকে এই সব অঞ্চলের লোকেরা খাদ্যাভাবে আলু কচু পোড়া ইত্যাদি খেয়ে জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, খাদ্য সঙ্কটের সাথে কলেরা বসন্তের প্রকোপ তাদের জীবনকে আরও বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

যাদের কিছু জমিজমা ছিলো তারাও প্রথম অবস্থায় তা বিক্রি করে টিকে থাকার চেষ্টা করেছে। এক কচুয়া রেজিস্ট্রী অফিসে যেখানে পূর্বে দিনে আট নয়টার বেশী দলিল রেজিস্ট্রী হতো না সেখানে দিনে একশো থেকে দুশো পর্যন্ত দলিল এই সময় রেজিস্ট্রী হতে দেখা গেছে। এই সমস্ত জমিই মানুষ পানির দরে বিক্রি করেছে। কেউ কেউ সামান্য সরকারী ঋণও পেয়েছে।

কিন্তু এই এলাকার অধিকাংশ লোকই ভূমিহীন। তাদের না আছে জমি, না আছে সরকারী ঋণ পাওয়ার সম্পত্তিগত যোগ্যতা। এর ফলে তাদের অবস্থা সহজেই অনুমান করা চলে। গ্রামে গ্রামে কঙ্কালসার মানুষের মিছিল বের হয়েছে। শরণ খোলা থানার খাওলিয়া ইউনিয়নে দেখা যায় যে, কোন কোন বাড়ীতে আগে যেখানে ছয় সাতজন মানুষ ছিলো সেখানে খাদ্যাভাব ও মহামারীতে চার পাঁচ জনই মারা গেছে।

বাকী দুই একজন কোন রকমে টিকে আছে। মৃতদেহ সৎকার করার মতো লোকও এলাকায় তেমন নেই।

এই সমস্ত অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষকরা স্থানীয় মহাজন, তালুকদার, জোতদার প্রভৃতিদের জমিতে চাষ করে এক-চতুর্থাংশ মজুরী হিসেবে পেতো। তার দ্বারাই তারা সারা বৎসরের ভরণ-পোষণ চালাতো। কিন্তু এ সময় মহাজনেরা আর কোন লোক খাটাতে পারে না। এই সবের ফলে বাগেরহাট শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অসংখ্য ভিক্ষুক ও বেকার মানুষের ভীড় দেখা যাচ্ছে।

কৃষি কার্যের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্টটিতে বলা হয় যে, গো মড়কে এইসব এলাকার অধিকাংশ কৃষকের গরু বাছুর প্রায় শেষ হয়ে গেছে। গরু খরিদ করার জন্যে কোন কোন এলাকায় সরকার থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই ঋণ প্রয়োজনের তুলনায় এতো অল্প যে একজন গৃহস্থের পক্ষে সেই টাকা দিয়ে গরু তো দূরের কথা একটা ছাগল পর্যন্ত কেনা সম্ভব নয়। মোট কথা নানা কারণে এই খাদ্য সঙ্কটগ্রস্থ এলাকাগুলিতে এ বৎসর কৃষকদের পক্ষে সমস্ত জমি চাষ করা কোন মতেই সম্ভব নয়।

সরকারী খাদ্যনীতি সম্পর্কে এতে বলা হয় যে, এই সমস্ত এলাকায় সরকার রীতিমতো ব্যবসা আরম্ভ করেছে। পৌষ মাসে ধান সংগ্রহের সময় সরকার ৫।৬ টাকা মণ দরে কৃষকদের থেকে ধান কিনে সেই ধান এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে কৃষকদের দুর্দিনে তাদের কাছে ১১।১২ টাকায় বিক্রির জন্যে পাঠাচ্ছে। কিন্তু এত উচ্চহারে ধান কেনার ক্ষমতা এই এলাকায় কৃষক অথবা নিম্ন মধ্যবিত্তের নেই।

খুলনা, যশোর ও ফরিদপুরের বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় সাহায্যের জন্যে তমদ্দুন মজলিশ ২৯শে মে 'দুর্গত এলাকা দিবস' পালন করে। সেদিন মজলিস কর্মীরা ঢাকার রাস্তায় গান গেয়ে দুর্গত এলাকার জন্যে সাহায্য সংগ্রহ করেছিলেন। সেইভাবে সংগৃহীত অর্থ এবং অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে তমদ্দুন মজলিসের কয়েকজন কর্মী দুর্গত এলাকায় সাহায্যের জন্যে যান এবং খুলনার অবস্থা সম্পর্কে একটা বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এ. আই. আরা কর্তৃক লিখিত এই রিপোর্টের কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করা গেলো:

আমরা পাইকগাছা পৌঁছেই যে দৃশ্য প্রথমে দেখলাম সেটি হলো এই: একটি মেয়েছেলে, পরণে তার ছেঁড়া মশারীর এক টুকরো।

বুকে ছোট শিশু, কম্পিত গলায় হাত বাড়িয়ে বল্লে, "বাবা একটু খেতে দেবে?" বিজলীর চমকের মত সমস্ত শরীর শিহরে উঠলো; এই নগ্ন দৃশ্য যেন আর কোথায় দেখেছি? এই কম্পিত গলার আওয়াজ আরো যেন কোথায় শুনেছি? সমস্ত দেহ অবশ হয়ে এলো '৫০' সালে * মর্মান্তিক দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলো—প্রশ্ন মনে জাগলো—আবার সেই কলঙ্কিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে কি? নদী পার হয়ে এগিয়ে চললাম—গ্রামের পর গ্রাম দেখে মনে হতে লাগলো যেন প্রাণ শূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে সব। একটি গ্রামের পাশে এসে দাঁড়ালাম—দেখে মনে হলো জন-শূন্য। আমাদের সাথী স্থানীয় একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলাম এই গ্রামে কি লোকজন নেই? সে বল্লে, "এ গ্রামের পুরুষরা এক মুঠো চালের আশায় সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ছেলেমেয়েরা কাপড়ের অভাবে বাইরে বেরোতে পাচ্ছে না।" হয়ত বা তারা কয়দিন ধরে উপবাসী কথা বলবার শক্তিটুকু তাদের মাঝে আর বাকী নেই। নস্কর গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ জীর্ণ একটি দীর্ণ কুঁড়ে ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম আজ ২ দিন ধরে তারা উপবাসী, ঘরে এক কণা চাল নেই—ছেলেদের পিতা কলেরায় আক্রান্ত। ওষুধ কেনা বা ডাক্তার দেখার মত একটি পয়সাও তাদের কাছে নেই। সেই বাড়ীর একটি ছেলে (দশ এগারো বছর বয়স হবে) জানালো তার বাবা দুদিন বিনা-মূল্যে চাল বিতরণ কেন্দ্র থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে। বাগ্দিকাটি গ্রামে গিয়ে খবর পেলাম গত মাসের তেইশ তারিখে সোনা-গাজির মা ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যা করেছে। বিভিন্ন সূত্রে খবর পেলাম সারা দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে এরূপ হৃদয় বিদারক কাণ্ড প্রায় ঘটছে……

ক্ষুধার তাড়নায় প্রত্যহ কয়েকশত লোক তাদের জমি মহাজনের কাছে বন্ধক দিচ্ছে। যেখানে দলিল লেখা হচ্ছে ৫।৬ শ সেখানে তারা পাচ্ছে মাত্র পঁচিশ টাকা। চাষীদের শেষ সম্বল এক টুকরো জমিও আজ মহাজনের করতলগত হয়ে যাচ্ছে। সুতারখানি ইউনিয়নের ফকির সর্দারের একই অবস্থা। সাব রেজিষ্ট্রারের অফিসের সামনে

---

* বাংলা ১৩৫০ অর্থাৎ ১৯৪৩ সাল

জমাজব ভিড়। আমরা সাব রেজিষ্ট্রারের অফিসে গিয়ে অনেকগুলি দলিল নিজেরা পড়ে দেখলাম। তাতে জমি সরাসরি বিক্রির কথা লেখা রয়েছে—বন্ধক অথবা ফেরত দেবার কোন কথাই তাতে উল্লেখ নেই। খোঁজ নিয়ে জানলাম দরিদ্র অসহায় কৃষকদের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে মহাজনেরা ফেরত দেবার প্রশ্নটা মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষান্ত হয়ে রয়েছে—দলিলে তার বিন্দুমাত্রও উল্লেখ নেই। আমরা রেজিষ্ট্রারি অফিসের বাইরে এসে চাষীদের সাথে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম এবং বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে যখন এক এক জন তাদের ওপর মহাজন, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, মাতব্বর প্রভৃতির অত্যাচার ও নিজেদের দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করতে করতে আমাদের সাথে সাথে এগুচ্ছিলো, তখন এই অর্দ্ধউলঙ্গ বুভুক্ষ গরীব চাষী মজুরদের দেখে মনে হচ্ছিল এ যেন ভুখা জনগণের মিছিল……

আমাদের সরকার জোর গলায় প্রচার করছেন অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্থানে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হবে। সেই সাথে আমরা দেখছি প্রত্যহ খুলনার হাজার হাজার চাষী ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হচ্ছে। আর মহাজনেরা রাতারাত্রি নাম মাত্র মূল্যে জমি কিনে বিরাট বিরাট জমিদার হয়ে যাচ্ছে। পাইকগাছা বাজারের উপর অবস্থিত কয়েকটি এলাকার মধ্যে সাব রেজিষ্ট্রারী অফিসে এইরূপ দলিলের সংখ্যা হল ১৯৫০ সালের জানুয়ারীতে ১০৫টি, ৫১ সালের জানুয়ারীতে ৫৪৭টি, দিন দিন এ সংখ্যা আরও বেড়ে যাচ্ছে। '৫০ মে'তে হয়েছিলো ৩৪৭টি আর ৫১ সালের মে মাসে হয় ১৩৪১টি। ৫০ সালের জুন মাসে হয়েছে ৬৪২টি আর ৫১ সালের ২৬ তাং বেলা চার'টা পর্যন্ত হয় ১৬১৯টি। মহাজনরা বন্ধক দেওয়ার ভাঁওতা দিয়ে এই সব জমি সরাসরি কিনে নিচ্ছে। সেখানে মহাজনরা যাদের কাছে থেকে জমি কিনেছে তাদের আবার দিনমজুর হিসেবে নিয়োগ করছে—অনেকে আবার তাও করছে না।

কিন্তু শুধু খুলনা নয়। পূর্ব বাঙলার অন্যান্য জেলাতেও এই সময় খাদ্য সংকটের তীব্রতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্থান যুব লীগের কার্য্যকরী সংসদের সদস্য মোহাম্মদ আবদুস সামাদ কর্ত্তৃক নওবেলাল সম্পাদকের কাছে লেখা একটা চিঠিতে এই সময় সিলেট জেলার দিরাই ও

জগন্নাথপুর থানার খাদ্য সংকট সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।[১০] প্রথম দিকে অনাবৃষ্টিতে এই অঞ্চলের উঁচু জমিগুলির ফসল নষ্ট হয়। তারপর বৈশাখের পূর্বে শিলাবৃষ্টিতে পাকা ধান অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হয়। তারপরও যা কিছু অবশিষ্ট ছিলো বন্যার পানিতে তাও নষ্ট করে দেয়। এ সবের পর মহাজনের নির্যাতন। যারা কিছু ধান ঘরে তুলেছিলো তাদের ভাঁড়ার এই মহাজনেরা শূন্য করে দিলো। এই অঞ্চলের দুর্দশা সত্ত্বেও সরকারী সাহায্যের কোন চিহ্ন মাত্র সেখানে অনুপস্থিত। জগন্নাথ-পুর এবং সেই সাথে ছাতকের অবস্থা এরপর আরও অবনতি ঘটে। ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫১, তারিখে নওবেলালে জগন্নাথপুরের ৩৫ ব্যক্তি একটি চিঠিতে এই অঞ্চলের দুর্দশার একটা বর্ণনা দেন। ছাতক সম্পর্কেও একটি রিপোর্ট ঐ তারিখেই নওবেলালে প্রকাশিত হয়।

সুনামগঞ্জের বুরো অঞ্চলেও শিলাবৃষ্টির ফলে ব্যাপকভাবে ফসলের ক্ষয় ক্ষতি হয় এবং সেখানে নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এই অবস্থায় সরকার এই মহকুমার বর্ডার অঞ্চল ছাতক থেকে শুরু করে মহিসখোলা পর্যন্ত ভারতীয় বর্ডার থেকে পাঁচ মাইল ভিতরের এলাকাকে রেশনিং এলাকা বলে ঘোষণা করেন। এই এলাকার অধিবাসীদিগকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা এই পাঁচ মাইলের বাইরে ধান কিংবা চাল নিয়ে যেতে পারবে না। এই পাঁচ মাইল এলাকার ভেতরের বাজারেও ৫ সের চাল ও ১০ সের ধান এর বেশী নেওয়া চলবে না। এই এলাকার উদ্বৃত্ত ধান সরকার ৮ টাকা মণ দরে ক্রয় করবেন এবং যাদের খোরাকীর অভাব ঘটবে তাদেরকে সেই ধান ১০ টাকা মণ দরে বিক্রি করবেন। এই সরকারী খাদ্য নীতির ফলে কৃষকেরা নিজেদের ক্ষতির পরিমাণের দিকে তাকিয়ে সরকারের কাছে ধান বিক্রির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। এবং উচ্চতর মূল্যে সেই ধান বিক্রির ব্যবস্থা করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোরাকারবারী, স্থানীয় মাতব্বর, আনসার এবং বর্ডার সিপাইদের খপ্পরে পড়ে।[১১]

১৯৫১ সালের শেষ দিকে খুলনার বিভিন্ন এলাকার অবস্থার কোন উন্নতি না ঘটে বরং আরও অবনতি ঘটে। এর ফলে সরকার তাদের পূর্ববর্তী ঔদাসীন্য কাটিয়ে খাদ্য সংকটকে স্বীকার করে সেই সংকট নিরসনের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দান করে এবং উদ্যোগ নেয়। ৮ই নভেম্বর ফজলুল হক খুলনা ও বরিশালের দুর্ভিক্ষ ও বন্যা-

পীড়িত জনগণের সাহায্যের জন্যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে আবেদন জানান[১২] এর মাত্র কয়েক দিন পর ১৩ই নভেম্বর তিনি আবার বিশেষ ভাবে খুলনার দুস্থদের জন্যে একটা পৃথক আবেদন প্রচার করেন।[১৩] ১১ই নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় খুলনার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঁচ কোটি টাকার সাহায্য দাবী করা হয়।[১৪] এর পর ঢাকায় খুলনার জন্যে অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহ শুরু হয় এবং ঢাকার নাগরিকেরা অনেকেই তাতে সহযোগিতা করেন।[১৫]

এই সময় সমগ্র খাদ্য পরিস্থিতি, বিশেষতঃ খুলনার পরিস্থিতি, সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে নানা ধরণের ভয়াবহ রিপোর্ট প্রকাশিত হতে থাকলেও পূর্ব বাঙলার সাহায্য মন্ত্রী মফিজউদ্দীন ১৮ই নভেম্বর করাচীতে বলেন যে, খুলনা জেলার অনাহারে কেউ মারা যায় নাই। যারা মারা গেছে তাদের মৃত্যুর কারণ পুষ্টির অভাব।[১৬]

সাহায্য মন্ত্রীর এই বক্তব্যের সাথে সঙ্গতি রেখে পূর্ব বাঙলা সরকার ২৭শে নভেম্বর, ১৯৫১, তারিখে খুলনা ও বরিশাল সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রেস নোট জারী করেন।

> সম্প্রতি কয়েকদিন সংবাদপত্রে এই রূপ প্রকাশিত হইয়াছে যে খুলনা ও বরিশাল জেলায় অনশনে লোকের মৃত্যু হইতেছে। এই দুইটি জেলার বন্যা পীড়িত এলাকায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ এই পর্যন্ত যত-টুকু তদন্ত করিয়াছেন এবং সরকারের নিকট তাঁহারা এই সম্পর্কে যে সমস্ত রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, এই সকল সং-বাদের মধ্যে কোন সত্যতা নাই এবং অনশনে কাহারও মৃত্যু হয় নাই। খুলনা জেলায় কোন ক্ষেত্রে হয়ত অপুষ্টিই এই মৃত্যুর কারণ, অবশ্য অন্যান্য কারণও থাকিতে পারে, কিন্তু অনশনে মৃত্যুর সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রাদেশিক সাহায্য সচিব নিজে খুলনা জেলা সফর করিয়া আসিয়া এই সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন।

১৩
লবণ সংকট

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পূর্ব বাঙলায় লবণ সংকট একটা চরম আকার ধারণ করে। এই সংকটকালে লবণের দর ক্রমাগত ওপরের

চিন্তার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রভাব বিস্তার করে। চিন্তার কাঠামোকেও তা অনেকাংশে নির্ধারণ করে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বন্ধ্যাত্বের জন্তে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ভারতে এবং বিশেষতঃ বাঙলাদেশে যত বিচিত্র পথগামী হয়, অন্তত্র তা হতে দেখা যায় নি। এদিক দিয়েও এদেশীয় সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস গুরুতর পর্যালোচনার যোগ্য।

কিন্তু অন্ত আর এক কারণেও এই সন্ত্রাসবাদের গুরুত্ব আমাদের দেশে খুব বেশী। সে কারণটি হলো এই যে, এই সন্ত্রাসবাদের মধ্যে থেকেই ভারতীয় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 'জন্ম এবং সন্ত্রাসবাদীদের হাতেই তার প্রাথমিক ভিত্তি রচিত। অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে সন্ত্রাস বাদীদের কিছু কিছু গৌণ প্রভাব থাকে কিন্তু ভারতে ও বাঙলাদেশে সন্ত্রাসবাদীরাই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের জন্ম দেন এবং তার প্রাথমিক বিকাশ ঘটান।

পৃথিবীর সব দেশেই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পূর্ববর্ত্তী পর্যায়ে মধ্যশ্রেণীর যুবকদের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের একটা অস্তিত্ব দেখা যায়। এবং সেই হিসেবে কমিউনিষ্ট আন্দোলন ঐতিহাসিকভাবেই হয় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পরবর্ত্তী পর্যায়। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও কমিউনিষ্ট আন্দোলন ঐতিহাসিকভাবে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিরই পরবর্ত্তী পর্যায়। কিন্তু তবু এক্ষেত্রে একদিক দিয়ে অন্যান্য দেশের পরিস্থিতির সাথে আমাদের দেশের পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। অন্যান্য দেশে (উদাহরণ স্বরূপ রাশিয়া ও চীনে) কমিউনিষ্ট আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পরবর্ত্তী পর্যায় হলেও সন্ত্রাসবাদীরা সেখানে প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের জন্মদান অথবা বিকাশ ঘটান কোনটিই করেননি। কিন্তু এদেশে ঠিক তাই হয়েছিলো। বর্তমান শতকের তিরিশের দশকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তার শেষ সীমায় উপনীত হওয়ার পর সন্ত্রাসবাদীরা দলে দলে মার্কসবাদে দীক্ষিত হন এবং কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যোগদান করেন। এই প্রক্রিয়া পূর্বেই শুরু হয়ে তিরিশের দশকে একটা পরিণতি লাভ করে। অল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা সকলেই কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যোগদান করেন এবং গণ আন্দোলণ থেকে বেরিয়ে আসা মার্কসবাদীদের

থেকে সংখ্যা ও প্রভাবের দিক দিয়ে তাঁরা প্রথম থেকেই প্রাধান্যে আসেন। এই কারণেই মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, ষ্ট্যালিন, মাও সেতুঙ প্রভৃতি পাঠ এবং অনুশীলন সত্বেও ভারতীয় সন্ত্রাসবাদের এবং সেই সাথে ভারতীয় 'জাতীয়তাবাদের' বিশিষ্ট ঐতিহ্যিক লক্ষণগুলি (এমনকি আপোষমুখীতা পর্যন্ত) থেকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে কোন দিনই মুক্তি হতে পারেননি। এই লক্ষণগুলির মধ্যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন চিন্তা (জনগণের প্রতি যথোপযুক্ত আস্থার অভাব) এবং সাম্প্রদায়িক কাঠামোর মধ্যে চিন্তা এই উভয়ই হলো প্রধান লক্ষণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

বাঙলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার (পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের) সর্বত্র কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ঐতিহ্য কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তার পর্যালোচনা তো আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে হয়ইনি, উপরন্তু তার প্রচেষ্টা পর্যন্ত কেউ করেন নি। কিন্তু বর্তমান বাঙলাদেশ এবং ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসের দিকে, বিশেষতঃ ১৯৪৭ সালের পরবর্ত্তী ইতিহাসের দিক তাকালে মনে হয়, উপরোক্ত দুই কুপ্রভাব স্থূলভাবে না হলেও অতি সূক্ষ্মভাবে কি পরিমাণে কমিউনিষ্ট আন্দোলনে অবক্ষয় সৃষ্টি করে বারবার তাকে বিভ্রান্ত করছে তার একটা হিসেব সেই পর্যালোচনার মধ্যেই পাওয়া যাবে।

কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদ, বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক প্রভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করতে অনেকে কুণ্ঠিত হবেন এবং সে বিষয়ের উল্লেখের জন্য অনেকে বিক্ষুব্ধ এবং ক্রোধান্বিত হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের কতকগুলি মূল সমস্যার পর্যালোচনা ও চরিত্র উপলব্ধি এই পর্যালোচনা ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নয়। সততা ও সাহসিকতার সাথে এই আত্মসমালোচনামূলক পর্যালোচনায় এগিয়ে আসতে কমিউনিষ্টরা যতদিন বিলম্ব করবেন ততদিন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিন্তার অভ্যাস তাঁদের দূরীভূত হবে না এবং সাম্প্রদায়িকতা কত সূক্ষ্মভাবে, অচেতন ও আধা সচেতনভাবে, এদেশের প্রগতিশীল কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে ভেতর থেকে ছুরিকাঘাত করছে সেটাও তাঁরা

যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন না। *

চব্বিশ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ সম্পর্কে এই আলোচনা আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে করি নাই। সামন্তবাদ, দেশীয় মুৎসুদ্দী পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে নানান ভুলভ্রান্তি ও বিচ্যুতির সাথে এই আলোচ্য বিষয় যদি সম্পর্কহীন হতো তাহলে এই সমালোচনাকে বিশুদ্ধ জ্ঞানান্বেষণের পর্যায়েই ফেলা যেতো। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে এই আলোচনা বর্ত্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোটেই অবান্তর অথবা অপ্রাসঙ্গিক নয়, উপরন্তু অতিশয় সম্পর্কিত এবং প্রাসঙ্গিক।

ইংরেজ শাসন ও চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার মধ্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, সেই আন্দোলন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সমাজ সংস্কার আন্দো-

---

* "আনন্দমঠে যে বিষবৃক্ষের বীজ, রামরাজ্যবাদী গান্ধিজীর সমধর্মী আন্দোলনের (পাকিস্তান আন্দোলনের—ব. উ.) মাধ্যমে তার পরিণতি ঘটে দেশ বিভাগে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দিকের নারী চরিত্রে সামাজিক বিদ্রোহের আভাস আছে; কিন্তু আনন্দমঠের পর তাঁর রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক কাহিনীগুলিতে যে-সব বীরাঙ্গনার আবির্ভাব ঘটে তাদের অনেকে অবাস্তব। তাদের ক্রিয়াকলাপ মাঝে মাঝে অত্যন্ত পুরুষোচিত, অতীব বীরত্বব্যঞ্জক। শক্তির ধারিকা এই নায়িকারা হিন্দী সিনেমার কথা মনে করিয়ে দেয়। যে বিভ্রান্ত রাজনীতি বন্দে মাতরম গানের পেছনে, যে মনোভাবের ফলে মাতৃমূর্ত্তির এত প্রচলন, সে রাজনীতি ও মনোভাব এখনো আমাদের মধ্যে বর্তমান বলে আজকাল রাস্তাঘাট বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে যখন-তখন মুখরিত হয় (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাঙলাদেশে এখনো আল্লাহু আকবর ধ্বনি অনেক "প্রগতিশীল" সংগঠনের মিটিং মিছিলে শোনা যায়-ব. উ.)। কিন্তু এই মাতা অবাস্তব। একদিকে ছিলো সতীদাহ, অন্যদিকে মা নিয়ে আবেগ। আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ সমালোচনা নকশাল পন্থীরা পর্যন্ত করেন নি।"

সমর সেন: বন্দে মাতরম। এক্ষণ: দশম বর্ষ ॥ ১-৩ সংখ্যা: শারদীয় ১৯৭৯। পৃষ্ঠা, ৩৫-৩৬

লনের মধ্যে একটা পরিণতি লাভ করে। কিন্তু সেই সাথে দেশীয় শিল্প বাণিজ্য ধ্বংসের মাধ্যমে এদেশীয় লোকদের জীবন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বেড়াজালের মধ্যে অধিকতরভাবে আটকা পড়ে। এই বেড়াজালই উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে সংস্কারবিরোধী সামাজিক রক্ষণশীলতা ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদত্ব উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে বাড়িয়ে তোলে এবং পরবর্তী পর্যায়ের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নানা প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা দ্বারা আচ্ছন্ন করে।

এই জাতীয়তাবাদী চিন্তার সীমাবদ্ধতা থেকেই জন্মলাভ করে জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন।* পরবর্তী পর্যায়ে কংগ্রেস মার্কা জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বিকাশের কোন সুযোগ না পেয়ে এই আন্দোলন কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে বিলুপ্ত হয় এবং সন্ত্রাসবাদীরা মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পতাকা হাতে নেন। এই ভাবে উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণীর সীমাবদ্ধ অবস্থান থেকে যে সামাজিক আন্দোলন সমূহের সূত্রপাত ঘটে, সেগুলি বাঙলাদেশ ও ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে নানা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে রূপান্তরিত হতে হতে পরিশেষে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়।

এই লয় প্রাপ্তির জন্যেই উনিশ শতকের বাঙলাদেশের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর প্রগতিশীলতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ সম্পর্কে আলোচনা বিশ শতকের সত্তরের দশকে এ দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও অপ্রাসঙ্গিক নয়, উপরন্তু অতিশয় আবশ্যকীয়।

* বিশ শতকের প্রারম্ভে এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী চিন্তা কিয়দাংশে বিবেকানন্দকেও মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু 'মুচি, মেথর, ডোম' ইত্যাদিকে জাতভাই বলে উচ্ছাস প্রকাশ করলেও বিবেকানন্দ পুরোপুরিভাবেই ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রেরই পথের পথিক। এদিক দিয়ে বিবেকানন্দের চিন্তা রামমোহন, বিদ্যাসাগরের চিন্তা থেকে অগ্রসর তো ছিলই না, উপরন্তু তা ছিলো বঙ্কিমী চিন্তারই পরবর্তী সংস্করণ।

পরিশিষ্ট

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

উনিশ শতকীয় বাঙলাদেশের রেনেসাঁস নামে পরিচিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিলো নগরকেন্দ্রিক এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উদ্ভূত ভূস্বামী শ্রেণী ছিলো তার মেরুদণ্ড। বাঙলাদেশের এই আন্দোলনের সাথে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের এখানেই হলো মৌলিক তফাৎ। কারণ ইউরোপীয় রেনেসাঁসের নেতা ছিলো ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণী এবং তার লক্ষ্য ছিলো সামন্ত প্রথা ও সামন্ত ভূমি-ব্যবস্থার উচ্ছেদ। পনেরো থেকে আঠারো শতকের মধ্যে এই ব্যবসায়ী-বুর্জোয়া শ্রেণী ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও সমাজকাঠামোর ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে তার ফলে সামন্ত ভূমি ব্যবস্থার উৎপীড়ন থেকে বৃহত্তর কৃষকসমাজ মুক্তিলাভ করে এবং ইউরোপে প্রগতিশীল ধনতন্ত্রের জয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

উনিশ শতকীয় বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্রগত প্রভেদই উপরোক্ত দুই সাংস্কৃতিক নবজাগরণের মধ্যে এই পার্থক্য সৃষ্টির জন্যে দায়ী। ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণী পনেরো শতকের প্রথম দিকেই একটি নোতুন ও স্বাধীন শ্রেণীরূপে জন্মলাভ করে। এর পর তিন-চার শতক ধরে নব নব রূপে বিকাশ লাভ করে নিজের এই যাত্রা পথে সমগ্র সমাজ কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এই বুর্জোয়াশ্রেণী ইউরোপীয় সমাজের পরিপূর্ণ রূপান্তর ঘটায়। কিন্তু বাঙলাদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর মূল ভিত্তি ব্যবসা বাণিজ্য অথবা শিল্পকার্য ছিলো না। তার মূলভিত্তি ছিলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত ভূমি-ব্যবস্থা। এজন্যেই উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্ত বাঙালীর নবজাগরণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নি। অনেকে সেই বন্দোবস্তের কঠোর সমালোচনা করলেও তার উচ্ছেদের প্রশ্নে তাঁরা মোটামুটিভাবে নীরব থেকেছেন। প্রচলিত সামন্ত ব্যবস্থার প্রতি এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই বাঙলার নবজাগরণ সমগ্র বাঙালী-সমাজে, এমনকি মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেও কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি।

ইংরেজ সৃষ্ট সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে সারা উনিশ শতক ধরে সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিলো বন্দী দশাপ্রাপ্ত।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস আন্দোলন সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে স্থাপিত হওয়ার জন্যে তা গ্রামাঞ্চল এবং কৃষক সমাজকেও বিপুলভাবে নাড়া দেয়। সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন তাদের জীবনের মধ্যেও আনে বিপুল উদ্দীপনা। কিন্তু বাঙলাদেশের উনিশ শতকীয় নবজাগরণ বাঙলার কৃষক সমাজকে স্পর্শই করেনি, প্রায় সর্বতোভাবে তা কলকাতা এবং আরো কয়েকটি শহরকে কেন্দ্র করেই বিকাশ লাভ করেছে। রামমোহনের সতীদাহ প্রথা নিবারণ অন্দোলন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা-বিবাহের আন্দোলন এদিক দিয়ে সামান্য ব্যতিক্রম হলেও তা গ্রাম-বাঙলার জীবনে রেনেসাঁসের মতো কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেনি।

দুই

উনিশ শতকের বাঙলায় যে সাংস্কৃতিক ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন হয়েছিলো সেটা অবশ্য কোন সরলরেখা ধরে অগ্রসর হয় নি। তৎকালীন বাঙালী সমাজের শ্রেণী বিন্যাস এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘাতের ফলে রেনেসাঁস নামে কথিত এই সাংস্কৃতিক ও সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের যথেষ্ট প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতার উল্লেখ এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ এই বিরোধ শুধুমাত্র ব্যক্তির বিরোধ নয়। এই বিরোধ ছিলো উনিশ শতকের বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুই অংশের বিরোধ। এর এক অংশ ছিলো পুরোপুরিভাবে সামন্ততন্ত্রের এবং সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের রক্ষক এবং অন্য অংশ সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার উচ্ছেদকামী না হলেও ইউরোপীয় চিন্তাভাবনার প্রভাবে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তাকে অনেকাংশে সামন্ত প্রভাবমুক্ত করতে উদ্যোগী। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রথম অংশের নেতা। ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয় দত্ত ছিলেন দ্বিতীয় অংশের নেতা।

উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল অংশ অন্ত অংশের মতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপুষ্ট হলেও ইউরোপীয় শিক্ষা এবং উদারনৈতিক চিন্তাধারা তাদেরকে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে অনেকখানি সচেতন ও সক্রিয় করে তোলে। সমাজের নানা কুসংস্কার এবং রক্ষণশীল রীতি-নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা শুরু করেন তাঁদের সংগ্রাম ও সংস্কার আন্দোলন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দার্শনিক ও শিক্ষাচিন্তা এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের আন্দোলন হলো তারই সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

সমগ্র বাঙালী হিন্দু সমাজে যখন ধর্মের জোয়ার বইছে, ধর্মচিন্তাকে নানাভাবে সংস্কার করে বেদ বেদান্ত নোতুন ভাবে ব্যাখ্যা ও বিচার প্রচেষ্টা চলছে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন বেদান্তের অসারত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। শুধু তাই নয়, ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে বার্কলের মতো ভাববাদীদের প্রভাব থেকে বাঙালী শিক্ষিত যুবসমাজকে রক্ষা করতেও তিনি রীতিমতো ব্যগ্র। ব্যালান্টাইন হিন্দু কলেজের তৎকালীন ইউরোপীয় অধ্যক্ষের সাথে এ ব্যাপারে তাঁর বিতর্কই তাঁর এই ব্যগ্রতার পরিচয় প্রদান করে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিক্ষা এবং ইউরোপীয় উদারনীতিবাদকে বাঙালী সমাজের চিন্তাগত পশ্চাদপদত্ব এবং অন্তহীন কুসংস্কার দূরীকরণের একটা নিশ্চিত ও উপযুক্ত প্রতিষেধক হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন এবং সে জন্যেই তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা ত' করেনই নি, উপরন্তু সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের দীর্ঘ জীবনই কামনা করেছিলেন। কোন প্রত্যক্ষ ভূমিস্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও এ'জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির মতো তিনিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উৎখাত কামনা করেন নি।

তবে এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে তাঁর একটা বড়ো পার্থক্যকেও উপেক্ষা করা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র যে শুধু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসৃষ্ট ভূমি ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার স্বার্থ ও সংস্কারের রক্ষক ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিক্রি-

য়ার সর্বপ্রধান প্রতিনিধি। সেজন্যে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত প্রভৃতির বিভিন্ন সংস্কার তৎকালীন বাঙালী সমাজের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো, সমাজের মৌলিক কাঠামোকে না হলেও তার উপরিভাগে যেভাবে আঘাত হেনেছিলো তার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন রীতিমতো সোচ্চার। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য প্রচেষ্টা একদিকে যেমন নিযুক্ত ছিলো কৃষক স্বার্থের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে তেমনি তা সমান নিষ্ঠার সাথে নিযুক্ত ছিলো ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র চিন্তা ও সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে। এ জন্যেই একদিকে তিনি যেমন লিখেছিলেন "বঙ্গদেশের কৃষক" তেমনি অন্যদিকে লিখেছিলেন "কৃষ্ণকান্তের উইল" এবং "বিষবৃক্ষ"।

তিন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ছিলো সর্বতোভাবে সংস্কারমুখী, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের নেতাদের মতো তাঁর চিন্তাধারা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও ভূমি-ব্যবস্থার উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিলো না। এজন্যেই তাঁর চিন্তার মধ্যে কোন বৈপ্লবিক সম্ভাবনাও থাকেনি। দীনবন্ধু মিত্র এবং 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক হরিশচন্দ্র যে ভাবে নির্যাতিত কৃষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র তা কোনদিন চিন্তাও করেননি। হিন্দু বিধবাদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে তাঁর হৃদয় বিচলিত হলেও দরিদ্র কৃষকদের ওপর নীলকরদের নির্যাতন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হাজারো অত্যাচার তাঁর মনকে বিন্দুমাত্র আলোড়িত করেনি। তাই বিধবা-বিবাহের সংস্কার আন্দোলনে তিনি প্রচুর অর্থ ও শক্তি ব্যয় করলেও নিজের কথা, লেখা ও কর্মের মাধ্যমে বৃহত্তর কৃষক সমাজের সুখ দুঃখের প্রতি তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন।

কিন্তু এদিক দিয়ে আবার ঈশ্বরচন্দ্র কোন ব্যতিক্রম ছিলেন না। উনিশ শতকের বাঙালী মধ্যবিত্তের স্বার্থ সাধারণভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপরই ছিলো প্রতিষ্ঠিত এবং তার প্রভাবে সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীই কৃষক স্বার্থের প্রতি শুধু উদাসীনই ছিলো না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

ছিলো শত্রুভাবাপন্ন। অর্থাৎ তারা ছিলো দরিদ্র কৃষকদের শ্রেণীশত্রু। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ঈশ্বরচন্দ্র কৃষক স্বার্থের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন বক্তব্য উপস্থিত না করলেও তার প্রতি ঔদাসীন্যই তাঁর চিন্তার একটা বিশেষ পরিধি নির্দিষ্ট করে। এবং এই পরিধিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূল্যায়নে সঠিকভাবে বিচার ও বিবেচনা করা প্রগতিশীল চিন্তার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে

'পরিচয়'-এর ১৩৭৯ শারদীয় সংখ্যায় প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য লিখিত "বিদ্যাসাগর, বাঙলার কৃষক এবং মার্কসবাদ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়লাম। তাতে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগর' নামক সংকলনে আমার একটি প্রবন্ধের কিছু সমালোচনা উপস্থিত করা হয়েছে। এই সমালোচনাকে আমি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর মনে করি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে কৃষকদের সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না সেটা প্রদ্যুম্নবাবু কতকগুলি বিচিত্র উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এক জায়গায় তিনি বলছেন যে বিদ্যাসাগরের সাথে ভদ্রলোকদের বিচ্ছেদ ঘটেছিল, যে কারণে তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের মত ভদ্রবেশধারী আর্য সন্তান অপেক্ষা আমার অসভ্য সাঁওতাল ভালো লোক।" বিদ্যাসাগরের এই উক্তি যে আমার জানা ছিল না, তা নয়। কিন্তু এই ধরনের উদ্ধৃতির মাধ্যমে ঈশ্বরচন্দ্রের কৃষকপ্রীতি প্রমাণের চেষ্টাকে অপচেষ্টা মনে করেই তার কোন উল্লেখ করা আমি প্রয়োজন বোধ করিনি।

সামন্ত-বুর্জোয়া সমাজ "তুমি একটা চাষা", "তোমার চেয়ে একটা চাষাও ভালো" অথবা "তুমি চাষার থেকেও অধম" এই ধরনের উক্তি হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু এর দ্বারা চাষীর প্রতি কোন ব্যক্তির শ্রদ্ধা, প্রীতি অথবা সহানুভূতি প্রকাশ পায়না। উপরন্তু তার থেকে এটাই মনে হয় যে, তার মতে চাষী নিকৃষ্ট ধরনের মানুষ। কাজেই তিনি যাকে ভর্ৎসনা করছেন সে কতখানি নীচে নেমে গেছে সেটা বোঝানোর জন্যেই তার সাথে চাষীর তুলনা।

উনিশ শতকের ভদ্রবেশী আর্য সন্তানেরা ঈশ্বরচন্দ্রের মতো মানুষকে যে ভাবে উত্যক্ত করেছিল তাঁর ফলে তাদের প্রতি তার এই উক্তি খুব স্বাভাবিক ছিল। এই উক্তিতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাঁওতালদের উল্লেখ

থাকলেও এর মাধ্যমে সাঁওতাল প্রীতি অপেক্ষা "ভদ্রবেশী আর্য সন্তানদের" প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণাই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কাজেই বিদ্যাসাগরের এই উক্তিকে তার কৃষক প্রীতির উদাহরণ হিসেবে হাজির করার অর্থ বিদ্যাসাগর চরিত্রকে বিকৃত করারই নামান্তর মাত্র। এর দ্বারা সত্য অর্থে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র যে খর্ব ও বিকৃত করা হচ্ছে সেটা উপলব্ধি না করাটা কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপুষ্ট মধ্যবিত্ত সুলভ নয়?

প্রবন্ধটিতে অবশ্য কৃষকদের প্রতি বিদ্যাসাগরের ভালোবাসার অন্য কতকগুলি উদাহরণও আছে। সেগুলি হল ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ড, ১৮৬৯ সালে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া মহামারী শুরু হলে হিন্দু-মুসলমান চাষীদের মধ্যে তাঁর সেবাকর্ম এবং সাঁওতালদের সাথে তাঁর সহজ আত্মীয়তা। এসব ঘটনাও আমার অজানা নয়। কিন্তু এই ঘটনাসমূহ জানা সত্ত্বেও "বেয়াড়া তথ্যের ওপর ধামা চাপা দিয়ে ঝোঁকের মাথায় তাত্ত্বিক ছক বানানোর মধ্যবিত্ত রোগ" দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আমি যে সেগুলির উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি তা নয়। এই সব উদাহরণ আমি উল্লেখ করিনি এ জন্যে যে, আমার বক্তব্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের উদাহরণ অপ্রাসঙ্গিক।

প্রদ্যুম্ন বাবু তাঁর প্রবন্ধটির মাধ্যমে কৃষক সমাজের সাথে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে বিষয়টিকে আমার আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে যে ভাবে উপস্থিত করেছেন তাতে মনে হয়, আমি বিদ্যাসাগরকে কৃষক সমাজের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছি। এজন্যেই তিনি ওপরের কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করে আমার বক্তব্য যে কতখানি 'তথ্যহীন' সেটা দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন।

কৃষক সমাজের সাথে বিদ্যাসাগরের ওপরে উল্লিখিত সম্পর্ক যে শুধু মাত্র সত্য তাই নয়। তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাঁর মানবিকতা, হৃদয়ের ঔদার্য এত বিশাল ছিল যে তা কোনদিনই বিধবাদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলো না। মাইকেল মধুসূদনের মতো প্রতিভাধর ব্যক্তি থেকে শুরু করে শহরের হিন্দু মুসলমান দীন দুঃখী দরিদ্র, গ্রামের দরিদ্র, আদিবাসী সাঁওতাল কেউই তাঁর সেই বিশাল

ঔদার্যের আওতা বহির্ভূত ছিল না। এজন্যেই তিনি ছুটে গিয়েছিলেন ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ পীড়িতদেরকে সাহায্য করতে, ছুটে গিয়েছিলেন বর্ধমানে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে, গিয়েছিলেন সাঁওতালদের মধ্যে।

কিন্তু গ্রামের গরীবদের কাছে এই ভাবে ছুটে যাওয়া, তাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করার এই প্রচেষ্টা এবং বিধবাদের দুঃখ লাঘবের সপক্ষে তাঁর আন্দোলন—এই দুই কি একই পর্যায়ের? এ দুইয়ের মধ্যে কি কোনো মৌলিক এবং গুরুতর পার্থক্য নেই? আছে, এবং তা হল এই যে, প্রথমটি নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক কৃষকদের দুঃখ লাঘবের জন্যে ব্যক্তি পর্যায়ের প্রচেষ্টা এবং দ্বিতীয়টি বিধবাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে না দেওয়ার সামাজিক ব্যবস্থা বা প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন।

ব্যক্তি পর্যায়ের দয়া দাক্ষিণ্য যদি অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত নাও হয় (এবং বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে তো তা ছিলই না) তাহলেও তার সামাজিক মূল্য নিতান্তই নগন্য। তাছাড়া এ ধরনের দয়া দাক্ষিণ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখানো হয় করুনার বশবর্তী হয়ে, কখনো বা পুণ্য অর্জনের অথবা সমাজ সেবক হিসেবে সুনাম অর্জনের জন্য। এর মাধ্যমে তাই 'বৃহত্তর' সমাজের ভিত্তি পরিবর্তনের কোনো প্রশ্ন তো থাকেই না, উপরন্তু সেই ভিত্তিভূমিকে যারা নানা ভাবে টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী তারাই এ ধরনের দয়া দাক্ষিণ্যের প্রতি মনোযোগী হয় বেশী। এই দান খয়রাত সামাজিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে পড়ে সেটা কি একজন মার্ক্সবাদীকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয়?

প্রদ্যুম্নবাবু ব্যক্তিগত পর্যায়ের কল্যাণকর কাজকর্ম কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ এলাকার ব্যক্তিদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্যে ব্যক্তিগত প্রতিকার এবং বৃহত্তর সমাজের দুঃখকষ্ট এবং শোষণের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিকার এবং তার পক্ষে আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্যকে উপলব্ধি করতে এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতার জন্যেই "বৃহত্তর কৃষক সমাজের সুখ দুঃখের প্রতি তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন"—আমার এই বক্তব্যকে খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত দয়া দাক্ষিণ্য ইত্যাদি অবতারনা করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনে কোনো অসাধুতা অথবা শঠতা ছিল না, তাই তিনি যখন কৃষকদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ অথবা মহামারীর সময় গিয়েছিলেন তখন তাদের সেবা করার সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলেন। কিন্তু এ ধরনের সেবার প্রয়োজন সমাজে যাই থাকুক বা এই ধরনের সেবা যিনি করেন তাঁর হৃদয়ের ঔদার্য যত বিশালই হোক, তার দ্বারা দুর্ভিক্ষ মহামারীর কোন স্থায়ী প্রতিকার সম্ভব নয়। কাজেই সেই স্থায়ী প্রতিকার করতে যাঁরা অগ্রসর হন তাঁরা প্রকৃত অর্থে বৃহত্তর সমাজের ব্যাপক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই তা করেন। এই দ্বিতীয় ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে প্রথমোক্ত ধরনের কর্মকাণ্ডের গুণগত পার্থক্য কি কোন মার্কস-বাদীকে বুঝিয়ে বলতে হবে ?

কৃষকদের এই বৃহত্তর 'বিদ্যাসাগরের উপর আমার আলোচিত প্রবন্ধটিতে 'বৃহত্তর' শব্দটি আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করেছি) স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা উনিশ শতকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যতীত কোনোক্রমেই সম্ভব ছিলো না। এবং এক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগরের ঔদাসীন্য উল্লেখযোগ্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা নিপীড়িত কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের চেষ্টা তিনি অনেক ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে করেছেন কিন্তু সেই দুঃখ কষ্টের মূল যে চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থা, যা বৃহত্তর কৃষক সমাজের দুঃখ দুর্দশার মূল কারণ তার উচ্ছেদের জন্যে তিনি কলম ধরেন নি, আন্দোলনে অবতীর্ণ হন নি, যেমনটি হয়েছিলেন বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে। এখানেই হরিশচন্দ্রের সাথে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটা গুরুতর পার্থক্য। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য নির্দেশ করতে যাওয়াকে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে 'রোগাক্রান্ত' আক্রমণ বলে বর্ণনা করার থেকে বিভ্রান্তিকর আর কি হতে পারে ?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে কৃষক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন একথা বোঝাতে গিয়ে প্রদ্যুম্নবাবু 'সাধারণী' 'সোমপ্রকাশ' এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এর উল্লেখ করেছেন। 'এগুলি এক এক করে বিচার করলেই ভাল হবে।

প্রথমেই 'সাধারণী'তে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক অংশটি বিচার করা যাক। এখানে বলা হচ্ছে যে, জমিদারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি সভা করবেন বলে "একবার জনরব উঠিয়াছিল"। প্রদ্যুম্নবাবু নিজেও প্রথমে খবরটিকে একটি 'গুজব' বলেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তারপর সেই

জনরবকে সত্য বলে ধরে নেওয়ার সপক্ষে যুক্তি স্বরূপ বলছেন যে, বিদ্যাসাগর তখন "প্রবল পরাক্রমে বিরাজ" করেছিলেন অথচ সেই সংবাদের কোনো প্রতিবাদ তিনি 'সাধারণীর' পাতায় করেন নি। কাজেই সেই 'জনরবকে' নেহাৎ ভিত্তিহীন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া অসমীচীন।

কেন অসমীচীন কেন? বিদ্যাসাগর এ ধরনের খবরের প্রতিবাদই বা করতে যাবেন কেন? এক জায়গায় প্রদ্যুম্নবাবু বিদ্যাসাগরের 'মেজাজ বা চারিত্রের" উল্লেখ করেছেন, আমিও এখানে তারই উল্লেখ করে বলতে চাই যে, বিদ্যাসাগরের মেজাজ এবং চারিত্র যা ছিল তাতে এই সংবাদের প্রতিবাদ করার কোনো প্রশ্ন তাঁর ছিল না।

তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদের জন্যে কোনো চিন্তাভাবনা অথবা আন্দোলন না করলেও কৃষকদের প্রতি তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শত্রুভাবাপন্ন তো ছিলেন না। তাছাড়া প্রতিবাদ করার অন্য কোনো কারণও তাঁর ছিল না। এ ধরনের খবরের প্রতিবাদ করে তারাই যারা সরকারের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। সরকারের কাছে গা বাঁচিয়ে চলা লোকেই এই ধরনের কাজ করতে অভ্যস্ত। বর্তমান কালেও এই ধরনের প্রতিবাদ আমরা হামেশাই দেখি। এই সংবাদ প্রকাশের সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজের চারিত্রের গুণে বলিয়ান হয়ে 'প্রবল পরাক্রমে বিরাজ' করছিলেন বলেই তো তিনি এর প্রতিবাদ করে সরকারের খয়েরখাঁগিরি করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এটাই তাঁর মৌনতার মূল কারণ হতে পারে না কি? আর একটি কথা। বিদ্যাসাগর যদি কৃষক সভা করবেন বলে সত্যসত্যই স্থির করতেন তাহলে তিনি তা করতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি।

কাজেই বিদ্যাসাগর 'সাধারণী'তে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করেন নি, এই অতি ক্ষীণ সূত্র ধরে উপরোক্ত জনরবকে সত্য বলে ধরে নেওয়া অসমীচীনের পরিবর্তে সমীচীন হবে কেন?

দ্বিতীয়ত, 'সোম প্রকাশ' সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য শ্রী বিনয় ঘোষ সম্পাদিত সাময়িক পত্রে বাঙলার সমাজ চিত্রের তৃতীয় খণ্ডে 'সোমপ্রকাশ-এর অনেক রচনা সংকলিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে 'সোম প্রকাশ' সংকলিত হয়েছে চতুর্থ খণ্ডে। এ ক্ষেত্রে তিনি বলছেন যে, বিদ্যাসাগর 'সোম প্রকাশ' সংকলিত পত্রিকার আদি পরিকল্পক এবং

এই দুর্ভিক্ষের কারণসমূহকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথমতঃ বাঙলাদেশের ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী ভূমি ব্যবস্থা।* দ্বিতীয়তঃ, বন্যা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি পানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সমস্যা। তৃতীয়তঃ, সরকারী নীতি এবং শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থা ও দুর্নীতি। ১৯৪৮–৪৯ এবং ১৯৫১ সালে পূর্ব বাঙলার খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষের কারণ আলোচনাকালে এই তৃতীয় কারণটির ওপরই এখানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, কারণ ভূমি ব্যবস্থা ও পানি নিয়ন্ত্রণ ঘটিত কারণে যে অবস্থার সৃষ্টি সে সময় হয়েছিলো সে অবস্থাকে সরকারী নীতি এবং বিবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতো। কিন্তু পাকিস্তান অথবা পূর্ব বাঙলা, কোন সরকারই সে দিকে উপযুক্ত সতর্ক দৃষ্টি না দেওয়ার ফলেই সংকট আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই সরকারী খাদ্য সংগ্রহ এবং আমদানী নীতির উল্লেখ করা চলে। বিভিন্ন মহল থেকে সরকারকে বারবার সতর্ক করা সত্বেও তাঁরা পূর্ব বাঙলার খাদ্য ঘাটতির সঠিক পরিমাণ নির্ণয়ের কোন চেষ্টা করেননি। তাছাড়া জরুরী অবস্থার মুখোমুখী হয়েও আভ্যন্তরীণ সংগ্রহের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে তাঁরা বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর গুরুত্বকে ভয়ানক লঘুভাবে দেখেন। এর মূল দায়িত্ব অবশ্য ছিলো কেন্দ্রীয় সরকারের, পূর্ব বাঙলা সরকারের নয়। পূর্ব বাঙলার প্রয়োজন কেন্দ্রের দ্বারা উপেক্ষিত হওয়ার ফলেই প্রয়োজনের তুলনায় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ায় অনেক অল্প।

আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিও সরকারী বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কর্মচারীদের দুর্নীতি, চোরাকারবারী ও ব্যবসায়ীদের সাথে তাদের যোগ-সাজশের ফলে তেমন কার্যকরী হয় নাই। উপরন্তু জোতদার শ্রেণীর লোকদের ধান চাল সংগ্রহের অপেক্ষা তারা গরীব ও মধ্য কৃষকদের থেকে জোরপূর্বক ধান আদায়ের চেষ্টা করে সংগ্রহের কর্মসূচীকেই অজনপ্রিয় করে তোলে। এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে কৃষকরা কোন কোন এলাকায় সংঘবদ্ধভাবে সরকারী খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেন।** এবং তার সুযোগ নিয়ে জোতদার শ্রেণীর লোকেরা সরকারকে

* দ্রষ্টব্য : বদরুদ্দীন উমর :—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক

** তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ফাঁকি দিয়ে চোরাকারবারীদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ধানচাল ভারতে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

অন্যদিকে কর্ডন এলাকা বহির্ভূত এলাকায় ব্যবসাদারদের হাতে ধান চাল ক্রয় বিক্রয়ের দায়িত্ব দেওয়ায় তারা খাদ্য মজুদ করার অবাধ সুযোগ পায় এবং ঘাটতি এলাকাগুলিতে ধান চালের দর ইচ্ছেমতোভাবে বৃদ্ধি করে।

সরকারী সংগ্রহ নীতির ব্যর্থতার আর একটি কারণ হলো লেভীকৃত ধানের নিম্নমূল্য নির্ধারণ। সাধারণভাবে ধানের এবং সামগ্রিক ভাবে অন্যান্য দ্রব্যের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির মুখে সরকার যে দরে উদ্বৃত্ত ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন তার ফলে, বিক্রেতারা নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এদের অধিকাংশই ছিলো অল্প জমির মালিক। এটাই হলো সরকারী খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রতি-রোধের সম্মুখীন হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া ক্রয় মূল্য কম হলেও সরকারী বিক্রয় মূল্য সেই তুলনায় অনেক বেশী হওয়ার ফলে এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। সরকার কর্তৃক ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্যের মধ্যে এই তারতম্য রাখার কারণ তাঁরা বেসামরিক সরবরাহ বিভাগকে একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করিয়ে তাকে আর্থিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার নীতি গ্রহণ করেন।

এইভাবে একদিকে আমদানীকৃত খাদ্যের অল্প পরিমাণ এবং আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতির আংশিক ব্যর্থতার ফলে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ সরকার কর্তৃক এ সময় সম্ভব হয় না। সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যথো-পযুক্ত যোগাযোগ রক্ষিত না হওয়া এবং চলাচল ব্যবস্থার অসন্তোষজনক অবস্থার জন্যে মওজুদকৃত খাদ্যশস্যও সময়মতো বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

দুর্ভিক্ষের মোকাবেলার ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো সরকারী উদ্যোগের সাথে জনগণের সম্পর্কহীনতা। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সরকার জনগণের ব্যাপক সহযোগিতা লাভের কোন চেষ্টা তো করেই নি উপরন্তু সরকারী দল মুসলিম লীগ সংগঠনের সাথেও এক্ষেত্রে তাদের কোন উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক এবং যোগাযোগ ছিল না। জনগণের সাথে এই বিচ্ছিন্নতা সামগ্রিক ভাবে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ।

১৪

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন

১৯৪৮–৪৯ এবং ১৯৫১ সালে পূর্ব বাঙলায় যে ব্যাপক খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা গেল সেই অবস্থাকে প্রতিরোধ করার জন্যে কোন সু-সংগঠিত আন্দোলন হয়নি। এদিক দিয়ে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের অবস্থার সাথে এই দুর্ভিক্ষের অবস্থার একটা মস্ত তফাৎ। একথা অবশ্য সত্য যে, ১৯৪৮–৪৯ এর দুর্ভিক্ষে ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের মতো ব্যাপক ও ভয়াবহ ছিলো না। কিন্তু তা না হলেও এ দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকট জনগণের জীবনে ব্যাপক ভাবে যে সংকট সৃষ্টি করেছিলো তাকেও ছোট করে দেখা চলেনা।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়কার সর্বদলীয় রিলিফ কমিটির মতো কোন কমিটি এই সময় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় হয়নি। প্রথমদিকে সিলেট জেলায় মুসলিম লীগ, কংগ্রেস ও কিষাণ সভার মিলিত উদ্যোগে একটি রিলিফ কমিটি অল্প কিছুদিন সক্রিয় থাকলেও পরে তা নানান কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং রিলিফের কাজ সেখানে আর অগ্রসর হয় না। এদিক থেকে সরকারী উদ্যোগেরও যথেষ্ট অভাব ছিলো। মুসলিম লীগ সরকার প্রাদেশিক লীগের সুপারিশক্রমে ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে একটা রিলিফ কমিটি গঠন করেছিলেন। কিন্তু সেই কমিটির কোন তৎপরতা কোন স্থানেই ছিলো না। এ সম্পর্কে সিলেটের নওবেলাল পত্রিকা স্থানীয় রিলিফ কমিটির অবস্থা সম্পর্কে 'খাদ্যাভাব' নামে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন:

> প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অনুরোধ ক্রমে পূর্ব পাক সরকার প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় মুসলিম লীগের সহযোগে রিলিফ কমিটি গঠন করিয়াছেন। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি উত্তর সিলেটেও অনুরূপ একটি রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছিল। সিলেট জেলায় বিতরণের জন্য সরকার কিছু টাকাও বরাদ্দ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু এই রিলিফ কমিটির কোন সভা আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত হই নাই। এই কমিটিকে যদি অকেজো করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে নাম-কা-ওয়াস্তে এক রিলিফ কমিটি রাখার যুক্তিযুক্ততা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।[১]

রিলিফ কমিটির এই নিষ্ক্রিয়তা শুধু সিলেট জেলাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরিশাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বরিশাল জেলা মুসলিম লীগ সম্পাদক মহীউদ্দীন আহমদের পূর্বোক্ত পত্র থেকেও রিলিফ কমিটির নিষ্ক্রিয়তার কথা জানা যায়। শুধু রিলিফের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তাই নয়, বস্তুতঃপক্ষে সরকারী আমলা কর্তৃক রিলিফের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার ব্যাপারটাই সেখানে বড়ো হয়ে দেখা দেয়। প্রত্যেক জেলাতেই ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে এই সমস্ত রিলিফ কমিটি গঠিত হয়েছিলো এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই সমস্ত আমলা সভাপতিদের ইচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তার ফলেই রিলিফ কমিটিগুলি পুরোপুরিভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে রিলিফের ক্ষেত্রে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সভা ইত্যাদি মিলিত ভাবে রিলিফ কমিটিতে কাজ করতো। পূর্ব বাঙলার ১৯৪৮—৪৯ সালের দুর্ভিক্ষে কংগ্রেস বহুলাংশে সাম্প্রদায়িক কারণে নিজেদের কাজ পূর্ব বাঙলা পরিষদের চৌহদ্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বাইরে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। কমিউনিষ্ট পার্টি এই সময় সশস্ত্র আন্দোলনে নামার ফলে তার এবং কৃষক সভার ওপর সরকারী নির্যাতন ও নানা প্রকার নিষেধাজ্ঞার জন্যে তারা খোলাখুলিভাবে রিলিফ কমিটিতে যোগদান করতে পারেনি। তাদের এই অনুপস্থিতিই এই কমিটিগুলির নিষ্ক্রিয়তার মুখ্য কারণ ছিলো। ১৯৪৩ সালের অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা প্রমাণিত হয়। কারণ সে সময় কমিউনিষ্ট পার্টি এবং কৃষক সভাই ছিলো সারা বাঙলাব্যাপী রিলিফ সংক্রান্ত কাজের পুরোভাগে। এইভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষকসভা এবং কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে রিলিফ কমিটিগুলি মুসলিম লীগের সদস্যদের দ্বারাই মোটামুটিভাবে গঠিত ছিলো। এই সমস্ত মুসলিম লীগ ওয়ালারা রিলিফের কাজে নিজেরা তেমন উৎসাহী না থাকায় ফলে আমলাদের নিজেদের উদ্যোগে সেই সমস্ত কমিটিকে সক্রিয় করার প্রশ্ন ওঠে নি। যে সমস্ত স্থানে স্থানীয় ভাবে মুসলিম লীগাররা রিলিফ কমিটিকে তৎপর করার চেষ্টা করেছিলেন সেখানেও প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে রিলিফ কমিটিকে উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট শৈথিল্য আমলাদেরকে সক্রিয় করে তোলার পথে হয়ে দাঁড়ায় মস্ত বাধা-স্বরূপ।

উপরোক্ত কারণগুলি মিলিত হয়ে এই পর্যায়ে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলনে জনগণকে ব্যাপকভাবে ও দেশব্যাপী সংগঠিত করা কারো

পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এবং জনগণকে সংগঠিত করতে না পারার ফলে রাজনীতিগত ভাবে দুর্ভিক্ষ প্রশ্ন যতখানি খোলাখুলি সামনে আসা দরকার ছিলো ততখানি আসেনি। কিন্তু এই অবস্থা সত্বেও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কোন আন্দোলন অথবা দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে কোন বিক্ষোভ সংগঠিত হয়নি এমন নয়। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে সে চেষ্টা হয়েছিলো। নীচে তারই কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা গেলো।

(ক) ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক যুব লীগের* সাংগঠনিক কমিটি ১৮ই ও ১৯ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সভার পর নিজেদের কর্মীদের কাছে প্রেরিত একটি সার্কুলারে[২] খাদ্য সংকট সম্পর্কে একটি কর্মসূচীর বিবরণ দেন। তাতে বলা হয় যে, তৎকালীন খাদ্য সমস্যার সমাধানের ওপর লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নির্ভর করছে। কাজেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে হিন্দু মুসলমানকে মিলিতভাবে খাদ্য আন্দোলন গঠন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে:

> যে সব জায়গায় আজ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে সেই সব এলাকায় জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত স্থানীয় খাদ্য কমিটির কর্তৃত্বাধীনে অবিলম্বে সরকারী লংগরখানা খুলিতে হইবে এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যাহাতে স্বল্প মূল্যে তাহাদের আহার্য দ্রব্যাদি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি পাইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ ধরণের দোকান খুলিতে হইবে এবং এই সব প্রত্যেক কাজ আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীর উপর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া না দিয়া, প্রত্যেক দেশপ্রেমিক কর্মিদের নিজ হাতে লইতে হইবে।
>
> এই সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করিতে হইলে—অবিলম্বে সকল সম্প্রদায় ও সকল মতাবলম্বী ছাত্র ও যুবকদের বৈঠক আহ্বান করিতে হইবে। সেই সভায় ছাত্র ও যুবকদের যুক্ত রিলিফ ও খাদ্য কমিটি এবং খাদ্য কমিটির অধীনে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গড়িয়া তুলিতে হইবে। মহিলা ও ছাত্রী কর্মিরাও অনুরূপভাবে মহিলাদের মধ্যে কাজ করিবার জন্য এবং বিশেষতঃ হিন্দু মহিলাদের আতংক দূর করিবার জন্য নিজদিগকে সংগঠিত করিয়া তুলিতে পারেন।

---

* দ্রষ্টব্য: বদরুদ্দীন উমর—পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি: প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬—১৪

এই স্বেচ্ছাসেবকদল চোরাকারবারীদের উপর কড়া নজর রাখিবে, মজুতদার সম্পর্কে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিবে, খাদ্য দ্রব্যের বেআইনী যাতায়াতের উপর লক্ষ্য রাখিবে; মজুত বিরোধী, চোরাকারবার বিরোধী আন্দোলন এর মধ্য দিয়া জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তুলিবে, এবং চোরাকারবার ও মজুতদারদের দমনে জনসাধারণকে সক্রিয় করিবে; প্রত্যেক চোরাকারবারী ও মজুতদারদের সাথে সকল প্রকার সামাজিক সংস্রব বর্জন করিতে প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে; লুকায়িত খাদ্য শস্যের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সরকারী কর্মচারীদিগকে খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করিবে।

গণতান্ত্রিক যুব লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং এই সংগঠনের প্রতি সরকারের শত্রুতাপূর্ণ আচরণের জন্যে উপরোক্ত কর্মসূচী অনুযায়ী কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়নি। তবে এই সংগঠনের কর্মীরা সীমিত-ভাবে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গঠনের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করেন।

(খ) দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সারা পূর্ব বাঙলাব্যাপী একটা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে না উঠলেও বিচ্ছিন্নভাবে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করার জন্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীরা অনেক এলাকাতেই এগিয়ে আসেন। স্থানীয় ভাবে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি, রিলিফ কমিটি ইত্যাদি নামে বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। অনেক জায়গায় খাদ্যের অভাব এবং উচ্চমূল্যের প্রতিবাদে মিছিল বের করা হয় এবং সেই সমস্ত মিছিলের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে, লাঠি চার্জ কাঁদানী গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলি-বর্ষণ পর্যন্ত হয়। এই ধরণের ঘটনা শুধু যে ঘাটতি এলাকাগুলিতেই ঘটে তাই নয়। উদ্বৃত্ত এলাকাগুলিতেও এই ধরণের সংঘর্ষের ঘটনা কিছু কিছু ঘটে।

বরিশালে ছাত্রদের উদ্যোগে, বিশেষতঃ ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে একটি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়।[৩] একমাত্র সরকার সমর্থক মুসলিম ছাত্র লীগ ব্যতীত অন্যান্য সংগঠনও এই কমিটির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে। মহিলা সমিতির মধ্যে এই সময় নৌকার মাঝি, রিক্সাচালকদের স্ত্রী প্রভৃতি গরীব মহিলারা ছিলেন। তাঁহারাও বেশ সক্রিয়ভাবে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। গণতান্ত্রিক যুব লীগের একটা শাখাও এই সময় বরিশালে হয়েছিলো। আবদুর রহমান

চৌধুরী, কাজী বাহাউদ্দীন প্রভৃতির নেতৃত্বে তাঁরা এবং মহিউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একাংশ এই কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন।

এই কমিটির কাজ শহর কেন্দ্রিক হলেও তারা বরিশাল শহর থেকে আট দশ মাইলের মধ্যে যে সব উদ্বৃত্ত ধান চাল জোতদার, চোরাকারবারী প্রভৃতিদের কাছে জমা ছিলো সেগুলির খবরাখবর সংগ্রহ করতো, সেখানে গিয়ে তাদেরকে ঘেরাও করে উদ্বৃত্ত ধান চাল স্থানীয় গরীব কৃষকদের মধ্যে কিছুটা বিতরণ করতো। ট্রাকে করে কিছু অংশ শহরে এনে খাদ্য বিভাগের হাতেও তুলে দিতো। ছাত্রেরা দুই একটা চোরাচালানের নৌকাও ধরেছিলো। এই সব কাজের প্রতি সাধারণভাবে জনগণের যথেষ্ট সমর্থন থাকতো।

১৯৪৮ এর জুন মাসের দিকে খাদ্য পরিস্থিতির খুব অবনতি ঘটায় সে সময় বরিশাল শহরে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে একটা বিক্ষোভ মিছিল বরিশালের কালেকটরেট বিলডিং-এ গিয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঘেরাও করে। এই মিছিলে মনোরমা বসু, স্বদেশ বসু, গোলাম কিবরিয়া প্রভৃতি নেতৃস্থানে থাকেন। মিছিলকারীদের সাথে কালেকটরেট বিলডিং এর এলাকার মধ্যেই পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। মানোরমা বসু, স্বদেশ বসু, গোলাম কিবরিয়া প্রভৃতিকে এ সময় গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া স্বদেশ বসুকে ঐ সময় পুলিশ বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করে। শুধু এই কয়জন নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীই নয়। অন্যান্য অনেকেই এ সময় পুলিশের হাতে মারধোর খান এবং গ্রেফতার হন।

এঁদেরকে East Pakistan safety Ordinance এ গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু যে সময় গ্রেফতার করা হয় তার পূর্বেই অর্ডিন্যান্সটির মেয়াদ শেষ হয় এবং সরকার সেটিকে সময়মতো revalidate না করায় সেই গ্রেফতার হয়ে পড়ে বেআইনী। প্রথমে এই রাজবন্দীদেরকে বেল দিয়ে ছেড়ে দিয়ে পরে আবার বেল বাতিল করে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া অক্টোবর মাসে সরকার উপরোক্ত অর্ডিন্যান্সটিকে retrospective effect দিয়ে আবার জারী করেন। এই সময় বন্দীরা তাঁদের গ্রেফতারের বৈধতা নিয়ে মামলা করলে কোর্ট তাঁদেরকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু এই ভাবে ছাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরকে নিরোধ-মূলক আইনে আবার আটক করা হয়।

(গ) গণতান্ত্রিক যুব লীগের রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটির একটি সম্মেলনে ১৯৪৮ এর সেপ্টেম্বরে ঈশ্বরদীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই যুব সম্মেলনে গৃহীত ইস্তাহারে[৪] অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে "খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াও। আমলা-তান্ত্রিক গাফিলতির মুখোস খুলিয়া দাও। জনগণের প্রতিরোধ গড়িয়া তোল।"—এই শীর্ষক একটি অংশে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সাধারণ ভাবে বলা হয়:

> পূর্ব্ব পাকিস্তানে খাদ্য সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়া যশোর জেলায় ৪০ টাকা, খুলনায় ৩৮ টাকা, পাবনা নদীয়ায় ৩৫ টাকার উপরে চাউলের দর চলিতেছে। ২২।২৪ টাকার নীচে কোন জেলাতেই চাউল পাওয়া সম্ভব নয়। এক কথায় বলিতে গেলে পূর্ব্ব পাকিস্তানে খাদ্যের মূল্য জনসাধারণের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইহা দ্বিতীয় খাদ্য সংকট।
>
> এই সংকট সমাধানে সরকারের তরফ হইতে এক বিবৃতি দেওয়া ছাড়া অন্য কোনই চেষ্টা হইতেছে না। খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ সম্পর্কে সরকারী নীতি খাদ্য সংকটকে আরও প্রকট করিয়া তুলি-তেছে। এখন পর্যন্ত খাদ্য সংগ্রহের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। বড় জোতদার ও মজুতদারদের স্পর্শ না করিয়া সাধারণ কৃষকের নিকট হইতে ধান চাউল সংগ্রহ করাই সরকারের নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মজুতদার ও জোতদারকে তোষণ করিয়া কৃষকের ধান 'সীজ' করিবার নীতিতে খাদ্য সংগ্রহ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীরও কোন ব্যবস্থা হইতেছে না।
>
> যে খাদ্য বর্তমানে সরকার সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও সঠিকভাবে সরবরাহ হইতেছে না।
>
> খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ এইরূপে চলিতে থাকায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের পূর্ব্ব পাকিস্তান আজ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সামনে উপস্থিত হইয়াছে।

এই বক্তব্যের পর খাদ্য সমস্যার আশু সমাধানের উদ্দেশ্যে এই যুব সম্মেলন অবিলম্বে নিম্নলিখিত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করার জন্যে সরকারের নিকট দাবী জানায়:

১। কৃষকের নিকট হইতে জবরদস্তিমূলকভাবে ধান কাড়িয়া লওয়া চলিবে না। অবিলম্বে সমস্ত, জোতদার ও মজুতদারদের বাড়তি খাদ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে হইবে।

২। ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমঝোতা করিয়া খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। সরকার কর্তৃক সংগৃহীত খাদ্য কালবিলম্ব না করিয়া ঘাটতি এলাকায় সস্তাদরে সরবরাহ করিতে হইবে।

৪। প্রত্যেক শহরে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে এবং রেশনিং এলাকায় নিয়মিতভাবে সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। যে সমস্ত লোক দুস্থ হইয়া পড়িয়াছে এবং খাদ্য ক্রয়ে অক্ষম তাহাদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিলির ব্যবস্থা করিতে হইবে। বন্যা প্রপীড়িত অঞ্চলে দ্রুত সরবরাহ পাঠাইতে হইবে।

৬। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য কমাইতে হইবে।

৭। কৃষকের ক্রয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য অর্থকরী ফসল যেমন পাট ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন দর মণ প্রতি ৪০ টাকা বাঁধিয়া দিতে হইবে।

৮। মজুর ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মাহিনা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৯। জিন্না তহবিল হইতে দুই তৃতীয়াংশ অর্থ পূর্ব্ব পাকিস্তানের দুর্ভিক্ষ ও বন্যা পীড়িতদের সাহায্যের জন্য বরাদ্দ করিতে হইবে।

উপরোক্ত কর্মসূচী যাতে যথাশীঘ্র কার্যকর করা সম্ভব হয় তার জন্য গণতান্ত্রিক যুব লীগের এই সম্মেলন পূর্ব্ব বাঙলার যুব সমাজ ও জনগণের নিকট আহ্বান জানায়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে গৃহীত কর্মসূচীর মতো এই আহ্বানও পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে কোন ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।

(ঘ) সিলেট জেলায় যে সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠিত হয়েছিলো সেটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিন্তু রিলিফ কমিটির নিষ্ক্রিয়তা সত্বেও সিলেটে খাদ্য পরিস্থিতি ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে অনেক সভা সমিতি হয়।[৫] সিলেট শহরে ১লা মার্চ, ১৯৪৯, তারিখে অনুষ্ঠিত এ ধরণের একটি জনসভার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।

সভাটি আহ্বান করে উত্তর সিলেট জেলা মুসলিম লীগ। তাতে সভাপতিত্ব করেন মওলানা সাখাওতুল আম্বিয়া। হিন্দু মুসলিম জনগণের এই বিরাট মিলিত জনসভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:

ফসল সংগ্রহের পর আজ ৪ মাস যাইতে না যাইতে দেশের প্রায় সর্ব্বস্থান হইতেই খাদ্যাভাবের ভয়াবহ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। খাদ্য শস্যের মূল্য সর্ব্বত্রই অতি উর্দ্ধে উঠিয়াছে এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, খাদ্য শস্যের মূল্য দেশবাসীর ক্রয় ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ইহাও সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সরকারের বর্ত্তমান খাদ্য সংগ্রহ নীতি সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়াছে।

বর্ত্তমান অবস্থার উপর নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করিয়া সরকার দেশবাসীকে প্রত্যক্ষভাবে মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিতেছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সিলেটের জনসাধারণের এই সভা যে সকল অঞ্চলে এই রূপ ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে সত্বর তাহাকে দুর্ভিক্ষাঞ্চল ঘোষণা করিয়া তদনুযায়ী অবস্থা আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট দাবী জ্ঞাপন করিতেছে।[৬]

এই প্রস্তাব উত্থাপন করে পূর্ব্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য মাহমুদ আলী এবং প্রস্তাব সমর্থন করে সিলেট জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রমেশ চন্দ্র সোম বক্তৃতা করেন। এর পূর্বে খাদ্য পরিস্থিতির চরম অবনতির কথা বর্ণনা করে বক্তৃতা করেন আবদুস সামাদ, হরেন্দ্র কুমার মজুমদার, মোয়াজ্জেম আহমদ চৌধুরী, মতসির আলী ও ওয়াহিদুর রেজা।

(ঙ) পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৪৯ এর ১১ই অক্টোবর ঢাকা আসেন। তাঁর এই সফরের সময় পূর্ব বাঙলায় খাদ্য পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি ঘটে। লিয়াকত আলীর ঢাকা উপস্থিতিকালে সারা দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থার এবং প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ ঐ দিনই আরমানীটোলা ময়দানে একটি জনসভা এবং তার পর একটি বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী গ্রহণ করে।[৭]

এই বিক্ষোভ বন্ধ করার জন্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান ও আলী আহমদকে অনুরোধ জানান। তাঁরা এ ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর সাথে আলাপ করেন কিন্তু ভাসানী তাঁর কর্মসূচী বাতিল করতে রাজী হন না। কাজেই ১১ই অক্টোবর বিকেলে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আরমানীটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের সেই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[৮]

সভায় শামসুল হক এবং শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতা করেন। শেখ মুজিবের বক্তৃতা ছিলো খুব উত্তেজনাপূর্ণ। দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, একজন অন্য একজনকে খুন করলে তার ফাঁসি হয়। যে নূরুল আমীন শত শত লোক খুন করছে তার কি হওয়া উচিৎ? তাকে এই মাঠের মধ্যে এনে গুলি করা উচিৎ।[৯]

এই সভায় পূর্ব বাঙলার মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করে এবং মন্ত্রীসভার ব্যাপারাদি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নোতুন নির্বাচনের দাবী তাঁরা জানান। সভার পর বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের এক মিছিল বের হয়।[১০]

বাবু বাজার পুল ইত্যাদি পার হয়ে সেটি নবাবপুর দিয়ে যায়। নবাবপুরের রেল ক্রসিং বন্ধ করে দেওয়ার ফলে মিছিল ফুলবাড়িয়া রেল ষ্টেশনের* সামনে দিয়ে নাজিরাবাজার রেল ক্রসিং এর সামনে উপস্থিত হয়। সেখানেও গেট বন্ধ। S.D.O. North সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সাথে শামসুল হক ও শেখ মুজিবের তর্কাতর্কি শুরু হয়। মওলানা ভাসানী তখন রেল ক্রসিং এর পাশেই নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে যান। এই সময় একজন পুলিশ তাঁকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে যাচ্ছিলো কিন্তু শওকত আলী সে লাঠি ধরে ফেলেন। তাঁর সাথেও S.D.O. North এর তর্কাতর্কি শুরু হয়। অবস্থা যখন সেই পর্যায়ে পুলিশ তখন কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়া শুরু করে এবং গ্যাসের জ্বালায় অস্থির হয়ে সকলে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। শামসুল হক সহ ১১ জন ঘটনাস্থলেই গ্রেফতার হন। শেখ মুজিব, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুলওদুদ, শওকত আলী প্রভৃতি নাজিরাবাজার রেল ক্রসিং থেকে দৌড়ে ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে উপস্থিত হন।[১১]

* পুরাতন ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশন—ব. উ.

শওকত আলী তখন ঐ বাড়ীতে থাকতেন। তিনি অন্যদেরকে বলেন যে, সেখানে থাকা তাঁদের পক্ষে নিরাপদ নয়। কিন্তু শেখ মুজিব সে সময় অন্যত্র যেতে রাজী না হওয়ায় শওকত আলী তাঁদেরকে তালা বন্ধ করে রেখে যান এবং বলে যান কেউ যেন তাঁর আসার আগে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা না করেন। এরপর রাত তিনটের সময় পুলিশ তালা ভেঙে মোগলটুলীর বাড়ীতে ঢোকে। ভেতরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এর পূর্বেই ওপর থেকে অন্য বাড়ীর ছাদ বেয়ে পালিয়ে যান।[১২]

পরদিন শেখ মুজিবর রহমান নুর জাহান বিল্ডিং এ ক্যাপ্টেন শাহ-জাহানের বাড়ীতে আহত অবস্থায় আশ্রয় নেন। সেখানে দু'তিন দিন থাকার পর একদিন পুলিশের দুজন অফিসার সে বাড়ীতে উপস্থিত হন। তাঁদের একজনের সাথে ক্যাপ্টেন শাহজাহানের সদ্ভাব ছিলো। তিনি কথা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানাটা পকেট থেকে একটু উঁচু করে তাঁকে দেখান। ক্যাপ্টেন শাহজাহান তখন সহজেই বুঝতে পারেন যে তাঁর বাড়ীতে শেখ মুজিবের অবস্থান সম্পর্কে পুলিশ সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল এবং তাঁর নিজের ওপর যাতে কোন বিপদ না আসে সেজন্যে অফিসারটি তাঁকে ইঙ্গিতে সাবধান করে দিলেন। এরপর ক্যাপ্টেন শাহজাহানের স্ত্রী শেখ মুজিবকে চাদর জড়িয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের করে দেন।[১৩] শেখ মুজিব সেখান থেকে আনোয়ারা খাতুনের বাসায় গিয়ে ওঠেন এবং সেই বাসাতেই গ্রেফতার হন।[১৪]

১১ই অক্টোবরের ঘটনাবলী সম্পর্কে ঐ দিন রাত্রেই পূর্ব বাঙলা সরকার একটি প্রেস নোট জারী করেন। তাতে বলা হয়:

> অদ্য বৈকাল ৪টায় আরমানিটোলা ময়দানে মুর্শিদাবাদের জনাব সাখাওয়াৎ হোসেনের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের এক সভা হয়। সভায় প্রায় ২ হাজার লোক যোগদান করে। জনাব শামসুল হক এম.এল.এ. মুজিবর রহমান, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং আরও কতিপয় বক্তা প্ররোচনামূলক উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ফলে প্রায় ৫ শত লোকের এক মিছিল রমনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। মিছিলকারীদের অনেকের কাছে ইট পাটকেল ও লাঠি ছিল। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মিছিল ছত্রভঙ্গ করার আদেশ দেয়। ম্যাজি-স্ট্রেটের নির্দেশ-সহ পুলিশ বাহিনী নাজিরাবাজার রেলওয়ে লেবেল

ক্রসিংয়ের নিকট মিছিলকারীদের বাধা দেয়। তখন মিছিলকারীরা পুলিশের ওপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকিলে সাব ডিভিশনাল অফিসার এবং*৫ জন কনস্টেবল আহত হয়। তন্মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। অতঃপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই জনতাকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলে পুলিশ সামান্য লাঠি চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করে। ঘটনাস্থলেই পুলিশ মিছিলকারীদের ১১ জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।[১৫]

১১ই অক্টোবর আরমানিটোলায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সভায় সভাপতি হিসেবে এই প্রেস নোটে ঢাকার সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটার সাখাওয়াৎ হোসেনের নাম উল্লেখ করায় সাখাওয়াৎ হোসেন একটি বিবৃতির মাধ্যমে বলেন যে তিনি উক্ত সভায় শুধু যে সভাপতিত্ব করেন নি তাই নয়, সেদিন তিনি ঐ সময়ে ঢাকা শহরেই উপস্থিত ছিলেন না।[১৬]

১২ই অক্টোবর তারিখে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান 'বিভেদ স্বষ্টিকারীদের' বিরুদ্ধে হুশিয়ারী দিয়ে তাদেরকে শায়েস্তা করার সংকল্প ঘোষণা করেন[১৭]। ঐ দিন আওয়ামী লীগ পুলিশ নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা শহরে হরতালের আহ্বান দেয়। এর ফলে নবাবপুর, জনসন রোড ইত্যাদি এলাকায় অধিকাংশ দোকান পাট বন্ধ থাকে। কাজেই পূর্ণ সাফল্য না হলেও হরতাল অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হয়।[১৮]

১৪ই অক্টোবর কারকুনবাড়ী লেনস্থ ইয়ার মহম্মদ খানের বাসা থেকে মওলানা ভাসানীকে বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স বলে গ্রেফতার করা হয়। মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, শেখ মুজিবর রহমান প্রভৃতিসহ যে কয়জন আওয়ামী লীগারকে ১১ই তারিখের থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় উনিশ।[১৯]

(চ) ১৯৫১ সালে খাদ্য পরিস্থিতি সরকারী দল মুসলিম লীগের মধ্যেও কি প্রতিক্রিয়া স্বষ্টি করেছিলো তার একটি চিত্র বরিশালের একটি মুসলিম লীগ সভার নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে পাওয়া যাবে।[২০]

বরিশাল জেলার গুরুতর খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনার জন্যে জেলা মুসলিম লীগ কর্তৃক আহূত এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় এ.কে. স্কুলের ময়দানে। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা মুসলিম লীগ সভাপতি সদর-

উদ্দীন আহমদ। সভা শুরু হওয়ার পূর্বে কতকগুলি পোষ্টার প্রদর্শিত হয়। কংকাল অঙ্কিত সেই পোষ্টারগুলিতে লেখা থাকে "এটি একটি স্বাধীন দেশ কিন্তু জনগণ স্বাধীনতা ভোগ করছে না," আমরা চাই খাদ্য বস্ত্র এবং মানুষের মতো বাঁচতে," "দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে" ইত্যাদি।

পটুয়াখালি মহকুমার দুর্গত এলাকা সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে জেলা মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এস.ডব্লিউ, লকিতুল্লাহ বলেন যে, জনসাধারণ সেখানে ভুখা মিছিল করছে। জনগণের দুঃখজনক অবস্থাকে তুলে ধরতে অক্ষমতার জন্যে তিনি জেলার পরিষদ সদস্যদের, বিশেষতঃ খাদ্য মন্ত্রী মহম্মদ আফজলের দারুণ সমালোচনা করেন।

শামশের আলী এডভোকেটও মহম্মদ আফজল সহ অন্যান্য পরিষদ সদস্যদের সমালোচনা করেন। এ.পি.পির পরিবেশিত সংবাদকে খণ্ডন করার জন্যে, "জনগণ গাছের শিকড় ও পাতা খেয়ে আছে একথা অসত্য" এই বলে যে সরকার প্রেস নোট প্রকাশিত হয়েছিলো তিনি তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। শামশের আলী অনাহারে মৃত্যুর কতকগুলি উদাহরণ উল্লেখ করে মহম্মদ আফজলসহ অন্যান্য পরিষদ সদস্যদেরকে "প্রত্যাহার" করে নেওয়ার জন্যে জনগণের কাছে আহ্বান জানান।

সরকারের সমালোচনা প্রসঙ্গে বি.ডি. হাবিবুল্লাহ বলেন যে, বর্ত্তমান সরকার যদি জনগণকে খাদ্য দিতে না পারে এবং তারা যদি অনাহারে মারা যায় তাহলে তাদের গদীতে বসে থাকার কোন অধিকার নেই। তিনি আরও বলেন যে খোদাতালার রুদ্ররোষের জন্যে নয়, সরকারী নীতি নির্ধারকদের দুর্নীতির জন্যেই খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

মহম্মদ আলী আশরাফ দুর্গত এলাকায় নিজের সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, পটুয়াখালি মহকুমার আটটির মধ্যে ছয়টি থানায় ১৫00 বর্গ মাইল এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং জনসাধারণ সেখানে সত্যি সত্যিই অনাহারে থাকছে। তিনি সেই দুরবস্থাকে আশঙ্কাজনক বলে বর্ণনা করেন। প্রতিটি ইউনিয়নে প্রায় ৩00 জন মানুষ তিন থেকে পাঁচ দিন পর্যন্ত অনাহারে থাকছে। আলী আশরাফ অনাহার মৃত্যু এবং আত্মহত্যার কতকগুলি উদাহরণ সভায় উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব বাংলা জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন

পূর্ব বাঙলা বিধান পরিষদে জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিলের প্রথম খসড়া পেশ

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার পক্ষে রাজস্ব মন্ত্রী ফজলুর রহমান বঙ্গীয় বিধান পরিষদে 'বঙ্গীয় জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল' পেশ করেছিলেন।* বিভিন্ন মহলের আপত্তি সত্ত্বেও বিলটিকে লীগ সরকার সিলেক্ট কমিটিতে বিবেচনার জন্যে পাঠান। কিন্তু ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ৩রা জুন ভারত, পাঞ্জাব ও বাঙলাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণার ফলে সিলেক্ট কমিটির পক্ষে সে বিষয়ে কোন রিপোর্ট প্রদান সম্ভব হয় না।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাঙলা সরকার জমিদারী ক্রয় এবং প্রজাস্বত্ব সম্পর্কে একটি নোতুন বিল নিজেদের বিধান পরিষদে পেশ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে মোটামুটিভাবে পূর্ববর্ত্তী বিলটির ভিত্তিতেই তাঁরা 'পূর্ব বাঙলা জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিলের' খসড়া প্রস্তুত করেন।[১] এই খসড়াটিই প্রাদেশিক অর্থ মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৮, পূর্ব বাঙলা বিধান পরিষদে পেশ করেন। এই প্রসঙ্গে বাঙলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং তার সংস্কার ও উচ্ছেদ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচেষ্টার উল্লেখ করে তিনি বিলটির কয়েকটি দিক সম্পর্কে নিজের বক্তব্য উপস্থিত করেন।

এ সম্পর্কে হামিদুল হক চৌধুরী প্রথমেই, বলেন যে, কৃষকদেরকে জমিস্বত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্যবস্থা করেছেন যাতে কৃষকরা সরকারকে দেয় খাজনার পঁচিশ গুণ এক কালীন দিলে ভবিষ্যতে তাঁদেরকে আর কোন খাজনা দিতে হবে না। এবং 'স্বাধীন কৃষক' হিসেবে তাঁরা জমিস্বত্ব

* দ্রষ্টব্য : বদরুদ্দীন উমর :—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৮

ভোগ করতে পারবেন।* এর ফলে প্রদেশের জীবনে গভীর পরিবর্ত্তনের সূচনা হবে, কৃষকদের জমির আকাঙ্খা পূর্ণ হওয়ার ফলে তাঁদের কর্মক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধি পাবে, দেশের শিল্পোন্নয়ন দ্রুতগতি হবে, ধন সম্পদের উৎপাদন উন্নত হবে এবং এ সবের ফলেও কৃষকদের অবস্থার মধ্যে সামগ্রিকভাবে অনেক পরিবর্ত্তন আসবে।[২]

ভবিষ্যতে জমিদারী প্রথার উত্থান আর যাতে না ঘটতে পারে তার জন্যে কোন প্রজা তিন বৎসরের বেশী নিজের জমি চাষের জন্যে অন্যকে বর্গা দিতে পারবেন না বলে বিলটিতে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে হামিদুল হক উল্লেখ করেন।[৩] তিনি আরও বলেন যে, ঋণগ্রস্থ খাজনাভোগী জমিদারদের জমিদারী ক্রয়ের ফলে তাঁদের আয় হ্রাস পাওয়ার ফলে তাঁরা যাতে খুব বেশী অসুবিধার মধ্যে না পড়েন তার জন্যে তাঁদের আয় যে পরিমাণ হ্রাস পাবে সেই অনুপাতে জমিদারদের ঋণের বোঝাকেও কমিয়ে আনা হবে। এর ফলে মহাজনদের যে ক্ষতি হবে সেটাকে প্রজাদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তাদের সাহায্য হিসেবেই ধরা যেতে পারে।[৪]

জমিদারী ক্রয়ের ফলে অপেক্ষাকৃত অল্পবিত্ত খাজনাভোগীরা যাতে বেশী আঘাত পেয়ে রাষ্ট্রের ওপর একটা বোঝাস্বরূপ হয়ে না দাঁড়ান তার জন্যে ক্ষতিপূরণের হার কিছুটা পরিবর্ত্তন করা হয়েছে বলেও অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক উল্লেখ করেন।[৫] এর পরই জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণের প্রসঙ্গ অবতারনা করে তিনি বক্তৃতায় বলেন:

> কোন রকম ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবী মাঝে মাঝে উত্থাপন করা হয়েছে। এটা কোন নোতুন ব্যাপার নয়। ভূমি রাজস্ব কমিশনের** সামনে কতকগুলি সাক্ষের মধ্যে এই চরম অভিমত প্রকাশ করা হয়েছিলো। ক্ষতিপূরণের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছিলো যে, জমিদার ও জমির স্বত্ত্বাধিকারীরা ইতিমধ্যে তাদের সম্পত্তি থেকে যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করেছে। সঠিকভাবে হোক অথবা ভ্রান্তভাবে হোক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অনেক লোক নিজেদের সন্তান সন্ততিদের জন্যে ভরণপোষণের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে

* এক বৎসরের দেয় খাজনা দিতে যে কৃষকরা বাধ্যতাবশতঃ মহাজনের বাড়ী ধর্ণা দেয় তারা এক কালীন পঁচিশ বৎসরের খাজনা কি ভাবে দেবে সে কথা অবশ্য হামিদুল হক উল্লেখ করেন নি।

** ফ্লাউড কমিশন।

জমিদারী স্বত্ব খরিদ করেই তাদের সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করেছিলো। এই ধরণের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত করার ফলে রাষ্ট্র এমন সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে যার সমাধান তার পক্ষে সম্ভব নয়। জমিদারী স্বত্বকে রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে যদি সামগ্রিকভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয় তাহলে সর্বত্রই নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কে আশঙ্কা দেখা দেবে এবং তার ফল স্বরূপ ব্যক্তিগত উদ্যম সর্বক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমাদের নোতুন রাষ্ট্রের উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে নিদারুণ পারণতি ডেকে আনবে।[৬]

বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের প্রশ্নে নোতুন 'ইসলামী' রাষ্ট্র পাকিস্তানে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষকের' ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বৃটিশ সরকার প্রণীত ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রের ২৯৯ ধারার উল্লেখ করে বলেন:

আমি বলতে বাধ্য যে আমাদের দেশের সমৃদ্ধি বহুলাংশে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং উদ্যমের উপরই নির্ভরশীল থেকেছে এবং রাষ্ট্রেরও উচিত এই প্রচেষ্টা এবং উদ্যমকে উৎসাহ দান করা। এই কারণেই ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের আইনের ২৯৯ ধারা সন্নিবেশিত হয়েছিলো। এই আইনই এখন পর্যন্ত আমাদের সাংবিধানিক আইন হিসেবে প্রচলিত। এই ধারায় খুব নির্দ্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, কোন জমি অথবা ব্যবসায়িক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জোর পূর্বক দখল করার জন্যে কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক কোন বিধান পরিষদই কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে না। এক্ষেত্রে আইন প্রণীত হতে পারে তখনই যখন দখলকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ অথবা কোন নীতির ভিত্তিতে ও কিভাবে সেই ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হবে তা উল্লিখিত হয়।

এই প্রদেশে প্রায় ৫১ লক্ষ খাজনাভোগী স্বত্ব আছে এবং এই আয়ের উপর নির্ভরশীল পরিবারসমূহের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করে রাষ্ট্র যদি তাদের স্বত্ব কেড়ে নেয় তাহলে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ পরিবার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং অন্য উপায়ে তাদের পুনর্বাসনের অসম্ভব দায়িত্ব রাষ্ট্রকে ঘাড়ে নিতে হবে। এই থেকেই সমস্যাটির ব্যাপকতা বিচার করা যেতে পারে।[৭]

৬—

এর পর বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ সমাজে যে 'অশান্তির' সৃষ্টি করবে তার উল্লেখ করে তিনি সেই ধরনের প্রস্তাবকে অচিন্তনীয় এবং অবাস্তব বলে বর্ণনা করেন।[৮]

অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক পরিষদে যে বিলটি পেশ করেন সেই অনুসারে জমিদারী ক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর কৃষিকার্যে নিযুক্ত সমস্ত কৃষকরাই সরাসরি-ভাবে প্রাদেশিক সরকারের প্রজায় পরিণত হবেন এবং তাঁদের সকলের মর্যাদা সেই হিসেবে সমান হবে। তাঁদের সব রকম দখলীস্বত্ব বজায় থাকবে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির যাঁরা মালিক এবং যাঁরা নিজহাতে চাষ করেন একমাত্র তাঁদের কাছেই তাঁরা জমি হস্তান্তর করতে পারবেন। এই বিলে আরও প্রস্তাব করা হয় যে, জমি ক্রয়ের সময় কোন ব্যক্তিই দুশো বিঘা জমির বেশী জমি নিজের দখলে রাখতে পারবেন না। মাথা পিছু দশ বিঘা হিসেবে রেখে কোন পরিবারের যদি দুশো বিঘা জমি রাখার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে অবশ্য তারা দুশোর অধিক বিঘা আইনতঃ রাখতে সক্ষম হবেন।[৯] এদিক দিয়ে বিচার করলে আলোচ্য বিলটি পূর্ববর্তী মুসলিম লীগ সরকারের ১৯৪৭ সালের বিলের থেকে অনেক বেশী পশ্চাদ-মুখী। কারণ সেই বিলটিতে জমি মালিকানার উর্ধতম পরিমাণ ছিলো একশো বিঘা।

হামিদুল হকের হিসেব মতো পূর্ব বাঙলায় তখন দুশো বিঘার ওপর জমিওয়ালা পরিবারের সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। এই তিন হাজার পরিবারের অতিরিক্ত জমি সরকারের খাস দখলে এলে পরে তাকে ভূমি-হীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বন্টনের প্রস্তাব করা হয়। এ ছাড়া কোন ব্যক্তির ষাট বিঘা জমি অথবা তার পরিবারের প্রত্যেকের মাথাপিছু পাঁচ বিঘা হিসেব করে তা যদি ষাট বিঘার বেশী হয় তাহলে সেই পরিমাণ জমির যারা মালিক তারা কোন নতুন জমি খরিদ করতে পারবে না। কোন ব্যক্তির হাতে যাতে ভবিষ্যতে বেশী জমি কেন্দ্রীভূত না হয়, তার জন্যেই বিলে এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে হামিদুল হক উল্লেখ করেন।[১০]

বর্গাপ্রথা সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, তার ভালমন্দ দুই দিকই আছে। কাজেই তাকে সরাসরি উচ্ছেদ না করলেও ধীরে ধীরে তার উচ্ছেদের একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই সাথে যে পর্যন্ত বর্গাপ্রথা চালু থাকবে সে পর্যন্ত বর্গাদারদেরকে ইচ্ছেমতো জমি থেকে উৎখাত করার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখও তিনি বিলটিতে করেন।[১১]

জমিদারী ক্রয় সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, সিলেট থেকে তখনো পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য না পাওয়ার ফলে সিলেটকে বাদ দিয়েই তিনি এর আর্থিক ফলাফল হিসেব করেছেন। বিলটিতে মোট আয়ের ছয় থেকে পনেরো গুণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং গড়ে দশ গুণ ধরে তিনি মোটামুটি হিসেব তেরী করেছেন বলে উল্লেখ করেন।[১৫]

এই হিসেব মতো সারা প্রদেশে রায়তদের খাজনা বাবদ দেয় টাকার পরিমাণ ৮°২৪ কোটি। কিন্তু এর মধ্যে সমস্ত রকম খাজনা ট্যাক্স নিয়ে সরকারের ঘরে আসে মাত্র ৩ কোটি টাকা। এই অঙ্কের সাথে সরকারের খাজনা আদায়ের খরচা ১৫% হারে ধরে ১°২৪ কোটি যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে জমিদারী ক্রয়ের পর সরকারের মোট মুনাফা দাঁড়ায় প্রায় ৪ কোটি টাকা। জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ বাবদ সরকারী তহবিল থেকে দিতে হবে প্রায় ৪০ কোটি টাকা এবং এই হিসেব মতো হামিদুল হক দেখান যে, ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করে সরকার বৎসরে ৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয়ের বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হবেন।[১৬]

এইভাবে জমিদারী ক্রয় বিল সম্পর্কে পরিষদকে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়ার পর হামিদুল হক তাঁর বক্তৃতার শেষে বলেন:

স্যার, এটা আমাদের একান্ত আন্তরিক কামনা যে, বিলটি আইনে পরিণত এবং কার্যকর হলে তা এক শ্রেণী ও আরেক শ্রেণীর মধ্যে তিক্ততা ও সন্দেহের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবে। বিদেশী অনুপ্রেরণা ও নির্দেশের দ্বারা চালিত যে সমস্ত সংগঠনসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর স্বাভাবিক পার্থক্যগুলিকে শ্রেণী সংগ্রাম হিসেবে বাড়িয়ে তুলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইছে, সেই সমস্ত সংগঠনগুলির কার্যকলাপও এর ফলে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসবে। এই সমস্ত রাজনৈতিক গ্রুপ এবং চক্রের কাছে জনগণের মঙ্গল প্রচারণার একটা আকর্ষণীয় ধুয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে ক্ষমতা দখলই এই প্রচারণার একমাত্র উদ্দেশ্য। যে কোন-রূপে শ্রেণী ঘৃণার প্রকাশ আমাদের শিশু-রাষ্ট্রের জন্যে বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং আমরা যা কিছু বিশ্বাস করি ও জীবনে যা কিছুকে মূল্যবান মনে করি তাকেই ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত এই সমস্ত সংগঠনগুলিকে তাদের আকাংখিত সুযোগ এনে দেবে। আমি আজ পরিষদের সামনে যে ব্যবস্থা প্রস্তাব করার সম্মান লাভ করেছি

সেই ব্যবস্থা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অনেকখানি সমঝোতা সৃষ্টি করে তাদেরকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে।

কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে এইভাবে বিষোদ্গার করে পূর্ব বাঙলা সরকারের অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী 'জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন' এর ওপর তাঁর প্রাথমিক বক্তৃতা শেষ করেন।

এই বক্তৃতার শুরুতে তিনি সমগ্র বিলটিকে একটি 'স্পেশাল কমিটিতে' পাঠাবার প্রস্তাব করেন। ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির সদস্যদের নামও তিনি পরিষদে পাঠ করেন। হামিদুল হক প্রস্তাবিত এই কমিটির সদস্যরা হলেন :

(১) মাননীয় অর্থমন্ত্রী, রাজস্ব বিভাগ, (২) মিঃ হামিদুদ্দিন আহমদ, (৩) মিঃ সিরাজউদ্দীন আহমদ, (৪) মিঃ আহমদ আলী মৃধা, (৫) মিঃ দেওয়ান লুৎফার রহমান, (৬) মিঃ নাজির হোসেন খোন্দকার, (৭) মিঃ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, (৮) মিঃ মুনাওয়ার আলী, (৯) মিঃ মহম্মদ আবদুল্লাহ, (১০) মিঃ আসান আলী মুকতার (১১) মিঃ মির্জা এ, হাফিজ, (১২) মিঃ এক্কান্দার আলী খান, (১৩) মিঃ নুরুজ্জামান, (১৪) মিঃ আলী আহমেদ চৌধুরী, (১৫) মিঃ মহম্মদ এ, সালাম, (১৬) মওলানা আবদুল হামিদ খান (ভাসানী), (১৭) মিঃ নওয়াব আলী, (১৮) মিঃ মহম্মদ আলী হায়দার খান, (১৯) ডক্টর এ, আহাদ, (২০) মওলানা আবদুর রশীদ খোন্দকার তর্কবাগীশ, (২১) মিঃ হাফিজুদ্দীন চৌধুরী, (২২) মিঃ ফজলুল কাদের, (২৩) মিঃ আহমদ হোসেন, (২৪) মিঃ শরফুদ্দীন আহমদ, (২৫) মিঃ তফজ্জল আলী, (২৬) মিঃ এ, টি, মাজহারুল হক, (২৭) মিঃ আবদুল মোমিন, (২৮) মিঃ ফজলুর রহমান (নোয়াখালি), (২৯) মিঃ দেওয়ান আবদুল বাসেত, (৩০) মিঃ মহম্মদ আরিফ চৌধুরী, (৩১) মিঃ নুরুল হোসেন খান, (৩২) মিঃ মুকুন্দ বেহারী মল্লিক, (৩৩) মিঃ হারান চন্দ্র বর্মন, (৩৪) মিঃ এম, এ, সেলিম, (৩৫) মিঃ বসন্ত কুমার দাস, (৩৬) মিঃ ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, (৩৭) মিঃ নরেন্দ্র নাথ সিংহী, (৩৮) মিঃ রাজেন্দ্র নাথ সরকার, (৩৯) মিঃ প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, (৪০) ডক্টর প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায়, (৪১) মিঃ সুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত, (৪২) মিঃ মনোরঞ্জন ধর, (৪৩) মিঃ গণেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, (৪৪) মিঃ ধনঞ্জয় রায়, (৪৫) মওলানা আবদুল্লা-হেল-বাকী।

হামিদুল হক এই নামগুলি প্রস্তাব করার পর বলেন যে, উপরোক্ত স্পেশাল কমিটিকে ৩১শে জুলাই, ১৯৪৮, এর মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশ দিতে হবে। কমিটির চেয়ারম্যান হবেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং কমিটির বৈঠকে কোরামের জন্যে প্রয়োজন হবে ১১ জনের উপস্থিতি। এই স্পেশাল কমিটি অধিকার, সুবিধা ও কর্তব্যের দিক থেকে সিলেক্ট কমিটির মর্যাদা পাবে বলেও হামিদুল হক উল্লেখ করেন।

২

বিলের ওপর প্রাথমিক বিতর্ক

'পূর্ব বাঙলা জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল পরিষদে অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক কর্তৃক পেশ হওয়ার পর ৭ই এপ্রিল তারিখেই তার ওপর পরিষদ সদস্যেরা সংক্ষিপ্তভাবে নিজেদের প্রাথমিক মন্তব্যসহ বক্তৃতা দেন।

প্রথমেই এ. টি. এম. মাজহারুল হক বলেন[১] যে, নোতুন বিলটিতে জমিদারদেরকে বাৎসরিক প্রাপ্য খাজনার ১৫ গুণ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে অথচ ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ ছিলো ১০ গুণ। কাজেই এদিক থেকে বিলটি ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশের থেকে বেশী হারে জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। তিনি বলেন যে, জমিদারদেরকে যদি একান্তই ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তাহলে তার পরিমাণ কোন ক্রমেই ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশের থেকে বেশী হওয়া উচিত নয়।

ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে সাধারণভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে গিয়ে মাজহারুল হক বলেন যে, তিনি জমিদারদেরকে কোন রকম ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী। জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণের সপক্ষে যাঁরা জমিদারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের অর্থ নিয়োগের প্রশ্ন তুলেছেন তাঁদের জানা উচিত যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল চুক্তি সম্পাদন করেছিলো তখন জমিদারদের ওপর দায়িত্ব ছিলো জমির উন্নতি সাধন। কিন্তু জমির উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে জমিদাররা কিছুই করে নি, কাজেই তাদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কোন অধিকারই নেই। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ২৯৯ ধারার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সেই ধারাটির প্রথম অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে যে আইন করে যে কোন সম্পত্তিই সরকার বিনা ক্ষতিপূরণে নিয়ে নিতে পারেন।

এই পর্যায়ে আবদুল খালেক মাজহারুল হকের বক্তৃতায় বাধা দান করে বলেন যে, তিনি সিলেক্ট কমিটির একজন সদস্য। অর্থাৎ সিলেক্ট কমিটির একজন সদস্য হয়ে এই ধরণের মন্তব্য করা তাঁর উচিৎ নয়।[২] হামিদুল হক চৌধুরীও তখন বলেন যে, এই অবস্থায় তাঁর পক্ষে সিলেক্ট কমিটির সদস্য থাকা সম্ভব নয়।[৩] শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদও বলেন যে ব্যাপারটা দলীয় বৈঠকে আলোচিত হবে কাজেই তিনি পরিষদে সেইভাবে নিজের মতামত দিতে পারেন না।[৪]

এই সমস্ত সমালোচনার মুখে এ,টি, মাজহারুল হক বলেন যে, পরিষদে নিজের মতামত ব্যক্ত করার জন্যে যদি তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। তাঁরা তাঁকে বাদ দিতে চাইলে অনায়াসে তা করতে পারেন।[৫]

এরপর তিনি বলেন যে, জমিদারীর ক্ষতিপূরণ যারা দিতে চাইছে তারা নিজেদের স্বার্থেই তা চাইছে। যে সমস্ত খোদ চাষীর উপকারের জন্যে জমিদারী প্রথা তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তাদের কোন উপকার এর দ্বারা হবে না। তারা কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পক্ষপাতী নয় এবং তিনি নিজেও মনে করেন যে, জমিদারীর ক্ষতিপূরণ দেওয়া মোটেই উচিত নয়। এরপর তিনি বলেন যে, ক্ষতিপূরণ একান্ত দিতে চাইলে বিহারের মতো রাজস্বের তিনগুণ হয়তো দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তার বেশী কোন ক্রমেই নয়।[৬]

এরপর বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী জমিদারদের অধীনস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন যে, জমিদারী দেখাশোনার জন্যে যে সমস্ত কর্মচারীরা নিযুক্ত রয়েছে তারা সরকারের কাছে জমিদারী হস্তান্তরিত হওয়ার পর তাদের চাকুরী হারাবে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ক্ষেত্রে শুধু জমিদার নয়, এই সমস্ত কর্মচারীদের স্বার্থ এবং জীবিকা সংস্থানের উপায় সম্পর্কেও বিবেচনা করা দরকার। কিন্তু সরকারের জমিদারী ক্রয় বিলটিতে তাদের সম্পর্কে কোন উল্লেখই নেই। স্পেশাল কমিটির সদস্যদেরকে তিনি এ ব্যাপারটি বিশদভাবে বিবেচনা করে সেই সমস্ত কর্মচারীদেরকে তাদের কাজে পুনর্বহাল করার জন্যে আবেদন জানান।[৭]

মহম্মদ আবদুস সালাম স্পেশাল কমিটির সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, পরিষদের ১৭১ জন সদস্যের মধ্যে ৪৫ জনকে স্পেশাল কমিটিতে রাখা হয়েছে। কমিটির মধ্যে এত অধিক সংখ্যক সদস্য

রাখার পরিবর্তে তিনি সকল পরিষদ সদস্যকে নিয়েই কমিটি গঠনের কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে, যে ৪৫ জন সদস্যকে নিয়ে স্পেশাল কমিটি গঠন করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ২০ জন জমিদার শ্রেণীর লোক। এই জমিদারদের দ্বারা প্রজাদের স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হবে সে কথা বিবেচনার জন্যে তিনি পরিষদকে আহ্বান জানান।[৮]

এরপর সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার প্রাক্তন সদস্য শামসুদ্দীন আহমদ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট স্পেশাল কমিটির থেকে ১৭১ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদেই বিলটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া অধিকতর সমীচীন। বিলটিতে জমিদার ও বর্গাদারদের রাজস্বকে পৃথকভাবে দেখার সুপারিশ করে তিনি সত্বর বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ প্রসঙ্গে বলেন:

> জমিদারদেরকে আমাদের সরাসরি বলে দেওয়া উচিত যে, অতীতে তারা জনগণের অর্থ নিয়ে ইচ্ছেমতো ছিনিমিনি খেলেছে কিন্তু এখন পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর জমির ওপর তাদের কোন অধিকার আর নেই। জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্নটি নিয়ে অযথা সময় নষ্ট না করে সরকারের উচিত এখনই জমিদারীর ভার নিজের হাতে নেওয়া এবং তারপর উপযুক্ত বিচার বিবেচনার পর স্থির করা জমিদারদেরকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে কিনা। আমি নিজে অবশ্য মনে করি যে, জমিদারদেরকে এক কানাকড়ি ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং আমি বলি যে, এটা পৃথকভাবে দেখতে হবে—জমিদারদের রাজস্ব ও অন্যদের রাজস্বকে পৃথক করা দরকার।[৯]

পূর্ব বাঙলা সরকার কর্তৃক আনীত জমিদারী ক্রয় বিলটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে এর পর মজিবুর রহমান* বলেন:

> যে ৪৫ জন মেম্বর নেওয়া হয়েছে তাদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আমার বন্ধু হামিদুল হক সাহেব নিজেও একজন জমিদার। তাঁর নিজেরও যথেষ্ট স্বার্থ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত মেম্বরদের ভিতর যাঁরা এ সম্বন্ধে ওয়াদা করেছেন তাঁরা সে ওয়াদা রাখবেন কিনা তাতে আমার ঘোর সন্দেহ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখতে পাই যে

* নোয়াখালীর সদস্য—ব.উ.

গত বিলে* ছিল এক পরিবারে খাস দখলে ১০০ বিঘার বেশী জমি রাখতে পারবে না। কিন্তু জনাব হামিদুল হক সাহেব এই বিলে ব্যবস্থা করেছেন সে স্থলে ২০০ বিঘা রাখতে পারবে। এখন এক একটা পরিবার কত রকমে পৃথক পৃথক হয়ে পৃথক পৃথক Record-এ প্রতি পরিবারে ২০০ বিঘা করে জমি দখল করবে। এক এক পরিবার কত জায়গায় বিচ্ছিন্ন হবে তারপরে হিসাব করলে সারা বাঙলাদেশে দরিদ্র প্রজাদের জন্য ১ ছটাক জমিও পাওয়া যাবে না। সুতরাং এই বিল অনুসারে ৬ থেকে ১৫ গুণ Compensation দিয়ে তার উপর ২০০ বিঘা জমি রাখলে দেশের জনসাধারণের জন্য কিছুই রাখা হবে না। তারপর এই Compensation এর মাপ জরিপ হওয়া এই মন্ত্রীত্বের জীবনে ও আমাদের মেম্বর জীবনে কুলাবে না। আবার এক মন্ত্রীত্ব আসবে নূতন নূতন মেম্বর আসবে তারা জনসাধারণের কাছে এমনিভাবে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করবে জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিবে। আমাদের দাবী, দেশের দাবী এবং আমাদের কথার মূল্য যদি জনসাধারণের কাছে রাখতে হয় তাহলে আমাদের প্রধান মন্ত্রীর কাছে আমাদের নিবেদন যে Ordinance করে অতি সত্বর জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করুন। পরে হিসাব নিকাশ করে যাকে যা দিতে হয় আস্তে আস্তে দিন। তা না'হলে দেশবাসীকে বুঝাতে পারবেন না দেশে মুখ দেখাতে পারবেন না, দেশের জনসাধারণ বিদ্রোহ করবে।[১০]

মুজিবুর রহমানের এই বক্তৃতার পর শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদ জমিদারী উচ্ছেদ প্রসঙ্গে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু প্রশ্নের অবতারণা করে 'সংখ্যালঘু' জমিদারদের প্রতি সুবিচারের আহ্বান জানিয়ে পরিষদ সদস্যদের বলেন:

এই বিষয়ে আমরা যখন একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি তখন আমি আমার বন্ধু শামসুদ্দীন আহমদ অথবা মজিবুর রহমানের মতো সুর অথবা মেজাজ নেওয়ার পক্ষপাতী নই। স্যার, এ ব্যাপারে পরিষদের ভূমিকা হলো বিচারকের। আপনারা কি এখানে কেবলমাত্র সংখ্যাগুরুদের স্বার্থ দেখার জন্যেই আছেন? সংখ্যালঘুদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও কি আপনাদের কর্তব্য নয়? আপনারা হলেন বিচারক। আবেগের দ্বারা চালিত না হয়ে আমি আপনাদেরকে বিষয়টি বিবেচনা করতে এবং এমন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বলি যে সিদ্ধান্ত কার্য-

* যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা কর্তৃক ১৯৪৭ সালে আনীত বিল—ব.উ.

কর করা হবে। জমিদারদের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে। একদল জমিদার আছে যারা সকাল বেলা উঠে হঠাৎ একদিন দেখলো যে তারা বিরাট ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে বসেছে এবং সেই হিসেবে জমিদারীর জন্যে তাদেরকে এক কপর্দ্দকও নিয়োগ করতে হয়নি। অন্য জমিদারদেরকে জমি কেনার জন্যে অর্থ নিয়োগ করতে হয়েছে। আপনাদেরকে দেখতে হবে যে জমিধারদেরকে ক্ষতিপূরণ না দিলে তাদের ওপর এর কি ফল বর্তাবে।[১১]

শিক্ষা মন্ত্রী আবদুল হামিদের পর শরফুদ্দীন আহমদ বলেন যে, বিলটিতে জমিদারী উচ্ছেদ সম্পর্কে কোন সময় সীমা নির্দেশ করা হয়নি। এই ধরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিলে যদি সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকে তা হলে জমিদারী উচ্ছেদ অনিশ্চিতভাবে বিলম্বিত হবে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।[১২] মহম্মদ ইসরাইল বলেন যে ৩১শে জুলাই, ১৯৪৮ এর মধ্যেই যাতে স্পেশাল কমিটি তাদের রিপোর্ট পরিষদে যথারীতি পেশ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। অতীত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, স্পেশাল কমিটি সাধারণতঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট দিতে সক্ষম হন না।[১৩]

বিলটির আলোচনা প্রসঙ্গে খায়রাত হোসেন ক্ষতিপূরণ, ২০০ বিঘা পর্যন্ত জমি রাখার ব্যবস্থা এবং সাধারণভাবে জমিদারী উচ্ছেদ প্রশ্নের উল্লেখ করে বলেন:

জনাব হামিদুল হক চৌধুরী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন যে বাংলার জনসংখ্যার খুব কম করে হ'লেও ৪ কোটির ১ কোটি লোক খাজনা আদায় করে খায়, এই এক কোটি লোকের চিন্তা তাঁর মাথার ভিতর ঢুকে গিয়েছে কি করে তাদের Compensate করবেন। যাই হোক আজকে শুনলাম তাঁর এক কোটি কমে ৫০ লক্ষে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ অর্দ্ধেক কমে গিয়েছে। এতদিন আমার জানা ছিল যে East Bengal Minority Community বলতে হিন্দুদের বুঝায় কিন্তু আজকে মাননীয় আবদুল হামিদ সাহেবের কাছে শুনছি জমিদার জোতদার তারাও minority Community তা'হলে এই House এর মধ্যে ৭ জন মাত্র মন্ত্রী আছেন তাঁরাও minority Community. Lord Cornwallis গোটা কয়েক লোক ডেকে নিয়ে জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিলেন। অথচ হামিদুল হক চৌধুরী

সাহেব যাঁর পিছনে সৈন্য আছে, আনসার বাহিনী আছে তিনিও এই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করতে গিয়ে Compensation এর কথা চিন্তা করছেন। Compensation এর জন্যে শুনা যাচ্ছে যাদের জমির আয় ২ হাজার টাকা তারা জমির আয়ের ১৫ গুণ ক্ষতিপূরণ পাবে। এরপর নিশ্চয়ই বড় জমিদাররা তাদের জমিদারী ৭ নামে ভাগ করে ২ হাজার টাকার বেশী income না দেখিয়ে মোটা মোটা Compensation আদায় করবে এবং জমিও এমনভাবে বেনামি করে ভাগ করে দেখাবে যাতে প্রত্যেক খণ্ডিত family-র ২00 বিঘার বেশী জমির হিসাব পাওয়া যাবেনা। তারা Compensation ও আদায় করবে অথচ জমি কিছুই বার করা যাবে না। এখানকার member দের অধিকাংশই Compensation এর পক্ষপাতী। আজকার দিনে যখন কোন election হয় তখন খুব জোর গলায় বলা হয় যে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদের ব্যবস্থা করব ইত্যাদি তারপর কাজের বেলায় তার উল্টা। Special Committee মেম্বরদের report থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।[১৪]

স্পেশাল কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে খয়রাত হোসেনের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে, তা কমিটির সদস্যদের প্রতি একটা বিরূপ মন্তব্যস্বরূপ।[১৫] কিন্তু ধীরেন দত্তের এই প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাজশাহীর মাদার বক্স ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে স্পেশাল কমিটির ভূমিকা প্রসঙ্গে এর পর বলেন:

জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গিয়ে যে ভাবে মেম্বর নিয়োগ করেছেন তার কোন কাজ আমরা বুঝতে পারিনা। এটা সময়ের দাবী যে বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করতে হবে। আজ যদি Special Committee থেকে এই রকম মতবাদ হয় যে জমিদারকে খেসারত দিতে হবে তাহলে জনসাধারণ অনেকে এটা অনুভব করতে পারবে যে Special Committee-তে যে সব মেম্বর নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের নিরপেক্ষ ব্যবস্থার জন্য করা হয় নাই। আমি গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করছি যাতে দেশে কোন বিপ্লব সৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থা করুন। —জমিদারীর কোন খেসারত দেওয়া যায় না। যে ভাবে এবং যে অবস্থায় জমিদারী পরিচালিত হয়েছে তাতে দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে। এই সব মর্মান্তিক

অত্যাচারের কথা যদি আমরা মনে করি তাহলে Compensation এর কথা কল্পনাও করতে পারি না। অনেকে বলছে Compensation না দিলে জমিদার কি করে বাঁচবে, Special Committee যদি এই সব কথা বিবেচনা করে Compensation দেওয়ার কথা চিন্তা করেন তাহলে আমি বলব গভর্ণমেন্ট অগণিত জনসাধারণের দিকে তাকাবেন না মুষ্টিমেয় জমিদারের দিকে তাকাবেন। খেসারত দিয়ে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কোন অর্থ হয় না। এ কথা বিবেচনা করা উচিত।[১৬]

বিরোধীদলের নেতা বসন্তকুমার দাস স্পেশাল কমিটির প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। শুধু তাই নয়। তিনি আরও বলেন যে, স্পেশাল কমিটির রিপোর্ট পরিষদে পেশ করার পর হয়তো তাকে আবার একটা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর আবশ্যক হতে পারে।[১৭]

সিলেটে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কতকগুলি বিশেষ দিকের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সেগুলির প্রতি বিলটিতে কোন লক্ষ্য রাখা হয়নি। এই বিশেষ দিক সম্পর্কে সরকারের করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেন:

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার সময় ও তার পরেও বাংলার অন্যান্য জেলায় যে নীতি অবলম্বিত হচ্ছে শ্রীহট্টের সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য রয়েছে। Government এর কাগজ পত্রে দেখা যায় সিলেটের তৎকালীন কালেক্টর Lindsay সাহেব Sylhet district এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব সম্পর্কে যে নীতি উল্লেখ করেছিলেন তাতে শ্রীহট্টের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক সৃষ্টি হয়েছিল। সিলেটে প্রকৃতপক্ষে কোন জমিদার ছিলেন না। যাহাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছিলো তাহার অধিকাংশই permanent proprietor এই কথাই Lindsay সাহেব বলিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম ও বাখরগঞ্জ জেলাতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের best advantage পেয়েছিল। কালক্রমে খরিদ বিক্রীর সূত্রে এটির পরিবর্ত্তন হয়ে এসব জেলায়ও বহু বৃহৎ জমিদারী সৃষ্টি হইয়াছে।—শ্রীহট্টে প্রায় সকল পরগণাতে বহু তালুকের জমি এজমালী থাকা শ্রীহট্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব থেকে শ্রীহট্টে স্বত্বের নানা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সুষ্ঠুভাবে এই সকল জটিল স্বত্বের মীমাংসা করিতে হইলে বহু বৎসর ব্যাপী এক সার্ভে হওয়া

দরকার এবং এই সার্ভের ভিত্তিতে record of right প্রস্তুত করিতে হইবে।[১৮]

বিলটির প্রাথমিক আলোচনার শেষে তফজ্জল আলী জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং বর্গাপ্রথা সংক্রান্ত অংশটিকে মূল বিল থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করে বস্তুতঃপক্ষে জমিদার জোতদারদের সপক্ষে নিম্নলিখিত বক্তব্য হাজির করেন:

> বর্গাপ্রথাকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল এবং তাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদের জন্যে আনীত বিলের অংশ হিসেবে রাখা উচিত ছিল না। স্যার, আমি আশা করি কেউ আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বড়ো জোতদারদের হয়ে অথবা অযৌক্তিকভাবে প্রজাদের হয়ে কথা বলছি না। জমিদারীর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কিনা এবং দিলেও তার পরিমাণ কি হবে সে সম্পর্কেও আমি এখন কোন মতামত দিতে চাই না। কিন্তু স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যদি এই বিষয়টি এই আইনের বাইরে রাখতেন তাহলেই খুব ভাল হতো। স্যার, আমার ক্ষুদ্র মতে বিলটির সমস্ত অংশই নিতান্ত অস্পষ্ট এবং এতে যে পদ্ধতি অনুসরণের ব্যবস্থা হয়েছে তাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদ একটা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। মাননীয় মন্ত্রী এই সব দিকগুলি বিবেচনা করুণ আমি তাই চাই। স্পেশাল কমিটিতে যখন বসবো তখন এগুলি আলোচনার সুযোগ আমরা লাভ করবো। স্যার, কোন বক্তার নাম উল্লেখ না করে আমি বলবো যে, জমিদারদের ন্যায্য এবং আইনসঙ্গত স্বার্থকে উপেক্ষা করার কোন অধিকার আছে এ কথা বলা ঠিক নয়।[১৯]

'জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল' এর ওপর প্রাথমিক বিতর্কের শেষে অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী বলেন যে, বড় জমিদারদেরকে তাঁরা ৬ গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলেছেন কিন্তু তাঁদের ওপর আরও এত রকম কর ধার্য হয়েছে যে, এই ক্ষতিপূরণ বাস্তবপক্ষে ৪ গুণের বেশী হবে না। সেদিক দিয়ে এই বিলটিকে ১৯৪৭ সালের বিলের থেকে অধিকতর প্রগতিশীল বলে তিনি দাবী করেন, কারণ ঐ পূর্ববর্তী বিলটিতে ক্ষতিপূরণের হার নির্দিষ্ট হয়েছিল ৮ থেকে ১৫ গুণ।[২০]

এরপর ক্ষতিপূরণের প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন:

> ১০০ অথবা ১৭৫ বৎসর আগে তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে সম্পত্তি

দেওয়া হয়েছিলো কোন ব্যক্তি অথবা পরিবারকে পূর্ব পুরুষদের সেই সম্পত্তি থেকে কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে বঞ্চিত করা কি উচিত অথবা ন্যায়সঙ্গত? তাদেরকে কিছুই না দিয়ে কিভাবে আপনারা এই জমিদারীগুলি পেতে পারেন? এটা বলা কি উচিত হবে যে, বৎসরের পর বৎসর এবং পুরুষানুক্রমে এই জমিদাররা জনগণকে শোষণ করছে সুতরাং এই জমিদারদের সন্তানদেরকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত নয়? এই. জমিদার শ্রেণী দেশের প্রচলিত আইন কানুনের ওপর নির্ভর করে নিজেদের আয় শিল্প, শহরে বাড়ীঘর নির্মান অথবা ব্যাঙ্কে নিয়োগ না করে নিজেদের সন্তানদের জীবিকার উদ্দেশ্যে দেশের বিঘোষিত নিরাপদ সম্পত্তি জমিতে নিয়োগ করেছে। অন্যদের সাথে আমি কি হিসাবে তাদের পার্থক্য করবো? এটা কোন ব্যক্তির প্রশ্ন নয়, এটা কোন গ্রুপের প্রশ্ন নয়, এটা এমন একটা প্রশ্ন যা দেশের সমস্ত অংশকে স্পর্শ করবে। যদি আমরা এই জমিদারীগুলিকে এবং খাজনাভোগী স্বার্থকে কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উচ্ছেদ করি তাহলে তার ফলে দেশের কোন উপকার হবে কিনা সেটা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে আমরা দেখতে পারি। পরীক্ষা এবং সমীক্ষার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট তথ্য আপনাদের সামনে পেশ করছি। এই সমস্ত সংখ্যা সংগ্রহ করার জন্যে আমি গ্রামে যাইনি, এগুলি রাজস্ব বিভাগ ও কৃষি আয় কর বিভাগের দ্বারা সংগৃহীত হয়েছে। ৫১ লক্ষ খাজনাভোগী স্বার্থ আছে। আমি এর নির্ভুলতার সম্পর্কে কোন প্রমাণ দিতে পারি না। এই স্বার্থগুলি যদি সরকার নিয়ে নেন তাহলে প্রায় ২০ লক্ষ পরিবার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং রাষ্ট্র যদি তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তাহলে তারা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং কোন রাষ্ট্রই তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বকে পরিত্যাগ অথবা অস্বীকার করতে পারে না। প্রায় ২০,০০০ জন বিহার থেকে এখানে এসেছেন এবং তাঁদের কয়েক মাসের ভরণপোষণের জন্য সরকারকে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। উপযুক্ত ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা না করে নিজের দেশের লোকের সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত করাকে কোন সরকার এবং কোন দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিই সম্ভব অথবা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুবিবেচনামূলক মনে করতে পারে না। খাজনাভোগী

স্বার্থকে হাতে নিয়ে এসে আপনারা কৃষকদের উপকার করতে যাচ্ছেন। কিন্তু ক্ষতিপূরণ না দিয়ে যদি আপনারা সেটা করেন তাহলে আপনারা এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করবেন যাদের ভরণপোষণ আপনাদের নিজেদের খরচেই চালাতে হবে।[২১]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ২৯৯ ধারা সম্পর্কে হামিদুল হক বলেন যে, সর্ব্বোচ্চ আদালতের ব্যাখ্যা অনুসারে সেই ধারা বলে কাউকেই জমিদারী, শিল্প, বাণিজ্য অথবা অন্য কোন স্বার্থ থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীত বঞ্চিত করা চলে না।[২২]

হামিদুল হক চৌধুরীর এই বক্তৃতার পর বিলটিকে স্পেশাল কমিটিতে সোপর্দ্দ করা এবং তাঁদের রিপোর্ট ৩১শে জুলাই, ১৯৪৮ এর মধ্যে পেশ করার জন্যে নির্দেশ দিয়ে পরিষদের সেদিনকার অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

৭ই এপ্রিল পূর্ব বাঙলা পরিষদে জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ত্ব বিলটি পেশ করার পর সে বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য সমালোচনা অথবা মন্তব্য কোন বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক দল অথবা পত্র পত্রিকায় করা হয়নি। অবশ্য সে সময় সক্রিয় বিরোধী দল বলতে শুধু ছিলো পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি এবং গণতান্ত্রিক যুব লীগ। কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস তখন সবে মাত্র শেষ হয় এবং পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত তাঁদের রাজনৈতিক কর্মধারার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা করে। সেই পরিবর্ত্তনের মুখে তাঁদের পক্ষে উপরোক্ত বিলটির কোন প্রকাশ্য সমালোচনা সম্ভব হয়নি।

ঢাকা-কেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক যুব লীগ সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যে জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিলটির বিরুদ্ধে কোনও ব্যাপক আলোচনা অথবা আন্দোলন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। তবে ১৯৪৮ এর সেপ্টেম্বর মাসে ঈশ্বরদীতে তাঁদের রাজশাহী বিভাগীয় সম্মেলনে "জমিদারী উচ্ছেদের ভাওতা দিয়া কৃষক উচ্ছেদ চলিবে না। বিনা খেসারত জমিদারী উচ্ছেদ ও কৃষককে জমির মালিক করিতে হইবে" এই শীর্ষক একটি প্রস্তাবে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে এ সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করেন। প্রস্তাবটির বিবরণ হলো নিম্নরূপ:

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজের শাসন ও শোষণ কায়েম করিবার জন্য জমিদারী প্রথা সৃষ্টি করিয়া আমাদের দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। দেশে চিরস্থায়ী খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি

করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট এই ঘৃণ্য প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকের আন্দোলন বহুদিনের আন্দোলন। আজাদী পাইলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে জমির মালিক করা হইবে—ইহাই ছিল নেতাদের ওয়াদা। আজ পূর্ব পাকিস্তান সরকার জমিদারী উচ্ছেদের এক বিলও উত্থাপন করিয়াছে। কিন্তু এই বিলে যে সমস্ত ধারা রহিয়াছে তাহা সমস্তই কৃষক স্বার্থের বিরোধী। এই বিলের মূল ধারাগুলি হইতেছে—(১) জমিদারদের জন্য ৪০ কোটি টাকারও অধিক ক্ষতিপূরণ, (২) জোতদারদের জন্য জমি, (৩) জমিদারের ঋণ মকুব, (৪) ওয়াকফ্ ও দেবোত্তর সম্পত্তির সুবিধা ইত্যাদি।
এই সম্মেলনের মতে উপরোক্ত সমস্ত ধারাগুলি কৃষক স্বার্থবিরোধী এবং বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে জমির মালিক করিবার মূল দাবী গৃহীত হয় নাই। এই বিল পাশ হইলে জমিদারী উচ্ছেদের পরিবর্তে কৃষক উচ্ছেদেরই ব্যবস্থা হইবে। জমিদারী উচ্ছেদের নামে এইরূপ কৃষক বিরোধী বিল উত্থাপন করিয়া সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনমতের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। এই সম্মেলন প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহার করিয়া বিনা ক্ষতিপূরণে ও "কৃষকই জমির মালিক" এই নীতির ভিত্তিতে জমিদারী উচ্ছেদের দাবী জানাইতেছে।

এই সম্মেলন মনে করে যে তুমুল আন্দোলন ব্যতীত সরকার কৃষকের দাবী অনুযায়ী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিবে না। কৃষকের শ্রেণী সংগঠনকে জোরদার করিয়াই এই আন্দোলন সফল হইতে পারে। এই সম্মেলন পূর্ব পাকিস্তানের যুব সমাজকে কৃষকের শ্রেণী সংগঠনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া জমিদারী উচ্ছেদকে সফল করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছে।[৭৩]

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে কোন "তুমুল আন্দোলন" সংগঠিত করা বিভিন্ন কারণে গণতান্ত্রিক যুব লীগের দ্বারা আর সম্ভব হয়নি।

৩

বিশেষ কমিটির রিপোর্ট

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ বিল পর্যালোচনার জন্যে নিযুক্ত বিশেষ কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে হামিদুল হকের পরবর্তী রাজস্বমন্ত্রী তফাজ্জল আলী ৩রা আগষ্ট পূর্ব বাঙলা সেক্রেটারিয়েটে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন।[১] সেই সম্মেলনে তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারী উচ্ছেদ করতে হলে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক জমিদারদেরকে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এবং জমিদারী সরকারী কর্তৃত্বে বর্তানোর পর তার থেকে সরকারের বাৎসরিক আয় দাঁড়াবে ২ কোটি ৪১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার বেশী। জমির সিলিং সম্পর্কে তিনি বলেন যে, মাথা পিছু ১০ বিঘা হিসেবে প্রতি পরিবারের ১০০ বিঘা জমি রেখে উদ্বৃত্ত খাস জমি সরকার নিজের হাতে নিয়ে আসবেন এবং পরে তা ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বন্টন করবেন।

যারা নিজে অথবা পরিবারের লোকজন দিয়ে জমি চাষ করে এবং যাদের তিন একরের কম কৃষি জমি আছে তাদেরকেই প্রথম জমি বিলি করা হবে বলে বিশেষ কমিটি সুপারিশ করেন। এই সমস্ত সরকার অধিকৃত জমির প্রজাদেরকে খাজনা দিতে হবে। পূর্বে যে সমস্ত জমি নিষ্কর ছিলো সেগুলিকে নিষ্কর না রেখে তার জন্যেও উপযুক্ত খাজনা ধার্য করা হবে। অর্থাৎ খাজনা কাউকে মাফ করা হবে না।

সরকার কর্তৃক উদ্বৃত্ত জমির দখল নেওয়ার পর যে সকল চাষী পরিবারের ১০০ বিঘার কম জমি আছে তারা ব্যতীত অন্য কেউ অতিরিক্ত জমি ক্রয় করতে পারবে না। যারা কৃষিজীবী নয় তারা কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি নিয়ে জমি ক্রয় করতে পারবে। সাংবাদিক সম্মেলনকে রাজস্ব সচিব আরও জানান যে, প্রতি বৎসর চারটি করে জেলায় জমি নেওয়ার কাজ শুরু হবে এবং এক একটি ক্ষেত্রে সে কাজ শেষ করতে সময় লাগবে তিন বৎসর করে। এই ভাবে সমস্ত জমি সরকারের অধীনে নিয়ে আসতে লাগবে চল্লিশ বৎসর। এছাড়া রেকর্ড সংশোধন করতে লাগবে আরও নয় বৎসর। কাজেই পূর্ব বাঙলা পরিষদে জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল আইনে পরিণত হওয়ার ৪৯ বৎসর পর পূর্ব বাঙলা থেকে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হবে।

যে সমস্ত জমিতে প্রজা পত্তন করা হয়েছে সেগুলির জন্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে হার বিশেষ কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছিলো তার একটি তালিকা তিনি দেন এবং তালিকাটিতে মূল বিলের সাথে বিশেষ কমিটির সুপারিশের পার্থক্যও নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করেন :

	নীট আয়	মূল বিলের হার	কমিটির সুপারিশ
১।	৫০০	১৫ গুণ	১০ গুণ
২।	৫০১—২০০০	১৫ ,,	৮ ,,
৩।	২০০১—৫০০০	১২ ,,	৭ ,,
৪।	৫০০১—১০,০০০	১০ ,,	৬ ,,
৫।	১০,০০১—২৫,০০০	৮ ,,	৫ ,,
৬।	২৫,০০১—৫০,০০০	৮ ,,	৪ ,,
৭।	৫০,০০১—১,০০,০০০	৭ ,,	৩ ,,
৮।	১,০০,০০০ এর উপর	৬ ,,	২ ,,

রাজস্ব সচিব তফজ্জল আলীর সাংবাদিক সম্মেলনের পর স্পেশাল কমিটির সুপারিশকে সাধারণভাবে অভিনন্দন জানিয়ে দৈনিক আজাদ ৫ই আগষ্ট একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বলেন :

> নীতি হিসাবে আমরা জমিদারীর এই ক্ষতিপূরণ দানের বিরোধী। তবে এই প্রসঙ্গে আমরা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ক্ষতিপূরণকে এই কমিটি যথাসাধ্য কম করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তা বুঝা গিয়াছে। এজন্য সরকার বা দেশবাসীর উপর বিপুল ঋণভারের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া যাতে না হয় তার জন্যও তাদের তৎপরতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। বস্তুত ক্ষতিপূরণ দানের ব্যাপারে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া কর্তৃপক্ষকে আমরা আইন রচনা করিতে অনুরোধ জানাই। এ টাকা যাতে বিদেশে চলিয়া না যাইয়া এ দেশের শিল্প বাণিজ্যে নিয়োজিত হইতে পারে, তার ব্যবস্থা পাকাপাকি আইনে হওয়া উচিত। তা হইলে এই ক্ষতিপূরণের কিছুটা সার্থকতা প্রমাণিত হইতে পারে।

জমিদারী এবং মধ্যস্বত্ব ছাড়াও সরকার কর্তৃক খাস জমি দখল ও সেই জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের যে কথা রাজস্ব সচিব ৩রা আগষ্টের

সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, সে প্রসঙ্গে ৯ই অগাষ্ট অপর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দৈনিক আজাদ বলেন :

> এই সব কথা বিশ্লেষণ করিলে এ সত্যটাই সর্বপ্রথম স্বীকৃত হয় যে, সরকার "লাঙ্গল যার জমি তার" নীতি মানিয়া লইয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানে ভূমিহীন কৃষি মজুরদের দাবী এভাবে অগ্রগণ্য করিয়া জমিদারী বিলোপ সম্পর্কিত বিশেষ কমিটি একটি কাজের মত কাজ করিয়াছেন। আশা করি, আইন সভায় যখন ইহাকে বিলের আকারে উপস্থিত করা হইবে, তখন ইহা সকলের সমর্থন লাভ করিবে।

এই প্রশস্তির পর কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে উপরোক্ত সম্পাদকীয়টিতে আজাদ আরও বলেন :

> একদল কমিউনিষ্ট এবং বর্ণচোরা কমিউনিষ্ট আজ ভূমিহীন কৃষি-মজুরদিগকে ক্ষেপাইয়া স্বার্থোদ্ধারের ফিকিরে আছে। তারা তাদের দুরবস্থার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করিতেছে। "তেভাগা আন্দোলন" এবং "টঙ্ক বন্ধ আন্দোলনের" পশ্চাতে বহুবার যে কমিউনিষ্টদের কুচক্রী হস্ত সক্রিয় হইতে দেখা গিয়াছে, তা অস্বীকার করা চলে না। আজ ভূমিহীন কিষাণরা সত্য সত্যই যদি জমির মালিক হয়, তবে কমিউনিষ্টদের সকল কারসাজি সত্বরেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

৩০শে অগাষ্ট তারিখের দৈনিক আজাদে ২৮শে অগাষ্ট ঢাকার আরমানীটোলার রায় হাউসে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাঙলার জমিদারদের একটি ঘরোয়া বৈঠকের খবর জানা যায়। এই বৈঠকে জমিদাররা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সে সময় সেস্ বাকীর জন্যে জমিদারী নিলামের যে আইন প্রাদেশিক সরকার পাশ করেছিলেন সে বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন যে, জমিদাররা সরকারের সেস্ পরিশোধ করতে ইচ্ছুক থাকলেও প্রজাদের কাছে খাজনা ও সেস্ বাকী পড়ায় তাঁরা তা পরিশোধ করতে পারছেন না। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়ে যাবে বলে প্রজারা খাজনা দেওয়া নিরর্থক মনে করছে, এই কারণ দেখিয়ে জমিদারী খাস করার কাজ যাতে বন্ধ রাখা হয় তার জন্যে সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে তারা সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এ ছাড়া রাষ্ট্র কর্তৃক ভূমিস্বত্ব দখল করা হলে জমিদারদেরকে যাতে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তার জন্যেও সরকারকে অনুরোধ করার অপর একটি প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ করেন।

জমিদারদের উপরোক্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ মুখ্যমন্ত্রী, রাজস্বমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সাথে আলোচনার জন্যে তাঁরা নয়জন সদস্য নিয়ে একটি প্রতি-নিধিদল গঠন করেন। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে ঢাকার নবাব, গোলাম মাওলা চৌধুরী, সুবোধ চন্দ্র নাগ, রায়বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, অমূল্য মোহন রায়, খান বাহাদুর হাবিবউদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় পূর্ব বাঙলার জমি-দারদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তও এই সভায় গৃহীত হয়।

'পূর্ব বাঙলা জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল, ১৯৪৮' বিবেচনার জন্যে ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট স্পেশাল কমিটির প্রথম বৈঠক বসে ১লা জুন, ১৯৪৮। ৭ই এপ্রিলের পরিষদ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির রিপোর্ট দাখিলের সর্বশেষ তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছিলো ১৯৪৮ এর ৩১শে জুলাই। কিন্তু কমিটির পক্ষে ঐ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করা সম্ভব হয় নি। কারণ ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে তারা মাত্র ১৪টি বৈঠক করেছিলেন এবং সেই সমস্ত বৈঠকে বিলটির সামান্য অংশই বিবেচিত হয়েছিলো।[২] সমস্ত বিলটি বিবেচনার জন্যে তাঁদের আরও ৩৭টি বৈঠক করতে হয়েছিলো এবং তারা তাঁদের রিপোর্টের চূড়ান্ত খসড়া তৈরীর কাজ শেষ করেছিলেন ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৯।[৩] পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজস্বমন্ত্রী তফজ্জল আলী সেটি পেশ করেন ১৯৪৯ এর ১৫ই নভেম্বর।

৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ২৩ জন মূল রিপোর্টের সাথে একমত না হওয়ার ফলে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র নোট দেন।[৪] যে সদস্যেরা স্বতন্ত্র নোট দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুসলিম লীগ দলভুক্ত ঢাকা নবাব পরিবারের এস-এ সেলিম এবং সিলেটের মহম্মদ আলী হায়দার খান ও মঈনুদ্দীন আহমদ চৌধুরী।[৫] এঁরা তিনজনই হলেন পূর্ব বাঙলার মুসলমান জমি-দারদের শীর্ষস্থানীয়।

রিপোর্টটি প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত আরও ১১ জনের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে না পারার ফলে তাঁদের স্বাক্ষরও স্পেশাল কমিটির রিপোর্টে সংযোজন করা সম্ভব হয় নি।[৬] স্পেশাল কমিটির রিপোর্ট ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৯; মুদ্রাঙ্কিত করা হলেও ছাপার কাজ শেষ না হওয়ায় পরবর্তী বাজেট অধিবেশনে রাজস্ব মন্ত্রী সেটি পরিষদে পেশ করতে পারেন নি।[৭] ছাপার কাজ এতো বিলম্বিত হওয়া সত্ত্বেও সেই অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে ১১জন কমিটি সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ার ব্যাপারটি থেকে মনে হয় যে, ঐ সমস্ত

সদস্যেরা স্বতন্ত্র নোট না দিলেও ইচ্ছাকৃতভাবে রিপোর্টটিতে নিজেদের স্বাক্ষর দানে বিরত থাকেন। স্পেশাল কমিটির কয়েকজন সদস্যের উক্তি থেকেও অনেকটা তাই মনে হয়। তাঁরা পরিষদে রিপোর্টটি আলোচনার সময় বলেন যে, স্পেশাল কমিটিতে তাঁরা দলগতভাবে আলোচনা করেন নি, করেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে। ফলে দেখা গেছে যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কোন কোন সদস্যেরা অনেক বিষয় পরস্পরের সাথে একমত হয়েছেন এবং নিজেদের দলীয় সদস্যদের বিরোধিতা করেছেন।[৮] কংগ্রেস ও মুসলিম লীগভুক্ত জমিদারদের স্বার্থের একাত্মতার কারণেই যে সদস্যদের এই 'ব্যক্তিগত' ভূমিকা সম্ভব হয়েছিলো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ব্যবস্থা পরিষদের আলোচনার মধ্যেও এই ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা এই সমস্ত সদস্যদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কংগ্রেস লীগভুক্ত সদস্যদের মধ্যে অনেকেই এ ক্ষেত্রে পরস্পরের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এজন্যে যে, কংগ্রেস লীগ সদস্যদের এই 'ব্যক্তিগত' ভূমিকা এবং 'ঐক্য ফ্রন্ট' অন্য কোন গুরুতর আলোচনার সময়ে লক্ষ্যিত না হলেও তাঁদের মৌলিক শ্রেণী স্বার্থই তাঁদের মধ্যে এই মিলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলো।

স্পেশাল কমিটি তাঁদের মূল রিপোর্টে বিলটির কতকগুলি সংশোধন[৯] প্রস্তাব করেছিলেন। বিলটির প্রথম খসড়ায় মিউনিসিপ্যাল এলাকা এবং মৎস্যচাষের উপযোগী নদীগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিলো না, কিন্তু রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট ২ ধারা বাতিল করে সেগুলির অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হয়। কমিটি দুটি নোতুন অধ্যায় সংযোজন করে তাদের একটিতে (chapter IA) কতকগুলি জমিদারী স্বত্বকে তৎক্ষণাৎ ক্রয়ের ব্যবস্থা এবং অন্যটিতে (chapter IB) চাকরান জমিতে চাষীদেরকে স্বত্বদানের সুপারিশ করেন। বিলের ৭ ধারা সংশোধন করে এক ব্যক্তির খাস জমির সিলিং ২০০ বিঘা থেকে কমিয়ে ১০০ বিঘায় নিয়ে আসেন। বিলের ৮ ধারাকে নোতুনভাবে রচনা করে জমিদারী ক্রয়ের পর প্রজারা যাতে ন্যায্য খাজনা দিয়ে সরাসরি-ভাবে সরকারের অধীনস্ত প্রজা হিসেবে জমি ভোগ দখল করতে পারেন তার জন্যে সুপারিশ করা হয়। ১৯ ধারাকেও স্পেশাল কমিটি ক্ষতি-পূরণের নোতুন হার নির্দেশের উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করেন। বিলের সপ্তম অধ্যায়কে পুরোপুরি বাতিল করে তার স্থানে নোতুন অধ্যায় সংযোজন

করে ব্যবস্থা করা হয় যাতে জমিদারী ক্রয়ের পর বাকী খাজনা ও সেসু সরকার কর্তৃক আদায় এবং সেই খাজনা ও সেসুর শতকরা ৫০ ভাগ ঐসব জমিদারীর পূর্ববর্তী মালিকদেরকে দেওয়া যায়। বিলের ৫৩ ধারা সংশোধন করে কমিটি রায়তদের নিজেদের জমি ইচ্ছেমতো ব্যবহারের অধিকার দান করেন। এছাড়া ৬২ ধারা সংশোধন করে তাঁরা রায়তদের নিজেদের দ্বারা আবার জমি বর্গা দেওয়াকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। ৮২ ধারায় বিশেষ পরিস্থিতিতে খাজনার নোতুন হার নির্দিষ্ট করার যে ব্যবস্থা ছিলো স্পেশাল কমিটি তা বাতিলের পক্ষে রায় দেন। ৮৪ ধারায় খাজনা মকুফের যে ব্যবস্থা ছিলো সেটাও তাঁরা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্গা প্রথা সম্পর্কে মূল বিলটির প্রস্তাব হামিদুল হক চৌধুরী ১৯৪৮ এর ৭ই এপ্রিল পরিষদে পেশ করার পর তার ওপর যে প্রাথমিক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তাতেও তৎকালীন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি বহির্ভূত বিরোধীদলীয় সদস্য হিসেবে নোতুন রাজস্বমন্ত্রী তফজ্জল আলী মূল বিলটি থেকে বর্গা-প্রথা সংক্রান্ত অধ্যায়টি সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়ার পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন। সেই সুপারিশও স্পেশাল কমিটির রিপোর্টে কার্যকর করা হয়।[১০]

স্পেশাল কমিটিতে বিলটিকে 'মৌলিকভাবে' সংশোধনের ফলে সেটি একটি সম্পূর্ণ নোতুন বিলে পরিণত হয়েছে এই অভিযোগ এনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য অমূল্যচন্দ্র অধিকারী সমগ্র বিলটিকে স্পেশাল কমিটিতে আবার নোতুন করে সোপর্দ করার জন্যে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন।[১১] তিনি তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা দেখাতে গিয়ে বলেন[১২] যে দুই ধারায় নোতুনভাবে চাষের জমি ছাড়াও অন্য জমি অন্তর্ভুক্তি করা একটি মৌলিক পরিবর্তন ব্যতীত কিছুই নয়। কতগুলি বিশেষ জমিদারী তাড়াতাড়ি ক্রয় এবং চাকরাণ জমি চাষীদেরকে সেই সমস্ত জমিতে স্বত্ব দানের সুপারিশ বিলটির চরিত্রকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। মনোরঞ্জন ধর সহ কংগ্রেস দলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য এ বিষয়ে অমূল্য অধিকারীর সাথে একমত হন এবং বিলটিকে আবার স্পেশাল কমিটিতে পুনর্বিবেচনার জন্যে পাঠাবার সুপারিশ করে পৃথক পৃথক সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন।[১৩]

৪

বিরোধী দলীয় সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর আলোচনা

জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্নেই ব্যবস্থা পরিষদে সব থেকে দীর্ঘ এবং তিক্ত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। 'পূর্ব বাঙলা জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিলে' বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদের কোন কথা ছিলো না। উপরন্তু জমিদারদেরকে তাদের বাৎসরিক রাজস্বের ৬ থেকে ১৫ গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থাই সেখানে রাখা হয়েছিলো। সিলেক্ট কমিটি এই হারকে কমিয়ে ২ থেকে ১০ গুণ করেন। এই ব্যবস্থায় কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্যেরা সন্তুষ্ট না হয়ে জমিদারদেরকে আরও অনেক বেশী এবং 'উপযুক্ত' ক্ষতিপূরণ দানের জন্যে নানা বক্তব্য হাজির করেন। ক্ষতিপূরণের হার বৃদ্ধির এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে বাহ্যতঃ তাঁরা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে কোন সরাসরি আপত্তি না তুললেও তাঁদের অধিকাংশই যে, জমিদারী প্রথাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার দেশের সামগ্রিক উন্নতির প্রচেষ্টার দিকে অধিকতর এবং জরুরীভিত্তিক মনোযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করে বলেন যে, অন্যান্য উপায়ে জনগণের অবস্থার উন্নতির দিকেই সরকারের বেশী নজর দেওয়া দরকার। অনেক বড়ো জমিদার নিজেদের জমিদারী প্রথম চোটে যাওয়ার সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্যে সমস্ত জমিদারী একত্রে ক্রয় করে নেওয়ার দাবী জানান। কংগ্রেস বহির্ভূত দুই একজন হিন্দু সদস্য অবশ্য সরাসরিভাবে ক্ষতিপূরণ ব্যতীতই জমিদারী উচ্ছেদের কথা বলেন।

অন্যদিকে মুসলিম লীগ দলভুক্ত এবং সেই দল বহির্ভূত কিছু সংখ্যক মুসলমান পরিষদ সদস্য জমিদারী উচ্ছেদের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারী ক্রয় প্রস্তাবের ভীষণ বিরোধিতা করেন।

১৫ই নভেম্বর, ১৯৪৯, তারিখে স্পেশাল কমিটির রিপোর্টটি পরিষদে পেশ করার পর ঢাকা এলাকার ভূস্বামীদের প্রতিনিধি শীতাংশু কান্ত আচার্য প্রথমেই জমিদারী প্রথার গুণকীর্তন করতে গিয়ে বলেন[১] যে হিন্দু যুগে, আকবরের আমলে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে জমিদারেরা একটা গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছেন। জমিদারী প্রথার অবসান জমিদারদের সেই গৌরবময় ভূমিকা থেকে জনগণকে বঞ্চিত করবে একথা

পরিষদকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর বক্তৃতায় অনেক বিলাপ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সরকারকে হুশিয়ার করতে গিয়ে যে বক্তব্য পেশ করেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন :

জমিদাররা সব সময়েই সরকারের অবৈতনিক খাজনা সংগ্রাহক এবং প্রজা, জনগণ ও সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রেতা ও বাফার হিসেবে কাজ করে এসেছেন। তারা বরাবর দু' পক্ষেরই চাপ সহ্য করে এসেছেন, দু'পক্ষেরই হিতার্থে কাজ করেছেন। স্যার, জমিদার হিসেবে, আমার বিদায়ের পূর্বে আমি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই যে, সেই বাফাররা যখন আর থাকবে না তখন সরকার সরাসরিভাবে খাজনা দানকারী জনগণের সংস্পর্শে আসবেন এবং সরকারের পক্ষে সেটা মোটেই সুখকর হবে না।[২]

জমিদার ও সরকারের অধীনস্থ প্রজাদের আপেক্ষিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে শীতাংশু আচার্য বলেন :

এই আইনের মাধ্যমে সরকার জমিদারদের স্থলাভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন। এর ফলে কি প্রজাদের অবস্থার কোন উন্নতি হবে ? যদি আপনারা খাস মহল প্রজা অথবা কোর্ট অব ওয়ার্ডস প্রজাদের সাথে জমিদারদের অধিনস্থ প্রজাদের অবস্থার তুলনা করেন তাহলে তৎক্ষণাৎ আপনারা তার ফলাফল দেখতে পাবেন। আমি সাহসের সাথে একথা বলবো যে জমিদারদের অধীনস্থ প্রজারা খাস মহলের অধীনস্থ প্রজাদের থেকে অনেক ভাল অবস্থায় আছে। প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্যে তাদেরকে আপনারা কি আশ্বাস দিয়েছেন, অথবা কি আশ্বাস দেওয়ার কথা বিবেচনা করছেন ?[৩]

এর পর ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উত্থাপন করে শীতাংশু আচার্য বলেন :

জমিদারীর প্রতি কোন আকর্ষণ আর আমাদের নেই। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেলে আমরা খুশী হয়ে তা সরকারের হাতে তুলে দেবো। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ উপযুক্ত এবং যথেষ্ট হতে হবে। বিলে যে ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে সেটা কোন ক্ষতিপূরণই নয়। তা জবরদস্তিমূলক দখলেরই সমতুল্য। আইন অনুযায়ীও ক্ষতিপূরণ উপযুক্ত ও যথেষ্ট হওয়া দরকার। এ বিষয়ে ক্রয় আইনও সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট। যে পর্যন্ত তা অনুসরণ করা হয়েছিলো সে পর্যন্ত তা ঠিকই ছিলো। কিন্তু আজ পাশব সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে যদি আপনারা একটা বেআইনি

আইনকে আইনে খণ্ডিত করেন তাহলে সেই আইন আপনাদের জন্য সুবিধাজনক হলেও তার দ্বারা কোন ন্যায়বিচার হবে না। ক্ষতিপূরণ বুলিয়ন অথবা ষ্টার্লিং, পাউণ্ড অথবা ডলারে দেওয়া উচিত যাতে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় তা ভাঙানো যায়। নন নেগোশিয়েবল বণ্ড দ্বারা যদি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাহলে সমগ্র চিত্রের রং একেবারে পাল্টে যাবে। এর অর্থ দাঁড়াবে জবরদস্তিমূলক দখল। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, বিতাড়িত জমিদারদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্যে তাদের নগদ মূলধনের প্রয়োজন হবে এবং সেই মূলধনের কাজ নন্-নেগোশিয়েবল বণ্ডের দ্বারা সম্পন্ন হবে না।[৪]

স্পেশাল কমিটির রিপোর্টে (chapter 1 A) কতকগুলি জমিদারী প্রথম চোটে তাড়াতাড়ি নিয়ে নেওয়ার যে প্রস্তাব হয় সে বিষয়ে শীতাংশু কুমার আচার্য বলেন :

আপনাদের অবগতির জন্য আপনাদের প্রস্তাবের আর একটি জঘন্য দিক সম্পর্কেও আমি কিছু বলবো। মাত্র কয়েকজন জমিদারকে কেন বাছাই করা হয়েছে? অতীতে ভালভাবে জমিদারী চালানোর শাস্তি হিসেবেই কি তাদেরকে এই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? স্যার, আমি এ ব্যাপারে আরও বলতে চাই যে, দুর্ভাগ্যবশত: অধিকাংশ বড়ো জমিদাররা হিন্দু হওয়ার ফলে তা প্রস্তাবিত বিলটিকে একটা সাম্প্রদায়িক চরিত্র দান করবে। আমাদের সন্দেহ হয় যে, প্রথম দফা বলিদানের পর উচ্ছেদের পরবর্তী পরিকল্পনাকে সরকার আর স্পর্শ না করে তাকে ঠাণ্ডা গুদাম ঘরে ফেলে রাখবেন। এই অবস্থায়, স্যার, উচ্ছেদ যদি করতেই হয় তাহলে ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত জমিতে সমস্ত রকম অধিকারই বিলোপ করতে হবে, এই মর্মে কি পরিষদ সুস্পষ্ট রায় দান করবে?[৫]

এর পর নিজের বক্তৃতা শেষ করার পূর্বে শীতাংশু আচার্য কমিউনিজম সম্পর্কে পরিষদকে ভয় দেখিয়ে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন :

আমরা বোধহয় সরকারকে দেখবো কমিউনিজমকে ডেকে আনতে যা যা আমাদের সরকারের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। সূত্রপাতের চেহারা যদি এই হয়, তাহলে ভবিষ্যতের চিন্তা করে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠছে। এটা খুব কঠোর শোনাতে পারে কিন্তু যারা এদেশকে

বহু শতাব্দী ধরে শাসন করেছে তাদের থেকে এই বিদায়কালীন উপদেশ আপনারা গ্রহণ করতে পারেন। তাদের অভিজ্ঞতার তুলনায় আপনাদেরকে বড়ো জোর দুগ্ধপোষ্য অথবা গতমাসে ভূমিষ্ঠ শিশু বলা চলে।[৬]

ঢাকা এলাকার ভূস্বামীদের প্রতিনিধি শীতাংশু কুমার আচার্যের বক্তৃতা থেকে উপরোক্ত অংশগুলি উদ্ধৃত করার কারণ সমগ্র বিলটির ওপর কংগ্রেস সদস্যদের আলোচনা ও বিতর্ক এইসব বক্তব্যের কাঠামোর মধ্যেই মোটামুটি-ভাবে সীমাবদ্ধ থাকে। তৎকালে পূর্ব বাঙলার জমিদারী স্বার্থের বড়ো তরফের প্রতিভূ হিসেবেই তাঁরা এই ভূমিকা পালন করেন।

২ নম্বর ধারা বাতিল এবং IA ও 1B পরিচ্ছেদ সংযোজনের বিরুদ্ধে মনোরঞ্জন ধর কর্তৃক আনীত সংশোধনীর সপক্ষে ১৫ই ও ১৬ই নভেম্বর কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার ধীরেন দত্ত বক্তৃতা করেন। সংশোধনীর সমর্থনে বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেও তাঁর বক্তৃতায় জমিদারী উচ্ছেদ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সমূহেরও উল্লেখ থাকে।

কিছু সংখ্যক জমিদারদের জমিদারী প্রথম দফায় সরকারী কর্তৃত্বে নিয়ে আসার জন্যে IA অধ্যায়ে সিলেক্ট কমিটি যে ব্যবস্থা রাখেন সে সম্পর্কে ধীরেন দত্ত বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কোন রেকর্ড অব রাইটস তৈরী করার পূর্বেই সমস্ত জমিদারী উচ্ছেদ করা। তার আরও অর্থ হচ্ছে জমি-দারদের মধ্যে কারও কারও বিরুদ্ধে সরকারী আমলাতন্ত্র কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন। এ প্রসঙ্গে খাজা সেলিমের অনৈক্যমূলক নোটের[৭] উল্লেখ করে বলেন যে, তিনিও সেই নোটে বলেছিলেন যে রেকর্ড অব রাইটস তৈরী না করে কোন জমিদারী সরকার নিজের হাতে নিতে পারেন না।*

---

*কংগ্রেস দলের নেতা বসন্তকুমার দাসও তাঁর ২১শে নভেম্বরের পরিষদ বক্তৃতায় রেকর্ড অব রাইটস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে খাজা সেলিমের নোটের উল্লেখ করেন।[৮] তার কারণ খাজা সেলিমের স্পেশাল কমিটির সদস্য হিসেবে ঐ নোট দেওয়ার পর মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে মন্ত্রী করে এবং তিনি নিজের পূর্বোক্ত বিরোধিতা বাদ দিয়ে সরকারী মতের সমর্থক হন। এই ভাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের পরিবার-ভুক্ত এবং পূর্ব বাঙলার জমিদারদের মধ্যে যে দুতিনজন শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন তাদের অন্যতম খাজা সেলিমকে "অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ" দেওয়ার উদ্দেশেই তাঁকে মন্ত্রীত্বের পদিতে বসান হয়। অন্য যে দুজন অনৈক্যমূলক নোট দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন সিলেট জেলার জমিদার মহম্মদ আলী হায়দার খান ও মঈনুদ্দীন আহমদ চৌধুরী।

জমিদারী উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা সাধারণভাবে স্বীকার করলেও ধীরেন দত্ত পরিষদকে বলেন যে, সেই মুহূর্তে অন্যান্য সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনের তুলনায় জমিদারী উচ্ছেদের প্রয়োজন তুলনায় অগুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, অধিক খাদ্য উৎপাদন, কৃষির উন্নয়ন, কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদির ওপরই প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। শুধু জমিদারী উচ্ছেদ করে এগুলি সম্ভব নয়।[১]

কতকগুলি সাধারণ প্রশ্নের অবতারণা করে, জনগণের ব্যাপক দুঃখ দারিদ্র এবং দেশের অর্থনৈতিক অনুন্নতির উল্লেখ করে কিভাবে জমিদারী উচ্ছেদের প্রশ্নটিকে কংগ্রেস দল "অগুরুত্বপূর্ণ" বলে চালাবার চেষ্টা করছিলো ধীরেন দত্তের ঐ বক্তব্য থেকে সেটা খুব স্পষ্ট। শুধু জমিদারী উচ্ছেদ করে জনগণের দুঃখ দুর্দশা এবং দেশের সত্যিকার অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয় একথা সত্য। কিন্তু এগুলি করার জন্যে জমিদারী উচ্ছেদ যে অন্যতম প্রাথমিক প্রয়োজন সে কথা অনস্বীকার্য। ধীরেন দত্ত কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় অন্যান্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে জমিদারী উচ্ছেদের প্রশ্নে যা বলতে চেয়েছেন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে জমিদারী উচ্ছেদ ব্যতীতই অধিক খাদ্য উৎপাদন, কৃষির উন্নয়ন, কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বস্ত্র সমস্যার সমাধান ইত্যাদি সম্ভব।

ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে ধীরেন দত্ত বলেন যে, শুধু ক্ষতিপূরণ দিলেই হবে না। জমিদারদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাঁদের জমিদারী সরকারকে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি যা বলেন সেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

> সরকারের দরকার দায়িত্ব জ্ঞান বজায় রেখে কথা বলা। আমাদের পাকিস্তান রাষ্ট্র বিশেষতঃ পূর্ব বাঙলা, যাতে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উন্নত হয় তার জন্য আমি খুব উদ্বিগ্ন। যথেষ্ট বিদেশী মূলধন ব্যতীত শিল্পের উন্নতি একেবারে অসম্ভব। নিজেদের জমিদারদেরকে সরকার যদি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দেন তাহলে তারা কিভাবে বিদেশী মূলধন প্রত্যাশা করতে পারেন? মন্ত্রী পরীষদের এটা বোঝা দরকার যে, জনগণ যখন মনে করছে যে তাদের সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপূরণে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং শিল্প সংস্থাসমূহও ঐ একইভাবে ক্ষতিপূরণ ব্যতীত নিয়ে নেওয়া হবে, সেই অবস্থায় বিদেশী মূলধন পূর্ব বাঙলায় নিয়োগ সম্ভব হবে না। স্যার, আমি আপনাকে এই বিষয়টি বিবেচনা করতে বলছি। আমি বলছি এজন্য যে, আমার রাষ্ট্রের উন্নয়নের আকাংখার

দিক থেকে আমি কারো থেকে কম নই। আমি মনে করি বিদেশী মূলধন ব্যতীত এই দেশের কোন উন্নতি সম্ভব নয়। আমি মনে করি বিদেশী মূলধন যাতে আমরা আকৃষ্ট করতে পারি তার জন্যেই যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া দরকার। সেই উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে? প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়।[১০]

ধীরেন দত্তের এই বক্তৃতায় সামন্ত স্বার্থের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের যোগসূত্রের ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক খোলাখুলিভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কৃষিতে সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার উচ্ছেদ না'হলে যথেষ্ট কৃষি উদ্বৃত্ত সম্ভব নয় এবং সেটা সম্ভব না হলে শিল্পোন্নতি বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য। এজন্যে দেশীয় শিল্পের উন্নতিকে আত্মনির্ভশীল করার জন্য সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তার সাথে সামন্ত স্বার্থের অবসান অপরিহার্য। পূর্ব বাঙলার মতো দেশে কৃষিই শিল্পোন্নয়ন এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ভিত্তিভূমি। এবং কৃষির উন্নতির জন্যে তাই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ অপরিহার্য।

শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে ধীরেন দত্তের বক্তব্য হলো, বিদেশী সাহায্য ব্যতীত কোন শিল্পোন্নয়নই সম্ভব নয়। কাজেই কৃষি উদ্বৃত্তের কথা চিন্তা না করে তিনি বিদেশী অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী মূলধনের ওপরেই সম্পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জনস্বার্থের নামে সামন্ত স্বার্থকে যাঁরা টিকিয়ে রাখতে চান তাঁদের পক্ষে এই যুক্তি খুবই স্বাভাবিক।

জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে ধীরেন দত্ত বলেন যে, ক্ষতিপূরণের থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পদ্ধতিটি আরও খারাপ, কারণ চল্লিশ বছর ধরে এই ক্ষতিপূরণ জমিদারদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি দাবী করেন যে, জমিদারদেরকে শুধু যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত তাই নয়, এই ক্ষতি পূরণের টাকা খুব দ্রুততার সাথে দেওয়া উচিত।[১১]

সকল শ্রেণীর প্রতিই সরকারের নীতি ন্যায়সঙ্গত হওয়া দরকার এই যুক্তি দেখিয়ে এর পর তিনি বলেন যে সরকারের উচিত জমিদারী উচ্ছেদের পর জমিদারদেরকে পথে না বসিয়ে 'পুর্নবাসনের' ব্যবস্থা করা।[১২]

অকৃষি-প্রজাস্বত্ব (Non-agricultural tenancy) IA পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে তিনি স্পেশাল কমিটি রিপোর্টের সমালোচনা করেন এবং বিলটিকে তিনি হয় আবার একটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে অথবা

মোতুনভাবে অন্য একটি বিল তৈরী করে তার থেকে অকৃষি প্রজাস্বত্বকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেন।[১৩]

পূর্ব বাঙলায় জমিদারদের তুলনায় জোতদারদের মধ্যে মুসলমানরা সম্প্রদায়গতভাবে শুধু যে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিলো তাই নয়, তাদের জমির পরিমাণও ছিলো অনেক। উত্তর বাঙলার জোতদারদের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই জোতদারদের বিরুদ্ধে ১৯৪৬-৪৭ এর তে-ভাগা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিলো, এরাই ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির সভায় বঙ্গীয় বর্গাদার নিয়ন্ত্রণ বিলকে বানচাল করে নিজেদের ভূমিস্বার্থ রক্ষা করেছিলো। ১৯৪৮ সালের এই জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিলের মধ্যে এবং স্পেশাল কমিটির সুপারিশে জোতদারদের স্বার্থরক্ষার ষোল আনা প্রচেষ্টা চালানো হয়। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সত্বেও সামন্ত ভূমিস্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে কৃষক স্বার্থের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের এই চক্রান্ত সম্পর্কে পরিষদে অনেকেই বক্তৃতা করেন। কংগ্রেস দলের মুখপাত্র হিসেবে এ বিষয়ে ধীরেন দত্তের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য :

> আমরা যদি এই বিল এর ৭ ধারার দিকে তাকাই তাহলেই যে কোন ব্যক্তি নিজের অধিকারে কি পরিমাণ জমি রাখতে পারবে সেটা দেখতে পাবো। এই বিলের উদ্দেশ্য অনুযায়ী অধিক পরিমাণ জমি কোন ব্যক্তির নিজের অধিকারে রাখা ঠিক নয় কারণ গরীব জনগণ ও ভূমি-হীনদের মধ্যে জমি বিতরণ করা দরকার। কিন্তু স্যার, জোতদারদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে তারা ১০০ বিঘা জমি অথবা মাথাপিছু ১০ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিঘা জমি যেটাই বেশী হয় সেই পরিমাণ জমি রাখতে পারবে। স্যার, আমার মতে এটা খুব বেশী। আমি মনে করি প্রত্যেক পরিবারে মাথাপিছু ৫ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিঘাই ন্যায়সঙ্গত পরিমাণ এবং উর্ধতম যে পরিমাণ জমি রাখতে দেওয়া হবে তার পরিমাণ ১০০ বিঘার বেশী হওয়া উচিত নয়। যে পর্যন্ত না এটা করা হবে সে পর্যন্ত ২০ জনের একটি পরিবার ২০০ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিঘা জমি আইনত: রাখতে পারবে। এটা মোটেই সঙ্গত নয়। আমরা একটি শ্রেণীর প্রতি ন্যায় এবং অপর একটি শ্রেণীর প্রতি অন্যায় করতে পারি না। এক্ষেত্রে আমি জমিদারদেরকে বোঝাতে চাইছি যাদের সম্পত্তি বিনা ক্ষতি পূরণে নিয়ে নেওয়া হবে। জোতদারদের ক্ষেত্রে শুধু ১০০ বিঘা

হয়, মাথা পিছু ১০ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিঘা হিসেবে ধরে ৩০ জনের পরিবারে ৩০০ বিঘা পর্যন্ত জমি রাখার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। স্যার, এজন্য আমি বলতে চাই যে, আমরা এক শ্রেণীর লোকের প্রতি অতিরিক্ত ন্যায় করছি, তাদের প্রতি খুব কোমল ব্যবহার করছি এবং অন্যদের প্রতি অতিরিক্ত রূঢ় ব্যবহার করছি। আমরা চীৎকার শুনতে পাই যে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে জোতদার এবং সেজন্য জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা জোতদারদের স্বার্থ রক্ষা করতে চাই। স্যার, আমি মনে করি এটা খুবই অন্যায় এবং কাউকেই ১০০ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিঘার বেশী জমি রাখতে দেওয়া উচিত নয়।[১৪]

কংগ্রেসের মধ্যে যে বড়ো বড়ো জোতদাররা ছিলো না, তা নয়। যাঁর সংশোধনী প্রস্তাবের সপক্ষে ধীরেন দত্ত এই বক্তব্য পেশ করছিলেন সেই মনোরঞ্জন ধর ছিলেন ময়মনসিংহ-এর একজন জাঁদরেল জোতদার। ১৯৪৬-৪৭ এর তে-ভাগা আন্দোলনের সময় কৃষক স্বার্থের বিরোধিতা করে নিজেদের জোতদারী শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ঐ অঞ্চলের মুসলমান জোতদারদের সাথে জোট পাকিয়ে অনেক কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।* কাজেই জোতদারদের স্বার্থ অনেকাংশে খর্ব করার জন্যে ধীরেন দত্ত এবং অন্যান্য কংগ্রেস সদস্যদের সুপারিশের অর্থ এই নয় যে- তাঁরা প্রকৃতপক্ষে জোতদারী স্বার্থ খর্ব করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা ঐ সুপারিশ নিশ্চিন্তে করতে পেরেছিলেন তার কারণ তাঁরা জানতেন, মুসলিম লীগের মধ্যে জোতদারী স্বার্থের প্রভাব ভয়ানক প্রবল। কাজেই জোতদারী স্বার্থ যতখানি সম্ভব রক্ষা করার ক্ষেত্রে তারাই সব থেকে বেশী সচেষ্ট থাকবে। এবং সে চেষ্টা তারা করলে তার ফলে তাঁদের জোতদারী স্বার্থও রক্ষা পাবে। এসব কথা জেনেই জমিদারদের তুলনায় জোতদারদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের বিশেষ উৎসাহকে নগ্নভাবে তুলে ধরে তাদেরকে বিব্রত করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা এটা করেছিলেন। এজন্যে শুধু ধীরেন দত্ত নয়, অন্যান্য কংগ্রেস সদস্যেরাও বিলের উপর বক্তৃতা করতে গিয়ে জোতদারদের প্রসঙ্গ এই একইভাবে উল্লেখ করেছিলেন।

১৬ই নভেম্বর ধীরেন দত্তের বক্তৃতার পর মুসলিম লীগ দলের হাবিবউদ্দীন আহমদ তাঁর বক্তৃতায় অন্যান্য প্রসঙ্গের সাথে নানকারদের প্রসঙ্গ

---

* কৃষ্ণবিনোদ রায়: চাষীর লড়াই। পৃষ্ঠা: ৩৫-৩৬ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার পক্ষে [illegible] কর্তৃক ২৪৯, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

উত্থাপন করেন।[১৪] তিনি বলেন যে, জমিদাররা যে কোন সময়ে মানকারদের যে কোন কাজে গোলামের মতো ব্যবহার করতে পারে এবং যে কোন সময়ে তাদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারে। তাদের জীবনের এই ভয়াবহ অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে জমিতে তাদেরকে দখলীস্বত্ব দানের ব্যবস্থা IB পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু মনোরঞ্জন ধর তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবে মানকারদেরকে সেই সামান্য অধিকার দানের বিরোধিতা করেছেন এবং সেই প্রস্তাব ধীরেন দত্ত কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। যাঁরা দরিদ্র জনগণের সপক্ষে এত বেশী কথা বলেন তাঁদের এই আচরণে হামিদুদ্দীন আহমদ বিস্ময় প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মনোরঞ্জন ধরের সংশোধনী প্রস্তাবে সব রকম অকৃষি জমিকে বিলের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতার কথাও উল্লেখ করেন।

১৫ই নভেম্বর মুকুন্দ বিহারী মল্লিকের বক্তৃতায়[১৬] বলা হয়েছিলো যে, জমিদাররা যেখানে মাসিক বিশ টাকা বেতনের কর্মচারী দিয়ে জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তার জায়গায় জমিদারী উচ্ছেদের পর সরকারকে সেই কাজের জন্য পাঁচশত টাকা মাইনের কর্মচারী রাখতে হবে এবং সেটা সরকারের পক্ষে একটা বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। এই বক্তব্যের উল্লেখ করে হামিদউদ্দিন বলেন যে, জমিদারের ঐ মাসিক বিশ টাকা মাইনের কর্মচারীরা তাদের পরিবারের জন্যে প্রতিদিন বিশ টাকা ব্যয় করে এবং দরিদ্র কৃষকদের রক্ত শোষণ করে মাসের বাকী দিনের খরচ চালায়।[১৭]

অমূল্য চন্দ্র অধিকারী বিলের কয়েকটি গুরুতর ত্রুটির দিকে পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে চা, চিনি, ইক্ষু, ও তুলা ইত্যাদির চাষ অথবা অন্য কোন বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবারের মাথা পিছু ১0 বিঘা অথবা ১00 বিঘার বেশী জমি রাখা চলবে। কিন্তু সেই ধরনের কোন ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা বৃহদাকার সমবায় সমিতি, যৌথ খামার অথবা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষের জন্যে রাখা হয়নি। তিনি বলেন যে, এই ব্যবস্থা না থাকায় জমিদারী উচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য কৃষি উন্নতির অনেকখানি ব্যাহত হবে।[১৮]

নন-নেগোশিয়েবল বণ্ডের মাধ্যমে জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থাকে তিনি সম্পত্তিচ্যুত সংখ্যালঘু জমিদারদের অর্থ আটকে রাখার একটা কৌশল বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, অধিক পরিমাণ জমির মালিক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। এই আইন কার্যে পরিণত হলে পূর্ব পাকিস্তানে থাকার জন্যে কোন উৎসাহ

জাদের থাকবে না এবং এর ফলে তারা দলে দলে পশ্চিম বাঙলায় চলে যাবে।[১৯]

বর্গাদারদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তাদেরকে কৃষি শ্রমিক হিসেবেই ধরা হয়েছে এবং তাদেরকে কোন অধিকার দানের কথা বিলের মধ্যে নেই। বর্গাদারী নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থাও এতে নেই। এর ফলে যে সমস্ত জোতদাররা খাসে জমি রাখবে তারা বর্গাদারদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করার সব রকম সুযোগ সুবিধা পাবে।[২০]

প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী স্পেশাল কমিটিতে আলোচনা ধারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন :

আমরা যখন স্পেশাল কমিটিতে এই বিল নিয়ে আলোচনা করি তখন আলোচনাকালে কোন দলগত আলোচনা হয়নি, প্রত্যেকেই আমরা ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করেছিলাম। তার ফলে অনেক সময় এমন দেখা গিয়েছে যে আমাদের দিকের লোক এবং মুসলিম লীগের লোক কোন কোন ব্যাপারে একমত হয়েছেন, আবার এমন হয়েছে যে, আমাদের লোক আমাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন।[২১]

মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস দুই দলের মধ্যেই জমিদার জোতদার শ্রেণীর সমাবেশ এবং স্পেশাল কমিটিতে প্রধানত: এই দুই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের জন্যেই যে এই 'ব্যক্তিগত ভূমিকা' এবং 'ভ্রাতৃত্বমূলক' মনোভাব সম্ভব হয়েছিলো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

IA পরিচ্ছেদ সম্পর্কে প্রভাস লাহিড়ী বলেন যে, এতে জমিদার এবং জোতদারের মধ্যে একটা পার্থক্য করা হয়েছে। সরকার ইচ্ছে করলে জমিদার, যাদের রেকর্ড অব রাইটস তৈরী আছে, তাদের জমিজমা নিয়ে যাবেন কিন্তু তাদের অধীনস্থ তালুকদার জোতদারদের জমি নেবেন না। কারণ তারা বলবে তাদের কাগজপত্র তৈরী নেই। এইভাবে তারা আরও কিছুকাল পর্যন্ত জমির অধিকার ভোগ করবে। জোতদার-দেরকে এই বিশেষ সুবিধা-দানের জন্যেই উপরোক্ত পরিচ্ছেদ নোতুনভাবে যোগ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।[২২]

খাজনার হার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, বিলে খাজনা কমানোর কোন কথা নেই। উপরন্তু উল্লেখ আছে যে, রেভিনিউ অফিসার ইচ্ছে করলে খাজনা বৃদ্ধি করতে পারবেন। রেভিনিউ অফিসারকে এই

ক্ষমতা দানের ফলে প্রজাদের স্বার্থ কতখানি রক্ষা হবে সে বিষয়ে প্রভাস লাহিড়ী ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেন।[২৩]

জমিদারীর উচ্ছেদের পর জমিদারদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, মূল বিলটি পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী বলেছিলেন যে, জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কারণ তাদের পুনর্বাসন সাহায্য করা। কিন্তু যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ জমিদারদেরকে দেওয়া হচ্ছে এবং যেভাবে দেওয়া হচ্ছে তাতে তাদের পুনর্বাসন সম্ভব নয়। এরপর ক্ষতিপূরণের ব্যাপারকে ভাঁওতাবাজী আখ্যা দিয়ে তিনি "জনগণের পক্ষ থেকে" বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবী উত্থাপন করেন।[২৪] জমিদারদের জন্যে যথেষ্ট এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ চেয়ে এবং ষ্টার্লিং, বিনিময় ইত্যাদিতে সেই ক্ষতিপূরণ দানের দাবী জানিয়ে যাঁরা পরিষদ কক্ষে ঝড় তুলেছিলেন তাঁদের দলভুক্ত প্রভাস লাহিড়ীর এই বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদের দাবী নিতান্তই একটা বিদ্বেষ প্রসূত চীৎকার ব্যতীত অন্য কিছুই ছিলো না।

সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মনোরঞ্জন ধরের সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, আলোচ্য বিলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে কায়েমী স্বার্থ থেকেই যাবে। এই কায়েমী স্বার্থ হচ্ছে জোতদারী।[২৫] প্রভাস লাহিড়ীর মতো ভাব ধারণ করে তিনিও এই বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন :

> জমিদারদের জমি যখন নিচ্ছেন তখন জোতদারদের এবং অন্যান্য সকলের জমি একেবারে নিয়ে নিন। আইনের নূতন ২টি Chapter তুলে দিন। আপনার revolution করবার বয়স আছে। If you are really a revolutionary, then bring such legislation as will aim at nationalisation of all lands.[২৬]

মনোরঞ্জন ধর ১৭ই নভেম্বর নিজের সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর বক্তৃতা প্রসঙ্গে অনেক বিষয়ের উল্লেখ করেন। মুসলিম লীগ সদস্যদেরকে লক্ষ্য করে তিনি দুঃখের সাথে বলেন যে, তাঁদের সকলেরই একটা প্রবণতা হচ্ছে জমিদারদেরকে আক্রমণ করা। কিন্তু কথা হলো যে, এই প্রথা জমিদাররা সৃষ্টি করেননি। তিনি ভোটার তালিকার থেকে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বলেন যে, সারা বাঙলায় জমিদারদের সংখ্যা হচ্ছে ১৯৫০ মাত্র। পূর্ব বাঙলায় তাদের সংখ্যা আরও অনেক কম। তিনি বলেন যে, এই সামান্য সংখ্যক জমিদারদের বিরুদ্ধে কেন এই আক্রমণ চালানো হচ্ছে তার কারণ তিনি জানেন না।[২৭]

মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সুপারিশের প্রতিবাদে

জনসভা

তারিখ—১৩ই অক্টোবর; বিকাল ৪টা

স্থান—আরমানিটোলা ময়দান।

পাকিস্তান গণপরিষদে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর "মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির" সুপারিশ পেশ করা হইয়াছে তাহা পাঠে যে-কোন আজাদ মানুষই মনে করিবে যে, গণতন্ত্রের কবরের উপর ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসী শাসন কায়েম করিয়া পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীনতা হরণ করার এক সুচতুর প্রয়াস চলিতেছে।

জনসাধারণ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আজাদী লাভের আশায় ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী ল্যাম্পপোষ্টগণকে ভোট দিয়াছিল। কিন্তু আজাদীর ৪র্থ বর্ষ পর্য্যন্তও পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হইল না। ইহাতে তাহারা টুশব্দটিও করিল না এই আশায় যে, হয়তবা তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা রূপ দেওয়ার জন্যই গণপরিষদ তাড়াহুড়া করিয়া শাসনতন্ত্র রচনা করিতেছে না। অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, যেই মূলনীতির ভিত্তিতে পাকিস্তান শাসিত হইবে বলিয়া তাহারা আশা করিয়াছিল "মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির" সুপারিশে জনসাধারণের সেই স্বপ্নসৌধ আকাশে মিলাইয়া গিয়াছে। কমিটি সুপারিশ করিয়াছে যে, কেন্দ্রে দুই-পরিষদবিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হইবে,—একটির নাম 'লোক পরিষদ' (House of people) এবং অপরটির নাম 'উচ্চ পরিষদ' (House of units)। প্রতিটি ইউনিট বা প্রদেশের সমান সংখ্যক সদস্য লইয়াই কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হইবে; যথা ৫ লক্ষ লোকের বাসভূমি বেলুচিস্তান আর ৪॥ কোটি লোকের বাসভূমি পূর্ব্ব-বাংলার সদস্য সংখ্যা এই পরিষদে সমান রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় কমিটির রিপোর্টে সরাসরি নির্ব্বাচিত লোক পরিষদ ও পরোক্ষ নির্ব্বাচিত উচ্চ পরিষদের ক্ষমতা সমান রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রাষ্ট্রের 'কর্ত্তা' ও প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচন; বাজেট, অর্থবিল অথবা যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কমূলক সমস্যা যুক্ত অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইবে। এসব ব্যাপারে এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে লোক পরিষদ ও উচ্চ পরিষদ সমান ক্ষমতাসম্পন্ন থাকিবে, সুপারিশে চাতুর্য্যের সহিত এই ব্যবস্থা রাখার অর্থ—গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা।

বিগত তিন বৎসরে পাকিস্তান পার্লামেণ্ট ও গণপরিষদে কে আসিতেছেন, কে বরখাস্ত হইতেছেন, আর কে কে চলিয়া যাইতেছেন এসব ব্যাপার দেশের জনসাধারণের অজ্ঞাত। এসব ব্যাপারে জনসাধারণকে সম্পূর্ণ দূরে রাখিয়া এবং তাহাদের রায়ের অপেক্ষা না করিয়া জোটবদ্ধ কতিপয় কোটারীর লোক নির্ব্বাচনে যাহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহারাই ভবিষ্যতের জন্য জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অপহরণের এই চেষ্টা করিতেছে। এই রিপোর্ট কার্য্যকরী হইলে বিপুল সংখ্যাগুরুর পূর্ববঙ্গ শাসক গোষ্ঠির উপনিবেশে পরিণত করিবে। হয়তবা এমন একদিন আসিবে, যে দিন বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি সময় বুঝিয়া দুই-একজন প্রধানকে হাত করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলির ন্যায় বিদেশীর সাহায্যে পাকিস্তানকে রাজতন্ত্রের কুখ্যাত জুয়ালে জুড়িয়া দিবে।

সুপারিশের অপর এক ধারায় এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের কর্ণধার বা যে-কোন মন্ত্রী (কেন্দ্রের অথবা প্রদেশের), অথবা আইন সভার যে-কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যে-কোন পাপ কার্য্য ও নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করা সত্বেও, কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে না—অর্থাৎ আইনসভায় একবার গদীনশীন হইলেই তিনি হইবেন সমালোচনার উর্দ্ধে; তিনি যাহা করিবেন তাহাই জনসাধারণকে নীরবে মানিয়া লইতে হইবে—এইরূপ বিধান রচনার ব্যবস্থা কমিটি করিয়াছে এবং মূল[illegible] নির্দ্ধারক কমিটিতে পূর্ববঙ্গীয় সদস্যগণের জ্ঞাতসারেই তাহা করা হইতেছে। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্যগণও মনোনীত হইবেন প্রাদেশিক গভর্ণরের দ্বারা এবং প্রাদেশিক আইনসভার নিকট মন্ত্রীদের কোন দায়িত্ব থাকিবে না। কমিটির রিপোর্ট [illegible]

মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সুপারিশের প্রতিবাদে জনসভা —

২রা মার্চ শান্তিদিবস পালন করুন

দেশ বিভাগের পর ঢাকার তথা পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজ রাষ্ট্রভাষার দাবীতে, দমননীতি-বিরোধী দিবসে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে, আরবী হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আরো নানা প্রগতিশীল আন্দোলনের মধ্য দিয়া স্বাধীন চিন্তাধারা ও বলিষ্ঠ সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় দিয়াছে এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্ত বারবার বানচাল করিয়া দিয়াছে। এই সকল আন্দোলন শুধু ছাত্র আন্দোলন হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকে নাই; প্রদেশব্যাপী গণ-আন্দোলনে পর্যবসিত হইয়াছে।

গণ আন্দোলনে ভীত কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সম্প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অতি পুরাতন অস্ত্র হিন্দুমুসলিম দাঙ্গাকে আবার চাঙ্গা করিয়া তুলিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করিবার চাল চালিয়াছিল। কিন্তু সচেতন ছাত্রসমাজ ও শান্তিকামী জনসাধারণ সক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা এই নয়া চক্রান্তকে রুখিয়া দাঁড়ায় এবং শান্তি ও সৌহার্দ্য ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু পূর্ণশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি? এখনো ১৪৪ ধারা, দাঙ্গা আইন মিলিটারীরাজ যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে কারো মনে পূর্ণ আস্থা ফিরিয়া আসিতে পারে না এবং কোন গণ-আন্দোলনই দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে না। অধিকাংশ শিক্ষায়তনের দুয়ার এখনও বন্ধ, শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাযন্ত্র প্রায় অচল।

এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান ঘটাইয়া পূর্ণ শান্তি ও আস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আরো জোরদার সংগ্রাম প্রয়োজন। এই শান্তির লড়াইয়ে আমাদের হাতিয়ার—সুসংহত ছাত্র ও গণশক্তি। আমাদের এমন অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যেখানে মেহনতী জনতার ভাত কাপড়ের লড়াই চলিবে, প্রগতিবাদী আন্দোলন চলিবে এবং ছাত্রদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি রুদ্ধ হইবে না। তাই জনসাধারণের মধ্যে যে কোন আকারের (তা ধর্মীয় ভিত্তিতেই হোক বা প্রাদেশিক ভিত্তিতেই হোক) সাম্প্রদায়িক সংঘাত বা তার উস্কানি আমাদের রুখিতে হইবে।

সেই জন্য আমরা ২রা মার্চ প্রদেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষায়তনে শান্তি দিবস পালনের আহ্বান জানাইয়াছি। ২রা মার্চকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমরা ঢাকার ছাত্রদের নিকট আবেদন জানাই। ঢাকা সহরের বিভিন্ন শিক্ষায়তন হইতে ছাত্রগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ১-৩০ মিনিটের সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সমবেত হোন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি কমিটি

২রা মার্চ শান্তি দিবস পালন করুন। পৃষ্ঠা ৩৩৮-৩৩৯।

BISMILLAHER RAHMANIR RAHIM

Presidential Address at the

GRAND NATIONAL CONVENTION

By

ATAUR RAHMAN KHAN

At BAR ASSOCIATION HALL, DACCA

4th November, 1950

Friends,

I feel proud to have been elected the president of this Grand National Convention, but I am sufficiently conscious of my shortcomings and I am sure you will overlook them and with your superior talents and intelligence, knowledge and experience you will help and guide me.

Ladies & Gentlemen, the issue is before us and for the matter of that before the country being very grave and vitally importan and the consequence being far-reaching, we must be extremely cautious and dispassionate in our deliberations with a full sense of responsibility and should not allow any emotional exuberance to drift us away from coming to right decision

You are all aware of the tremendous reaction and the universal resentment created throughout the country by the publication of the report of the Basic Principles sub-committee of our Constituent Assembly the acceptance of the Fundamental Rights recommendation by the consembly. All sections of our people have in one voice condemned the principles as undemocratic and un-Islamic and tending to the establishment of an autocratic regime and the enslavement of our people by a coterie of rulers These principles have been formulated with a deliberate design to cripple the rightful claims of the people and perpetuate the autocratic rule in the interest of a few at the top.

Pakistan was achieved by the sacrifices of the people who fought for their independence from the shackles of the Bristish Imperialism. They were inspired by the dream of emancipation and freedom from all bondages. In the establishment of Pakistan they saw the realisation of their dream and the fulfilment of their aspirations. The Father of the Nation, under whose singular leadership one hundred millions of muslims stood like one man in the fight tor freedom had dreamt of a homeland for these downtrodden masses in which they would live like human beings with all the bare necessities of life.

But within a short time of the establishment of Pakistan all the inspirations began to fade like smoke. All high hopes and aspirations began to shatter and people began to look a kance in bewilderment as to what became of the dream of the Quaide Azam. This was not certainly the Pakistan that the Great Leader wanted for his people. But the Leader is no more and who will hear the cry ot the people.

Ever since the establishment of Pakistan there has been persistant demand for the framing of the Constitution and the holding of general elections. The 'lamp-posts' that were voted to the assemblies on the issue of Pakistan ceased to represent the people. They had forfeited their right to remain as members of the different assemblies and fresh sets of honest and independent, free and conscious people were necessary for building Pakistan into a prosperous and powerful State. But that was not to be. The Government in its anxiety to retain power as long as possible did not respond to the demand of the people, which they characterised as anti-State and the old, imbecile and inefficient lamp-posts are still going strong.

The Constituent assembly elected on the wake of Independence was an improvised arrangement. It had neither a legal nor a representative character and although primarily meant to be a body for framing the Constitution of Pakistan it did nothing toward [illegible] and [illegible]

কম্যুনিজমের স্বরূপ

এই প্রদেশে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব ও কর্ম্মতৎপরতা বর্ত্তমানে প্রায় নাই বলিলেই চলে। কিন্তু প্রদেশের পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলিতে কম্যুনিষ্ট তৎপরতার ফলে পরিস্থিতির যে অবনতি ঘটিয়াছে, বিশেষতঃ চীন ও ব্রহ্মদেশে কম্যুনিষ্টগণ কর্ত্তৃক শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করার প্রচেষ্টার পরিণামে ব্যাপকভাবে ও বহু বর্ষব্যাপী যে গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাত শুরু হইয়াছে এবং ভারতে গত কিছুদিন হইতে কম্যুনিষ্টদের উপদ্রব যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া এই প্রদেশের জনগণকে কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ ও এই সব প্রতিষ্ঠানের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য সদস্যদের সম্ভাব্য অনাচার সম্বন্ধে সতর্ক করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সত্য যে, পাকিস্তানের মুস্‌লিম জন-সাধারণ কোন দিনই কম্যুনিষ্টদের ইসলাম বিরোধী মতবাদ সমর্থন করিবে না। কিন্তু এই বিশ্বাসই পাকিস্তানের জনগণকে তাহাদের রাষ্ট্রের প্রতি কম্যুনিষ্টদের সম্ভাব্য হামলা সম্পর্কে অসতর্ক করিয়া দেওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এই প্রদেশের সীমান্তে সম্প্রতি যে সব ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়া গিয়াছে এবং প্রদেশের ভিতরেও বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন জায়গায় যেসব ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হইতেই রাষ্ট্রের এই সব শত্রুর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপন্থার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

যেসব প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা দ্বারা পরিষ্কারই বুঝা যায় যে প্রদেশের বাহির হইতেই কম্যুনিষ্ট দল প্রেরণা ও নির্দ্দেশ লাভ করিতেছে এবং পাকিস্তানকে ধ্বংস করিয়া দিয়া সমগ্র পাক্-হিন্দ উপ-মহাদেশে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়াই ইহাদের উদ্দেশ্য। যদিও বাহ্যতঃ কম্যুনিষ্টরা হিন্দু-মহাসভার বিরোধী, তথাপি প্রায় সকল কম্যুনিষ্টই হিন্দু বলিয়া তাহারা তাহাদের মুস্‌লিম-বিরোধী মনোভাব বর্জ্জন করিতে পারে নাই। এইজন্যই ভারত ও পাকিস্তানকে পুনরায় মিলিত করিয়া প্রকারান্তরে পাকিস্তানকে ধ্বংস করিতে এবং সারা উপ-মহাদেশের মুসলমানগণকে সংখ্যাধিক হিন্দুদের পদানত করিয়া দেওয়ার জন্য মহাসভার অনুসৃত নীতি এই সব কম্যুনিষ্টও সমর্থন করিতেছে।

পাকিস্তানের অন্যান্য শত্রুদের সহিত কম্যুনিষ্টদের মতবিরোধ শুধুমাত্র কর্ম্মপন্থা লইয়া। আমাদের অন্যান্য দুশমনরা পাকিস্তান ও ভারতের পুনর্ম্মিলনে পাকিস্তানকে বাধ্য করার জন্য এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ কিম্বা আর্থিক অবরোধ জারী করার পক্ষপাতী; কিন্তু কম্যুনিষ্টরা রাষ্ট্রের ভিতরে ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ চালাইয়াই এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে চায়। জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা ছাড়াও, কম্যুনিষ্টরা রাষ্ট্রের ভিতরে যে ধ্বংসাত্মক নীতি কার্য্যকরী করিতে চায় তজ্জন্য প্রধানতঃ জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করিতেই তাহারা চেষ্টিত। ভারতে অবস্থিত কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গেও রেল-ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠানের যে হাস্যকর প্রচেষ্টা হইয়াছিল এবং এই প্রদেশের মুসলমানগণ কম্যুনিষ্টদের ফাঁদে পা দিতে রাজী না হওয়ায় যে প্রচেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতায়

কম্যুনিজমের স্বরূপ—একটি সরকারী ইস্তাহার। পৃষ্ঠা ৩০৬-৩১১।

জমিদার শ্রেণীভুক্ত লোকদের সংখ্যাল্পতার উল্লেখ করে শোষক শ্রেণী হিসেবে তাদের গুরুত্বকে খর্ব করার এই কংগ্রেসী প্রচেষ্টার সাথে মুসলিম লীগের মন্ত্রী আবদুল হামিদ কর্তৃক জমিদারদেরকে "সংখ্যালঘু" হিসেবে বর্ণনা করে সংখ্যাগুরু কৃষকদের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্যে পরিষদের কাছে উদাত্ত আহ্বানের[১৮] স্বার্থগত ঐক্য এক্ষেত্রে সহজেই লক্ষণীয়। এই স্বার্থগত ঐক্যের কারণেই যে স্পেশাল কমিটির আলোচনায় তাঁরা অনেকেই দলগত ভূমিকা পরিত্যাগ করে "ব্যক্তিগতভাবে" অংশ গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

মনোরঞ্জন ধর এর পর বলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যুগ যুগ ধরে এদেশে আরও এত রকম কুপ্রথা ও ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে যেগুলির অবসান ব্যতীত শুধুমাত্র জমিদারী প্রথার অবসান অবস্থার কোন উন্নতি সাধন করতে পারে না। শুধু একজন শীতাংশু কুমার আচার্য অথবা ব্রজেন্দ্র কিশোর চৌধুরীর জমিদারী কেড়ে নিলেই এই অবস্থার অবসান ঘটবে না। সেজন্যে এই সমস্ত কুপ্রথা ও ব্যবস্থাগুলির প্রতি অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উপযুক্ত ভূমি সংস্কারের জন্যে পরিষদের কাছে তিনি আবেদন জানান।[১৯]

মুসলিম লীগ সরকারের জোতদারপ্রীতি সম্পর্কে তিনি তাঁর এই পরিষদ বক্তৃতায় যা বলেন সেটা উল্লেখযোগ্য:

> স্যার, আমি জানি যে অবিভক্ত বাঙলায় বর্গাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল প্রায় আইনে পরিণত হতে যাচ্ছিলো।* ঐ একই পার্টি এখানেও ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু সেই পার্টি, যাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে আমার বন্ধু শরফুদ্দীন আহমদ এতো ওকালতি করেছেন, তারা রহস্যজনকভাবে সেই প্রস্তাবিত আইনকে হঠাৎ বাদ দিয়ে দিলো। বর্গাদারদের সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। শুধু তাই নয়, আমার বলতে লজ্জা হচ্ছে যে, সংখ্যাগুরু সদস্যেরা স্পেশাল কমিটির রিপোর্টে বলেছেন কৃষির বর্তমান অবস্থায় অথবা এরই মতো কোন অবস্থায় বর্গাদারী প্রথা যথেষ্ট উপকারী। এই ধরনের কোন নিন্দনীয় বক্তব্যের চিন্তা আমি করতে পারি না এবং আমি আমার সম্মানীয় বন্ধু শরফুদ্দীন আহমদকে বলবো সেই ধারাটি বিবেচনা করে তিনি যেন আমাদেরকে জানান বর্গাদারদের ভাগ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে যে আইন প্রস্তাব করা

---

* দ্রষ্টব্য: বদরুদ্দীন উমর—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হয়েছিলো সেটা তাঁরা বাদ দিলেন কেন? তাঁর আন্তরিকতা এর দ্বারাই যাচাই হবে। তিনি এ ব্যাপারে একটি বিবৃতি দিন।[৩০]

সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর শরফুদ্দীন আহমদের পূর্ববর্তী বক্তৃতার[৩১] উল্লেখ করে এইভাবে মনোরঞ্জন ধর জোতদার শ্রেণীর প্রতি মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জমিদারীর ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, অনেক জায়গায় ক্ষতিপূরণের অর্থ আংশিকভাবে নগদ টাকায় দেওয়া হয়েছে। এখানেও সরকারের উচিত তাই করা। যে সমস্ত জমিদাররা পূর্ব বাঙলা থেকে চলে যাচ্ছে তারাও রাষ্ট্রের নাগরিক এবং তারাও নিজেদের আয়ের একটা ব্যবস্থা দাবী করতে পারে।[৩২]

এই পর্যায়ে হাবিবুল্লাহ বাহার মনোরঞ্জন ধরের বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বলেন, 'থলির বেড়াল এবার বেরিয়ে পড়েছে।'

এর পর মনোরঞ্জন ধর বলেন, জমিদাররা সন্তুষ্ট না হলে তারা দেশের পক্ষে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া জমিদারীর অধীনে এখন যে সমস্ত কর্মচারীরা আছে জমিদারী উচ্ছেদের ফলে তারা কর্মহীন হয়ে পড়বে। এমনিতেই দেশে বেকার যুবকের সংখ্যা অনেক। তার ওপর এইভাবে বেকারত্ব সৃষ্টি হলে দেশের সমস্যা বাড়বে, কমবে না। কিন্তু জমিদারদেরকে যদি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাহলে সেই মূলধন দিয়ে তারা কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করবে এবং তার ফলে কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে। কেউ কেউ বলেছেন যে, ক্ষতিপূরণের পয়সা নিয়ে জমিদাররা ভারতে চলে যাবে। মনোরঞ্জন ধর এই সমালোচকদের সম্বন্ধে বলেন যে, সরকারী দলের অনেকেই প্রতি মাসে কলকাতায় যান এবং সেখানে তাঁদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সও আছে। কিন্তু এসব করলে তাঁরা নিজেরা পাকিস্তান বিরোধী হন না।[৩৩]

এর পর অবলাকান্ত গুপ্ত জমিদারী উচ্ছেদের জন্যে আনীত বিলটিকে বাতিল করার জন্যে নিম্নলিখিত যুক্তি দেন:

> এই State Acquisition বিলটা যাতে অবিলম্বে আইনে পরিণত না হয়, তারই চেষ্টা করবার জন্য আমি এখানে দাঁড়িয়েছি। আমার মতটা আমি পরিষ্কার করে বলি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি এই Reactionary প্রতিক্রিয়াশীল, Corrupted এবং জনসাধারণের আস্থাহীন গভর্ণমেন্টের হাতে আর অধিক ক্ষমতা দিতে কিছুতেই

রাজী নই। যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিলো সে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে। আরও যদি বেশী ক্ষমতা এঁদের হাতে দেওয়া যায় তাহলে সেটা গণতন্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ হবে।[৩৪]

একথা সত্য যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে মুসলিম লীগ সরকার ব্যাপকভাবে জনগণের আস্থা হারিয়েছিলো। ১৯৪৯ এর জুন মাসে টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে তাদের শোচনীয় পরাজয়ই সেটা অনেকাংশে প্রমাণ করেছিলো। মুসলিম লীগ সরকার যে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার তাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলো না। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, সেই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের হাতে আরও বেশী ক্ষমতা না দেওয়ার কথা বলে এবং গণতন্ত্রের দোহাই পেড়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং জমিদারী প্রথাকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। কংগ্রেসের মধ্যে জমিদারী স্বার্থ নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্যে কিভাবে সর্বমুখী প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো অবলাকান্ত গুপ্তের এই বক্তব্য তারই একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস লীগ বহির্ভূত বিরোধী দলীয় যে কয়জন সদস্য জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে এবং কৃষক স্বার্থের সপক্ষে সব থেকে জোরালো ভাবে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করেন তাঁদের মধ্যে খয়রাত হোসেন ছিলেন অন্যতম প্রধান। স্পেশাল কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে মতামত দিতে গিয়ে তিনি বলেন:

> Special Ccmmittee তাঁদের কাজ করেছেন। জোতদারদের দু'শ বিঘা জমি দেওয়ার কথা ছিল সেখানে একশ' বিঘা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছেন। Compensation ১৫ গুণ থেকে ১০ গুণ করেছেন। Special Committee র ৪৫ জন সদস্য যদি ক্ষতিপূরণের হার ১৫ গুণ থেকে ১০ গুণ করতে পারে আমরা এই House এর ১৭১ জন সদস্য কেন সেই হার আরও কমাতে পারব না? আমাদের উচিত ক্ষতিপূরণ না দেওয়া। আমার বন্ধু টি আলী সাহেব ১৯৪৭* সনের এপ্রিল মাসে নরসিংদিতে বলেছিলেন যে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উঠিয়ে দেওয়া উচিত। তাঁর একথা বলার অনেকদিন পরে এ বিল এসেছে। তিনি চেষ্টা করলে এখনো ক্ষতিপূরণ না দিতে পারেন।[৩৫]

---

* এখানে তারিখ ভুল আছে। এ সম্পর্কে অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাত আলাপের থেকে জানা যায় যে নরসিংদীতে কৃষক সম্মেলন হয়েছিলো ১৯৪৮এর প্রথম দিকে এবং তফাজ্জল আলী তাতে উপস্থিত ছিলেন।

এর পর বর্গাদারদের ভূমিস্বত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে খয়রাত হোসেন জোতদার শ্রেণী কর্তৃক জমিদার শ্রেণীর উত্তরাধিকারীতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা সম্প্রর্কে নিম্নলিখিত বক্তব্য প্রদান করেন:

আর আমি প্রস্তাব করি যে বর্গাদারদের জমির উপর স্বত্ব দেওয়া হউক। জোতদার বন্ধুদের হাতে গরীব বর্গাদার কি রকম হয়রান হয় তা' আপনারা সকলেই জানেন। শরীকের নাম দিয়ে জোতদাররা বহু বিঘা জমি নিতে পারেন। বর্তমানে যেভাবে নজর সেলামী প্রভৃতি আদায় করেন এই আইন হইলেও তারা তা' করতে পারেন, কাজেই আমি প্রস্তাব করি যে বর্গাদারদের অধিকার দেওয়া হউক এবং বিনা অপরাধে কোন দিন কোন জোতদাব কোন বর্গাদারকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। যদি উচ্ছেদ করতে হয় তা'হলে Civil court এ প্রমাণ দিয়ে উচ্ছেদ করতে হবে। বর্গাদারদের যদি জমিতে অধিকার দেওয়া না হয় তা'হলে আর একটা বড় রকমের জমিদাব শ্রেণী শিকড় গেড়ে বসবে। আর আমি বলি যে বর্তমানে যে Compensation এর হার দেওয়া হয়েছে সেটা উঠিয়ে দেওয়া হউক। প্রয়োজনের চেবে যদি বেশী Compensation দেওযা হয় তাহলে আমি বলবো যে আমাদের দেশ থেকে যে ইংরেজ চলে গেছে তাদেরও Compensation দেওয়া হউক।[৩৬]

পূর্ব বাঙলা পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা বসন্ত কুমার দাস তাঁর দলের পক্ষ থেকে আনীত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ, কোন কোন জমিদারী দ্রুত দখল, মূল বিলের ২ ধারা বাতিল করে অকৃষি জমিকে বিলের আওতাভুক্ত করা, মুসলিম লীগের জোতদারী স্বার্থের প্রতি বিশেষ সুদৃষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর দলভুক্ত পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তব্যেরই পুনরুক্তি করেন। এ প্রসঙ্গে জমিদার শ্রেণীর প্রতি সবকাবী দল মুসলিম লীগের মনোভাব সম্পর্কে তিনি পরিষদকে বলেন:

স্যার, আমি মনে করেছিলাম যে এই বিতর্ক চলাকালে আমরা পক্ষপাতহীন-ভাবে এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে অগ্রসর হবো। কিন্তু আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যদের প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির ক্ষেত্রে আমি দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি যে আবেগ, কুসংস্কার এবং যুক্তির প্রতি বেপরোয়া-ভাব থেকেই ঐ ধরনের বক্তৃতার প্রেরণা এসেছে এবং IA পরিচ্ছেদটি

ঢোকানোর পেছনে একমাত্র কারণ হচ্ছে একটি বিশেষ শ্রেণীকে অর্থাৎ বৃহৎ জমিদার শ্রেণীকে খতম করার ব্যবস্থা। আমি জমিদারদের জন্য ওকালতি করছি না, কিন্তু তবু আমি বলবো যে, ঐ ঐ ধরনের ঢালাওভাবে এইসব জমিদারদেরকে অত্যাচারী এবং রক্তশোষক হিসেবে বর্ণনা করতে গিয়ে সব রকম সীমা লংঘন এবং সত্যকার ঘটনা বিকৃত করা হচ্ছে। সত্য কথা বলতে, স্যার, জমিদারী প্রথার মধ্যে সব কিছুই খারাপ ছিলো না। এর ভাল দিকও ছিলো। তাছাড়া, স্যার, জমিদাররাও আর জমিদারী রাখতে খুব উদ্বিগ্ন নয়। যুগের ধারা সম্পর্কে তাঁরাও যে অবহিত নন তা নয়, এবং তাঁরা নিজেরাই বলছেন যে তাঁরা যেতে চান। কিন্তু তাঁরা বলেন যে, "আপনারা যদি আমাদেরকে উচ্ছেদ করতে চান, আমাদেরকে ভদ্রভাবে উচ্ছেদ করুন।" সেটাই তাঁদের প্রার্থনা। স্যার, আপনি মাননীয় শ্রীশীতাংশু কুমার আচার্যের বক্তৃতা শুনেছেন। তিনি কি বলেন নি যে, "আমরা জানি যে আমাদের অস্তিত্ব আর অভিপ্রেত নয়, এবং আমরাও উচ্ছেদ হয়ে যেতে উদ্বিগ্ন। কিন্তু আমাদের সাথে ন্যায়ানুগ আচরণ করুন। আমাদের সাথে এই ধরনের অপরিচ্ছন্ন ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ করবেন না।"[৩৭]

এর পর বসন্ত দাস মন্ত্রী তফজ্জল আলীর বক্তৃতা উল্লেখ করে বলেন যে, সরকারীভাবে দাবী করা হচ্ছে যে আলোচ্য বিলটি এদেশে বিপ্লব সৃষ্টি করবে। তিনি বলেন যে, বিলটি যে বিপ্লব সৃষ্টি করবে তার পরিণামে এই দেশ পরিণত হবে একটি ভিক্ষুকের দেশে এবং সে সময় তাদেরকে ভিক্ষে দেওয়ার কেউ থাকবে না।[৩৮] এমনভাবে কংগ্রেস দলের নেতা তাঁর এই বক্তব্য হাজির করেন যার থেকে মনে হয় যে ভিক্ষুকরা যাতে ভিক্ষে পায় তার সুব্যবস্থা করার জন্যেই জমিদারদের স্বার্থের প্রতি সরকারের সদয় হওয়া দরকার।

বক্তৃতা শেষ করার পূর্বে বৃহৎ জমিদার ও জোতদারদের সম্পর্কে তিনি যা বলেন তা উল্লেখযোগ্য:

স্যার, অতীতে জমিদাররা হয়তো অনেক দুষ্কৃতি করেছে। জমিদাররা অত্যাচারী ছিল, জমিদাররা রক্তশোষক ছিলো। কিন্তু আমি খুব বেশী ভুল করবো না যদি আমি বলি যে তারা এখন আর অত্যাচারী ও রক্তশোষক নয়। যদি আমরা নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করি

তাহলে দেখবো আজকাল এই রক্তশোষকরা হলো আরও নীচু পর্যায়ের অর্থাৎ তারা হলো বৃহৎ জোতদার ও বৃহৎ ভূমিস্বত্বাধিকারী শ্রেণী যাদের বিরুদ্ধে ঐ ধরনের অভিযোগ শোনা যায়। আমি এ ব্যাপারে আর কথা বাড়াতে চাই না। আমি শুধু একথাই বলবো যে আপনারা যদি বৃহৎ জমিদারদেরকে শাস্তি দিতে চান তাহলে আরও অনেকে আছে যাদেরকে রক্তশোষক এবং অত্যাচারী আখ্যা দেওয়া যায় এবং যারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।[৩৯]

কংগ্রেস দলের নেতা বসন্ত কুমার দাস পূর্ব বাঙলার বৃহৎ জমিদারদের বিরুদ্ধে 'অন্যায়'' আক্রমণের প্রতিবাদ করে এইভাবে বক্তৃতা শেষ করার পর সর্বশেষ বক্তৃতা করেন রাজস্ব মন্ত্রী তফজ্জল আলী। ১৫ই নভেম্বর স্পেশাল কমিটির সুপারিশ পরিষদে পেশ করার পর থেকে কংগ্রেস দলের সংশোধনী প্রস্তাবের ভিত্তিতে কয়েকদিন যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় ২১শে নভেম্বরের এই বক্তৃতায় তিনি তার জবাব দেন। অকৃষি জমি সরকারী দখলে নিয়ে আসার জন্যে স্পেশাল কমিটি যে সুপারিশ করে সে সম্পর্কে তফজ্জল আলী বলেন যে, মূল বিলটিতেও অকৃষি জমি বিলের আওতাবহির্ভূত ছিলো না। হাট বাজার ইত্যাদি কয়েক শ্রেণীর অকৃষি জমি মূল বিলের আওতার মধ্যে পড়েছিলো। কাজেই স্পেশাল কমিটি নোতুন একটা কিছু করে নি। তারা শুধু অন্যান্য শ্রেণীর অকৃষি জমিকেও বিলের আওতাভুক্ত করার জন্যে সুপারিশ করেছে মাত্র।[৪০]

IA পরিচ্ছেদে কতকগুলি বৃহৎ জমিদারী রেকর্ড অব রাইটস তৈরীর পূর্বেই দখলের সুপারিশ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, স্পেশাল কমিটি সেটেলমেন্ট সংক্রান্ত যে কোন ব্যবস্থা রদবদল করার অধিকারী। কাজেই সে দিক দিয়ে বিবেচনা করলে পরিচ্ছেদটি মূল বিলের আওতার বাইরে যাযনি।[৪১]

"জমিদারী উচ্ছেদ বিলটি সাম্প্রদায়িক বিবেচনাপ্রসূত, বিরোধীদলের এই অভিযোগ অস্বীকাব কবে তফজ্জল আলী বলেন যে, আলোচ্য বিলটি তাঁরা আকস্মিকভাবে পূর্ব বাঙলা পরিষদে পেশ করেন নি। দশ বারো বৎসর ধরে এ ব্যাপারে নানান চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে, ফ্লাউড কমিশনের মতো কমিশন বসানো হয়েছে, এর জন্যে অবিভক্ত বাঙলার মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা ১৯৪৭ এর ৭ই এপ্রিল একটি বিল

পূর্বেই তৎকালীন বাঙলার নিম্ন পরিষদে পেশ করেছিলেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের পরিবারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এই আইনের দ্বারা পূর্ব বাঙলার একটি মহা প্রতিপত্তিশালী মুসলমান পরিবারও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।*[৪২]

মুসলিম লীগ সরকার বিলটিতে জোতদারদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এই অভিযোগের জবাবে রাজস্বমন্ত্রী বলেন যে, নির্ধারিত পরিমাণ অর্থাৎ পরিবার প্রতি ১OO বিঘা জমি বাদ দিয়ে খাস জমি সরকারী দখলে আনার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার দ্বারা জোতদাররাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই সরকার জোতদারদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করছেন সে কথা সত্য নয়।[৪৩] এখানে লক্ষ্যণীয় এই যে, জোতদারী স্বার্থ সম্পর্কে এই বক্তব্য উপস্থিত করার সময় মন্ত্রী বর্গাদারী সম্পর্কিত অংশটি মূল বিল থেকে কেন বাদ দিলেন সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেন।

I.A পরিচ্ছেদের অংশ আইনে পরিণত হলে সরকার কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর সম্পত্তিও নিজের দখলে নিয়ে আসতে পারবেন বলে তফজ্জল আলী উল্লেখ করেন।[৪৪] জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর জমিদারদের কর্মচারীদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে আশালতা সেনের উদ্বেগের উল্লেখ করে তফজ্জল আলী বলেন যে, জমিদারদের যে সমস্ত কর্মচারীদেরকে সরকার যোগ্য মনে করবেন তাদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বহালের ব্যাপারে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।[৪৫]

সরকার কর্তৃক অ-কৃষি জমি নিজের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসার প্রসঙ্গ তুলে চা-বাগানগুলিকে নোতুন কোন অধিকারপ্রাপ্ত শ্রমিকদের হাত থেকে রক্ষার জন্যে পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্তের বক্তব্যকে "সাহায্য-মূলক" সমালোচনা৹ হিসেবে বর্ণনা করে মন্ত্রী বলেন যে, চা-বাগান-

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই মহা প্রতিপত্তিশালী 'পরিবার' এর সেলিম সাহেব পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি কংগ্রেসী জমিদার ও কংগ্রেসী সদস্যদের সাথে একযোগে মুসলিম লীগের জমিদারী উচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত বিলের বিরোধিতা করলেও শীঘ্রই তাঁকে পূর্ব বাঙলার মন্ত্রী সভার সদস্য করে নেওয়া হয় এবং এই অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের ফলে তিনি মুখ বন্ধ করেন।

গুলিকে অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের আওতাভুক্ত রাখার জন্যে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।*[৪৬]

বিলটি কৃষি সংস্কারের ক্ষেত্রে তেমন কোনই অগ্রগতি সাধন করবে না বলে যাঁরা তার সমালোচনা করছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, বিলটিতে যে প্রস্তাব করা হয়েছে তার থেকে বেশী বিপ্লবী কিছু করতে গেলে দেশে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি না করে সেটা সম্ভব হবে না। এ জন্যেই যে প্রস্তাব তাঁরা পরিষদে এনেছেন সেটি আইনে পরিণত হলে সেটাই হবে এদেশে ভবিষ্যৎ কৃষি সংস্কারের ভিত্তি।[৪৭]

কৃষি জমি টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করে জমি একত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সবুর খান এবং অন্যান্য কয়েকজনের বক্তৃতা প্রসঙ্গে তফজ্জল আলী বলেন যে, সেই প্রয়োজনীয়তা তিনি অন্যদের থেকে কিছু কম বোধ করেন না। মূল বিলের ৮৮ ধারাতে তা কার্যকর করার প্রস্তাবও করা হয়েছিলো, কিন্তু স্পেশাল কমিটি একমত হয়ে উক্ত ধারাটিকে বাতিল করে দেওয়ার ফলে সে ক্ষেত্রে কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে তিনি হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকার আইনেরও উল্লেখ করেন।**[৪৮]

এর পর জমিদারীর ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তফজ্জল আলী বলেন যে, ক্ষতিপূরণ দানের বিরুদ্ধে পরিষদে যাঁরা বক্তব্য পেশ করেছেন তাঁরা বলেছেন যে লর্ড কর্ণওয়ালিসের থেকে বিনা মূল্যে যারা জমিদারী পেয়েছিলো তাদেরকেই আবার ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা হচ্ছে। মন্ত্রীর মতে কর্ণওয়ালিসের থেকে ১৭৯৩ সালে যারা জমিদারী লাভ করেছিলেন সে রকম পরিবারের সংখ্যা পূর্ব বাঙলায় ছয়টির বেশী নয়। অন্য জমিদারেরা নিজেদের পকেট থেকে পয়সা খরচ করেই জমিদারী কিনেছিলেন। কাজেই তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।[৪৯]

---

* চা বাগান মালিকদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে সিলেট জেলার অধিবাসী কংগ্রেসী সদস্য পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত এবং মুসলিম লীগের মন্ত্রী তফজ্জল আলীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব লক্ষ্যণীয়।

** কৃষি জমি টুকরো টুকরো হওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি সত্ত্বেও মন্ত্রী নিজেও স্পেশাল কমিটিতে ৮৮ ধারা বাতিলের সপক্ষে ভোট দিলেন কেন সে সম্পর্কে অবশ্য তিনি কিছু বলেন নি।

খয়রাত হোসেন তফজ্জল আলীর নরসিংদী বক্তৃতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তার জবাবে মন্ত্রীর উক্তি খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন:

জনাব খয়রাত হোসেন নরসিংদীর একটি জনসভার যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটা তিনি কোন্ সূত্রে লাভ করেছেন আমি জানি না। উক্ত জনসভায় বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী নিয়ে নেওয়ার দাবী সমর্থন করে আমি বক্তৃতা করেছিলাম বলে তিনি যা বলেছেন তা হলো সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি বলছি এবং একথা আমি বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলার যোগ্যতা রাখি যে, রাজনৈতিক কাজকর্মের কোন পর্যায়েই আমি একথা বলি নি যে, জমিদারী অথবা কোন রকম খাজনা-আদায়ী স্বত্ব ক্ষতিপূরণ ব্যতীত উচ্ছেদ করা উচিত। জীবনে কোন সময়ে আমি বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী তুলে দেওয়ার কথা বলেছি এই মর্মে কোন সংবাদপত্রের উল্লেখ করার জন্যে আমি আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের আহ্বান জানাচ্ছি। স্যার, জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ না দেওয়াটা হবে একটি ভ্রান্ত নীতি।[৪৩]

এ ব্যাপারে তফজ্জল আলীর বক্তব্যই খুব সম্ভবতঃ সঠিক। কারণ ভূসম্পত্তির মালিক এই ধরনের ব্যক্তিরা বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদের কথা কোন সময়েই বলবেন সেটা মনে হয় না।*

বিলটিকে আবার স্পেশাল কমিটিতে পাঠানোর বিরোধিতা করে তিনি বলেন যে তার দ্বারা কোন ফল লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ ইতিপূর্বে স্পেশাল কমিটি বিলটির প্রত্যেকটি ধারা এক এক করে বিবেচনা করেছেন।

এর পর বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনীগুলি ভোটে দেওয়া হয় এবং সেগুলি বাতিল হয়ে যায়। ফলে স্পেশাল কমিটিতে বিলটিকে ফেরৎ না পাঠিয়ে সেটিকে পরিষদে বিবেচনার সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়।

---

* নরসিংদীর জনসভা সম্পর্কে ২৫.৪.১৯৬৯ তারিখে তফজ্জল আলী এক সাক্ষাৎকারের সময় আমাকে যা বলেন সেটা নীচে উদ্ধৃত করা হলো। জন সভাটির তারিখ সঠিক ভাবে নির্ণয়ের সুবিধের জন্যে তার পূর্ববর্তী একটি ঘটনারও উল্লেখ তাঁর জবানীতেই দিলাম:

"রাজশাহী কলেজের ছাত্রদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ (তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে কারণ ট্রেনে চড়ার পূর্বে সেই রাত্রে ষ্টেশনেই আমরা গান্ধীজীর হত্যার খবর পেলাম) আমি এবং নজিরুদ্দীন রাজশাহী রওয়ানা হই।

রাজশাহী গিয়ে দেখলাম সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভুবন মোহন পার্কে ৩১শে জানুয়ারী জনসভা হয়েছিলো এবং সরকারের তরফ থেকে বাধা প্রদানের কোন চেষ্টা হয় নি।

"এর কিছুদিন পর নরসিংদীতে একটা জনসভার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। মহম্মদ আলী এবং আমার সেখানে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার দু'ঘন্টা পূর্বে মহম্মদ আলী আমাকে চিঠি লিখে জানালেন যে, মিটিং হতে না পায় তার জন্যে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। আমরা যখন পার্টিতে আছি তখন সেই পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে জারীকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা ঠিক হবে না। এ সত্ত্বেও আমি কিন্তু গেলাম, কারণ আমি মনে করলাম যারা সভা অর্গানাইজ করেছিলো তারা good মুসলিম লীগার এবং না গেলে তাদেরকে let down করা হবে। নরসিংদী পৌঁছে অবশ্য দেখা গেলো যে মহম্মদ আলীর information ঠিক ছিলো না। ১৪৪ ধারা জারী করা হয় নি এবং সেখানে একটা বিরাট সভা হয়েছিলো।"

নরসিংদীর এই জনসভা সম্পর্কে কমরুদ্দীন আহমদ ২৬.৪.৬৯ তারিখে এক সাক্ষাৎকারের সময় আমাকে বলেন:

"নরসিংদীতে পুরানো কিছু কৃষক কর্মীরা একটা সভা আহ্বান করেছিলেন এবং সেই সভায় মহম্মদ আলীর সভাপতিত্ব করার কথা ছিলো। সভাটিতে আমাদের এবং মালেক, তফজ্জল আলী প্রভৃতিরও যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু যাওয়ার দিনে বেলা দশটার সময় অর্থাৎ ট্রেন ছাড়ার কিছু পূর্বে মহম্মদ আলী বলেন যে, তিনি যেতে পারবেন না কারণ জিন্নাহ খবর দিয়েছেন যে আমরা জমিদারী উচ্ছেদ ইত্যাদির কথা বলছি এবং সেটা রাষ্ট্রবিরোধী কথা। কাজেই মিটিং-এ যাওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। মালেকও সেই কারণে গেলেন না। তফজ্জল আলী এ খবর না জানার ফলে নরসিংদী পৌঁছে দেখলেন যে মহম্মদ আলীরা আসেন নি। সেই দেখে তিনি বক্তৃতা না করেই ফেরৎ এলেন। এসব কথা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে।"

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আরও তথ্যবিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য:

পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা: ১০১ ১০২

৫

পূর্ব বাঙলা জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল-এর ওপর পরবর্তী বিতর্ক

স্পেশাল কমিটির রিপোর্ট আংশিকভাবে পরিবর্তনের জন্যে আবার স্পেশাল কমিটিতে ফেরৎ পাঠানোর সংশোধনী প্রস্তাব পরিষদ কর্তৃক বাতিল হয়ে যাওয়ার পর বিলের এক একটি ধারা ধারাবাহিকভাবে বিতর্কিত হতে থাকে। এই বিতর্ক ১৯৫০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে এবং ঐ দিনই পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক সমগ্র বিলটি কিছুটা সংশোধিত হয়ে আইনে পরিণত হয়।

স্পেশাল কমিটির রিপোর্টের ওপর বিতর্কের বিস্তৃত বিবরণের কোন প্রয়োজন এখানে নেই। ইতিপূর্বে প্রাথমিক বিতর্কের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার থেকেই ভূমি সংস্কার সম্পর্কে জমিদার জোতদার ইত্যাদি ভূস্বামী শ্রেণী এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি কংগ্রেস লীগ সদস্যদের শ্রেণীগত ভূমিকা যথেষ্ট স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। এজন্যে বিলটি সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনাকালে বিভিন্ন বিষয়ে কংগ্রেস লীগ সদস্যদের বিতর্কের কোন বিস্তৃত বিবরণ আর না দিয়ে এর কয়েকটি বিশেষ দিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো।

৬

নানকার প্রথার বিলোপ

নানকাররা ছিলো এক ধরনের ভূমিদাস।* ভূস্বামীদের বাড়ীতে সব ধরনের কাজ করার সর্তেই নানকারদেরকে কিছু পরিমাণ জমি বিনা খাজনায় "ভোগ" করতে দেওয়া হতো। শুধু যে গৃহভৃত্যের কাজ অথবা কৃষি কাজের জন্যেই এই ধরনের জমি মৌখিক বন্দোবস্ত হতো তাই নয়। ধোপা, নাপিত ইত্যাদিকেও কাজের পরিবর্তে এইভাবে জমি দেওয়া হতো। শুধু জমিও নয়। জমিদাররা

* তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অনেক সময় নিজেদের বাড়ীর কাছাকাছি নানকারদেরকে বাস্তুভিটার জন্যেও জায়গা দিতো। এই কাছাকাছি অবস্থানের জন্যে নানকারদের থেকে কাজ আদায়ের অনেকখানি বেশী সুবিধা হতো।

নানকার প্রথা সিলেট জেলাতেই প্রচলিত ছিলো, পূর্ব বাঙলার অন্য কোন অঞ্চলে নয়। অন্যান্য অঞ্চলে কিছু কিছু গৃহকর্মের পরিবর্তে ধোপা, নাপিত ইত্যাদিদেরকে বিনা খাজনায় জমি রাখতে দেওয়ার একটা রেওয়াজ ছিলো। এর মাধ্যমে কিছুটা শোষণ এবং অতিরিক্ত শ্রম আদায়ও হতো। এই প্রথার নাম ছিলো চাকরাণ। কিন্তু চাকরাণ প্রথা নানকার প্রথার মতো এতোখানি নির্যাতনমূলক ছিলো না। চাকরাণ জমি যারা "ভোগ" করতো তারা নানকারদের মতো ভূমিদাস ছিলো না এবং তাদের ওপর ভূস্বামীদের অতখানি কর্তৃত্বও থাকতো না।

'জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল' এর অধীনে পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে নানকার প্রথা উচ্ছেদের জন্যে প্রস্তাব আনা হয় ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৯। তার পূর্বে সিলেট জেলায় নানকাররা জমিদার মিরেসদারদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং নানকারদের সাথে অনেকক্ষেত্রে পুলিশেরও সরাসরি সংঘর্ষ বাধে।* নানকার প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলন এ সবের ফলে সিলেট জেলায় খুব জোরদার হয় এবং সরকার এই প্রথা উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরই সে আন্দোলন নানকাররা প্রত্যাহার করেন।

সরকার নানকার প্রথা উচ্ছেদ সংক্রান্ত ধারাগুলিতে প্রথমে কৃষি, বাগিচা অথবা বাস্তুভিটার জন্যে সে সমস্ত নানকার অথবা 'চাকরাণরা মৌখিক জমি বন্দোবস্ত পেয়েছিলো তাদেরকে সেই সমস্ত জমিতে দখলী স্বত্ব দানের ব্যবস্থা করেন।[১] কিন্তু এই দখলী স্বত্ব দানের ক্ষেত্রে সরকার যে নীতি গ্রহণ করেন তার ফলে অনেকাংশে সেই স্বত্ব হয়ে দাঁড়ায় অর্থহীন। কারণ যে সমস্ত জমি অথবা বাস্তুভিটার ওপর নানকারদেরকে দখলীস্বত্ব দেওয়া হয় সেই জমি অথবা বাস্তুভিটা যদি ভূস্বামীদের বাস্তুভিটার এলাকার মধ্যে পড়ে তাহলে নানকারদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা ভূস্বামীদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই উচ্ছেদের জন্যে একটা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও অবশ্য তার মধ্যে থাকে।

---

* তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এ প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী দুটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। ধীরেনদত্ত প্রস্তাব করেন[২] যে, ভূস্বামীর বাস্তুভিটার এলাকায় নানকারের বাস্তুভিটা অথবা অন্য জমি পড়লে ভূস্বামী তাকে উচ্ছেদ করতে পারে কিন্তু তার জন্যে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া দরকার সে ক্ষতিপূরণ আদালতের মাধ্যমে নির্ধারিত হতে হবে। পুরাতন জায়গা থেকে ভিটা উঠিয়ে নোতুন জায়গায় ভিটা তৈরীর জন্যে যে ব্যয় হবে সেই ব্যয়ের হিসেব অনুযায়ীই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া দরকার।

এ ছাড়া আর একটি বিষয়ের উল্লেখ ধীরেন দত্ত করেন। সরকারী প্রস্তাব অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের যে কথা বলা হয়েছিলো তা কেবল পাঁচ বিঘা পর্যন্ত জমির ওপর যাদের মৌখিক বন্দোবস্ত ছিলো তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতো, তার বেশী জমির ক্ষেত্রে নয়। ধীরেন দত্ত প্রস্তাব করেন যে, যে সমস্ত নানকার প্রজাকে এইভাবে উচ্ছেদ করা হবে তাদের প্রত্যেককেই জমির পরিমাণ নির্বিশেষে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। কারণ পাঁচ বিঘার অধিক জমি যাদের হাতে আছে তাদেরকে উচ্ছেদ করার অধিকার যদি ভূস্বামীদেরকে দেওয়া হয় এবং যারা এইভাবে উচ্ছেদ হয়ে যাবে তাদের কোন ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে তাদের কোন সমস্যার সমাধান না হয়ে দুঃখ দুর্দশা হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি লাভই করবে।[৩]

এই পর্যায়ে সরকারী মুখপাত্র হামিদুদ্দীন আহমদ[৪] জিজ্ঞেস করেন যে, ভূস্বামী যদি দরিদ্র হন তাহলে কি হবে, অর্থাৎ তিনি কিভাবে পাঁচ বিঘার অধিক জমির ক্ষতিপূরণ দান করবেন। এর জবাবে ধীরেন দত্ত বলেন যে, উচ্ছেদ করলে সব ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং ভূস্বামী যদি দরিদ্র হন তাহলে তিনি প্রজাকে উচ্ছেদ করবেন না। কিন্তু উচ্ছেদ করলে তিনি ধনী অথবা দরিদ্র যাই হোন, তাঁকে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৫]

সরকারী প্রস্তাবে ছিলো যে, প্রজাকে উচ্ছেদের পূর্বে আদালতের বাইরে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের টাকা আদালতে জমা দিতে হবে অথবা প্রজাকে আদালতের সামনে লিখিতভাবে স্বীকার করতে হবে যে, তিনি আদালতের বাইরে ভূস্বামীর থেকে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ ইতিপূর্বে লাভ করেছেন। ধীরেন দত্ত বলেন যে, আদালতের বাইরে ক্ষতিপূরণের টাকা প্রজাকে দিয়ে সেই ব্যাপারে আদালতের সামনে স্বীকারোক্তির ব্যবস্থা বাতিল করে

আদালতের মাধ্যমেই ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হোক। কারণ আদালতের বাইরে ভূস্বামী ইচ্ছেমতো ক্ষতিপূরণ দিয়ে জবরদস্তিমূলকভাবে প্রজাকে দিয়ে আদালতের সামনে লিখিত স্বীকারোক্তি আদায় করবে।[৬]

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী নানকার প্রজাদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদের প্রস্তাবের সমালোচনা করেন। পাঁচ বিঘার অধিক জমি যে সমস্ত প্রজার হাতে আছে তাদেরকে উচ্ছেদের ক্ষেত্রে কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়েই তাদেরকে উচ্ছেদ করা যাবে, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তিনি ধীরেন দত্তের সংশোধনী-কেই সমর্থন করেন। কিন্তু ধীরেন দত্ত যেখানে ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ নির্দেশের বিরোধী সেখানে তিনি পাঁচ বিঘার পরিবর্তে পাঁচ একর পর্যন্ত জমি যে সমস্ত প্রজাদের হাতে আছে তাদেরকে উচ্ছেদের সময় ক্ষতিপূরণ দানের জন্যে সংশোধনী প্রস্তাব দেন।[৭]

সরকার পক্ষ ধীরেন দত্ত এবং প্রভাস লাহিড়ী উভয়েরই সংশোধনী প্রস্তাব নাকচ করে দেন। রাজস্বমন্ত্রী তফজ্জল আলী এ প্রসঙ্গে বলেন[৮] যে, আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থার পরিবর্তে ভূস্বামীর থেকে প্রজাদের সরাসরি ক্ষতিপূরণ লাভের ব্যবস্থায় প্রজাদের অধিক লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। অন্য সংশোধনীটির জবাবে তিনি বলেন যে, পাঁচ বিঘার অধিক জমি যে সমস্ত প্রজাদের আছে তাদেরকে যদি ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা হয় তাহলে "অসুবিধার" সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে অসুবিধা কার হবে এবং মন্ত্রী কার স্বার্থ পাহারা দেওয়ার জন্যে এই ধরনের বক্তব্য উপস্থিত এবং আইন প্রণয়ন করছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

নানকার প্রজাদের দখলী স্বত্বের ক্ষেত্রে সরকার প্রস্তাব করেন যে ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৮, এর পূর্বে আদালত, কালেক্টর অথবা রেভিনিউ অফি-সারের নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোনভাবে যারা উচ্ছেদ হয়েছেন তাদের কৃষি জমি ও বাগিচা জমিতে তাদেরকে পুনরায় দখলীস্বত্ব দেওয়া হবে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত।[৯] তিনি বলেন যে, নানকার প্রজাদেরকে সত্যিকার কোন সুবিধা দিতে হলে ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৮ এর তারিখ সীমা তুলে দিতে হবে। কারণ ঐ তারিখের পরেও অনেকে উচ্ছেদ হয়েছে এবং তাদেরও পুনর্বাসন প্রয়োজন। পুনর্বাসনের প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, শুধু কৃষি ও বাগিচা জমির ক্ষেত্রে দখলী স্বত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা সরকারী প্রস্তাবে

উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তুভিটে সম্পর্কে কিছু না বলে তাঁরা সেটা বাদ রেখেছেন। এই অসঙ্গতি দূর করার জন্যে তিনি কৃষি ও বাগিচা জমির সাথে বাস্তুভিটার জমিও অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন।

পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্তের প্রস্তাব সমর্থন করে ধীরেন দত্ত[১০] বলেন যে, আদালত ইত্যাদির মাধ্যমেও যারা উচ্ছেদ হয়েছে তাদেরকেও পুনরায় দখলী স্বত্ব দেওয়া দরকার। কারণ এই দুই ধরনের উচ্ছেদের মধ্যে পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে নেই। তাছাড়া এই ব্যবস্থা কার্যকর করার পূর্বেই আদালতে অনেক নোতুন উচ্ছেদ মামলা দায়ের হবে এবং এই নোতুন মামলা এবং পুরাতন মামলার রায় জমিদার মিরাসদাররা নিজেদের সপক্ষেই তাড়াতাড়ি আদালত থেকে বের করবে। কাজেই এই আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বেই বহু নানকার প্রজা তাদের জমিজমা ও ভিটামাটি থেকে জমিদার মিরাসদারদের দ্বারা উচ্ছেদ হয়ে যাবে। জমির সাথে বাস্তুভিটাকেও আইনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্তের প্রস্তাবকেও ধীরেন দত্ত সমর্থন করেন।

মন্ত্রী তফজ্জল আলী[১১] বলেন যে ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৮, এই তারিখকে তাঁরা সীমারেখা হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন কারণ এক জায়গায় একটা সীমা নির্দেশ করাই দরকার। নানকারদের বিষয়ে গণ্ডগোল একমাত্র সিলেট জেলাতেই হয়েছে এবং সেখানে উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলার কোন রায় দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই সে বিষয়ে কোন কিছু করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলে সরকার সে ব্যবস্থা করবেন। মামলার কোন রায় দেওয়া হচ্ছে না, একথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী উল্লেখ করেন নি সরকার নির্দেশ দিয়ে রায় দান বন্ধ রেখেছেন কিনা। সে নির্দেশ যদি না থাকে তাহলে 'রায় দান বন্ধ আছে' এই বক্তব্য অর্থহীন ব্যতীত আর কি? বাস্তুভিটাকে কৃষি ও বাগিচা জমির সাথে একত্রে বিবেচনা করতে অস্বীকার করে মন্ত্রী জানান যে, ভূস্বামীদের সাথে নানকার প্রজাদের খারাপ সম্পর্কের জন্যেই তাদেরকে বহু পূর্বেই উচ্ছেদ করা হয়েছে। কাজেই বাস্তুভিটা থেকে যাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদেরকে আবার সেখানে দখলী স্বত্বদানের প্রশ্ন ওঠে না। এবং তার জন্যে কোন সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণেরও কোন প্রশ্ন ওঠে না।

এর পর সরকার পক্ষ থেকে হামিদুদ্দীন আহমদ[১২] এই মর্মে সংশোধনী প্রস্তাব আনেন যে, নানকারদেরকে দখলী স্বত্ব দেওয়ার জন্যে যে

ব্যবস্থা করা হচ্ছে সে ব্যবস্থা চা বাগান অথবা অন্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। জমিদাররা যেভাবে নানকারদেরকে জমিতে বসিয়ে তাদের থেকে কাজ নেয় ঠিক সেইভাবে চা বাগান অথবা অন্যান্য বড়ো প্রতিষ্ঠানেরাও নিজেদের কর্মচারীদেরকে জমি দেয় এবং তারা সেখানে চাষাবাদ ও বসবাস করে। এই সমস্ত কর্মচারীদেরকে চা বাগান ইত্যাদির এলাকার মধ্যে জমিতে দখলীস্বত্ব দিলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কাজেই এই ধরনের কর্মচারীদেরকে উচ্ছেদ করলে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দান করতে হবে না।

চা বাগান ইত্যাদি থেকে ঢালাওভাবে কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উচ্ছেদ, বিশেষতঃ বাঙলাদেশের বাইরে থেকে যে সমস্ত পরিবার বহুদিন পূর্বে এসে সারা জীবন চা বাগানে শ্রমশক্তি বিক্রি করে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন, তাঁদেরকে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন এই কথা বলে তফজ্জল আলী হামিদুদ্দীনের সংশোধনীটি পরিষদে পাশ করিয়ে নেন।[১৩]

৭,

ওয়াক্ফ ও দেবোত্তর সম্পত্তি এবং কোম্পানী আইন

৭ নম্বর ধারায় পরিবার পিছু ১০০ বিঘা জমি রাখার প্রস্তাব সম্পর্কে সরকারী পক্ষ থেকে নাসিরুদ্দীন আহমদ একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন।[১] এই সংশোধনীতে কোম্পানী রেজিষ্ট্রীকরণের যে বাধ্যবাধকতা বিলটিতে রাখা হয়েছিলো তা উঠিয়ে নেবার প্রস্তাব করা হয়। এর অর্থ প্রকৃতপক্ষে দাঁড়ায় এই যে, কয়েকজন মিলে একটি কোম্পানী গঠন করেছে বলে দাবী করলেই তারা ১০০ বিঘার বেশী জমি হাতে রাখার অধিকার আইনতঃ লাভ করবে।

মুসলীম লীগের মইনুদ্দীন চৌধুরী অপর একটি সংশোধনী প্রস্তাবে সমস্ত রকম খাস জমি মালিকের হাতে রাখার জন্যে প্রস্তাব করেন।[২] এছাড়া ওয়াক্ফ এর মাধ্যমে জমি হাতে রাখার ব্যবস্থাও সরকারী প্রস্তাবের মধ্যে

করা হয়।[৩] এ ক্ষেত্রে সরকারী পক্ষের এ. এম. আব্দুল হামিদ তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, দেবোত্তরের পূর্বে "Public" শব্দটি জুড়ে দেওয়ার কারণ ব্যক্তিগত দেবোত্তর এবং সাধারণ দেবোত্তরের মধ্যে তফাৎ আছে। ব্যক্তিগত দেবোত্তর বস্তুতঃ পরিবারেরই সম্পত্তি, তাতে বাইরের কোন লোকের দাবী দাওয়া নেই। কিন্তু ওয়াক্‌ফ্ এর ক্ষেত্রে "Public" শব্দ জোড়ার প্রয়োজন নেই কারণ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী সব রকম ওয়াকফই মূলতঃ সাধারণের জন্যে উৎসর্গীকৃত।*

পারিবারিক ওয়াক্‌ফ্ বা ওয়াক্‌ফ্ আলাল-আওলাদ সম্পর্কে মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের তত্ত্বগত প্রশ্ন উঠিয়ে পারিবারিক ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তিকে ১০০ বিঘা সিলিং এর আওতার বাইরে রাখার প্রস্তাব সুকৌশলে করা হয়। এই সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে মওলানা ফজলুল করিম বলেন,

> বিলে ওয়াক্‌ফ্ আলাল-আওলাদ সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না বলা হয়েছে, কিন্তু পাকিস্তান এখন দারুল ইসলাম** গভর্ণমেণ্টের। এখানে সকল সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপের অধিকার রয়েছে। কাজেই ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তিগুলিকে জিয়াইয়া রাখার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এ সম্পত্তিগুলি প্রায়ই অন্যায়ভাবে হজম করা হচ্ছে। বড়ই দুঃখের বিষয় আমরা যেভাবে জমিদার ও জোতদারদের support করি এবং এ আইন পাশের বেলায়ও support করছি তাতে দেশের জনসাধারণ আমাদের সততার উপর সন্দেহ করবে। আজ এই আইন পাশের ভেতর প্রমাণ হবে আমরা সত্যসত্যই জনসাধারণের হিতার্থে আজাদ মুলুকের আইন পাশ করছি, না জমিদারদের ফেন চাঁটা হয়ে এই আইন পাশ করছি।[৪]

ওয়াক্‌ফ্ ও দেবোত্তরের মাধ্যমে জমি হাতে রাখার ব্যবস্থা সম্পর্কে মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন,

*ওয়াক্‌ফ্ আলাল-আওলাদ এর এই ব্যাখ্যা একেবারে ভ্রান্ত। সাধারণ ওয়াক্‌ফ্ এবং এর মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে এবং ওয়াক্‌ফ্ আলাল-আওলাদের ওপর পারিবারিক দখল ও অধিকার প্রায় সার্বজনীন ব্যাপার।

**যে সমাজে ইসলামী শাসন কায়েম থাকে তাকে বলা হয় দারুল ইসলাম। যে সমাজে অনৈসলামিক শাসন থাকে তাকে বলা হয় দারুল হরব।

সমস্ত মুসলমান জমিদারেরা Wakf-al-al-awlad করবেন। তাঁদের খাস জমি ছুঁতে পারবেন না। আর হিন্দু জমিদারের জমি দেবোত্তর হবে। তাহলে আপনারা কি নেবেন?[৫]

ওয়াক্‌ফ্ ও দেবোত্তরের মাধ্যমে জমি হাতে রাখা, সমস্ত খাস জমি হাতে রাখা ইত্যাদি প্রস্তাবের মাধ্যমে যে নীতি মুসলিম লীগ সরকার অনুসরণ করছিলেন তার ফলে খোদ কৃষকের হাতে জমি যাওয়া যে প্রায় অসম্ভব একথা উপলব্ধি করে শাসক শ্রেণীর কর্ণধারদের মধ্যেও কেউ কেউ যে যথেষ্ট বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন সেটা এই বিতর্কের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুশো আড়াইশো অথবা তারও অধিক জমি খাস দখলে রাখার যে ব্যবস্থা ৭ নম্বর ধারায় রাখা হয়েছিলো সে সম্পর্কে খুলনার আবদুস সবুর খান যে সাবধান বাণী তাঁর স্বশ্রেণীব উদ্দেশ্যে উচচারণ করেন এ ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

স্যার, এখন এই ধরনের যে সংশোধনীগুলি পেশ করা হয়েছে সেগুলির দ্বারা অনেকাংশে দেখা যাবে যে, জমিদাবী উচ্ছেদেব আসল অর্থ শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে তাদের স্থলে জোতদারদেরকে বসিয়ে দেওয়া। এটা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার এবং আমি বলতে চাই যে কমিউনিজমের ঢেউ আমাদের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। তা এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের উল্টো দিকে এবং গিলগিটের উল্টো দিকে।* আকস্মিকভাবে এই কমিউনিজম আমাদেব মধ্যে একটা তৈবী ক্ষেত্র পেযে যেতে পাবে। আমার জোতদার বন্ধুরা যদি এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে না ওঠেন এবং পূর্বাহ্নেই যদি তাঁরা পদক্ষেপ না নেন তাহলে একথা বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, তাঁবা একদিন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই কমিউনিজমের ঢেউয়ের দ্বারা প্লাবিত হবেন এবং এটা মনে করা ভুল হবে যে তার কব্জা থেকে কেউ রক্ষা পেতে পারবে।[৬]

"রেজিষ্টার্ড" কোম্পানী, ওয়াক্‌ফ্ দেবোত্তর ইত্যাদি সম্পর্কে বিতর্কের জবাবে রাজস্বমন্ত্রী তফজ্জল আলী বলেন যে, কোম্পানীর পূর্বে "রেজিষ্টার্ড" শব্দটি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে কারণ ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী কোম্পানীর অর্থই হলো রেজিষ্টার্ড কোম্পানী। কাজেই

*সবুর খানের এই উদ্বেগের আসল কারণ তৎকালীন পূর্ব বাঙলায় কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম এবং বিদ্রোহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশীয় পরিস্থিতির কোন উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকে কৌশলের সাথে তিনি এখানে চীনের অবস্থানের উল্লেখ করছেন।

"রেজিষ্টার্ড" শব্দটি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন মনে করেই তা বাদ দেওয়া হচ্ছে।[৭]

"রেজিষ্টার্ড" শব্দটি তুলে দিয়ে জমির মালিকদেরকে অতিরিক্ত জমি হাতে রাখার যে সুযোগ মুসলিম লীগ মন্ত্রীত্ব করে দিচ্ছিলেন তা দারুণ সমালোচনার সম্মুখীন, এমনকি তাঁদের নিজেদের দলভুক্ত সদস্যদেরও সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ায় ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের দোহাই পেড়ে রাজস্বমন্ত্রী যে এক্ষেত্রে তাঁদের সম্পর্কে "ভুল বোঝাবুঝির" অবসান ঘটাতে চেয়েছেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

স্পেশাল কমিটি সুপারিশ করেছিলেন যে চা, ইক্ষু এবং তুলা শিল্প সংক্রান্ত কোম্পানীগুলি ১০০ বিঘার অতিরিক্ত জমি চা, ইক্ষু ও তূলা চাষের জন্য হাতে রাখতে পারবে। কিন্তু একটি সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার এই তিন ধরনের কোম্পানীর পরিবর্তে ঢালাওভাবে যে কোন বড়ো শিল্পের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হবে বলে প্রস্তাব করেন। এই সংশোধনীর সপক্ষে রাজস্ব মন্ত্রী বলেন যে, এই পরিবর্তনের কারণ উপরোক্ত তিন ধরনের শিল্প ছাড়াও অন্যান্য শিল্পের জন্যেও অতিরিক্ত জমি প্রযোজন হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে তিনি ঢাকার নিকটস্থ একটি রাবার শিল্পের* উল্লেখ করেন। এই ধরনের নোতুন কোম্পানীগুলিকে শিল্প সম্প্রসারণের সুযোগ দানের জন্য অতিরিক্ত জমি হাতে রাখার সুযোগ শুধুমাত্র তিন ধবনেব শিল্পেব ক্ষেত্রে না রেখে তাকে আরও প্রসারিত করা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৮]

পূর্বে সরকারী প্রস্তাবে ছিলো যে ১৯৪৮ এর ১লা জুনের পূর্ব পর্যন্ত ওয়াক্ফ্ ও দেবোত্তরগুলি একশো বিঘার অতিরিক্ত জমি রাখতে পারবে। কিন্তু একটি সরকারী সংশোধনীর মাধ্যমে[৯] এই তারিখ সীমা উঠিয়ে নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে রাজস্ব মন্ত্রী বলেন যে, উপবোক্ত তারিখের পরও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যাঁরা সম্পত্তি ওয়াক্ফ্ ও দেবোত্তর করে জনগণকে দান করতে চান তাঁদেরকে বাধা দেওয়া উচিত হবে না। এজন্যেই তাঁরা এই তারিখ সীমা উঠিয়ে নিচ্ছেন। তবে এই সমস্ত সম্পত্তির আয় কিভাবে ব্যয় হচ্ছে তার হিসেব নেওয়ার দায়িত্ব সরকার নিজ হাতে গ্রহণ

---

*খুব সম্ভবতঃ অতিরিক্ত জমি হাতে রাখার উদ্দেশ্যেই এই "রাবার কোম্পানী" চালু করা হয়েছিলো। কারণ পরবর্তীকালে রাজস্বমন্ত্রী উল্লিখিত এই "কোম্পানীর" কোন হদিস আর পাওয়া যায় নি।

করছেন। কাজেই এ ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছায় সন্দেহের কোন কারণ নেই।[১০]

৮

টঙ্ক প্রথার বিলোপ

টঙ্ক খাজনার অর্থ হলো জমিদারের জমিতে চাষ আবাদ করে টাকায় খাজনা না দিয়ে অথবা ভাগে খাজনা না দিয়ে বৎসরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য জমিদারকে খাজনা হিসেবে দেওয়া। এই নির্দিষ্ট শস্য খাজনার জন্যেই এই প্রথাকে ভাগ প্রথা বলা চলে না। ভাগচাষীদের থেকেও টঙ্ক খাজনা দানকারী এই কৃষকদের অবস্থা ছিলো আরও খারাপ, তারা ছিলো আরও বেশী নির্যাতিত।

ভাগে খাজনা, সে আধি অথবা তেভাগা যাই হোক, উৎপন্ন ফসলের ওপরই দিতে হয়। ফসল ভাল না হলে জমির মালিকও সে বৎসর কম খাজনা পায়। কিন্তু টঙ্ক প্রথা অনুযায়ী জমির মালিকের প্রাপ্য খাজনা ফসলে নির্দিষ্ট, জমির উৎপাদনের ওপর তা নির্ভরশীল নয়। উৎপাদন কম বেশী যাই হোক, কৃষককে নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য জমির মালিককে দিতেই হবে। এই অবস্থার জন্যে খরা বা বন্যায় বা অন্য কারণে আশানুযায়ী ফসল না হলে কৃষককে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকেরও বেশী জমির মালিককে দিয়ে খাজনার দায় থেকে মুক্ত হতে হতো। এবং তার ফলে বৎসরের অধিকাংশ সময় অনাহার অর্ধাহার ব্যতীত তাদের অন্য কোন উপায় থাকতো না।

এই প্রথার বিরুদ্ধে ময়মনসিংহ জেলার সুসংদুর্গাপুর পরগণায় এক ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং কৃষকদের সেই সংগ্রাম ১৯৪৯ সালে ভয়ানক তীব্র ও সশস্ত্র আকার ধারণ করে।* এই সংগ্রামের চাপে সরকার টঙ্ক খাজনাকে টাকায় খাজনাতে রূপান্তরিত করে খাজনার হার কিছুটা কমিয়ে আনার প্রস্তাব ও পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়।

নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দলভুক্ত জমিদার জোতদাররা কিভাবে তৎপর ও কতখানি সতর্ক ছিলো সেটা

*এই কৃষক বিদ্রোহ ও সংগ্রামের বিস্তৃত বিবরণের জন্য তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত জমিদারী উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিতর্কে দেখা গেছে। নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে কতপ্রকার স্ববিরোধী ও ভণ্ডামীপূর্ণ যুক্তি দুই পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়েছে তার উদাহরণও এই বিতর্কের ক্ষেত্রে অসংখ্য। উৎপন্ন খাজনা বা টঙ্ক খাজনাকে টাকায় খাজনাতে রূপান্তরিত করা সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যেও সেই একই স্ববিরোধিতা, নির্লজ্জতা ও ভণ্ডামী সুস্পষ্ট-ভাবে দেখা যায়।

টঙ্ক এলাকায় টাকায় খাজনা প্রবর্তন করে সেই সাথে খাজনা হ্রাস এবং সেই নোতুন নির্ধারিত খাজনা অনুযায়ী জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দানের প্রস্তাব মুসলিম লীগ সরকার করেন। কংগ্রেস সদস্যেরা সদলবলে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে উদ্যত হন এবং তাঁদের পক্ষ থেকে তাঁদের উপ-নেতা ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত এই মর্মে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, টঙ্ক এলাকায় খাজনা হ্রাস করে সেই নোতুন প্রবর্ত্তিত খাজনার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ না করে পূর্ববর্তী দশ বৎসরের খাজনার গড় বের করে তার ভিত্তিতেই ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হোক। তাঁরা বলেন যে সেইভাবে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ না করলে জমিদারদের ওপর অন্যায় এবং অত্যাচার করা হবে।[১] মনোরঞ্জন ধর (ময়মনসিংহ জেলার জাঁদরেল জমিদার-জোতদার) একদিকে অভিযোগ করেন যে অবিভক্ত বাঙলার মুসলিম লীগ সরকার ও পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান সরকার টঙ্ক প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি এবং অন্যদিকে তিনি ধীরেন দত্তের প্রস্তাব সমর্থন করে দাবী করেন যে, খাজনার হার পরিবর্তন না করে পূর্ববর্তী দশ বৎসরের খাজনার গড়ের হিসেবে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হোক।[২]

মুসলিম লীগ সরকারও যে এক্ষেত্রে টঙ্ক প্রজাদের হিতার্থে খাজনা সম্পর্কিত উপরোক্ত প্রস্তাব করেছিলো তা নয়। একদিকে তাদের ওপর ছিলো ময়মনসিংহের টঙ্ক এলাকার হাজং ও মুসলমান চাষীদের ব্যাপক ও তীব্র আন্দোলনের চাপ অন্যদিকে এই এলাকার জমিদাররা ছিলেন প্রায় সকলেই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এজন্যে টঙ্ক এলাকার আন্দোলন দমন করতে গিয়ে তাঁরা নিদারুণ নৃশংসতার পরিচয় দান করলেও ফসলে খাজনাকে টাকায় খাজনায় রূপান্তরিত করে সেই সাথে খাজনার পরিমাণ হ্রাস করতেও তাঁদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নি।

টঙ্ক এলাকায় যে পরিমাণে ফসলে খাজনা নির্দিষ্ট হতো তাতে একর প্রতি খাজনা ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত কৃষকদেরকে দিতে হতো।

সেদিক থেকে বিচার করলেও এই খাজনা সমতুল্য অন্যান্য এলাকার জমির খাজনা, এমনকি পার্শ্ববর্তী এলাকার জমির খাজনা থেকেও অনেক বেশী ছিলো।

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০, রাজস্বমন্ত্রী তফজ্জল আলী 'জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন' অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে যে সর্বশেষ পরিষদ বিবৃতি দেন তাতে তিনি টঙ্ক প্রথা বিলোপ সম্পর্কে বলেন,

> স্যার, এই জমিদারী ক্রয় আইন পুরোপুরি প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বেই সকল প্রকার ফসলে খাজনা, যা অনেকক্ষেত্রে প্রজাদের ওপর খুবই পীড়নমূলক, এই আইনের বিধান অনুযায়ী ন্যায় ও বিচার সম্মত ভিত্তিতে টাকায় খাজনায় রূপান্তরিত করা হবে।[৩]

৯

'জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন' ও পূর্ব বাঙলার কৃষক

'পূর্ব বাঙলা জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন' যেভাবে প্রণীত হয়েছিলো তাতে প্রকৃতপক্ষে জমিদারী সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ হয় নি। কারণ এই আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রই জমিদারে পরিণত হয়, পূর্ব বাঙলা সরকারই হয় কৃষকদের থেকে খাজনা আদায়ের অধিকারী। এই ব্যবস্থায় জমিদারদের গোমস্তা ও কর্মচারীদের স্থান দখল করে সার্কেল অফিসার, তহশীলদার, চৌকিদার প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীরা এবং তাদের মাধ্যমে কৃষকদের থেকে নির্যাতনমূলকভাবে খাজনা আদায় এবং তাদের ওপর অন্যান্য নানা প্রকার অত্যাচার রীতিমতো অব্যাহত থাকে। 'জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন' প্রণীত হওয়ার সময় আইনগতভাবে বাৎসরিক কৃষকদের মোট দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিলো ৮.৪২ কোটি টাকা।[১] কিন্তু জমিদারদের থেকে সরকারের প্রাপ্ত অঙ্কের পরিমাণ ছিলো ২.২৪ কোটি টাকা।[২]* জমিদারী ক্রয় আইনের বিতর্ক চলাকালে হামিদুল হক যে হিসেব দান করেন সেই অনুযায়ী সরকারের খাজনা আদায় বাবদ খরচা হওয়ার কথা ১.২৪ কোটি টাকা।[৩] এই অনুযায়ী সরকার কর্তৃক জমিদারী উচ্ছেদের পর ভূমি খাজনা বাবদ সরকারের অতিরিক্ত আয় ৪ কোটি টাকার মতো হবে বলেও হামিদুল

*হামিদুল হক অবশ্য এই পরিমাণ ৩ কোটি টাকা বলে মোটামুটিভাবে নির্দেশ করেন।

হক উল্লেখ করেন।[৪] অর্থাৎ সে সময় সরকারের প্রত্যাশা অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব থেকে মোট আয়ের পরিমাণ কোনক্রমেই ৭ কোটি (পূর্ববর্তী ২.২৪+ অতিরিক্ত ৪ কোটি) টাকার বেশী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভূমি রাজস্ব আয় সংক্রান্ত সরকারী পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে এই বাবদ সরকারের আয় ১৯৫০ সালের পরবর্তী পর্যায়ে* ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর থেকে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৭০ সালে তা এসে দাঁড়ায় ১৮.৫০ কোটি টাকায়।[৫] ১৯৫০ সালের 'জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন' চালু হওয়ার পরও রাষ্ট্রীয় জমিদারীতে কৃষকদের ওপর খাজনা শোষণের পরিচয় এর থেকেই সুস্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়।

খাজনার শোষণ ছাড়াও আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। 'জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল' এর ওপর বিতর্ক চলাকালে সরকার পক্ষ থেকে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণের অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পর অতি অল্প পরিমাণ জমিই প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অধিকাংশ জমিই ভূস্বামীরা বেনামী করে নিজেদের দখলে রাখে এবং সরকারও উদ্বৃত্ত জমি বের করা ও কৃষকদের মধ্যে তা বিতরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা ও শৈথিল্যের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণের প্রশ্নটি কার্যক্ষেত্রে ধামা চাপা দেয়।

'জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন' প্রণয়ন করতে গিয়ে সরকার ময়মনসিংহের হাজং অধ্যুষিত এলাকায় টঙ্ক খাজনা রহিত করে টাকায় খাজনা প্রচলন করেন এবং সিলেটের ব্যাপক অঞ্চলে নানকার প্রথা নামক ভূমিদাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ করেন। এই দুই ক্ষেত্রের সরকারী সংস্কার উপরোক্ত এলাকার কৃষকদেরকে কিছু কিছু নোতুন অধিকার প্রদান করে। কিন্তু হাজং এলাকার কৃষকদেরকে টাকায় খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেও ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর সেই সব এলাকায় মোহাজেরদেরকে বসিয়ে কিভাবে সরকার ব্যাপকভাবে হাজং উচ্ছেদ করে একমাত্র সেদিকে লক্ষ্য রাখলেই এই সরকারী "অধিকার প্রদানের" প্রকৃত স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

---

*আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে এই খাজনা বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু খাজনা বৃদ্ধির যে সুযোগ আইনের মাধ্যমে সরকার নিজের হাতে রেখেছিলেন সেই সুযোগ ব্যবহার করেই আইয়ুব আমলে বেপরোয়াভাবে খাজনা বৃদ্ধি করা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব বাঙলায় কৃষক আন্দোলন

১

ভূমি সংস্কার সম্পর্কে সারা ভারত কিষাণ সভার প্রস্তাব

১৯৪৮ সালের ১৬ই ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বাঙলার বর্ধমান শহরে সারা ভারত কিষাণ কমিটির বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে ভূমি সংস্কার সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব[১] গৃহীত হয়:

"জমিদারী প্রথার ক্রমবর্ধমান চাপ এবং কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের জন্যে কৃষক সমাজ ও কৃষি শ্রমিকের দুর্দশা ভয়ানক-ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারা দেশব্যাপী তীব্র খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে এবং উত্তরোত্তর কৃষির অবনতি ঘটছে। অ-কৃষক জমিদারদের হাতে জমির কেন্দ্রীভবন গ্রামীন অর্থনীতিতে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। সারা দেশ বৎসরের পর বৎসর স্থায়ী খাদ্য সংকটের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছে। কনট্রোল, রেশনিং, খাদ্য সংগ্রহ—সবকিছুই ধনী, পরগাছাস্থলভ ও মুনাফাখোর জমিদারদের কুক্ষিগত থাকার ফলে ব্যর্থ হয়েছে। এই সংকটের সত্যিকার সমাধান সম্ভব একমাত্র এমন মৌলিক ভূমি সংস্কারের যার মধ্যে ব্যবস্থা থাকবে:

(১) ক্ষতিপূরণ ছাড়াই সমস্ত প্রকার জমিদারী উচ্ছেদ করা এবং দরিদ্র মধ্যশ্রেণীর জমিদারদেরকে জীবিকা নির্বাহের এলাউন্স দেওয়া এবং বাজেয়াপ্ত করণের একটা সীমা নির্দিষ্ট করা যা নির্ধারিত হবে প্রাদেশিক কৃষক সমিতির দ্বারা।

(২) জমি যারা নিজেরা চাষ আবাদ করে তাদের মধ্যে জমি বিতরণ করা।

(৩) টাকা অথবা ফসলে সমস্ত প্রকার খাজনা ও অন্য ধরনের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তে কৃষি আয়কর ব্যবস্থার প্রচলন করা।

(৪) সেচ ব্যবস্থার জাতীয়করণ এবং পানি, সার, বলদ, বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি পরিকল্পিতভাবে সরবরাহের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সাহায্য পরিকল্পনার অধীনে কৃষির উন্নতি সাধন; এবং

(৫) জমিদারদেরকে অপসারণের পর কৃষকদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমবায় গঠনের মাধ্যমে বড়ো আকারের যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষাবাদকে উৎসাহ দান করা।

এই ধরনের সংস্কারের সাথে সাথে দরকার বৃহৎ শিল্পগুলির জাতীয়করণ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অল্প মূল্যে সরবরাহ এবং গ্রামের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার পরিপূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য সেগুলির পরিকল্পিত সম্প্রসারণ।

কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সরকার কৃষকসমাজ ও কৃষি শ্রমিকদের প্রয়োজনের প্রতি পরিপূর্ণ নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করছে। একদিকে যেমন কৃষক আন্দোলনকে দমন করার জন্যে সর্বপ্রকার নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং পুলিশকে বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা সজ্জিত করা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে সত্যিকার কৃষি সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না।

মাদ্রাজ ও বিহারে কংগ্রেস সরকার কৃষি সংস্কারের জন্য বিল তৈরী করেছে এবং আরও কয়েকটি প্রদেশে ঐ একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই সমস্ত প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কৃষকদের স্বার্থে নিয়োজিত হচ্ছে না; এগুলি কেবলমাত্র ধনী জমিদারদের স্বার্থেই নিয়োজিত থাকছে কারণ এর দ্বারা খোদ কৃষকের কাছে জমি হস্তান্তরের কেন্দ্রীয় সমস্যাটির কোন সমাধান হচ্ছে না।

এই সমস্ত প্রস্তাবিত সরকারী ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে সামন্ত জমিদারদেরকে পুঁজিপতি খামার মালিকে পরিণত হওয়ার এবং কোন না কোন উপায়ে মধ্য ও গরীব কৃষকদের জমি জবরদখল করে বড়ো আকারের খামার সৃষ্টির সুযোগ করে দেওয়া। সরকার কায়েমী স্বার্থকে অন্যভাবে জিইয়ে রাখার জন্যে এইভাবে চেষ্টা করছে।

কংগ্রেস সরকার কৃষি সংস্কারের যে সমস্ত পদক্ষেপ বিভিন্নভাবে প্রস্তাব করেছে সেগুলির সব কয়টিরই সাধারণ চরিত্র নিম্নরূপ:

(১) জমিদারী উচ্ছেদ হচ্ছে না, জমিদারী ব্যবস্থার পরিবর্তে নূতন ধরনের জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হচ্ছে যেমন, রাষ্ট্রীয় জমিদারী, রায়তওয়ারী ব্যবস্থা, সমবায় জমিদারী এবং ব্যাপক আকারের ব্যক্তিগত জমিদারী।

(২) বিপুল পরিমাণ জমির মালিক ব্যক্তিগত জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে না। অন্যদিকে খামারী জমি একত্রীকরণের নামে তাদেরকে নিজেদের জমি বাড়াতে উৎসাহ দান ও সহায়তা করা হচ্ছে।

(৩) গরীব কৃষক, জমির উপর স্বত্বহীন কৃষক, বর্গাদার ও কৃষি শ্রমিকদেরকে জমি দেওয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে সরকার খোদ কৃষকদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদের জন্যে জমিদারদেরকে পুলিশ দিয়ে সাহায্য করছে।

(৪) কৃষকদের ভার লাঘব করার পরিবর্ত্তে ক্ষতিপূরণের এক নূতন বোঝা জমিদারী স্বত্বের রাষ্ট্রীয়করণের উদ্দেশ্যে সমগ্র জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলির একমাত্র ফল হবে মুনাফাখোরদের হাতে জমি ও খাদ্য কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং ব্যাপক আকারে কৃষক উচ্ছেদ। তার দ্বারা গ্রামীন জীবন আরও বিপর্যস্ত এবং গ্রামে চোরাকারবার আরও জোরদার হবে। তার দ্বারা সকল স্তরের কৃষকরাই আঘাতপ্রাপ্ত হবে এবং ধনী জমিদাররা, সহায়তা লাভ করবে। তার দ্বারা কৃষির উন্নতি হবে না, উপরন্তু মুনাফাখোর পরগাছাদের ও জমিদখলকারীদের হাত শক্তিশালী করে তাকে আরও জোরে গলাটিপে মারার ব্যবস্থা হবে।

বিগত নির্বাচনে কংগ্রেস রাষ্ট্র ও খোদ কৃষকের মধ্যবর্ত্তী স্বত্বাধিকারী-দেরকে উচ্ছেদ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। কৃষকরা তখন বিশ্বাস করেছিলো যে কংগ্রেস সরকার কৃষকদেরকে জমি দিতে যাচ্ছে। কিন্তু এখন জমিদারী এলাকায় কংগ্রেস এমন ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে যার ফলে তথাকথিত মধ্যস্বত্বভোগীরা বিপুল পরিমাণ জমির মালিকে পরিণত হবে। স্বত্বহীন খোদ কৃষকরা পরিণত হবে ভূমিহীন কৃষকে। এই পরিবর্ত্তনকে কার্যকর করার জন্য সমস্ত কৃষক সমাজকে ক্ষতিপূরণের ভার বহন করতে হবে।

অন্যদিকে রায়তওয়ারী এলাকায় কোন সংস্কারই এখনো পর্যন্ত প্রস্তাবিত হয় নি। খোদ কৃষকদেরকে জমিদারদের দয়ার ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ইউনিয়নের কৃষকদের ভাগ্য এইই হতে যাচ্ছে।

পাকিস্তানে সরকার এখনো পর্যন্ত কোন সংস্কার ঘোষণা করে নি। সারা পাকিস্তানের কৃষি অর্থনীতিতে নির্দয় শোষণ, জমি দখল এবং বিশৃঙ্খলা চলছে।

সারা ভারত কিষান কমিটি খোদ কৃষক, বর্গাদার ও কৃষি শ্রমিকদের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, কিষাণ সভার মধ্যে নিজেদেরকে সংগঠিত করার এবং জমি, খাদ্য, উন্নতর জীবন ও কৃষির উন্নতির জন্য সংগ্রামকে জোরদার করার আহ্বান জানাচ্ছে।

উপরে উল্লিখিত লক্ষ্যগুলিকে অর্জন করার জন্য এই সভা দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি ও জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। ঐক্য-বদ্ধ সংগ্রাম ব্যতীত এগুলি সম্ভব নয়। সকল সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক মতাদর্শের কৃষকদেরকেই এই সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

উচ্ছেদ ও গ্রামীন ঋনগ্রস্থতার বিরুদ্ধে এবং ফসলের ন্যায়সঙ্গত ভাগ, ফসলে ভূমি খাজনাকে টাকায় খাজনায় রূপান্তর, খাজনা হ্রাস ও কৃষিযোগ্য পতিত জমি গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কৃষকদেরকে সংগঠিত করার জন্য এই সভা প্রাদেশিক কিষান সভাগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছে।

খোদ কৃষকদেরকে জমি না দিয়ে জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্ত করণের মাধ্যমে কৃষি সংস্কার সম্ভব হবে, এই মর্মে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি করছে তার বিরুদ্ধে এই কমিটি কৃষক-দেরকে সাবধান করে দিচ্ছে।

সত্যি অর্থে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করতে হলে জমিদারদের ব্যক্তি-গত জমি বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং সেই সাথে স্বত্বহীন কৃষক, বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষকসহ যারা নিজেরা জমি চাষ করে তাদের মধ্যে জমি বিতরণ করতে হবে।"

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে সারা ভারত কৃষক সভা জমিদার-বুর্জোয়া রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বে ভূমি সংস্কারের চরিত্র ও পরিণতি সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলো তা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো সেটা পূর্ব বাঙলা সরকারের 'জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইনের' চরিত্র ও পরিণতির দিকে তাকালেই সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। জমিদারী ও সর্বপ্রকার ভূমি খাজনা ও কর উচ্ছেদের পরিবর্তে পূর্ব বাঙলায় রাষ্ট্র জমিদারে পরিণত হলো এবং পরবর্তী পর্যায়ে ভূমি খাজনার হার বহুলাংশে বৃদ্ধি করে সর্বস্তরের কৃষকদের ওপর খাজনার নির্যাতন অব্যাহত রাখলো। শুধু তাই নয়, এই আইনের মাধ্যমে ভূমি খাজনার সাথে সম্পর্কিত নানা ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রাও ১৯৫০ এর পর অনেক দিক দিয়ে বৃদ্ধি পেলো।

জমিদারী উচ্ছেদের নামে 'জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন' প্রণীত হওয়ার পূর্বে জমিদাররা দীর্ঘ দিন কৃষক আন্দোলনের ফলে অনেকখানি সংযত হতে এবং কৃষকদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা অনেকাংশে কমিয়ে

আনতে বাধ্য হয়েছিলো। কিন্তু জমিদারী সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আসার পর সরকার ও সরকারী কর্মচারীরা নোতুনভাবে তাদের শোষণ ও নির্যাতনকে চালু করে। পূর্বে জমিদারদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্যে অথবা তাদের ওপর স্থানীয়ভাবে চাপ সৃষ্টি করে অনেক সময় কৃষকরা খাজনা মাফ না হলেও খাজনা দাখিলের জন্যে সময় পেতো কিন্তু অস্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সে রকম কোন সুযোগ কৃষকদের থাকলো না। এ ক্ষেত্রে যান্ত্রিকভাবে খাজনা আদায় শুরু হলো। কৃষকদের নামে বডি ওয়ারেণ্ট, তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, গবাদি পশু জবর দখল ইত্যাদি সমানে জারী থাকলো। শুধু তাই নয়। অনেক ক্ষেত্রে জমিদার ও জমিদারদের কর্মচারীদের মতো সরকারী কর্মচারীরাও ঘুষের মাধ্যমে কৃষকদের থেকে নানা প্রকার বেআইনী আদায় শুরু করলো।

বডি ওয়ারেণ্ট, সম্পত্তি ক্রোক, হালের বলদ কেড়ে নেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের এই নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কৃষকরা এর পর পূর্ব্বের থেকে অধিক হারে মহাজনের কাছে ঋণগ্রস্থ হতে শুরু করলো। ফলে যে জমি রক্ষার জন্য তাদেরকে মহাজনের দারস্থ হতে হচ্ছিলো তাদের সেই জমিই ঋণের দায়ে তাদের হাত থেকে মহাজনের হাতে উত্তরোত্তরভাবে চলে যেতে থাকলো। মোটামুটি এই হলো পূর্ব বাঙলায় তথাকথিত জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পরবর্ত্তী পর্যায়ে পূর্ব বাঙলার কৃষকদের সামগ্রিক সাধারণ অবস্থা।

২

পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি

১৯৪৮ এর ১৬ই ও ১৭ই জানুয়ারী সারা ভারত কিষাণ কমিটির সভায় দেশ বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় উপ-মহাদেশের দুই পৃথক রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানে কৃষক সভাকে নোতুনভাবে সংগঠিত করার প্রশ্ন আলোচিত হয় এবং এ বিষয়ে তাঁরা কতকগুলি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১] এই সিদ্ধান্তগুলি হলো : (ক) দেশ বিভক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় কিষাণ সভাকে দুই অংশে বিভক্ত করা। ভারতীয় অংশে গঠিত কিষাণ সভার নাম হবে সারা ভারত কিষাণ সভা এবং পাকিস্তানে গঠিত

কিষাণ সভার নাম হবে সারা পাকিস্তান কিষাণ সভা। (খ) এই দুই কিষাণ সভাই প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর সারা ভারত কিষাণ সভার সংবিধানটিকেই গ্রহণ করবে। (গ) সারা ভারত কিষাণ কমিটির সদস্যেরা ভারত ও পাকিস্তান যেখানে থাকবেন সেই হিসেবে দুই অংশের কমিটি তাঁদের দ্বারাই গঠিত হবে। (ঘ) কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের যে সমস্ত সদস্যেরা ভারতে থাকবেন তাঁদেরকে নিয়েই নোতুন সারা ভারত কিষাণ সভার কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল গঠিত হবে। (ঙ) কিষাণ কমিটির যে সদস্যেরা পাকিস্তানে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা সুবিধামতো কোন স্থানে মিলিত হয়ে পাকিস্তানের জন্য নোতুন কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিল গঠন করবেন। এর জন্য মনসুর হাবিবকে আহ্বায়ক মনোনীত করা হলো। (চ) এর পরবর্তী পর্যায় থেকে দুই দেশের কিষাণ সভা সম্পূর্ণ স্বাধীন দুটি সংগঠন হিসেবে কাজ করে যাবে।

সারা ভারত কিষাণ কমিটির উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহের পর সারা পাকিস্তান কিষাণ সভা গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভবপর হয় নি মূলতঃ ভৌগলিক কারণে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে হাজার মাইলেরও বেশী দূরত্ব সে সময়ে সারা পাকিস্তান পর্যায়ে কৃষক সভা গঠনের ক্ষেত্রে ছিলো একটা দারুন প্রতিবন্ধক। তাছাড়া পাকিস্তানের এই দুই অংশে কৃষক আন্দোলনের পরিস্থিতিও ছিলো অনেক স্বতন্ত্র। পূর্ব পাকিস্তানে তখন তেভাগা আন্দোলন শেষ হলেও কতকগুলি এলাকায়—যেমন সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, খুলনা ও যশোরে—১৯৪৮ সালের প্রথম দিক থেকেই নোতুন আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে সে ধরনের কোন কিষাণ আন্দোলনের অস্তিত্ব তখন ছিলো না। পরিস্থিতির এই পার্থক্যের জন্যে পূর্ব পাকিস্তানে কৃষক সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা তখন যেভাবে অনুভব হয়েছিলো এবং তা যতখানি জরুরী ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে তা ছিলো না। মোট কথা, কৃষক সভার বর্ধমান বৈঠকের পর পূর্ব বাঙলায় যে কৃষক সমিতি গঠিত হয় তার সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের কিষাণ সভার প্রকৃতপক্ষে কোন সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিলো না। কাজেই এই অংশের কৃষক সমিতি একটা প্রাদেশিক সংগঠন হলেও প্রকৃতপক্ষে তার সংগঠনগত সমস্ত কাজ কর্মই স্বাধীনভাবে পরিচালিত হতে থাকে। কৃষ্ণবিনোদ রায়কে সভাপতি এবং মনসুর হাবিবকে সম্পাদক নির্বাচিত করে৭ পূর্ব পাকিস্তান কৃষক

সমিতি পূর্বোক্ত বর্ধমান প্রস্তাব অনুযায়ী কৃষক আন্দোলনকে পূর্ব বাঙলায় সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

সারা ভারত কিষাণ সভার বর্ধমান বৈঠকে কংগ্রেস ও লীগ সরকার এবং কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে যে সমস্ত বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেগুলি এই বৈঠকের প্রায় ছয় সপ্তাহ পরে (২৮শে ফেব্রুয়ারী) কলকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহের সাথে সাধারণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।* এর কারণ দ্বিতীয় কংগ্রেসে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো তার মোটামুটি লাইন ও কাঠামো ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকেই স্থিরীকৃত হয়।

১৯৪২ সালের পর থেকে প্রধানতঃ কমিউনিষ্ট পার্টির যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতির** কারণে অধ্যাপক রঙ্গ, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক প্রভৃতির মতো অ-কমিউ-নিষ্ট ব্যক্তিরা কিষাণ সভা পরিত্যাগ করতে শুরু করেন এবং ১৯৪৫ সালে সারা ভারত কিষাণ সভার সভাপতি স্বামী সহজানন্দ কৃষক সভা থেকে পদত্যাগ করার পর কিষাণ সভা কমিউনিষ্ট প্রভাবিত সংগঠন থেকে প্রায় পুরোপুরিভাবে কমিউনিষ্টদের দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠনে পরিণত হয়।* এজন্যে কমিউনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্তসমূহ সারা ভারত কিষাণ সভার ও পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সিদ্ধান্তসমূহ ও সাংগঠনিক কার্যকলাপকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে দেশ বিভাগের সময় ভারত ও পাকিস্তান উভয় অংশেই কমিউনিষ্ট পার্টি সরকারী স্বাধীনতা উৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করে এবং সরকারের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। কিন্তু এই আশ্বাস সত্ত্বেও উভয় অংশের সরকার নিজেদের উদ্যোগে তো নয়ই, উপরন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির উপর্যুপরি আহ্বান ও দাবী সত্ত্বেও সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দান করতে অস্বীকার করে। এর ফলে অসংখ্য রাজনৈতিক বন্দী, যার মধ্যে অধিকাংশই কমিউনিষ্ট, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরও ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে বন্দী থাকেন।

*ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের বিবরণের জন্য 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

**এ সম্পর্কে Agrarian struggle in Bengal by Sunil Sen এবং বদরুদ্দীন উমরের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক' দ্রষ্টব্য।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভবানী সেন, আব্দুল্লাহ রসুল প্রভৃতি কৃষক সমিতির নেতারা পূর্ব বাঙলার প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কাছে একটি তথ্য সম্বলিত স্মারকলিপি[৪] পেশ করে এক-দিকে নিজেদের বিভিন্ন দাবী সরকারকে জানান এবং অন্যদিকে সরকারের সাথে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও রাজবন্দীদের মুক্তি হলো না। এই কারণে এবং আরও নানাভাবে উত্তরোত্তর সরকারের গণবিরোধী চরিত্র শ্রেণী সচেতন রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। যাঁরা এই সরকারের থেকে সামান্য কিছুও আশা করেছিলেন তাঁরাও হতাশাগ্রস্থ হলেন এবং তার ফলে কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি রাজনৈতিক সংগ্রামকে নোতুনভাবে আবার সংগঠিত করতে সচেষ্ট হলো।

পূর্ব বাঙলায় কৃষক সমিতি নোতুনভাবে সংগঠিত হওয়ার পর ১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বরে রংপুর জেলার লালমনিরহাট অঞ্চলে পূর্ব বাঙলার সমস্ত জেলা প্রতিনিধিদের একটা সম্মেলন হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি তৎকালীন নাজিমুদ্দীন সরকারের দ্বারা বেআইনী ঘোষিত না হলেও তাঁরা বাস্তবক্ষেত্রে এই দুই সংগঠনকে তখন বেআইনী সংগঠন হিসেবেই ধরে নিয়েছিলেন এবং কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির সদস্য ও সমর্থক-দের ওপর আনসার ও পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে ধরপাকড়সহ সব রকম নির্যাতন চালাতে শুরু করেছিলেন। এজন্যে এই সম্মেলন অত্যন্ত গোপ-নীয়তার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।[৫]

তিন দিন স্থায়ী এই কৃষক প্রতিনিধি সম্মেলনে আন্দোলন সংক্রান্ত যে মূল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা হলো: (ক) নবাব জমিদারদের দ্বারা পরি-চালিত মুসলিম লীগ সরকার স্বেচ্ছায় কখনো জমিদারী উচ্ছেদ করবে না। কাজেই কৃষি প্রধান পূর্ব বাঙলায় সুকঠিন ও সুউচ্চ পর্যায়ের গণ আন্দো-লন ও সংগ্রামের মাধ্যমেই চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে হবে। (খ) সর্বাপেক্ষা সংগঠিত কৃষক অঞ্চলগুলি থেকে আন্দোলনের ঢেউ তুলতে হবে এবং তা একবার তুলতে পারলে পূর্ব বাঙলার সর্বত্র সেই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়বে।[৬]

৩

পূর্ব বাঙলায় কৃষক আন্দোলনের এলাকা

কৃষক সমিতির লালমনিরহাট জেলা প্রতিনিধি সম্মেলনে আন্দোলন সংক্রান্ত যে দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে নির্ধারিত লাইনেরই অনুবর্তী। এক্ষেত্রে "সুকঠিন ও সুউচচ" গণআন্দোলনের অর্থ তাই সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম এবং সর্বাপেক্ষা সংগঠিত এলাকাগুলি থেকে আন্দোলনের ঢেউ তুললে তা অন্যান্য এলাকাতেও আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করবে এই প্রত্যাশার অর্থ দেশের জনগণকে, বিশেষতঃ কৃষক জনগণকে সামগ্রিকভাবে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে পরিচালনা করা যায় এই প্রত্যাশা। সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির এই নীতির ফলে নোতুন পরিস্থিতিতে সারা দেশব্যাপী কৃষক আন্দোলনকে ধীরে ধীরে সংগঠিত না করে, কৃষক জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মানকে উচচতর পর্যায়ে তোলার জন্যে সুকঠিন আন্দোলন গঠনের প্রচেষ্টা না করে কৃষক সমিতি কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে অন্যান্য এলাকার কৃষকদের মধ্যে সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রাম ছড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই নীতি ও কর্মসূচীর ফলে তৎকালীন কৃষক আন্দোলন কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ হয়।

১৯৪৭ সাল থেকেই অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর থেকেই, পূর্ব বাঙলার সর্বত্র খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং ব্যাপক এলাকায় ১৯৪৯ সালের শেষ পর্যন্ত এবং পুনরায় ১৯৫১ সালে তা দুর্ভিক্ষের আকার পরিগ্রহ করে। কৃষক জনগণ দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, খাজনার নির্যাতন ইত্যাদিতে জর্জরিত হতে থাকেন। সরকারী খাদ্য নীতির ফলে কর্ডন ও লেভীর অত্যাচারও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বস্ত্র, কেরোসিন, ভোজ্য তেল ইত্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও মূল্য বৃদ্ধি জনগণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনকে চারিদিক থেকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এর ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই কৃষক জনগণ অতি দ্রুত মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেন এবং তাঁদের মধ্যে আন্দোলনের একটা সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু উপরোক্ত সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি কোন গণ-আন্দোলন গঠনে

করতে উৎসাহী না হওয়ার ফলে জনগণের বিক্ষোভ কোন আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। জনগণের এই বিক্ষোভকে রাজনৈতিক পথে পরিচালনার মতো অন্য কোন রাজনৈতিক সংগঠনও তখন বিদ্যমান ছিলো না। কিন্তু তবু যেটুকু সুযোগ তাঁরা পেতেন সেই সুযোগই যে জনগণ ব্যবহার করতে এগিয়ে আসতেন তার একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত ছিলো ১৯৪৯ সালে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল উপনির্বাচন।* এই নির্বাচনে টাঙ্গাইলের জনগণ মুসলিম লীগের সমস্ত চাপ ও সংগঠিত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে বিরোধী প্রার্থী শামসুল হককে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত করেন।

কিন্তু মুসলিম লীগের স্বল্পকালীন শাসনের পরই জনগণের বিক্ষোভ ধীরে ধীরে এবং ক্রমাগত উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উঠতে শুরু করলেও এবং মুসলিম লীগ সরকারকে উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উত্তরোত্তর উপলব্ধি করলেও পাকিস্তানকে উৎখাত করার কোন চিন্তা সেই পর্যায়ে জনগণের একেবারেই ছিলো না। মুসলিম লীগ সরকার ও পাকিস্তানকে তাঁরা এক করে দেখতেন না, যদিও মুসলিম লীগ ক্রমাগত নিজেদেরকে সেইভাবে চিত্রিত করার চেষ্টাই করে যেতো। জনগণ সে সময়ে তাই মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সাড়া দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু পাকিস্তান উৎখাত করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি কিন্তু সে সময়ে 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়" এই ধ্বনি তুলে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্র উচ্ছেদ করারই আহ্বান বস্তুতপক্ষে জনগণের সামনে উপস্থিত করেছিলো। এই আহ্বান ব্যাপক জনগণের মধ্যে কোন সাড়া না জাগিয়ে উপরন্তু তাদেরকে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তুলতেই সাহায্য করেছিলো। এবং জনগণের শত্রু মুসলিম লীগ সরকার সেই সুযোগকে অবহেলা না করে তাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহারের দ্বারা কমিউনিষ্টদেরকে হিন্দু ও ভারতের এজেণ্ট হিসেবে চিত্রিত করে ব্যাপক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে অনেকাংশে সফল হয়েছিলো। এই সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিলো এই যে, কৃষক সমিতি যে সমস্ত এলাকায় ১৯৪৮–৫০ সালে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত ও পরিচালনা করেছিলো সেগুলি প্রধানতঃ ছিলো আদিবাসী, নমশুদ্র ও সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকা।

* 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৪

সিলেটে জমিদারী ও নানকার প্রথা বিরোধী আন্দোলন

সমগ্র আসাম প্রদেশ জুড়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হলেও কাছাড়ের একাংশ এবং সমগ্র সিলেট জেলা ছিলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্গত। এই অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয় পরের দিকে। বন্দোবস্তের সময় এই অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিলো, সেজন্যে অনেক ছোট ছোট তালুকদারকে জমি সরাসরি সরকার বন্দোবস্ত দিয়েছিলো। এইসব তালুকদাররা ধনী ছিলো না, কিন্তু তারা আবার কারো প্রজাও ছিলো না।

এই সমস্ত তালুকদাররা ধনী না হলেও তাদের শোষণ ও অত্যাচার যথেষ্ট ছিলো। প্রত্যেক বৎসরই তারা নোতুনভাবে প্রজা বন্দোবস্ত করতো। এই বাৎসরিক বন্দোবস্তের জন্যে বাড়ীতে স্বরোপিত গাছের ফলের ওপরও কৃষকদের কোন অধিকার থাকতো না। জমির ওপর সমস্ত কিছুতেই তালুকদার এবং অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ ভূস্বামীদের (জমিদার, মিরেশদার) অধিকারকে খর্ব করার কোন ব্যবস্থা এই প্রথায় ছিলো না। এজন্যে ভূস্বামীদের যে কোন ধরনের জমির ওপর কিছু করতে গেলেই তাদেরকে সালামী না দিয়ে তা সম্ভব ছিলো না।

এ সব জমির খাজনা তুলনায় অল্প হলেও বে-আইনী আদায় এখানে প্রচুর ছিলো। জমির পরিমাণ অল্প এবং জমির চাহিদা বেশী থাকায় কৃষকদেরকে সব রকম হীন সর্ত এবং জোর জুলুম স্বীকার করে নিয়েই জমি ব্যবস্থা নিতে হতো। কৃষকদেরকে হাটবাজারের তোলা, ঘাটের তোলা (খুঁটগাড়ী) তো দিতেই হতো উপরন্তু যে জলমহলে পূর্বে অবাধে মাছ ধরার অধিকার তাদের ছিলো সেখানেও পরবর্তীকালে মাছ ধরতে গেলে জমিদারকে সালামী না দিয়ে তা সম্ভব হতো না। জমিদারের কাছারীতে প্রজাদের বসার ব্যবস্থা ছিলো মাটিতে।

এই অবস্থায় সিলেটে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন মূলতঃ প্রজাস্বত্ব নিয়েই শুরু হয়। পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সিলেট আসাম প্রদেশের অন্তর্গত ছিলো। আসামে সারা প্রদেশ জুড়ে কোন কৃষক সংগঠন ছিলো না। কেবলমাত্র কাছাড় ও সিলেট জেলাতেই কৃষক সভার সংগঠন ছিলো এবং এই দুই জেলার কৃষক সভা একত্রে ‘সুরমা উপত্যকা

কৃষক সভা' এই নামে প্রাদেশিক কৃষক সভা হিসেবে সারা ভারত কৃষক সভার সাথে সংযুক্ত ছিলো।[১]

সুরমা উপত্যকা কৃষক সভার উদ্যোগে এই অঞ্চলে প্রথম প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন হয় ১৯৩৬ সালে বেহেলীতে। ১৯৩৭ সালে কোন সম্মেলন না হলেও ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রতি বৎসরই প্রাদেশিক সম্মেলন সিলেট ও কাছাড়ের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর দাসের বাজারে সিলেট জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে। কৃষক সমিতি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ঘোষিত না হলেও কার্যক্ষেত্রে সরকার কৃষক সমিতিকে একটি বেআইনী প্রতিষ্ঠান হিসেবেই মোটামুটি দেখতো। কাজেই পাকিস্তানোত্তর এই প্রথম জেলা সম্মেলন গোপনীয়তার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।[২]

সুরমা উপত্যকা কৃষক সভার নেতৃত্বে ১৯৩৭–৩৮ সাল থেকে সিলেট জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারী অত্যাচার বন্ধ এবং প্রজাস্বত্ব অর্জনের জন্যে ব্যাপক এবং অনেকক্ষেত্রে সশস্ত্র আন্দোলনও শুরু হয়। এই সব আন্দোলনের, মধ্যে বংশীকুণ্ডা আন্দোলন, ভাটিপাড়া আন্দোলন, শাফেলা আন্দোলন, দাসের বাজার আন্দোলন, বৈঠাখালি আন্দোলন এবং হাজং ও নানকার আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব আন্দোলনই মোটামুটিভাবে প্রজা উৎখাত, বেআইনী আদায়, শারীরিক নির্যাতন, কাছারীর অপমানজনক ব্যবহার, জমিদারের দাসত্ব ইত্যাদির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

ইংরেজ আমলেই কৃষক আন্দোলনের ফলে জমিদার, মিরেশদার, তালুকদারদের অত্যাচার এই সব অঞ্চলে কিছুটা কমে এলেও নির্যাতন একেবারে বন্ধ হয় নাই। ১৯৪৮ সাল থেকে প্রায় দুই বৎসর স্থায়ী যে কৃষক আন্দোলন সিলেট জেলায় শুরু হয় এই জেলার হাজং অঞ্চলের কৃষক এবং নানকার প্রজারাই ছিলেন তার মূলশক্তি।

হাজং অঞ্চলের আন্দোলন: ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার উত্তর পশ্চিম সুসং-দুর্গাপুর থেকে শুরু করে সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার উত্তর পূর্বে ছাতক পর্যন্ত ছিলো আদিবাসী হাজং অধ্যুষিত এলাকা। কিন্তু ময়মনসিংহ জেলার হাজং এলাকার মতো সিলেট জেলার হাজং এলাকায় টঙ্ক প্রথা প্রচলিত না থাকায় সেখানকার হাজং আন্দোলনের মূল দাবীগুলি ছিলো কিছুটা স্বতন্ত্র।

সিলেটের হাজং এলাকার ব্যাপক অংশ ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরের মহারাজার অন্তর্গত ছিলো। জমিদারী কাছারির অত্যাচার, জমি থেকে

উচ্ছেদ, কৃষকদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে হিসেবের গণ্ডগোল, নানাপ্রকার বেআইনী আদায় ইত্যাদিই ছিলো এই এলাকার কৃষক আন্দোলনের মূল সমস্যা। এই সব সমস্যাকে কেন্দ্র করে সিলেটের হাজং এলাকায় কৃষক আন্দোলনের নোতুন সূত্রপাত হয় ১৯৪৫ সালে নেত্রকোণায় কিষাণ সভার সারা ভারত সম্মেলনের সময়।

বিসরপাশার কাছারীর এলাকায় কালীচরণ (বৈষ্ণব) নামে এক কৃষকের ৭ হাল জমি ছিলো। নানাপ্রকার অন্যায় আদায়, হিসেবের গণ্ডগোল ও জোরজুলুমের ফলে কালীচরণের ৭ হাল জমির ৩ হাল জমিদারের হস্তগত হয়। নেত্রকোণা সম্মেলনের ঠিক পূর্বেই বিসরপাশা জমিদার কাছারীর বিরুদ্ধে খোদ জমিদারের কাছে নালিশ করতে কালীচরণ গৌরীপুর রওয়ানা হন। রওয়ানা হওয়ার পরই মধ্যপথে তাঁর সাথে কৃষক সভার কর্মীদের দেখা হয়। জমিদারের কাছে আবেদন নিবেদন করা যে নিষ্ফল একথা তাঁকে বোঝানোর পর কালীচরণ কৃষক কর্মীদের সাথে নেত্রকোণায় যান এবং সেখান থেকে কৃষক নেতা মণি সিং-এর একটি চিঠি নিয়ে সুনামগঞ্জ উপস্থিত হন। কালীচরণকে আইনগত সাহায্য দেওয়া যায় কিনা সেটা বিবেচনার জন্যই মণি সিংহ সুনামগঞ্জ কৃষক সভাকে অনুরোধ জানান। সুনামগঞ্জ উত্তর কৃষক সভার সহ-সভাপতি চন্দ্রবিনোদ দাস নিজে উকিল ছিলেন এবং তিনি নিজেই কালীচরণের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। মামলায় শেষ পর্যন্ত কালীচরণের পক্ষেই রায় হয়। এদিকে কালীচরণের আচরণে রুষ্ট হয়ে জমিদার পক্ষ কালীচরণের জমি দখলের উদ্দেশ্যে লোক লস্কর হাতী ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে স্থানীয় কৃষক সংগঠনের ও আন্দোলনের পরিস্থিতি কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। কাজেই কৃষকরা কৃষক সভার নেতৃত্বে জমিদার কর্তৃক এই জমি দখল প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেন। কালীচরণের স্ত্রী বঁটি ও ঝাঁটা হাতে জমির আলে প্রতিরোধের জন্যে দাঁড়ান। তাঁর পেছনেই থাকেন কৃষক সভার কর্মীরা এবং কালীচরণ ও গ্রামের অনেক সহানুভূতিশীল অধিবাসী। জমিদারের লোকজন এই প্রতিরোধ দেখে বিরত না হয়ে কালীচরণের স্ত্রীর ওপর আঘাত করার জন্যে হাতিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে কৃষক সভার কর্মীরা সমবেতভাবে চোঙ্গার সাহায্যে জমিদারী নির্যাতন বিরোধী নানান শ্লোগান দিতে শুরু করেন এবং অন্যান্যরা তার সাথে যোগ দেন। এই চীৎকার কোলাহলে ভীত হয়ে হাতিগুলি পিছন

ফিরে পলায়ন করে। এভাবেই সেদিন এই অঞ্চলে জমিদার কর্তৃক বেআইনী ও জবরদস্তিমূলক জমিদখল কৃষকদের দ্বারা সমষ্টিগতভাবে প্রতিরোধ হয়। এর ফলে স্থানীয় কৃষকদের কৃষক সভার প্রতি আস্থা এবং আন্দোলনের শক্তির প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। কৃষক সভার কাজও এর পর এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে শুরু হয়। কালীচরণের খাজনা জমিদারী কাছারীতে জমা না দিয়ে ডাক মারফৎ প্রেরিত হতে থাকে এবং কাছারীর নির্যাতন পূর্বের তুলনায় অনেকখানি কমে আসে।[৩]

এই এলাকায় কৃষক আন্দোলনের নেতা ছিলেন রবি দাম, লালা শরদিন্দু দে, অনিমা দাস, জ্ঞান দাস, প্রমোদ দাস, কালীচরণ (বৈষ্ণব) হাজং, ব্রজেন্দ্র হাজং উনেশ্বর হাজং, আনীত গারো, যতীন্দ্র দাস ও কুঞ্জলাল সরকার।[৪]

সিলেটের হাজং এলাকার একটি মূল সমস্যা ছিলো মহাজনদের কাছে কৃষকদের জমি বন্ধক। ১৯৪৬–৪৭ সালের দিকে কৃষক সভা এই সমস্যার প্রতি নজর দেয়। ঋণের দায়ে জমি বন্ধক এবং জমির ফসল দখলের কোন আইনগত ভিত্তি ছিলো না। কিন্তু এই বেআইনী জুলুমই জমিদাররা হাজং কৃষকদের ওপর করতো। এই জমি দখল এমন পর্যায়ে গিয়েছিলো যে অনেক সময় মাত্র দশ বিশ টাকা দেনার দায়েও কৃষকদের জমি মহাজনরা হস্তগত করে তার ওপর ফসলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতো। জমি দখলের এই ব্যবস্থা এই এলাকায় এমনই একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিলো যে, সরল হাজং কৃষকরা একেই স্বাভাবিক নিয়ম মনে করে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কোন চিন্তা করতো না এবং তাকেই মেনে চলতো। এই অঞ্চলের মহাজনরা ছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।

মহাজন কর্তৃক জমি দখলের এই রীতি যে একটা বেআইনী জুলুম একথা হাজং কৃষকদের বোঝাতে কৃষক সভার কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষক সভার কর্মীরা ধৈর্য সহকারে অগ্রসর হওয়ার ফলে বছর খানেকের মধ্যেই এ ব্যাপারে কৃষকদেরকে বোঝাতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। এবং তার ফলে ১৯৪৭ সালের দিকেই সর্বপ্রথম এই অঞ্চলে হাজং কৃষকদের দ্বারা বন্ধকী জমি দখল শুরু হয়। এর পর অতি অল্প কালের মধ্যেই পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলার সীমায় মহিষখলা থেকে পূর্বে ধড়ছড়া (টাংওয়ার হাওরের উত্তর পাড়) পর্যন্ত দৈর্ঘে দশ-পনেরো মাইল ও প্রস্থে চার পাঁচ মাইল এলাকা জুড়ে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।[৫]

ঠিক এই সময়েই দেশ বিভক্ত হয়ে সিলেট জেলা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশ বিভাগের পর ভারতীয় সীমান্ত বরাবর এই অঞ্চলে পাঁচ মাইল অন্তর পুলিশ ঘাঁটি স্থাপিত হয়। এই সুযোগে পুলিশ ঘাঁটিকে হাত করে হিন্দু মহাজনরা বাইরে থেকে মুসলমান চাষীদেরকে এনে জমিতে বসিয়ে হাজংদেরকে জমি থেকে উৎখাত করতে চেষ্টা করে। এই ভাবে বহু জায়গায় তারা হাজং কৃষকদের জমি দখল করে নিতে সক্ষম হয়। এই সব নবাগত কৃষকদের সাথে পার্টি অনেক সভা এবং আলাপ আলোচনা করে তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করে কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। দেশের পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তখন মামলা মোকদ্দমারও সুযোগ সুবিধা তেমন না থাকায় স্থানীয় সংগ্রামের মাধ্যমেই কৃষক সমিতি এই জমি দখল প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেয়। এই প্রতিরোধ যে সশস্ত্র প্রতিরোধ ব্যতীত সফল হওয়া সম্ভব নয় সে বিষয়েও কৃষক সমিতি নিশ্চিত হয়। এজন্যে কৃষকদেরকে সংগঠিত করে তাঁরা কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন।[৬]

কৃষক সমিতির নেতৃত্বে হাজং কৃষকরা সশস্ত্রভাবে নিজেদের জমি পুর্নদখলের প্রস্তুতি নিচ্ছে একথা জেনে দখলকারী মুসলমান কৃষকরা জমির বেআইনী দখল ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এই প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে স্থানীয় হাজং কৃষকরা এবং কৃষক সমিতি সশস্ত্র বাহিনী রীতিমতো ভাবে গঠন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

স্থানীয় হাজং গারো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সম্পন্ন লোকদের কাছে শিকার, আত্মরক্ষা ইত্যাদির জন্যে কিছু সংখ্যক গাদা বন্দুক ছিলো। কৃষক বাহিনী সেগুলি জোরপূর্বক দখল করে নেওয়ার পর তাঁদের হাতে ৫০টি বন্দুক আসে যার মধ্যে একটি কার্তুজ বন্দুকও ছিলো। বাইরের আক্রমণ আশঙ্কা করে এর পর থেকে গ্রামগুলিতে সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হয়।[৭]

এইভাবে কৃষক বাহিনী গঠিত হওয়ার পর বাহিনীর মূল ঘাঁটি সীমান্তের ওপারে পার্শ্ববর্ত্তী ভারতীয় এলাকার জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। যে এলাকায় ঘাঁটি স্থানান্তরিত হয়েছিলো সেখানকার অধিবাসীরা ছিলো খাসী পার্বত্য জাতীয় এবং এলাকাটি ছিলো পার্বত্য জাতীয় রাজা (সিম) এর রাজ্য। কৃষক বাহিনীর উপস্থিতিতে রাজা ভীতগ্রস্ত হয়ে উঠলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি থেকে বিরত থাকে। কৃষক

বাহিনীও তার সাথে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। এর ফলে সীমান্তের ওপারে ঘাঁটি এলাকায় পরিস্থিতি শান্ত থাকে। সেখানকার স্থানীয় লোকদের মনে বিশ্বাস জন্মায় যে কৃষক বাহিনী গরীবদের বন্ধু এবং সেই হিসেবে তারা বাহিনীকে সমর্থনও করে। ওপারের বর্ডার গার্ডরাও বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশেষ কোন আক্রমণাত্মক তৎপারতা না চালালেও কয়েকবার তারা বাহিনীকে লোকদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। কিন্তু এই উত্তেজনা সত্ত্বেও বাহিনীর তরফ থেকে সে সবের কোন পাল্টা জবাব দেওয়া হতো না। একবার বর্ডার গার্ডের মুখোমুখী পড়ে বাহিনীর সদস্য যতীন্দ্র নাথ দাস ও লালা শরবিন্দু দে তাদের হাতে গ্রেফতার হন এবং সীমান্ত আক্রমণ-কারী হিসেবে তাঁদেরকে শিলং-এ চালান দেওয়া হয়। সেখানে কয়েকদিন সাজা খাটার পর তাঁরা ছাড়া পান এবং আবার ঘাঁটি এলাকায় ফিরে আসেন।[৮]

কৃষক বাহিনীকে এইভাবে সংগঠিত ও তৎপর হতে দেখে পূর্ব পাকি-স্তানী পুলিশ বাহিনীও নিজেদের সক্রিয়তা ও তৎপরতা বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন এলাকার হাজং গ্রামগুলিতে তারা তল্লাশী চালাতে থাকে কিন্তু বাহিনীর ভয়ে রাত্রিতে তারা নিজেদের ঘাঁটি ছেড়ে বাইরে বের হতে সাহস করতো না। তাদের যা কিছু তৎপরতা তা দিবাভাগেই সীমাবদ্ধ থাকতো। এই অবস্থাতে তাদের সাথে কৃষক বাহিনীর কয়েকটি সংঘর্ষ হয় কিন্তু বাহিনী এসব ক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করায় তাঁদের কোন ক্ষতি হয় নি অথবা কেউ এর ফলে হতাহত হয়নি।[৯]

কৃষক বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্থানীয় হাজং গারো এবং জমিদারের কর্মচারীদের মধ্যে কিছু কিছু দালালের সৃষ্টি হয়। তারা জমিদার ও পুলিশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে কৃষক আন্দোলন ও কৃষক বাহিনীর বিরুদ্ধতা ও ক্ষতি সাধন করতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় কৃষক বাহিনী দালাল খতমের কর্মসূচী গ্রহণ করে। একজন গারো এবং বিসরপাশা কাছারীর একজন কর্মচারী ও একজন পাইক দালালীর কারণে কৃষক বাহিনীর হাতে খতম হয়। তাদের মৃতদেহ সীমান্তের অপর পারে ভারতীয় এলাকায় ফেলে আসা হয়। এই ধরনের একটি ঘটনায় বর্ডার গার্ডের গুলি বর্ষণের ফলে রবি দাম সামান্য আহত হন।[১০]

সে সময় কৃষক বাহিনীকে দিনে বসতিপূর্ণ গ্রাম এলাকায় রাখা হতো না। তাঁরা পাহাড় অঞ্চলে থাকতেন এবং রাত্রি কালে গ্রামাঞ্চলে নেমে আসতেন। স্থানীয় কৃষকদের ব্যাপক ও সহজ সহযোগিতায় এইভাবে

পার্টি গ্রামের শাসন ব্যবস্থা চালাতো। পার্টি গ্রাম্য আদালতের মাধ্যমে বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করতো এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যাবলীর পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতো।[১১]

তখন বস্তুতঃপক্ষে কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলো না। কৃষক সমিতির মধ্যে কোন অকমিউনিষ্টই এ পর্যায়ে না থাকার ফলে কমিউনিষ্টদের দ্বারা তা সর্বতোভাবে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হতো। কমিউনিষ্টরাও মোটামুটিভাবে পার্টির নামেই সব কিছু পরিচালনা করতেন। হাজং কৃষকরা এই সময় ভয়ানক পার্টি ভক্ত ছিলেন এবং পার্টির নির্দেশ মেনে চলার ক্ষেত্রে তাঁরা কোন গাফলতী করতো না।[১২]

সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনায় নিযুক্ত থাকার জন্যে পার্টি সিলেটের এই হাজং এলাকায় বাহিনীর জন্যে নিয়মিত রসদ সংগ্রহ করতো এবং অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা স্থাপন করে নিজেরাই কিছু কিছু অস্ত্র তৈরী করতো। এই কারখানায় বোমা, বারুদ, পাইপ গান, পাইপ পিস্তল ইত্যাদি তৈরী করা হতো। নিয়মিত বাহিনীতে ১৫০ জনের মতো ছিলো কিন্তু তা ছাড়াও প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব অক্সিলিয়ারী বাহিনীও ছিলো। এদের হাতে বন্দুক ছিলো ৭০।৮০টি। এই সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন রবি দাম।[১৩]

তৎকালীন সারা পূর্ব পাকিস্তান এবং বিশেষতঃ ময়মনসিংহের হাজং এলাকা ও সিলেটের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই হাজং এলাকাতেও সরকারের খাদ্য সংগ্রহের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং এ ক্ষেত্রেও কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টি কৃষকদের সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। একদিকে সরকারী কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারমূলক লেভী নির্ধারণ এবং অন্যদিকে লেভীর ধান জমা দেওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে বর্ণণাতীত হয়রানিই এ সময় শুধু হাজং এলাকার কৃষকদেরকে নয়, সামগ্রিকভাবে কৃষক সমাজকে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এ সময়ে তাই কৃষকরা ব্যাপকভাবে "জান দিব, তবু ধান দিব না" এই ধ্বনি তুলে নির্যাতনমূলক সরকারী লেভীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। এছাড়া জমিদার, জোতদার, মহাজনদেরকে ধান না দিয়ে তাঁরা দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে তা বিতরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে অনেক ধান বিতরণ করা হয়। এই আন্দোলনেরও অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন রবি দাম।

এই ধান বিতরণের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ১৯৪৯ সালের ২৬শে মার্চ (১২ই চৈত্র, ১৩৬৫) রবি দাম পুলিশ বাহিনীর হাতে নিহত হন।

মোহনপুর গ্রামে ধান বিতরণের উদ্দেশ্যে সেখানে যাওয়ার জন্যে খবর আসায় রবি দাম, প্রমোদ দাস, কালীচরণ এবং উনেশ্বর একত্রে মোহনপুরের দিকে রওয়ানা হন। প্রমোদ দাসের শরীর অসুস্থ থাকায় গঙ্গা নগর পর্যন্ত পৌঁছানোর পর তিনি সেদিনের মতো যাত্রা বন্ধ রেখে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু রবি দাম তাতে সম্মত না হয়ে বাকী দুজনকে সাথে নিয়ে মোহনপুরের দিকে অগ্রসর হন। এর পর প্রমোদ দাস'ও ফিরে না গিয়ে কিছুক্ষণ পর রওয়ানা হয়ে তাঁদের সাথে মোহনপুরে মিলিত হন। সেখানে কয়েকজন মাতব্বর তাঁদেরকে জানায় যে তারা গ্রামের সমস্ত লোক জড়ো করে আনার জন্যে যাচ্ছে এবং তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁরা যেন অপেক্ষা করেন।

এই সময় স্থানীয় কৃষক কর্মীরা তাঁদেরকে জানান যে গ্রামের পরিস্থিতি ভাল নয় কারণ গ্রামের মোড়লদেরকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। এই কৃষক কর্মীরা আশঙ্কা করেন যে এই মোড়লরা রবি দাম ও অন্যান্যদের উপস্থিতির খবর দেওয়ার জন্যে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে গেছে। কৃষক কর্মীরা গ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে বারবার তাঁদেরকে বলার পর রবি দাম ও প্রমোদ দাস মোহনপুরের নিকটস্থ স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পের দিকে যান। পুলিশ ক্যাম্পে কোন রকম চাঞ্চল্যের পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিরবতা লক্ষ্য করে তাঁরা দুজনেই সিদ্ধান্ত করেন যে পুলিশের থেকে তখনকার মতো কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। তাঁরা আরও স্থির করেন যে, মোহনপুরের কাজ শেষ করে ফিরে যাওয়ার পথে তাঁরা পুলিশ ক্যাম্পটি আক্রমণ করবেন।

কিন্তু পুলিশ ক্যাম্পের অবস্থা দেখে মোহনপুর ফিরে এলে কৃষক কর্মীরা আবার তাঁদেরকে সাবধান করে দিয়ে জানান যে, তখন পর্যন্ত গ্রামের মোড়লদেরকে গ্রামে পাওয়া যাচ্ছে না। এই খবর পাওয়ার পর প্রমোদ দাস রবি দামকে বলেন সেদিনের মতো তাড়াতাড়ি মোহনপুর পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াই তাঁদের কর্তব্য কারণ পুলিশ তাঁদেরকে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু রবি দাম তাতে সম্মত না হয়ে বলেন যে নিকটস্থ পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশরা তাঁদেরকে আক্রমণ করবে না। দুই জনে মতবিরোধ

হওয়ার প্রমোদ দাস বলেন যে, তাঁদের অন্য দুইজন সাথীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে তাঁদের মতামত নেওয়া হোক এবং সেই মতো কাজ করা হোক। সেই অনুযায়ী অন্য দুজনের মতামত চাওয়ায় তাঁরা প্রমোদ দাসের সাথে একমত হন এবং বলেন যে সেদিনকার মতো মোহনপুর পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। এর পর প্রমোদ দাস রবি দাসকে বলেন আর এক মুহুর্ত বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ এলাকা পরিত্যাগ করা দরকার কারণ যে কোন মুহুর্তে তাঁদের ওপর আক্রমণ শুরু হতে পারে।

এই সব আলোচনা যেখানে হচ্ছিলো তার মাত্র কয়েকঘর পরই ছিলো মনীকান্ত নামে একজনের বাড়ী। সেখানে তাঁদের চারজনেরই রাত্রে খাওয়ার কথা ছিলো। রবি দাম মনীকান্তের বাড়ী হয়ে যাওয়ার কথা বললে প্রমোদ দাস তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেন যে, সেদিক দিয়ে গেলে তাঁদের মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করে রবি দাম মনীকান্তের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হন এবং সেখানে গিয়ে তাঁকে জানান যে তাঁর বাড়ী সে রাত্রে তাঁদের আর খাওয়া সম্ভব নয়, তাঁদেরকে তাড়াতাড়ি গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। মনীকান্ত কিন্তু তাঁদেরকে খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, শেষ হয়ে গেছে একটু বিলম্ব করুন। এই কথার সাথে সাথেই পুলিশের গুলি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে কিছুদুর থেকে বর্ষিত হতে থাকে।

সে সময় কৃষক গেরিলা বাহিনীর লোকেরা প্রায় সব সময়েই সশস্ত্র অবস্থায় চলাফেরা করতেন এবং নেতারা যাতায়াতকালে সশস্ত্র গার্ডও তাঁদের সাথে থাকতো। এজন্যে স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে রবি দাম এবং অন্যান্যদের মোহনপুর উপস্থিতির খবর পেয়ে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ না করে সতর্কভাবে গ্রামে তাঁদেরকে ঘেরাও করে। তাদের এই সতর্কতার জন্যেই তাঁরা পুলিশ ক্যাম্পে কোন রকম উত্তেজনা লক্ষ্য করেন নি এবং সেখানকার শান্ত অবস্থার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।

গুলি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই উনেশ্বর ও কালীচরণ দৌড় দিয়ে সেখান থেকে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। এই অবস্থায় প্রমোদ দাস রবি দামকে বলেন যে তাঁদেরকে উচিত তৎক্ষণাৎ অন্যদের মতো সেখান থেকে চলে যাওয়া। কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করে বলেন, গুলি যাতে গায়ে না লাগে সেভাবে নিজেকে রক্ষা করো। প্রমোদ দাস আবার তাঁকে বলেন যে তিন দিক থেকে গুলি আসছে শুধু একদিক

খোলা আছে, সেদিক দিয়েই আমরা পলায়ন করি। রবি দাম তাতে সম্মত না হয়ে বলেন, ঐ শয়তানদেরকে ধরতে হবে। এই কথার পর তিনি এবং প্রমোদ দাস দুজনেই মাটিতে শুয়ে বুকে হেঁটে পুলিশদেরকে ধরার জন্যে অগ্রসর হন এবং তাদের কাছাকাছি পৌঁছে তাদেরকে ধরেও ফেলেন। পুলিশ হাবিলদারকে ধরে চীৎ করে ফেলে, রবি দাম তাকে হত্যার জন্যে নিজের ছুরি বের করেন এবং তার কণ্ঠ নালিতে বসিয়ে দেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আর একজন পুলিশ রবি দামকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকবার গুলি বর্ষণ করে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বরণ করেন।

এদিকে প্রমোদ দাস অন্য এক পুলিশের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তার রাইফেল ছিনিয়ে নেন এবং চীৎকার করে রবি দামকে বলেন যে, আমি একটা রাইফেল কেড়ে নিয়েছি, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে রবি দামের দেখা অথবা তাঁর কোন জবাব না পেয়ে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে তিনি ভাবলেন যে অন্য দুজনের মতো তিনিও চলে গেছেন। এর পর তাই প্রমোদ দাসও স্থান ত্যাগ করে অন্যদিকে রওয়ানা হলেন। কিন্তু অল্প কিছুদর গিয়েই তিনি গ্রামের তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন লোকের দ্বারা ঘেরাও হয়ে ধরা পড়েন। তারা তাঁকে লাঠি দিয়ে ভয়ানকভাবে প্রহার শুরু করে। অল্পক্ষণের মধ্যে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয় এবং তারাও তাঁকে আক্রমণ করে। প্রমোদ দাস একা কিছুক্ষণ তাদের সাথে হাতাহাতি লড়াই করে শেষে তাদেরকে বলেন, তোমরা আমাকে গ্রেফতার করো। তারা তাঁকে গ্রেফতার করার পরও তাদের মার না থামিয়ে প্রহার করতে করতে তাঁকে অজ্ঞান করে দেয়। এর পর তাঁকে মৃত মনে করে তারা পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

পুলিশ ক্যাম্পে প্রমোদ দাসের জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি জল দাও, জল দাও বলে চীৎকার করলে পুলিশরা বলে, শালা এখনো মরেনি, গুলি না করে দেখছি ভুল করেছি। গ্রামের অনেক লোকও তখন সেখানে জড়ো হয় এবং বলে যে তিনি কাইতকান্দার প্রমোদ। এর পর পুলিশ প্রমোদ দাস ও রবি দামকে একত্রে বেঁধে রাখে। পুলিশ একটু সরে গেলে প্রমোদ দাস রবি দামকে ঠেলা দিতে থাকেন কিন্তু বার বার ঠেলা দিয়ে কোন নড়চড় না দেখে এবং জবাব না পেয়ে তখন তিনি বুঝতে

পারেন যে রবি দাম আর বেঁচে নেই। রাত্রি ভোর হলে তিনি দেখেন যে রবি দামের বাঁ চোখে গুলি বিদ্ধ হয়ে তা উল্টো দিক দিয়ে মস্তক ছেদ করে বের হয়ে গেছে।

বেলা আটটার দিকে রবি দামের লাশ সহ তাঁকে ধর্মপাশা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দারোগা প্রমোদ দাসকে দেখে বলে যে, এই দেশে সব শালারাই কমিউনিষ্ট। শুধু তাই নয় পাঁচটি বছর নিশ্চিন্তে ভাত খেতে পাই নি, এই কথা বলে দারোগা প্রমোদ দাসকে বেদম প্রহার শুরু করে। প্রমোদ দাস তখন তাকে বলেন যে তিনি বন্দী তা না হলে তার মতো দারোগাকে সহজেই শায়েস্তা করতে পারতেন। এর পর দারোগা তাঁকে মাটিতে ফেলে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে এবং তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দেয়। এইভাবে অমানুষিক নির্যাতনের পর প্রমোদ দাসকে সুনামগঞ্জ চালান করা হয় এবং তারপর তিনি বিনা বিচারে বন্দী থাকেন।[১৪]

রবি দামের মৃত্যু এবং অন্যান্যদের গ্রেফতারের ফলে এর পর এই এলাকায় আন্দোলন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে আসে।

নানকার আন্দোলন : দেশ বিভাগের পর সিলেট জেলায় প্রচলিত নানকার প্রথার মধ্যে সামন্তবাদের অবশেষসমূহ যে পরিমাণে বিদ্যমান ছিলো পূর্ব পাকিস্তানের অন্য কোন এলাকায় অন্য কোন প্রথার মধ্যে তেমনটি ছিলো না। এ অঞ্চলে মোগল আমলে প্রবর্তিত এক ধরনের এই ভূমিদাস (serf) প্রথার মাধ্যমে সামন্ত ভূস্বামীরা এক শ্রেণীর কৃষকদের ওপর নিজেদের শোষণ ও নির্যাতনকে জারী রাখতো।

'নান্' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো রুটি। রুটি অর্থাৎ খাদ্যের পরিবর্তে দৈহিক শ্রমই এই প্রথার দ্বারা বোঝায়। কিন্তু সাধারণ গৃহ-ভৃত্যদের থেকে নানকারদের পার্থক্য এই যে, তাঁদের দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে ভূস্বামীদের বাড়ীতে তাঁদের খাওয়া পরার কোন ব্যবস্থা থাকতো না। ভূস্বামী বা জমিদার তাঁদেরকে এক টুকরো জমি বরাদ্দ করেই এ ব্যাপারে তাঁদের 'রুটির' ব্যবস্থা করতো। জমিদার কর্তৃক নির্দেশিত এই ভূখণ্ডে নিজেদেরকে দৈহিক শ্রমের দ্বারা ফসল উৎপাদন করেই নানকার-

দেরকে নিজেদের খাদ্যের সংস্থান করতে হতো। এই সুযোগটুকু তাঁদেরকে দান করার পরিবর্তে জমিদারের বাড়ীতে জমিদারের অবাধ ইচ্ছানুযায়ী তাঁরা নিজেদের কায়িক শ্রম নিয়োগ করতে বাধ্য থাকতেন।

"নানকারকে যে জমি বরাদ্দ করা হতো তার নাম হল 'নান' (রুটির জন্য) জমি। তাকে 'খানে' (খাবার জন্য) বাড়িও বলা হত।

"এই 'নান জমি' বা 'খানেবাড়ি' ভোগ করার পরিবর্তে জমিদারের প্রয়োজনে নানকারকে অনির্দিষ্ট পরিমাণে তার শ্রমশক্তি ব্যয় করতে হত। সামন্তবাদী হিসাবে শ্রম শক্তি মুল্যহীন বলেই তার কোন হিসাব-নিকাশের ব্যবস্থা ছিল না, জমিদারের 'ডাকে হাঁকে' (অর্থাৎ জমিদার ডাক দিলেই অথবা হাঁক দিলেই) নানকারকে সশরীরে উপস্থিত থেকে জমিদারের আদেশমত কাজ করে দিতে সে বাধ্য। এই ধারার কাজে যে খাটুনী তার জন্যে কোন পৃথক মজুরী নানকারের প্রাপ্য নেই। বিনা মজুরীর এই খাটুনীকে বলা হত 'হদ' বা 'বেগারী'। এক দিকে জমি ('নান জমি' বা 'খানে বাড়ি') অন্যদিকে শারীরিক খাটুনী ('হদ বা 'বেগারী), এছাড়া নানকার প্রথায় কোন প্রান্তেই কোন বস্তুর আদান প্রদান ছিল না। সামন্তবাদী ব্যবস্থায় উৎপন্ন ফসলের অংশে, অথবা পরবর্তীকালে নগদ অর্থে খাজনা পরিশোধের ভিতর দিয়ে যেখানে জমিদার প্রজা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হত এখানে তেমন কোন বস্তুর আদান প্রদানের ব্যবস্থা না থাকলেও নানকারদের 'প্রজা' বলেই উল্লেখ করা হত। কোন কোন স্থলে রায়তও বলা হত। কিন্তু প্রজাস্বত্বে বা রায়তী ব্যবস্থায় প্রজার স্বত্ত্বাধিকার যেখানে যেটুকুই স্বীকৃত হোক, এখানে নানকাররা ছিলেন তার সব কিছুরই বাইরে। নামে প্রজা হলেও কাজে তারা ভিন্ন বর্গের প্রজা। তাঁদের এই ভিন্ন বর্গটা বুঝবার প্রয়োজন তাদের জন্য 'প্রজা' শব্দের সাথে নানকার জীবনের বিশেষাত্মক শব্দগুলি জুড়ে দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এভাবে তাদেরকে বলা হত 'নানকার প্রজা' 'খানে বাড়ির প্রজা', 'হদুয়া প্রজা', 'বেগার প্রজা', 'চাকরাণ প্রজা' (চাকরীর অর্থে) প্রভৃতি উপরোক্ত শব্দগুলি সম অর্থবোধক ও নানকার প্রজারই প্রচলিত বিভিন্ন নাম।

"নানকাররা যে জমি-জমা চাষাবাদ করতেন তা জমিদারের খাস দখলির এলাকা বলে পরিগণিত হত। তাই তার বিলি বন্দোবস্তে একমাত্র জমিদারের মর্জি ছাড়া আর কোন আইন বা প্রথাই কার্যকরী ছিল না। জমিদার তার মর্জি মাফিক এই জমি-বন্দোবস্ত করতে ও যখন তখন

তা হাত বদল করতে পারত, নানকার প্রজাকে উচ্ছেদও করতে পারত। কোন আইন-আদালতে তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার অধিকারী ছিল না। তাই জমিদারের মর্জি যুগিয়ে চলাই ছিল নানকার প্রজার স্বগৃহে টিকে থাকার একমাত্র সর্ত।"[১৫]

ভুস্বামী থেকে অনির্দিষ্ট পরিমাণ দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে প্রাপ্ত টুকরো জমি ও ভিটের ওপর নানকারদের কোন স্বত্ব তো থাকতোই না, এমনকি সেই জমির ওপর স্থায়ী কোন ফলের গাছ থাকলে তার ফলের ওপরও তাদের কোন অধিকার থাকতো না। অথচ সেই সমস্ত গাছ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকতো সম্পূর্ণভাবে নানকারদের ওপর। নানকাররা জমিদারের বাড়ীতে শ্রম দান করার পর যেটুকু সময় তাঁদের থাকতো সেই সময়ে নিজেদের নির্দিষ্ট জমিতে ধান, পাট, ডাল, তরিতরকারী ইত্যাদি ফসলের চাষ করে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন। অনেক সময় হাল, বীজ, সার ইত্যাদির জন্যে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে চাষাবাদও ঠিক মতো তাঁদের দ্বারা সম্ভব হতো না। এ সবের ফলে নানকারদের জীবন যে এক চরম দারিদ্র, দুর্দশা ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হতো সে কথা বলাই বাহুল্য। এই নানকারদের ভুস্বামীরা 'গোলাম' হিসেবেই বর্ণনা ও সম্বোধন করতো এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁদের জীবন ছিলো মধ্যযুগীয় ভূমি দাসদের জীবনের মতোই শোষিত, নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত। জমিদারের নির্দেশ ও ইচ্ছানুযায়ী যে কোন কাজ করতেই তাঁরা দিবারাত্রির যে কোন সময়ে বাধ্য থাকতেন। তাঁদের বাড়ীর স্ত্রীলোকরাও এই একই গোলামীর শৃঙ্খলে বাঁধা থাকতেন ও তাঁদের দৈহিক শ্রম, এমনকি তাঁদের দেহের ওপরও জমিদারের অধিকার ছিলো অবাধ ও সীমাহীন।

বংশগত পেশাভিত্তিক বহু খণ্ড সমাজের ভাঙ্গা ভাঙ্গা অংশের সমন্বয়েই গঠিত হয়েছিলো সমগ্র নানকার সমাজ। এই খণ্ড সমাজগুলি হলো নিম্নরূপ :

"(১) কিরাণ (বোধহয় কৃষাণ শব্দের অপভ্রংশ) মুসলমান সম্প্রদায়ের গৃহকর্মী; (২) ভাণ্ডারী হিন্দু সম্প্রদায়ের গৃহকর্মী; (৩) নমঃশূদ্র—হিন্দু সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবী, বাঁশ-বেতের গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য বাঁশ বেতের কাজও এদের পেশা; (৪) পাটনী (পরবর্তীকালে যারা মাহিষ্য দাস বলে পরিচয় গ্রহণ করে)—হিন্দু সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবী, নৌকা চালনা প্রভৃতিও এদের পেশা; (৫) মাইমল—মুসলমান সম্প্রদায়ের

মৎস্যজীবী, নৌকা চালনা প্রভৃতিও এদের পেশা ; (৬) মালাকার (মালী)—হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক, মাটি কাটা, পাল্কী বহন প্রভৃতি এদের পেশা ; (৭) ঢুলী-হিন্দু সম্প্রদায়ের বাদ্যকার ; (৮) বাজনী—মুসলমান সম্প্রদায়ের বাদ্যকার ; (৯) ধোপা—হিন্দু সম্প্রদায়ের রজক ; (১০) নাপিত—হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষৌরকার ; (১১) হাজাম—মুসলমান সম্প্রদায়ের সাবেক ক্ষৌরকার প্রভৃতি। তাছাড়া বাংলার বাইরে থেকে আগত হিন্দি বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষা-ভাষী মুচি ও চা বাগানের সাবেক শ্রমিক যারা জমিদারের আশ্রয়ে এসে বসবাস করতেন ; তাঁরা সংখ্যায় খুব বেশী না হলেও তাদের সবাই নানকার পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকতেন।[১৬]

নানকারদের ওপর জমিদারদের ক্ষমতা এবং অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যে জমিদাররা নানকারদের অন্যান্য প্রজাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত ব্যবহার করতো। নানকারদের একাংশ 'পেয়াদা' নামে পরিচিত ছিলো। এই 'পেয়াদা'রাই ছিলো অন্যান্য প্রজাদের ওপর জমিদারী নির্যাতনের মূল হাতিয়ার। এদেরকে ব্যবহার করেই জমিদার নিজের এলাকায় অবাধ্যতা, খণ্ড বিদ্রোহ ইত্যাদির ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতো।

নানকার এলাকায় জমিদারী শাসনব্যবস্থা কি ধরনের ছিলো তার একটা চিত্র নীচের বর্ণনা থেকে পাওয়া যাবে।

"জমিদারী শাসন ব্যবস্থায় সরকারী কোর্ট-কাছারীর কোন স্থান ছিল না। তার স্থানে জমিদারী কাছারী গুলিই ছিল কোর্ট কাছারী, আর জমিদার ও তার নায়েব মুন্সীরাই ছিল জজ ম্যাজিষ্ট্রেট-হাকিম-সুবা। তাই তাদের মুখের কথাই ছিল আইন। তাদের মুখের কথায়ই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যেত। এমন নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে কোন আপিল বা ওজর আপত্তি চলত না। জমিদারের রায়ের বিরুদ্ধে কেউ কোন প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করতে পারতো না। একমাত্র জমিদারের মর্জির পরিবর্তন না হলে তা কখনো পরিবর্তিত হত না। জমিদারী কাছারীগুলিতে প্রতিদিন এমন সহস্র বিচারের অভিনয় চলত আর তার ভিতর দিয়ে সাধারণভাবে প্রজা শাসন ও বিশেষভাবে নানকার শাসনের প্রহসন হত। এই বিচার প্রহসনে লোমহর্ষক কাণ্ড কারখানা দেখা যেত। নানকারদের সাজা শাস্তির ব্যাপারে সাধারণ কিল চড়, জরিমানা থেকে আরম্ভ করে বেত মারা, জুতা পেটা, হাত পা বেঁধে গাছের

ডালে ঝুলিয়ে রাখা, সময় সময় তার সাথে আবার বেত মারা, দুটি আস্ত বাঁশের ফাঁকে বা তক্তার তলায় হাত, পা, বা আস্ত দেহটা ফেলে দু' পাশে চেপে চেপে নাকে মুখে রক্ত বের করা, লোহার শিক পুড়ে দাগ দেওয়া বন্ধ ঘরে অভুক্ত অবস্থায় সপ্তাহাধিককাল আটক করে রাখা প্রভৃতি কোন কিছুই বাদ দেওয়া হত না।"[১৭]

এছাড়া জমিদার কাছারীগুলিতে আর একটি অভিনব ব্যবস্থা ছিলো। প্রজারা যে কোন ব্যাপারে জমিদারের অথবা তার কর্মচারীর বিরাগভাজন হলে প্রজাদেরকে দুই হাত লম্বা জুতো দিয়ে প্রহার করা হতো। এই জুতোকে বলা হতো 'শান্তিরাম'।[১৮] সিলেটের এই সব জমিদারী এলাকায় ভূস্বামীদের (যাদের অধিকাংশই ছোট ছোট)* প্রতাপ ও প্রভুত্ব এত প্রবল ছিলো যে তাদের আশ্রিত না হয়ে এবং তাদেরকে উপযুক্ত সালামী না দিয়ে কারও পক্ষে চাষাবাদ, ব্যবসা বাণিজ্য, গান বাজনা, বৈঠক, বিয়ে-সাদী কোন কিছুই সম্ভব ছিলো না। এক কথায় এই ধরনের জমিদারী এলাকায় যে স্বেচ্ছাচার প্রচলিত ছিলো সেটা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাঙলাদেশের অন্য কোন এলাকায় প্রচলিত ছিলো না।

বাঙলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে কৃষক আন্দোলন আসামের তুলনায় অনেক বেশী ঘন ঘন, ব্যাপক এবং সংগঠিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে একের পর এক প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে জমিতে কৃষকদের অধিকার অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং ভূস্বামীদের শোষণ নির্যাতনও পূর্বের তুলনায় অনেক কমে এসেছিলো। কিন্তু জমিদারী ও নানকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ মাঝে মাঝে দেখা দিলেও সিলেটের সেই সব বিদ্রোহ ছিলো অসংগঠিত এবং অল্পকাল স্থায়ী। এজন্যে সেই সব বিদ্রোহ বিক্ষোভ কোন সত্যিকার ভূমি সংস্কার এই অঞ্চলে প্রবর্তন করতে পারেনি। 'সিলেট জেলা প্রজাস্বত্ব আইন' নামে যে আইনটি প্রচলিত ছিলো তার মধ্যে প্রজাদের কোন অধিকারই প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃত বা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সে আইন প্রকৃতপক্ষে ছিল জমিদারীস্বত্ব আইন। কারণ সেই আইন অনুযায়ী জমিদাররা প্রজাদেরকে খাজনার রশিদ দিতে বাধ্য ছিল না, জমি বিক্রী অথবা হস্তান্তরের কোন অধিকার প্রজাদের ছিলো না, জমির ওপর গাছপালা ও উৎপন্ন ফসলের ওপর জমিদারের অধিকার ছিলো,

* ছোট বড়ো অনুযায়ী সিলেটে ভূস্বামীদেরকে সাধারণভাবে জমিদার, মিরাশদার ও তালুকদার এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হতো।

জমিতে পাকা ঘর তোলা অথবা পুকুর খননের কোন অধিকার প্রজাদের ছিলো না, জমিদার কর্তৃক প্রজা উচ্ছেদের অধিকার তাতে স্বীকৃত ছিলো এবং আইনগতভাবে প্রজা হিসেবে তাতে নানকারদের কোন স্বীকৃতি ছিলো না।[১৯]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন এবং সারা ভারত কৃষক সভার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সিলেট জেলায় কৃষক আন্দোলন কিছুটা সংগঠিত রূপ নেয়। ১৯৩৭ সালে সুনামগঞ্জ মহকুমা থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে করুণাসিন্ধু রায় আসামে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হন। কংগ্রেস দলভুক্ত হলেও তিনি ছিলেন উদারনীতিক ও ভূমি সংস্কারের পক্ষপাতী।* আসাম প্রাদেশিক পরিষদে তিনি সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের প্রস্তাব আনেন কিন্তু তৎকালীন আইন অনুযায়ী গভর্ণরের অনুমতি না পাওয়ায় প্রস্তাবটি পরিষদে বিতর্কের জন্যে উপস্থাপিত করাও সম্ভব হয় নি। এ নিয়ে তৎকালীন বামপন্থী ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক মহলে, এমনকি কংগ্রেসী মহলেও অনেক হৈ চৈ হয়।

পরিষদের আইনগত সংস্কারের মাধ্যমে প্রজাস্বত্ব আন্দোলনের কোন সাফল্যের সম্ভাবনা না থাকায় সেই আন্দোলন কিষাণ সভার হাতে পড়ে একটা ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করে। এতে কিষাণ সভার সুবিধেই হয়। সুরমা উপত্যকা কিষাণ সভা প্রজাস্বত্বকেই মূলতঃ অবলম্বন করে কৃষকদেরকে সমবেত ও সংগঠিত করতে অনেকাংশে সফল হন। কিন্তু কিষাণ সভার এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাদেশিক পরিষদকে প্রজাস্বত্ব আইনের সংস্কারে বাধ্য করা। অন্য কোন উপায়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন চিন্তা সে সময় কিষাণ সভার ছিলো না।

সিলেট জেলায় ১৯৩৮-৩৯ সালে কৃষক সভার নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনের একটা নোতুন পর্যায় শুরু হয়। এ সময়েই এই অঞ্চলের কৃষক আন্দোলন অনেকটা সংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করে। যে সমস্ত এলাকায় এই সময় আন্দোলনগুলি সৃষ্টি হয়েছিলো সেগুলি হলো : সুনামগঞ্জ মহকুমার বংশীকুণ্ডা, ভাটিপাড়া, শাফেলা, বৈঠাখালি; সদর মহকুমার রনিকেলী, ভাদেশ্বর, গোলাপগঞ্জ; করিমগঞ্জ মহকুমার দাসের বাজার, বিয়ানীবাজার,

---

*করুণাসিন্ধু রায় পরবর্তীকালে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি সিলেট জেলা কৃষক-সমিতির সভাপতি ছিলেন। আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় ১৯৪৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাহাদুরপুর। এর মধ্যে সদর মহকুমার রনিকেলী ও ভাদেশ্বর এবং করিমগঞ্জ মহকুমার বাহাদুরপুর ছিলো নানকার আন্দোলনের কেন্দ্র।[২০] এই শেষোক্ত তিনটি এলাকার আন্দোলন এক একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও এবং আন্দোলনগুলির মধ্যে অনেক কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত (বিশেষতঃ সংস্কারমূলক) দুর্বলতা সত্বেও সমগ্র সিলেট জেলার প্রায় দুই লক্ষ নানকারদের হদ বেগারী উচ্ছেদ এবং জমি স্বত্বের দাবীর আন্দোলনে তা এক নোতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর, বিশেষতঃ ১৯৪২ সালে জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিষ্ট পার্টির যুদ্ধকে সমর্থন দানের সিদ্ধান্তের পর কৃষক আন্দোলন অন্যান্য এলাকার মতো এই এলাকাতেও স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু যুদ্ধের পর আন্দোলন আবার নোতুন ভাবে শুরু হয়।

যুদ্ধের সময় আন্দোলনে ভাটা পড়ার ফলে জমিদার, মিরেশদার, তালুকদারদের নির্যাতন অনেক বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে সংগঠিত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দুজন নানকারও এক সাথে বসে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করার মতো অবস্থাও তখন ছিলো না। জমিদারদের বিভেদ নীতি, নানকারদেরকে দিয়েই নানকারদের ওপর নির্যাতন, বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, জমি থেকে উচ্ছেদ, নানকারদেরকে গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্তি ইত্যাদি কারণে নানকাররা নিজেরাই পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। এই পরিস্থিতিতে সদর মহকুমায় অন্তরীণ থাকার সময় ১৯৪৫ সালে অজয় ভট্টাচার্য ধীরে ধীরে নিজেদের গ্রাম বাহাদুরপুর এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য এলাকায় নানকার আন্দোলনকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

একজন একজন করে নানকারদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ শুরু করার পর পাঠশালার সহপাঠী দুজন নানকারের সাথে বন্ধুত্বের মাধ্যমে অজয় ভট্টাচার্য সংগঠনের কাজে কিছুটা অগ্রসর হন। জোয়াদ আলী ও আবদুশ সোভান (পটল) নামক এই দুজন নানকার ১৯৪৬ এর গোড়া থেকে গ্রুপ গঠন করে বৈঠক করেন। এই সময় লাউতা বাহাদুরপুরের এক সভায় একজন বয়স্ক নানকার প্রশ্ন তোলেন, "জমিদার বাড়ী আমরা ধ্বংস করবো।

*এই অংশের অপেক্ষাকৃত বিশদ বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: অজয় ভট্টাচার্য; নানকার বিদ্রোহ। পুঁথিপত্র প্রকাশনী বাংলা বাজার, ঢাকা-১। ১৩৮০

কিন্তু জমিতে আমাদের স্বত্ব নেই। সেই স্বত্ব কিভাবে আসবে?" এটা একটা খুব বাস্তব সমস্যা হিসেবেই দেখা দিলো এবং এই প্রজা স্বত্বের দাবীকে কেন্দ্র করেই নানকার আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত হলো। নানকারদেরকে ভূস্বামীরা নিজেদের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে অন্য প্রজাদেরকে দমন করতো। কাজেই নানকার আন্দোলন জোরদার হলে সামগ্রিকভাবে জমিদারদের শক্তি যে কমে যাবে এবং কৃষকের সংগঠিত শক্তি বৃদ্ধি পাবে এই চিন্তাও নানকার আন্দোলনকে সাধারণ প্রজাস্বত্ব আন্দোলনের সাথে একসূত্রে গ্রথিত করতে সাহায্য করলো।[২১]

এই সময় উপরোক্ত দুজন নানকার কর্মী ছাড়াও নৈমুল্লা নামে আর একজন জাহাজীকে নানকার আন্দোলনের সক্রিয় সংগঠক হিসেবে পাওয়া যায়। ইনি পরবর্ত্তীকালের আন্দোলনে খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বিশ বৎসর জাহাজে পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দরে তিনি ঘুরেছিলেন। এগুলির মধ্যে সোভিয়েত বন্দরও ছিলো। ১৯৪৬ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি আন্দোলনে নামেন এবং বিশ বৎসরের জাহাজী জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি খুব সোচ্চারভাবে আন্দোলনের বক্তব্যসমূহ নানকারদের সামনে উপস্থিত করতে থাকেন। দুই এক বৎসর কৃষক আন্দোলনে থেকে তিনি নিজেকে এতখানি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন যে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং কোন প্রতিষ্ঠানিক লেখাপড়া না থাকলেও অষ্ট্রেলীয়ান প্রতিনিধি শার্কীর সাথেও ইংরেজীতে আলাপ আলোচনা করতে তাঁর অসুবিধা হয় নি।[২২]

সে সময় কনট্রোল দরে যে কাপড় ইত্যাদি দেওয়া হতো সেগুলো নানকাররা পেতেন-না। কারণ ঐ একই কাপড় কনট্রোল দরে ভূস্বামীরাও পেতো। নানকার ও ভূস্বামী, 'গোলাম' ও 'মুনিব' এর কাপড় একই রকম হয়ে যাবে এটা ভূস্বামীরা বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিলো না। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে করিমগঞ্জে গিয়ে নৈমুল্লা কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টে নালিশ ও প্রতিবাদ করেন। এর ফলে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট থেকে এ বিষয়ে তদন্ত হয় এবং তারা জমিদারদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দান করে। এই সাফল্যে নানকারদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও প্রতিবাদ জানালে তার ফল পাওয়া যায় এই বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। নানকাররা এর পর

থেকে পরস্পরকে সন্দেহ করা থেকে অনেকখানি বিরত হন এবং নানকার প্রথার অবসান, টাকায় খাজনা দান, বেগারী বন্ধ ইত্যাদির দাবীতে পূর্বের থেকে অনেক বেশী সংগঠিত ও সোচচার হন। জমিদারদের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হতেও তাঁরা অস্বীকৃতি জানান।[২৩]

বাহাদুরপুর অঞ্চলে প্রথম প্রকাশ্য আন্দোলন হয় ১৯৪৬ এর অগাষ্ট মাসে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। রাত্রে বিক্ষোভ মিছিল হয় এবং নানকাররা জমিদারদের বাড়ীর নিকটেই সভা করেন।[২৪] এই বিক্ষোভ মিছিলের দ্বারা জমিদাররা প্রত্যক্ষভাবে আঘাত না পাওয়ায় তারা নানকারদের বিরুদ্ধে কিছু না করলেও এই সভা মিছিল সেই পর্যায়ে ঐ এলাকায় একটা অগ্রসর পদক্ষেপ ছিল।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে বাহাদুরপুরে কৃষক সভা এলাকায় অফিস স্থাপন করেছে এবং অফিসে কর্মীদের ও লোকজনের ভীড় হচ্ছে। এই সময় সেখানে একটা ঘটনা ঘটে। জমিদারের বিরুদ্ধে সামান্য অপরাধের জন্যে একজন পাটনীকে খাটের তলায় ঢুকিয়ে রাখা হয়। জমিদারের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কি করা যায় এই চিন্তা হচ্ছে এমন সময় কৃষক সভার একজন কর্মী নিজে গিয়ে খাটের তলা থেকে তাঁকে টেনে বের করে কৃষক সভার অফিসে এনে হাজির করেন। এতে কৃষকদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং জমিদাররাও কিছু করতে সাহস করে না। এই ঘটনার দুই একদিন পরই, ১৯৪৭ সালের ১৬ই জানুয়ারী, দুতিনশো স্থানীয় নানকার 'হদ বেগারী বন্ধ করো' এই ধ্বনি তুলে বাহাদুরপুরে মিছিল বের করেন।[২৫]

প্রকাশ্যে এই সভা মিছিলে যোগ দান করার পর নানকাররা জমিদার বাড়ীর দিকে যাওয়া বাদ দিলেন এবং বেগারী বন্ধ করলেন। এতে দুই দল জমিদারের মধ্যে দুই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। একদল কোন কিছু করতে রাজী হলো না কিন্তু অন্য দল মিথ্যা মামলা ইত্যাদির বেড়াজালে নানকারদেরকে বাঁধার ব্যবস্থা করলো। প্রথম দিকে তিন চারজন গ্রেফতার হলো। পরে তারা দুই তিনশো কৃষক কর্মী ও নানকারকে আসামী করলো। এর ফলে বহু সংখ্যক লোক ফেরারী অবস্থায় দূরে পাহাড়ীয়া অঞ্চলের জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। স্থানীয় মধ্যবিত্তেরাও (এঁদের মধ্যে তালুক চলে যাওয়া অনেক তালুকদারও ছিলেন) নানকারদেরকে সমর্থন করলেন। কারণ জমিদাররা নানকারদেরকে দিয়ে তাদের ওপরও নানা

অত্যাচার করতো। কৃষক ও মধ্যবিত্তের মধ্যে বেশ কিছুটা সমর্থনের ফলে এর পর সানেশ্বর, দাসের বাজার ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার কৃষকরা ঘোষণা করলেন যে, যারা নানকারদের বিরুদ্ধে মামলা করবে তাদের খাজনা বন্ধ। এইভাবে কিছু জমিদারের খাজনা বন্ধ হলো। কোন কোন জায়গায় তাঁরা জমিদারের হাল পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। এবং এই আন্দোলনের সমর্থনে হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হলেন। লাউতা এলাকায় এই সময় আন্দোলনের একটা দাবী সনদ তৈরী হলো যাতে নানকার প্রথা উচ্ছেদ থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রজাদের দাবীও অন্তর্ভুক্ত হলো। অবস্থা এমন পর্যন্ত পৌঁছালো যে জমিদারদের বাড়ীর রান্নার মসলা, ফরমাসী কাজের লোক ইত্যাদি সবকিছুই বন্ধ হয়ে গেলো। বেগারী বন্ধ, জমিদার বাড়ী যাওয়া বন্ধ, নানকারদের বিরুদ্ধে মামলা মকদ্দমা করলে হাট বাজার বন্ধ, খাজনা বন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে এক বলিষ্ঠ ও ব্যাপক আন্দোলন সমগ্র এলাকাটিতে গড়ে উঠলো।[২৬]

আসামে তখন কুখ্যাত সাদুল্লাহ মন্ত্রীসভার (মুসলিম লীগ) পতন ঘটে গোপীনাথ বরদলুই এর কুখ্যাত মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং বসন্তকুমার দাস সেই মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। যে সমস্ত জমিদার নানকারদের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা ও প্রতিরোধ চালায় তাদের মধ্যে দুটি পরিবার ছিলো মুসলমান এবং একটি হিন্দু। এই হিন্দু জমিদার শ্যামাপদ ছিলো বসন্ত কুমার দাসের আত্মীয়। শ্যামাপদর বাড়ীতেই এই সমস্ত ঘটনার সময় পুলিশ ক্যাম্প বসে।[২৭]

এই পরিস্থিতিতেই বাহাদুরপুরের কৃষক আন্দোলন দেশ বিভাগের ঠিক পূর্বকালে আরও ব্যাপক ও সংগঠিতভাবে শুরু হয়। অজয় ভট্টাচার্য এখানকার কমিটির সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে থাকেন জোয়াদ আলীর পিতা নজীব আলী (দরবারী নজুই), সভাপতি লাউতা বাহাদুরপুর কৃষক সমিতি; নৈমুল্লা, সহ-সভাপতি এবং তফজ্জল আলী (তকন মোল্লা)। এঁদের সকলের ভূমিকাই উল্লেখযোগ্য হলেও মূল সংগঠক হিসেবে নৈমুল্লার ভূমিকাই ছিলো সব থেকে উল্লেখযোগ্য।[২৮]

লাউতা বাহাদুরপুরের ও সেখান থেকে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী কানিশালী গ্রামের নানকারদের মধ্যে আত্মীয়তা কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিলো। আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতার সূত্রে বাহাদুরপুরের আন্দোলন সেখানেও বিস্তার লাভ করে এবং কানিশালীকে কেন্দ্র করে সমগ্র ঢাকা দক্ষিণ পরগণায় হাজার হাজার

নানকার আন্দোলনে যোগদান করেন। এখানকার নেতা ছিলেন বীরেশ্বর মিশ্র। ঢাকা দক্ষিণ ছিলো তাঁরই গ্রাম। বীরেশ্বর মিশ্র ব্যতীত অন্য দুজন উল্লেখযোগ্য স্থানীয় নেতার নাম ইসমাইল আলী (তালুকদার) এবং সুধন্যা দেব (নানকার)। ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চল থেকে ছয় সাত মাইল দূরবর্তী ফুলবাড়ি গ্রামেও আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। অন্যান্য এলাকাতেও আন্দোলনের ঢেউ কিছুটা পৌঁছালেও স্থানীয় নেতৃত্বের অভাবে সেগুলিতে আন্দোলন জোরদার হয়নি। বেগার বন্ধ, খাজনা বন্ধ, পুলিশ ক্যাম্প ও মামলা প্রত্যাহার ইত্যাদিই ছিলো এই আন্দোলনের মূল দাবী।[২৯]

সিলেটের পাকিস্তানভুক্তির পর মুসলিম লীগ নানকারদেরকে কমিউনিষ্টদের প্রভাব থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নানকার আন্দোলনকে নিজেদের মতো করে পরিচালনার প্রচেষ্টা করে। সিলেট রেফারেণ্ডামের সময় কিষাণ সভার কর্মী ইসমাইল আলী কৃষক সভা পরিত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করে। মাহমুদ আলী দেশভাগের পূর্বে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক ছিলেন। ইসমাইলের সহায়তায় তিনি, নূরুর রহমান প্রভৃতি এই উদ্যোগের পুরোভাগে থাকেন। গোপালগঞ্জে (সদর সিলেট) এই উদ্দেশ্যে তাঁরা এক সম্মেলন আহ্বান করেন এবং একটি ইস্তাহার প্রচার করে তাতে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও সে সময় নানকারদের মধ্যে কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচারণার কোন স্থান ছিলো না। কাজেই মুসলিম লীগের সেই সম্মেলন শেষ পর্যন্ত হতে পারে নি।[৩০]

পাকিস্তানোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সিলেট জেলা পার্টি কমিটি মুসলিম লীগের লোকদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নানকারদের দাবী কিছু কিছু আদায়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এই উদ্দেশ্যে ইসমাইলের সাথে যোগাযোগ করা হয়। এবং মাহমুদ আলী, নূরুর রহমান, ইসমাইল প্রভৃতির সাথে কমিউনিষ্ট পার্টির আলাপ আলোচনা চলে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরেই অজয় ভট্টাচার্য আসাম সরকারের পূর্ব ঘোষিত গ্রেফতারী পরোয়ানায় গ্রেফতার হন। সে সময়ে পার্টি থেকে সুরত পালকে বাহাদুরপুর এলাকায় দেওয়া হয়। বারীন দত্ত, রোহিনী দাস (জেলা কৃষক সম্পাদক), সুরত পাল ও চিত্ত রঞ্জন দাস মুসলিম লীগের সাথে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।[৩১]

ঠিক এই সময়ে এক ঘটনা ঘটে। গোলাপগঞ্জ থানার কানিশালী

গ্রামের মুখলেস আলী নামে একজন নানকার স্থানীয় জমিদারদের এক-জনকে জুতো মারেন। এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে জমিদাররা নিজেদের পক্ষ থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* কাছে একটা ডেপুটেশন পাঠায়। মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি বিষয়টি নিয়ে তাদের সাথে আলো-চনার পর সৈয়দ মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেন (যুক্ত বাঙলায় সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রী সভার সদস্য), আওলাদ হোসেন এম. এল. এ. ও. আব্দুল বারী এম. এল. এ. এই তিন জনকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। গোলাপগঞ্জ, ঢাকা দক্ষিণ, বাহাদুরপুর ইত্যাদি জায়গায় জমিদারদের হাতী চড়ে গিয়ে তাঁরা স্থানীয় নানকারদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেন।[৩২]

১৯৪৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তদন্ত কমিটি গোলাপগঞ্জ ও ঢাকা দক্ষিণ পরিদর্শন করে বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। জমিদার পক্ষ সিলেটের খ্যাতনামা আইনজ্ঞ ও জেলার বিভিন্ন স্থানের জমিদারদের প্রতিনিধিদের সহায়তায় নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন। অন্যদিকে আন্দোলনকারী নানকার প্রজারা সরাসরি কমিটির নিকট নিজে-দের বক্তব্য এবং দুঃখ দুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করেন।** এই দেখা সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনার সময় মুসলিম লীগের এ. জেড. আব্দুল্লাহ এবং নূরুর রহমানও উপস্থিত থাকেন। উত্তর সিলেট জেলা লীগও এই আলো-চনায় নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে।[৩৩]

তদন্ত কমিটি জমিদার ও নানকার উভয় পক্ষের কাছে আপোষের আবেদন জানায়। ফুলবাড়ীর জমিদার এই সর্তে আপোষে সম্মত হয় যে, যে সকল নানকার প্রজার ভিটা তাদের বাড়ীর এলাকার মধ্যে পড়েছে তারা সেখান থেকে অন্যত্র সরে যাবে এবং তার জন্যে ভূস্বামীরা ঐ গ্রামে অথবা তার নিকটবর্তী গ্রামে তাদেরকে উপযুক্ত জমি ও গৃহ স্থানা-ন্তরের খরচ প্রদান করবে। ঢাকা দক্ষিণ ডাক বাঙলায় কমিটির আপোষ প্রস্তাবে কানিশাইলের জমিদাররা বসত বাড়ীর ব্যাপারে গোলাপগঞ্জের

* তখন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে পুনর্গঠিত না হওয়ার জন্য তার পূর্ব নাম 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ'ই বহাল ছিলো।

** 'সিলেটে নানকার বিদ্রোহ' নামে একটি পুস্তিকা ইতিপূর্বে রোহিনী দাসের নামে প্রকাশিত হয়। তার অংশ বিশেষ অজয় ভট্টাচার্যের দ্বারা লিখিত ছিলো। নানকার আন্দোলনের সমস্ত রিপোর্ট 'সংহতি' নামক পত্রিকায় তৎকালে প্রকাশিত হয়েছিলো। অজয় ভট্টাচার্যের থেকে এই তথ্য পেলেও উপরোক্ত পুস্তিকা ও পত্রিকার কোন কপির সন্ধান আমি পাই নি।—ব. উ.

প্রস্তাবকেই গ্রহণ করে কিন্তু জমির ওপর নানকারদের কোন জোত স্বত্ব স্বীকার করতে তারা সম্মত হয় না।[৩৪]

ঢাকা দক্ষিণ থেকে আব্দুল বারী চৌধুরী লাউতা বাহাদুরপুর যান এবং সেখানেও কমিটির পক্ষ থেকে দুই পক্ষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেন। মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেনও ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকা দক্ষিণে থাকেন এবং তদন্তের জন্যে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। আওলাদ হোসেন খানও কয়েকটি এলাকা ঘুরে ১৩ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সিলেটে ফিরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে তদন্তের বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। এর পর ১৫ই ডিসেম্বর তদন্ত কমিটির তিন জন সদস্য সিলেট সার্কিট হাউসে মিলিত হন। এ সময়ে আন্দোলনকারী প্রজাদের ওপর সরকারী কর্মচারীদের পক্ষপাতমূলক আচরণ ও জুলুমের প্রমাণ হিসেবে এ. ডি. এম: এর দস্তখতী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের মোহরযুক্ত ১৪৪ ধারার এক নোটিশ মুসলিম লীগ কর্মীরা কমিটির সামনে উপস্থিত করেন।* এই ধরনের বহু নোটিশ ঢাকা দক্ষিণে অবস্থানকালে মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেনের সামনেও উপস্থিত করা হয়।[৩৫]

জমিদার ও নানকার পক্ষের বক্তব্যসমূহ শোনা এবং পর্যালোচনার পর তদন্ত কমিটি মুসলিম লীগ এবং সরকারের কাছে নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রদান করেন:

(১) যে সব ভূম্যধিকারীর খাজনা, খাস খামার অথবা উভয় সূত্রে আয় ছয় হাজার টাকার উর্দ্ধে তাঁহাদেরকে তাহাদের অধীনস্থ নানকার প্রজাদের নিকট হইতে পরিবর্ত্তন ফি স্বরূপ এক বৎসরের খাজনা গ্রহণ করিয়া প্রচলিত খাজনার হারে তাঁহাদের জোত জমি খাজনায়ী জোত জমিতে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

* নোটিশটির কপি:

Injunction u/s 144
Mis B15
47

In the court of A.D.M.

মাং ছইদ বক্ত চৌংগং—১ম পক্ষ
১২। সেক মছলম—২য় পক্ষ

যেহেতু কার্যবিধির ১৪৪ ধারার বিধানমতে তোমাকে জানান যাইতেছে যে, তুমি বাঁশ, গাছ, ধান্য কাটিবায় না, কাটিলে আইনতঃ আচরণ করা যাইবে। তোমার কোন আপত্তি থাকিলে আগামী—ইং তারিখে দর্শাইবার

(অপাঠ্য)
A.D.M.

(২) ছয় হাজার টাকা বা তন্নিম্ন আয় বিশিষ্ট ভূম্যধিকারীগণকে নিম্নোক্ত সর্ত্তে তাঁহাদের অধীনস্থ নানকার প্রজাকে খাজনায়ী প্রজায় পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে: (ক) ৬০০০৲ টাকা ৩০০১৲ টাকা আয় বিশিষ্ট ভূম্যধিকারীগণের $\frac{১}{৫}$ জমি জমিদারের খাসে ছাড়িয়া দিতে হইবে। (খ) ৩০০০৲ টাকা হইতে ১০০১৲ টাকা আয় বিশিষ্ট জমিদারগণের $\frac{১}{৪}$ ভূমি জমিদারের খাসে ছাড়িয়ে দিতে হইবে। (গ) ১০০১৲ হইতে ৫০১৲ টাকা আয় বিশিষ্ট জমিদারগণের $\frac{১}{৩}$ ভূমি জমিদারের খাসে ফিরত দিতে হইবে। (ঘ) ৫০০৲ অথবা তন্নিম্ন আয় বিশিষ্ট জমিদারগণের $\frac{১}{২}$ ভূমি জমিদার সরকারে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

অবশ্য যদি কোন নানকার প্রজার সর্ব্বপ্রকার জোত জমি দুই কেদারের উর্দ্ধে না হয় তাহা হইলে তাহার দখলীয় সমস্ত নানকার জমি বিনা প্রত্যার্পণে খাজনায়ী জমিতে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। এবং যদি কোন নানকার প্রজার সর্ব্বপ্রকার জোত দুই কেদারের উর্দ্ধে ও তিন কেদারের নিম্নে হয় তাহা হইলে সে সাধারণভাবে ১ কেদার নানকার জমি খাজনায়ী রূপে পাইবেই। এতাধিক অন্যান্য জমির যে অংশ উপরোক্ত সর্ত্তানুযায়ী ছাড়িয়া দিবার কথা প্রচলিত বাজার দরে তাহার জোত মূল্য ৫ হইতে ১০ কিস্তিতে আদায় করিলে ঐ ভূমিও খাজনায়ী জমিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে।

(৩) ভূম্যধিকারীগণের বাড়ীর মধ্যস্থিত সংলগ্ন নানকার প্রজার বাড়ীর পরিবর্ত্তে ঐ গ্রাম বা নিকটবর্ত্তী গ্রামে ভূম্যধিকারীগণ বাড়ী দিতে পারিলে এবং স্থানান্তরের খরচা দিলে নানকার প্রজাকে সরিয়া যাইতে হইবে।

(৪) কোন বিশেষ কারণে কোন ভূম্যধিকারী যদি তাহার বাড়ীর মধ্যস্থিত নহে এরূপ কোন নানকার প্রজার বাড়ী নিজের অথবা পরিবারের লোকের জন্য খাস দখলে আনিবার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে অনুরূপ ভূমি এবং স্থানান্তরের খরচ দিলে ঐ বাড়ীতে তাহার খাস দখল দেওয়া যাইতে পারে।

(৫) আবাদী জমির বিনিময় করিতে পারিলে কেবল মাত্র ভূম্যধিকারীগণ তাহাদের ফেরত পাওয়ার দাবী পরিত্যাগ করিলেই তবে বিনিময় করিতে দেওয়া যাইবে।

(৬) কোন নানকার প্রজা 'কনসেশন' হারে জমি ভোগ করিলে তাহার জমিতে পূর্ণ খাজনা প্রবর্ত্তিত হইবে; এবং নানকার প্রজা সকল প্রকার 'হদবেগারী' হইতে মুক্তি পাইবে।

(৭) ভূমি সংক্রান্ত সকল প্রকার বিবাদ এবং বার্ষিক খাজনা ইত্যাদির মীমাংসা গভর্ণমেণ্টের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোন রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী দ্বারা সম্পন্ন হইবে, এবং তাহার রায়ের বিরুদ্ধে রাজস্ব বিভাগীয় কোন গেজেটেড অফিসারের নিকট আপীল করা চলিবে। এবং ঐ অফিসারের রায়ই চূড়ান্ত, এবং কেবলমাত্র দেওয়ানী আদালতে পরিবর্ত্তিত হইবে।

(৮) নানকার আন্দোলন উদ্ভূত সকল প্রকার চালু মামলা, মোকদ্দমা, ডিক্রী এবং উচ্ছেদ উপরোক্ত সর্ত্তানুযায়ী চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রহিবে।

(৯) তিন বৎসরের উৎপন্ন ফসলের কনট্রোল মূল্য ভূমির বাজার দর বলিয়া ধরিতে হইবে।[৩৬]

উপরোক্ত আপোষ প্রস্তাবে নানকার পক্ষের অনেক আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু জমিদাররা প্রস্তাবটি গ্রহণের ব্যাপারে তাদের অসম্মতি জানায়।[৩৭]

এর পর জমিদাররা ঢাকাতে একটি সম্মেলন আহ্বান করে সেখানে এ বিষয়ে নিষ্পত্তির দাবী জানায়। তাদের সেই দাবী অনুযায়ী ১৯৪৭ এর ডিসেম্বর মাসেই ঢাকাতে নানকার, জমিদার ও সরকারী প্রতিনিধিদের একটি ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন হয় এবং তা বেশ কয়েকদিন স্থায়ী হয়। সম্মেলনে যে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় সেগুলি মোটামুটিভাবে হলো এই:

(১) নানকারদের সাথে সংশ্লিষ্ট যে শতাধিক বন্দী আছেন তাদের সকলের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে নিয়ে তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে (কমিউনিষ্টদেরকে মুক্তি দেওয়া নিয়ে অনেক বিতর্ক হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়)।

(২) যে সমস্ত নানকার বাড়ী জমিদার বাড়ীর সংলগ্ন সেগুলিকে জমিদার ইচ্ছে করলে উচ্ছেদ করতে পারবে কিন্তু তার পরিবর্তে জমিদার কর্তৃক নানকারকে অন্য জায়গা দিতে হবে। নানকার বাড়ী স্থানান্তরের ব্যয়ও এক্ষেত্রে জমিদারকেই বহন করতে হবে।

(৩) যে সমস্ত জমি নানকারদের দখলে আছে তার অর্দ্ধেক জমি-

দারকে ছেড়ে দিতে হবে এবং বাকী অর্ধেকে নানকারদের জোত স্বত্ব স্বীকৃত হবে। যে জমিতে নানকারদের জোতস্বত্ব স্বীকৃত হবে সেগুলি খাজনায়ী জমিতে রূপান্তরিত হবে।

(৪) জমি হস্তান্তর ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ দেখা-শোনার জন্যে সেট্‌ল্‌মেণ্টের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন অফিসার নিয়োগ করা হবে। এই অফিসার জমিদারদের আবেদন বিবেচনা, নানকারদের ঘরের মূল্য নির্ধারণ, খাজনার রেট নির্ধারণ ইত্যাদি করবে।[৩৮]

এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যে চুক্তি হয় তাতে ফুলবাড়ী ও ঢাকা দক্ষিণ নানকারদের প্রতিনিধি হিসেবে যথাক্রমে ইসমাইল আলী এবং ডক্টর মজিদ স্বাক্ষর করেন। লাউতা বাহাদুরপুরের প্রতিনিধি হলেও চিত্তরঞ্জন দাস স্বাক্ষর দানে বিরত থাকেন। কারণ কমিউনিষ্ট পার্টি নানকারদের অর্ধেক জমি হস্তান্তরের বিপক্ষে থাকে এবং পার্টির লোক হিসেবে তাঁকে চুক্তিতে স্বাক্ষর না করার নির্দেশ দেয়। এই সম্মেলনে নানকারদের পক্ষে পরামর্শ দানের জন্যে বারীন দত্ত উপস্থিত থাকেন। চুক্তিতে প্রাদেশিক লীগের (সরকারের) পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন হামিদুল হক চৌধুরী, হাবিবুল্লাহ বাহার, সৈয়দ মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেন এবং আব্দুল হামিদ। জমিদারদের পক্ষে স্বাক্ষর দেন কালী সদয় চৌধুরী (ঢাকা দক্ষিণ), আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী (বাহাদুরপুর) ও খান বাহাদুর গউসউদ্দীন চৌধুরী (দাউদ-পুর, সদর থানা)।[৩৯]

উপরোক্ত চুক্তিটির ফলে নানকার আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনেক রাজবন্দীসহ অজয় ভট্টাচার্য ১৯৪৮ এর ৭ই জানুয়ারী মুক্তি লাভ করেন।[৪০]

এই চুক্তির ফলে কিন্তু সিলেটের নানকার এলাকাগুলিতে সামগ্রিক ভাবে কোন পরিবর্ত্তন হলো না। কারণ যে তিনটি এলাকায় আন্দোলন হয়েছিলো চুক্তিটি কেবলমাত্র সেই সেই এলাকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিলো অন্যান্য জায়গায় নয়। তাছাড়া ঐ তিনটি এলাকারও অন্যান্য যে সমস্ত প্রজারা নানকারদের সমর্থনে এসেছিলেন তাঁদেরও অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হলো না। খাজনার হার কমানো, উচ্ছেদ বন্ধ করা ইত্যাদি সম্পর্কে কোন আইন সরকার প্রণয়ন করলো না।

নানকারদেরকে অল্প কিছু অধিকার প্রদান করে উপরোক্ত সরকারী

সিদ্ধান্তের পরও সেই সব সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে পুলিশ ও সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের ভূমিকা ১৯৪৮ এর পয়লা জানুয়ারীর একটি ঘটনা থেকে অনেকখানি বোঝা যাবে। ঐ দিন সন্ধ্যা ৮টার সময় ফুলবাড়ি বৈটিঘর বাজারে ইসমাইল আলী (যিনি তখন কৃষক সভা পরিত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেছেন) স্থানীয় নানকারদের একত্রিত করে নানকার মিরাশদার বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত হয়েছিলো সেগুলি তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করছিলেন। সেই সময় তিন চার জন পুলিশ ও মিলিটারী এসে তাঁকে ঘেরাও করে এবং গ্রেফতার করে এনে গোলাপগঞ্জ থানায় লকআপে আটক রাখে। থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা সেখানে ইসমাইল আলীকে সম্বোধন করে বলে, "এই শালার বাচচা ইসমাইল, তুই যে ডালে ডালে ঘুরে বেড়াস আমি যে ডালের পাতায় পাতায় বেড়াই। তুই ঢাকায় গিয়ে মন্ত্রীদের কাছে আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা লাগিয়েছিস, এখন যাবি কোথায়?" পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুষমন ইত্যাদি বলে ইসমাইলকে আরো অনেক গালাগালি করার সময় প্রতিবাদ জানালে দারোগা তাঁকে হাণ্টার দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করার হুমকি দেখায়। কৃষক সমিতির নৈমুল্লা তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে ইসমাইলের পক্ষে জামিন দাবী করলে দারোগা রুদ্র মুর্ত্তি হয়ে "কোন শুয়োরের বাচচা জামিন নিতে আইবি" বলে তাঁকেও ধাক্কা দিয়ে লক্‌আপে ঢোকায়। নৈমুল্লাকে পরে ছেড়ে দেওয়া হলে তিনি ইসমাইলের জামা কাপড় লকআপের বাইরে রেখে চলে যান। পর দিন সিলেটে ইসমাইলকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হলেও তাঁর জামা কাপড় এবং অন্যান্য মূল্যবান কাগজপত্রের কোন সন্ধান তিনি আর পান নি।[৪১]

মাত্র তিনটি এলাকার নানকারদের সাথে জমিদার ও সরকার পক্ষের একটা অসন্তোষজনক চুক্তি হলেও তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে অনেক গাফলতী দেখা দিলো এবং চুক্তিকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা চললো।[৪২] তাছাড়া অন্যান্য এলাকার নানকার এবং সাধারণ জমিদারীর প্রজাদের কোন সমস্যারই বিন্দুমাত্র সমাধান হলোনা। এর ফলে সিলেট জেলায় কৃষক আন্দোলনও বন্ধ না হয়ে অব্যাহত থাকলো। জমিদারের খাজনা বন্ধ হলো এবং নানকার সহ অন্যান্য প্রজাদের সাথে ভূস্বামীদের ছোট খাট সংঘর্ষও বন্ধ হলো না। জায়গায় জায়গায় পুলিশ ক্যাম্পগুলি তুলে না নিয়ে সরকার শান্তি রক্ষার নামে সেগুলিকে বসিয়ে রাখলো।

ইতিপূর্বে লাউতা বাহাদুরপুরে করম আলী নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব

হয়েছিলো। সে আসামে মুসলমান কৃষকদেরকে উচ্ছেদের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলো এবং দেশভাগের পর এই অঞ্চলে এসে জমিদারদের পক্ষে কৃষকদের ওপর নানান নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলো। এই অত্যাচারের ফলে তার বিরুদ্ধে কৃষকরা সাধারণভাবে ভয়ানক বিক্ষুব্ধ ছিলেন। ১৯৪৮ এর এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত্রিতে বাহাদুরপুরে নদীর অপর পারে অজয় ভট্টাচার্য কৃষক কর্মীদেরকে নিয়ে সভা করছেন এমন সময় করম আলী গ্রামে এসে উপস্থিত হলো। তার উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে গ্রামবাসীরা তাকে ধরে ফেলেন এবং প্রচণ্ড প্রহারের পর তাকে মৃত মনে করে ফেলে রেখে যান। কাছাকাছি যে সমস্ত পুলিশ ছিলো তারা সে সময় ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে পলায়ন করে। করম আলী কিন্তু মারা যায় নি। পরে থানা থেকে পুলিশ এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।[৪৩]

পরদিনই পুলিশ অধিক সংখ্যায় বাগ প্রচণ্ড খাঁ লাউতা বাহাদুরপুর অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ, মারপিট, ধর্ষন ইত্যাদি চালায়। এর ফলে পাশাপাশি পাঁচটি গ্রামের লোকজন গরু ছাগল ইত্যাদি ফেলে হাওর ও জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায় এবং গ্রামগুলি সম্পূর্ণভাবে জনশূন্য হয়ে পড়ে। প্রায় পাঁচ হাজার লোক এইভাবে ঘরবাড়ী থেকে উদ্বাস্তু হলেন এবং তাঁদের খাওয়া, থাকা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থাই হয়ে দাঁড়ালো এক বিরাট সমস্যা। এই সময় কৃষক সভার কর্মীদেরকে নিয়ে অজয় ভট্টাচার্য গ্রামে ঘোরবার সময় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। তাঁর বাড়ীতে পুলিশ ঢুকে ভাঙচোর করে এবং কাঁথা বালিশ ইত্যাদিসহ সমস্ত কিছু লুঠ করে নিয়ে যায়।[৪৪]

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের এই ঘটনাটির অতি সংক্ষিপ্ত নিম্নলিখিত রিপোর্টটি নওবেলালে প্রকাশিত হয়:

> লাউতা বাহাদুরপুর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—পুলিশের সঙ্গে সেখানকার জনতার এক ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষেই কয়েকজন লোক গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন। প্রকাশ, কয়েক জন লোককে ধরিবার জন্য বিয়ানীবাজারের দারোগা বাহাদুরপুর গেলে সেখানকার লোকের সঙ্গে তাঁহার বচসা হয় তার ফলেই এই সংঘর্ষের সূচনা হয়।[৪৫]

পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রে উপরোক্ত ঘটনার এই একমাত্র রিপোর্টটিতে যে প্রকৃত ঘটনার কোন উল্লেখই নাই তা বলাই বাহুল্য। শুধু এই

একটি মাত্র ঘটনা নয়। এই ধরনের সমস্ত ঘটনাই তৎকালীন মুসলিম লীগ সমর্থক ও সরকারী সংবাদপত্রে এর বেশী স্থান পেতো না এবং স্থান পেলেও ঘটনাগুলিকে যথাসাধ্য এভাবেই বিকৃত করে জনগণের সামনে উপস্থিত করা হতো।

একদিকে হাজার হাজার নানকার ও কৃষক উদ্বাস্তু হয়ে নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের জঙ্গলে ঘুরতে থাকলেন এবং অন্যদিকে জমিদার মুয়ীদ চৌধুরীর পরিচালনায় ভূস্বামীদের দালালরা তাদের কাছে প্রস্তাব করতে থাকলো যে জমিদারদেরকে টাকা দিলেই সব কিছু মিট-মাট হয়ে যাবে এবং তাঁরা আবার গ্রামে তাঁদের ভিটে বাড়ীতে ফিরতে পারবেন। এই পরিস্থিতিতে নানকাররা ঘরে ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং শেষ পর্যন্ত জমিদারদের প্রস্তাব মতো তাদেরকে টাকা দিয়ে গ্রামে ফিরলেন। কেবলমাত্র নানকারদের মধ্যে যাঁরা কৃষক সভা ও কমিউনিষ্ট পার্টির অগ্রসর কর্মী ছিলেন তাঁরা আর নিজেদের গ্রামে এইভাবে না ফিরে সানেশ্বর অঞ্চলে চলে গেলেন। এর পর নানকার আন্দোলনের মূল কেন্দ্রও সানেশ্বরে স্থানান্তরিত হলো। কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচী অনুযায়ী সেখানে কাজ শুরু হলো।

পূর্ব বাঙলা সরকার ১৯৪৭ এর ১লা ডিসেম্বর সিলেটের মনওওর আলী এম. এল. এর সভাপতিত্বে 'চাকরাণ প্রথা তদন্ত কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নামঃ ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী (জমিদার), যোগেন্দ্র দাস এম. এল. এ., ইদরিস আলী এম, এল. এ., আব্দুল লতিফ এম. এল. এ., আব্দুল মোমেন এম. এল. এ., মির্জা আব্দুল হাফিজ এম. এল. এ.। আসাম সরকারের অবসরপ্রাপ্ত এ. ডি. এল. আর খান সাহেব আজিজুর রহমানকে এই কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। জানুয়ারী, ১৯৪৮ এর মাঝামাঝি এই কমিটি তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে প্রশ্নাবলী প্রচার করেন তার মূল উদ্দেশ্য হলো:

(১) এই কমিটি পূর্ব বঙ্গে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার চাকরাণ প্রথা সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

(২) বিভিন্ন প্রকার চাকরাণ প্রজাদের অধিকার ও তাহার বিনিময় সম্পর্কে তদন্ত করিবেন।

(৩) ইহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য কোন সুবিধা ও অধিকার

দেওয়া যায় কিনা এবং দিলে ন্যায় সঙ্গতভাবে কি ও কতখানি অধিকার ও সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে তদন্ত করিবেন। বিশেষ করিয়া সিলেটের নানকার এবং অন্যান্য চাকরাণ প্রজাদের সম্বন্ধে অভিমত জ্ঞাপন করিবেন।[৪৬]

উর্দ্ধমুখী নানকার আন্দোলনের মুখে এবং পূর্বোক্ত মুসলিম লীগ তদন্ত কমিটির নানকার প্রথা সম্পর্কিত বিস্তৃত রিপোর্টের ও ত্রিপক্ষীয় চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানতঃ সিলেটের জমিদারদের দ্বারা গঠিত এই কমিটির প্রশ্নাবলী বিলির এই ব্যবস্থা যে নানকার আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করে নানকার প্রথা উচ্ছেদের প্রশ্নটি ধামা চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই পূর্ব বাঙলা সরকার কর্তৃক হয়েছিলো এ কথা মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকা নওবেলালের পক্ষেও অস্বীকার করার উপায় ছিলো না। তাই 'নানকার প্রথার বিলোপ সাধনে ধামা চাপা নীতি অবলম্বন' এই শীর্ষক একটি রিপোর্টে নওবেলাল বলেন,

> মধ্যযুগীয় নানকার প্রথার অবিলম্বে অবসান ঘটাইবার জন্য যখন চারিদিক হইতে সোরগোল শুরু হইয়াছে—বর্ব্বর যুগের ধ্বংসাবশেষ এই অমানুষিক প্রথার বিরুদ্ধে যখন প্রবল জনমত গঠিত হইয়া উঠিয়াছে—সুস্থ মানসিক অবস্থার ব্যক্তি মাত্রেই যখন এই প্রথাকে জাতির পক্ষে দেশের পক্ষে অসম্মানজনক বলিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন সেই যুগসন্ধিক্ষণে আমলাতন্ত্রীয় মনোভাবাপন্ন পূর্ব্ববঙ্গ সরকার বিগত ১লা ডিসেম্বর তারিখে পূর্ব্ববঙ্গ চাকরাণ প্রথা তদন্ত নামে কমিটি গঠন করিয়া জনমত সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি প্রশ্নাবলী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতেছেন।[৪৭]

এই কমিটি গঠিত হওয়ার ছয় মাস পর সভাপতিসহ ছয় জন সদস্য নানকারদেরকে দখলী জমিতে স্বত্ব দানের সুপারিশ করেন। কিন্তু সেক্রেটারী আজিজুর রহমান চৌধুরী, ইদরিস আলী এম. এল. এ. এবং ব্রজেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী একটি স্বতন্ত্র রিপোর্ট দাখিল করে নানকারদের অবস্থার কোন প্রতিকার না করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার স্বপক্ষে নিজেদের মত প্রকাশ করেন।[৪৮]

জনমত সংগ্রহ করতে গিয়ে নানকার প্রথা উচ্ছেদের সপক্ষে যে প্রবল জনমত সারা দেশে বিশেষতঃ সিলেট জেলায় বিদ্যমান ছিলো তার চাপে এবং নানকার আন্দোলনকে কমিউনিস্টদের প্রভাব ও নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে

আনার উদ্দেশ্যেই যে কমিটির অধিকাংশ সদস্য নানকার প্রথাকে সরাসরি বিলোপের সুপারিশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই সব সুপারিশ সত্বেও পূর্ব বাঙলা সরকার নানকার প্রথা উচ্ছেদের ক্ষেত্রে যে দীর্ঘসূত্রতা ও ধামাচাপা নীতি অবলম্বন করেছিলো তার ফলে নানকারদের অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তনই সারা সিলেটে ঘটেনি এবং নানকার আন্দোলনের তীব্রতাও কমে আসে নি। শুধু তাই নয়। একদিকে আন্দোলনের মূল এলাকাগুলিতে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে রেখে সরকার নানকারদের ওপর নিদারুণ নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলো এবং অন্যদিকে কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচারণার দ্বারা নানকারদের 'দেশপ্রেম' জাগিয়ে তুলে তাঁদেরকে আন্দোলন থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলো। সরকারের এই কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচারণার প্রকৃত স্বরূপও যে কি ছিলো তা জনগণের কাছেও আর অজানা থাকছিলো না এবং এর ফলে জনগণ সরকারের প্রতি অধিকতর বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ছিলেন। এ বিষয়ে সরকারকে সাবধান করে 'বাঁচিবার পথ' নামক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে নওবেলাল বলেন,

> কমিউনিজমভীতি প্রচারে সরকার আজ এমনই মাতিয়া উঠিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা কমিউনিষ্ট ভীতিকে জনমন হইতে পরিপূর্ণভাবে মুছিয়া ফেলা হইতেছে। দেশবাসী যখন খোলা চোখেই দেখিতে পাইতেছে যে, যে সকল দেশকর্মী পাকিস্তানের জন্য সত্যিকারের ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, সরকারী অব্যবস্থা এবং জনসাধারণের দুঃখ দৈন্যের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিবার অপরাধেই যখন তাহারা কমিউনিষ্ট আখ্যায় আখ্যায়িত হইতেছে, তখনই তাহারা ভাবিতে শিখিয়াছে যে স্বার্থবাদী লোকের বিরুদ্ধ মতবাদকে দমন করার এক সহজ অস্ত্র এই কমিউনিজমভীতি প্রচারের ফলে প্রচারের এই ধারা স্বাভাবিকভাবে বিরুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি করিতে বাধ্য।
>
> এই সরকারী নীতিকে আমরা গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার মতই মনে করি এবং বিশ্বাস করি যে দ্রুত বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ না করিতে পারিলে সমগ্র পাকিস্তানের উপর বিপদ ডাকিয়া আনাও অসম্ভব নহে।[৪৯]

সিলেট জেলা কৃষক সভার কর্মী শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য গ্রেফতার হয়ে সিলেট জেলে আটক থাকার সময় ১৯৪৮ এর মে মাসের মাঝামাঝি এই

মর্মে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে জেলের মধ্যে জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তিনি অমানুষিকভাবে প্রহৃত হয়েছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সভা সমর্থকদের একটি প্রতিবাদ সভা সিলেটে আহ্বান করা হয় এবং ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ তারিখে (২২শে মে, ১৯৪৮) এই ঘটনার বিবরণ সম্বলিত 'সংহতির' একটি ক্রোড়পত্রও প্রকাশিত হয়।[৮] কিন্তু এই সমস্ত রিপোর্টকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচারণা হিসেবে আখ্যায়িত করে মাহমুদ আলী নওবেলালে একটি বিবৃতির মাধ্যমে বলেন যে, শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য অমানুষিকভাবে প্রহৃত হয়েছিলেন বলে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে তাঁরা নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে তদন্ত করে দেখেছেন যে তা মিথ্যা। আসলে শৈলেন্দ্র বাবুই হঠাৎ সবেগে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ধাওয়া করলে তাঁর আক্রমণকে প্রতিহত করতে যাওয়ার ফলেই তিনি সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হন।[৫০]

সেই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে অনশনরত বিচারাধীন বন্দী শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য ও শিশির কুমার ভট্টাচার্যের মুক্তির দাবীতে কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে সিলেটের গোবিন্দ পার্কে একটি সভা আহ্বান করা হয়। সেই সভায় কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক গুণ্ডা চেয়ার টেবিল ভাঙ্গচোর করে সভা ভঙ্গ করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর পুলিশ সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে গুণ্ডামীতে অংশ গ্রহণকারীদের পরিবর্তে সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে সিলেট ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক বরুণ রায় ও কমিউনিষ্ট কর্মী ভূপতি চক্রবর্তীকে বিশেষ ক্ষমতা আইন অনুযায়ী গ্রেফতার করে। পুলিশের এই আচরণে জনগণ তাদের বিরুদ্ধে খুব বিক্ষুব্ধ হন।[৫১]

প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসনের অবসানের পরও সামন্ত নির্যাতন যে মধ্যযুগীয় কায়দায় সিলেটের অনেক জায়গাতেই জারী ছিলো ১৯৪৮ এর ডিসেম্বর মাসের একটি ঘটনার নিম্নলিখিত সংবাদপত্র রিপোর্ট থেকে তার একটা চিত্র পাওয়া যাবে:

> বিগত ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে পৃথিমপাশার প্রবল প্রতাপশালী জমিদার সাহেবান* সদলবলে স্থানীয় জংগলে ব্যাঘ্র নিধনের জন্য এক বিরাট অভিযান আরম্ভ করেন। এই অভিযানে সাহায্যের জন্য তাঁহারা প্রজা সাধারণের উপর এরূপ একটি হুকুমনামা জারী করেন যে, প্রত্যেককে অবশ্যই অনির্দিষ্ট কালের জন্যে সংশ্লিষ্ট জংগলে হাজির

* আলী হায়দার খান এম. এল. এ. —ব. উ.

থাকিতে হইবে। কিন্তু ধান মাড়াই ও ধান কাটা প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিভিন্ন কাজের মওসুম থাকায় তখন অধিকাংশ প্রজার পক্ষে জমিদার সাহেবানের- হুকুম তামিল করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। তবে জনৈক হতভাগ্য প্রজা নিজের প্রয়োজনীয় কাজে জলাঞ্জলী দিয়াও জুলুমের ভয়ে শিকারে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবরুদ্ধ বাঘের টিকিটির নাগাল না পাইয়া জমিদার সাহেবান যখন খাসমহলে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহাদের সম্পূর্ণ আক্রোশ গিয়া পড়িল হতভাগ্য প্রজাদের উপর। যাহারা শিকারে না যাওয়ার মত অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী তাহাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করার জন্য জমিদার সাহেবান তাঁহাদের সুযোগ্য নায়েবের উপর আদেশ জারী করেন। তদনুযায়ী অপরাধী প্রজাদেরকে ডাকিয়া পাঠান হইল। বিক্রমের মূর্ত প্রতীক নায়েব বাহাদুরের আদেশে তারপর হতভাগ্য প্রজাদের উপর যেরূপ বর্বর অত্যাচার চলিয়াছিলো—তাহা যে কোন সভ্যব্যক্তির বিস্ময় উদ্রেক করিবে। জমিদার সাহেবানের নিকট শত ক্ষমা ভিক্ষা ও হাতে পায়ে ধরা সত্ত্বেও কেহ এই রোমাঞ্চকর লাঞ্ছনার হাত হইতে রেহাই পায় নাই। প্রহৃতদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি রহিয়াছেন যাঁহাদের সামাজিক মর্যাদাও নেহাত কম নয়। এই সব ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথমেই দেওগাঁও নিবাসী মোঃ তুরাবউল্লাহ ও শ্রী বংকনাথের নাম করা যাইতে পারে।[৫২]

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া 'নওবেলাল' পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় মন্তব্য করা হয়: "এই বিংশ শতাব্দীতেও পাকিস্তানে মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথায় প্রজা পীড়ন হইতে পারে তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।"[৫৩]

এই ধরনের জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সিলেট জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছিলো এবং সাধারণভাবে পুলিশের নির্যাতন অন্যান্য অনেক জায়গার তুলনায় যথেষ্ট বেপরোয়া ছিলো। সাধারণ গ্রামবাসী কৃষকরা পুলিশের ক্রমবর্ধমান নির্যাতন, ঘুষ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আদালতে বা উর্ধতন কর্মচারীদের কাছে নালিশ করার কোন চিন্তাই করতেন না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে দুই একজন সেরকম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতেন তাঁদের অবস্থা পুলিশের হাতে কি হতো সেটা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ এর নিম্নলিখিত সংবাদ-পত্র রিপোর্ট থেকে বোঝা যাবে:

কিছুদিন পূর্বে সাল্লা থানার অধিবাসী এবাদউল্লা নামক জনৈক ব্যক্তি দিরাই থানার দারোগা আবদুর রহিমের উপর এক ঘুষের মামলা আনয়ন করে। বিগত ১৯৪৯ ইংরেজী তারিখে সিনিয়র ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ারিস আলী সাহেবের এজলাসে তাহার শুনানী ছিল। মোকদ্দমা শুনানীর পর বাদী এবাদউল্লা যখন কোর্ট হইতে বাহির হইয়া আসে তখন কোর্টের সম্মুখেই অভিযুক্ত দারোগা আবদুর রহিম এবাদউল্লাকে সুনামগঞ্জ পুলিশের সাহায্যে গ্রেফতার করে এবং অত্যধিক মারপিটের ফলে অজ্ঞান করিয়া ফেলে।

জানা গেল থানায় লইয়া যাইবার পথে পুলিশ বিশেষতঃ দারোগা মনিরুদ্দীন এবাদউল্লাকে ভীষণভাবে প্রহার করে। উক্ত দারোগা এবং অন্যান্য পুলিশ হাতলের রোল দ্বারা এবাদউল্লার মাথা ও শরীরে যখম করে। দারোগা মনিরুদ্দীন তাহার বুকে অসংখ্য সবুট লাথি মারে বলিয়া প্রকাশ। এবাদউল্লা থানার সিঁড়ির উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়, তখন কয়েকজন পুলিশ অজ্ঞান এবাদউল্লাকে টানিয়া ও হেচড়াইয়া থানা লকআপে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

তখন বিকাল প্রায় ৬ ঘটিকা। জনাব ওয়ারিস আলী সাহেব তখনও কোর্টে ছিলেন। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী উক্ত অমানুষিক অত্যাচার তাঁহার গোচর করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ এবাদউল্লাকে তাঁহার সম্মুখে হাজির করিবার জন্য থানায় আদেশ দেন। বার বার তাগিদের পর অনেক গড়িমসি করিয়া পুলিশ ধরাধরি করিয়া অর্ধচেতন এবাদউল্লাকে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত করে। তখন এবাদউল্লা আবার বেহুস হইয়া যায়। সুনামগঞ্জ সরকারী হাসপাতালের এসিষ্ট্যাণ্ট ও সাব-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জনদ্বয় মুমূর্ষু এবাদউল্লাকে এজলাসেই পরীক্ষা করেন এবং প্রাথমিক সাহায্য প্রদান করেন। কিছু সময় পরে এবাদউল্লার হুস হইলে পর ভাংগা ভাংগা কথায় ও বেগরামী সুরে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তাহার উপর পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে। তাহার জবানবন্দীতে প্রকাশ, থানা লক আপে যখন তাহার হুস হয়, তখন সে পানি চাহিলে পানি তো দেওয়া হয়ই নাই, বরং তাহাকে অত্যন্ত অভদ্র ভাষায় গালাগালি শুনিতে হয়।

কোর্ট হইতে ষ্ট্রেচারযোগে অর্ধমৃত এবাদউল্লাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই ঘটনায় সুনামগঞ্জ শহর ও শহরতলীতে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।[৫৪]

কিন্তু শহর ও শহরতলীর জনগণের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি এবং সিনিয়র ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট দারোগা ও পুলিশদের কোন শাস্তি না হওয়ায় এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থাও অবলম্বিত না হওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে 'নওবেলালের' সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত মন্তব্য করা হয়:

> সুনামগঞ্জে পুলিশী উৎপীড়ন সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারীর 'নওবেলালে' প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় এবাদউল্লা নামক জনৈক ব্যক্তিকে পুলিশ যেরূপ অমানুষিকভাবে উৎপীড়ন করিয়াছে তাহা ব্রিটিশ আমলেও কদাচিৎ সংগঠিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। সুনামগঞ্জে পুলিশের এবম্প্রকার আচরণের সংবাদ আমরা আরও পাইয়াছি। পুলিশ বিভাগের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে কোনই খবর রাখেন না তাহা আমরা বলিতে চাই না কিন্তু এই প্রকার অত্যাচারমূলক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ায় আমরা বলিতে বাধ্য যে, সুনামগঞ্জে পুলিশী রাজ কায়েম হওয়ার সুযোগ সরকার করিয়া দিতেছেন।[৫৫]

পূর্ব বাঙলায় তৎকালে আইনের শাসন কতখানি কায়েম ছিলো উপরোক্ত ঘটনা থেকে তা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। এই শাসনের আর একটি দিক রাজবন্দীদেরকে বিনা বিচারে আটক রাখা এবং তাঁদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সরকারী স্বেচ্ছাচারিতা। এ প্রসঙ্গে কৃষক নেতা রমানাথ ভট্টাচার্যকে জেল হাজতে আটক রাখা সম্পর্কে সিলেট জেলা কৃষক সমিতির সভাপতি করুণাসিন্ধু রায় কর্তৃক 'নওবেলালে'র সম্পাদককে লেখা নিম্নোক্ত পত্রটি উল্লেখযোগ্য:

> আজ প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল বাহাদুরপুরের নানকার আন্দোলন উপলক্ষে ধৃত হইয়া সিলেটের প্রবীন কৃষক নেতা রমানাথ ভট্টাচার্য জেল হাজতে আটক আছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে যে সব মামলা দায়ের হইয়াছে, সেই মামলাগুলি আজ পর্যন্ত আরম্ভ করাই হয় নাই। মামলার অন্যান্য অভিযুক্ত আসামীরা জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। রমানাথ বাবুরও জামানত মঞ্জুর হইয়াছে। কিন্তু বার বার উপযুক্ত জামিনদার উপস্থিত করা সত্ত্বেও জামিন নাকচ করা হইতেছে। ১১ মাসের উপর জেল হাজতে থাকার ফলে রমানাথবাবু ভীষণ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। সামান্য জল খাইলেও তাঁহার পেটে বেদনা উপস্থিত হয়। সর্বদা পেট

ক্ষাঁপে। তাঁহার ওজন দিন দিন কমিতেছে। জামানত মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁহাকে বেআইনীভাবে জেলে আটক রাখা হইতেছে তাহার কারণ সরকার জানাইবেন কি?

রমানাথবাবু গত ১৯২১ সাল হইতে স্বাধীনতার লড়াইয়ে সর্বক্ষণ কর্মী হিসাবে বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। তাঁহার এই কারাভোগকালে তিনি যদি মৃত্যুমুখেও পতিত হন তাহা হইলেও তিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করিবেন না ইহা আমরা জানি।

কিন্তু অত্যাচারীদের ষড়যন্ত্রের ফলে আটক রমানাথবাবুর জীবন রক্ষার দায়িত্ব কি আমাদের নয়? এইজন্য উদ্যোগী হইতে জেলার এম. এল. এ.গণ ও বিভিন্ন গণপ্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানাইতেছি।*[৫৬]

পূর্ব বাঙলার অন্যান্য অনেক জায়গার মতোই জমিদার, পুলিশ ও জেল নির্যাতনের উপরোক্ত ঘটনাসমূহ সিলেটেও কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ছিলো না। এই বেপরোয়া নির্যাতনে ব্যাপক জনগণ জমিদার, পুলিশ ও সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং মাঝে মাঝে স্থানীয় গণবিক্ষোভ ও কতকগুলি এলাকায় কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁরা তা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করেন।

এই সময় সরকারী খাদ্য সংগ্রহ নীতিকে কার্যকর করতে গিয়ে চারিদিকে কৃষকদের ওপর লেভীর অত্যাচারও শুরু হয়। কৃষকদেরকে নিজ খরচায় সরকারী গুদামে ধান পৌঁছে দেওয়ার আদেশ, বাজার দরের থেকে লেভীকৃত ধানের অনেক নিম্নমূল্য, সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবহার এবং পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে কিছু কিছু প্রতিবাদ সভা ও সমাবেশের সংবাদ প্রকাশিত হয়।[৫৭] এইসব সভা সমাবেশ এবং আন্দোলনের ফলে জমিদার শ্রেণী ও মুসলিম লীগের নেতারাও মাঝে মাঝে সভা সমাবেশের মাধ্যমে কমিউনিষ্ট বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করে কৃষক আন্দোলনকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার চেষ্টা করে। এই ধরনের সভার বিবরণও সিলেটের স্থানীয় পত্রিকা নওবেলালে কিছু কিছু প্রকাশিত হয়।[৫৮]

সিলেট জেলার নানকার আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে আন্দোলনের বিবরণ তৎকালীন পত্রিকাগুলিতে তেমন প্রকাশিত না হলেও পুলিশ ক্যাম্প এর অবস্থান এবং পুলিশ ক্যাম্পের সহযোগিতায় জমিদারদের অত্যাচারের

---

* এই বৎসরই (১৯৪৯ সালে) সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ৫০ বৎসর বয়সে নিজ গ্রাম বেহেলীতে করুণাসিন্ধু রায়ের মৃত্যু ঘটে (নওবেলাল ৮।৯।৪৯)।

কিছু কিছু বিবরণ সেগুলিতে প্রকাশিত হয়। এই বিবরণ থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে। 'জনৈক নানকার প্রজা' এই নামে ২০শে চৈত্র, ১৩৫৫ (৩রা এপ্রিল, ১৯৪৯) তারিখে লিখিত এই ধরনের একটি চিঠিতে লাউতা বাহাদুরপুর অঞ্চলে ১৯৪৯-এর এপ্রিল মাসের অবস্থার একটা উল্লেখযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায়:

> গত ৯ই মার্চ রেলওয়ে ষ্ট্রাইক হওয়ার সম্ভাবনায় তাহার ২।৩ দিন পূর্বে নানকার আন্দোলনের কেন্দ্র লাউতা বাহাদুরপুর হইতে পুলিশ পার্টি তুলিয়া নেওয়া হয়। এই পার্টি তোলার পরদিন হইতেই বাহাদুরপুরের জমিদারেরা আবার পার্টি ফিরাইয়া আনিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। পার্টি উঠার পরদিনই জমিদারদের নেতা মইদ মিঞা সাহেব (আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী এম. এল. এ.-ব.উ.) ঢাকায় উজির সভার নিকট দরবার করিতে ছুটিয়াছেন। অন্যদিকে পার্টি বসাইবার পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য তাহারা পার্টির অভাবে নিজেদের জান-মাল, জমি-জমা সবই গেল বলিয়া মিথ্যা আর্তনাদ শুরু করিয়াছেন। নিজেরা স্বইচ্ছায় মামলার তারিখে কোর্টে হাজির না হইয়া কোর্টেও সরকারের নিকট মিথ্যা টেলী পাঠাইতেছেন যে তাঁহারা নানকার প্রজাদের অত্যাচারে বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারিতেছেন না। প্রজার জোতের জমি ছিনাইয়া আনার উদ্দেশ্যে লাঠিঝাটাসহ সংঘবদ্ধভাবে প্রজার জমিতে নিজেরা হামলা করিয়া সরকারের নিকট টেলী পাঠাইতেছেন যে, প্রজারা জোর করিয়া তাহাদের জমি চাষ করিয়া নিতেছে এবং এই সব মিথ্যা ঘটনায় জড়াইয়া জামিনে মুক্ত কিষাণ কর্ম্মী ডাঃ শিশির চক্রবর্তী ও শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্যের জামিন নাকচের এবং অন্যান্য কর্মীদের জেলে পুরিবার হীন প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন।
>
> অথচ পুলিশ ক্যাম্প উঠিয়া যাওয়ার পরও জমিদারেরা লাউতা বাহাদুরপুরের কুটু, ভ্রমর, নবীন, জনৈক মুচি, সানেশ্বরের জনৈক কৃষক প্রভৃতির জমি জোরে ছিনাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। কালাই বিবির ঘর ভাঙ্গিয়া তাহার বাড়ীতে অন্য লোক দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। গোলাবকে নিজ বাড়ীতে ডাকাইয়া নিয়া সোয়াব মিয়া নিজে তাহাকে মারিয়া মাথা ফাটাইয়াছেন। থানা হইতে পুলিশ আনিয়া অনবরতঃ নানকার প্রজাদের অনর্থক ধরাইয়া মারপিট ও ঘুষ আদায় করিয়া সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন।

নানকার আন্দোলনের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ ২॥০ বৎসরের মধ্যে আমাদের উপর হইতে জমিদারী জুলুম ও পুলিশ জুলুম কখনই বন্ধ হয় নাই—সে পুলিশ পার্টি থাকুক আর নাই থাকুক। তথাকথিত আপোষ রফায় পুলিশ পার্টি উঠাইয়া নেওয়ার সর্ত্ত অন্যতম প্রধান সর্ত্ত হিসাবে থাকা সত্বেও সরকার বাহাদুরপুর হইতে পুলিশ পার্টি উঠাইয়া নেন নাই। যদিও অন্য প্রয়োজনে সাময়িকভাবে পুলিশ পার্টি উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পুলিশ জুলুম বন্ধ হয় নাই। আবার পুলিশ পার্টি বসাইবার তোড়জোড় চলিয়াছে। আরঁও নূতন নূতন গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করিয়া বেপরোয়া গ্রেফতার ও মারপিট চালাইবার চেষ্টা চলিয়াছে। যাঁহারা জামিনে মুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকেও আবার জেলে পুরিবার ষড়যন্ত্র চলিয়াছে।[৫১]

'জনৈক নানকার প্রজা'র নামে এই পত্রটি প্রকাশিত হলেও তা যে কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকেই প্রচারিত হয়েছিলো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ সে সময়ে লাউতা-বাহাদুরপুর অঞ্চলে নানকার প্রজাদের পক্ষে এবং মুসলিম লীগ সরকার, পুলিশ ও জমিদারদের বিপক্ষে এই ধরনের বক্তব্য পেশ করার মতো অন্য কোন সংগঠন ও শক্তি সেখানে ছিলো না। এবং যে ধরনের ব্যক্তিরা উপরোক্ত বক্তব্য প্রচার করার উপযুক্ত ছিলেন তাঁরা সকলেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য অথবা তার সাথে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট।

ওপরে উদ্ধৃত পত্রটির বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, উল্লিখিত অঞ্চলে নানকার আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠার ফলে নানকাররা আর পূর্বের মতো জমিদার-মিরেশদারদের ভূমি দাস হিসেবে নিজেদের শ্রমশক্তি ও ইজ্জত দান করতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং নানকার প্রথার শত সহস্র বেড়াজাল ছিন্ন করে সচেতনভাবে তাঁরা এই নির্যাতনমূলক প্রথাকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামকে উত্তরোত্তরভাবে শক্তিশালী করে চলেছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে সরকারের সহায়তায় জমিদাররাও নিজেদের শোষণ ও নির্যাতন ব্যবস্থাকে যথাসাধ্য টিকিয়ে রাখার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলো এবং পুলিশের সহায়তায় আন্দোলনকে ধ্বংস করার সর্বপ্রকার চক্রান্তে লিপ্ত ছিলো।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে এই পত্রটি প্রকাশিত হওয়ার অল্পকাল পরই লাউতা-বাহাদুরপুর অঞ্চলে আবার পুলিশ ক্যাম্প বসানো

হয় ও নানকার প্রজা এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে পুলিশের সহায়তায় জমিদার মিরেশদারদের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় ১৯৪৯ সালের অগাষ্ট মাসে সানেশ্বরে নানকার এবং অন্যান্য কৃষকদের সাথে পুলিশের এক বিরাট সংঘর্ষ বাধে এবং সংঘর্ষের পরবর্ত্তী পর্যায়ে সানেশ্বর সহ সমগ্র পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়।

১৮ই অগাষ্ট সানেশ্বরের সংঘর্ষটি ঘটার পূর্বে লাউতা-বাহাদুরপুর-সানেশ্বর অঞ্চলে কৃষকরা শান্তিতে এক রাত্রিও যাপন করতে পারছিলেন না কারণ প্রতিদিনই পুলিশ ক্যাম্প থেকে পুলিশেরা গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করে অবাধ লুঠতরাজ, তল্লাশী, মারপিট এবং ঘরের আসবাবপত্র নষ্ট করছিলো। পুরুষ কৃষকদের পক্ষে বাড়ীতে থাকাই সে সময় অসম্ভব হয়ে পড়ায় তাঁরা পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার ঝোপে জঙ্গলে রাত্রি যাপন করছিলেন। সেই সুযোগে মহিলা ও শিশুদের ওপরও পুলিশের নির্যাতন শুরু হলে মেয়েদের ইজ্জত রক্ষাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। পুলিশী নির্যাতন এই চরম পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর তা গ্রামের সাধারণ লোকের সহ্যের সীমা অতিক্রম করলো। তাঁরা স্থির করলেন গ্রামে আর পুলিশ কিছুতেই প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না, যেমন করে হোক পুলিশকে এর পর প্রতিরোধ করতেই হবে।[৬০]

সানেশ্বরের সংঘর্ষের পর ঘটনা সম্পর্কে ১লা সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতি দান করতে গিয়ে উত্তর সিলেট জেলা লীগের সহ-সভাপতি আরজদ আলী ১৮ই অগাষ্টের পূর্বাবস্থা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেন:

> "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব হইতে বড়লিখা এলাকাস্থ দাসের বাজার প্রভৃতি গ্রামে কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্যকলাপ দৃষ্টিগোচর হয়। সম্প্রতি তাহাদের আন্দোলন সানেশ্বর, নিহারী, উলূরী ইত্যাদি ৬।৭টি গ্রামে খুব জোরে শোরে চলিতে থাকে। এই গ্রামসমূহের বাসিন্দা শুধু দাস, নমশূদ্র গোত্রের লোক। গ্রামগুলো বড়লিখা বিয়ানীবাজার থানা হইতে ৭।৮ মাইল দূরে অবস্থিত। কোন রাস্তা ঘাটের সুবিধা নাই এবং ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। গ্রামগুলা এক সম্প্রদায় এবং এক মতবাদের লোক অধ্যুষিত হওয়ার কারণেই তাহাদের আন্দোলন এত প্রকটরূপে দেখা দেয়। খবর পাওয়া যাইতে থাকে তাহারা গ্রামে সভা সমিতি করিয়া লাল ঝাণ্ডা উড়াইয়া রাষ্ট্র বিরোধী বক্তৃতা দ্বারা লোকদিগকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে

এবং পলাতক লীডার সুরত পাল ও তকন মুল্লা প্রভৃতি এই গ্রামসমূহে থাকিয়া লোকগুলাকে চালিত করিতেছে। স্বাধীনতা দিবসে তাহারা লাল ঝাণ্ডা উড়াইয়া এইরূপ বক্তৃতা দিতেছে এই অবস্থা দেখিয়া মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে এক উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। বিয়ানী বাজারের পুলিশ সরজমিনে গিয়া গ্রামে নিরাপদে ঢুকিবারও সুযোগ আর থাকে না। পুলিশও ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলে আমাদের ও জনসাধারণের মনে দারুন ভাবনার সৃষ্টি হয়। অবশ্য আইনের মর্যাদার খাতিরে জনসাধারণ এই কার্যের বিরুদ্ধে কোনরূপ একশন নিতে বিরত থাকে।[৬১]

স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতার এই বিবৃতিতে বাহাদুরপুর-সানেশ্বর অঞ্চলে অবাধ পুলিশী ও জমিদারী নির্যাতনের কোন উল্লেখই নেই। উপরন্তু সেই অঞ্চলের স্থানীয় অমুসলমান কৃষকরা যে রাষ্ট্রদ্রোহী তা প্রমাণের যথেষ্ট ব্যগ্রতা আছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও বিবৃতিটিতে একটি বিষয়ের স্বীকৃতি খুব পরিষ্কার এবং তা হলো এই যে, তৎকালে সানেশ্বর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় কৃষক আন্দোলন যথেষ্ট জোরদার এবং সংগঠিত ছিলো। এবং কৃষক নির্যাতন ব্যতীত কোন এলাকাতেই যে কৃষক আন্দোলন জোরদার, সংগঠিত ও শক্তিশালী হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য।

অগাষ্ট মাসের দিকে কৃষকরা যখন পুলিশ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে সংগঠিত করতে সংকল্পবদ্ধ হলেন ঠিক সেই সময়ে ১২ই অগাষ্ট বিকালের দিকে একটি লঞ্চে পুলিশী লোকেরা গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছিলো। তাদেরকে এইভাবে এগিয়ে আসতে দেখে গ্রামের কিছু সংখ্যক লোক দলবদ্ধভাবে তাদেরকে তাড়া করেন। এর ফলে তারা আর গ্রামে প্রবেশ করার সাহস না পেয়ে ফিরে যায় এবং সিলেটের জেলা কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে রিপোর্ট দিয়ে বলে যে, সানেশ্বর একটি বিদ্রোহী এলাকায় পরিণত হয়েছে। সশস্ত্র বিদ্রোহী বাহিনী তাদেরকে আক্রমণ করায় তারা আর সেই গ্রামে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় নাই।[৬২]

১৮ই অগাষ্টের সংঘর্ষের অব্যবহিত পূর্বে সরকারী প্রশাসন, পুলিশ ও স্থানীয় মুসলিম লীগের তৎপরতা এবং ১৮ই অগাষ্ট তারিখের ঘটনা সম্পর্কে আরজাদ আলীর উপরোক্ত বিবৃতিতে বলা হয়:

গত ১৬ই তারিখে সিলেট হইতে সশস্ত্র পুলিশসহ ডি, এস, পি, ও ম্যাজিষ্ট্রেট খান সাহেব আবদুল লতিফ সাহেব ঘটনার স্থানে যাইতে-

ছেন সংবাদ পাইয়া বিয়ানীবাজারের লীগ কর্মীগণসহ তথায় যাইতে রওয়ানা হই। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জনসাধারণ ও আনসার বাহিনীও রওয়ানা হইয়া বাহাদুর ক্যাম্পে গিয়া উপস্থিত হই। তথা হইতে রওয়ানা হইয়া সানেশ্বর বাজারে পৌঁছিয়া দেখিতে পাই বাজারের সামান্য পশ্চিমের মাঠে কতেক লোক লাঠি হাতে জমা অবস্থায় আছে। দেখিতে দেখিতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে লোক লাঠি হাতে আসিতে থাকে এবং সামান্য সময়ের মধ্যে বড় এক জনতা সারিবদ্ধভাবে খাড়া হইতে থাকে এবং অনেক লোক নদীর অপর পাড়ে জমা হইতে দেখা যায়। তাদের এই অবস্থা দেখিয়া আমাদের লোক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ দেখা দেয়। যাহা হউক এই অবস্থায় আমাদের লোকেরা ধীর স্থিরভাবে বাজারে খাড়া হইয়া অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে থাকে। তৎপর পুলিশ বাহিনী রাইফেল হাতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। বিদ্রোহী লাইন হইতে ঘন ঘন "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" "পাকিস্তান ধ্বংস হউক" প্রভৃতি ধ্বনি শোনা যাইতে থাকে। পুলিশ বাহিনী তাহাদের মোকাবেলা হইয়া সামান্য তফাত থাকিতে ডি. এস. পি. সাহেব বিদ্রোহীদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলেন। পরে জানিতে পারিলাম ডি. এস. পি. সাহেব তাহাদিগকে হাতের লাঠি ইত্যাদি ফেলিয়া আত্মসমর্পণ করাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহারা প্রত্যুত্তরে পুলিশকে রাইফেল ফেলিয়া দিবার দাবী করে। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া যায়। তৎপর পুলিশ গুলি ছুড়ে। তখন বিদ্রোহীরা আরও অগ্রসর হইতে থাকে। তখন পুলিশের ছোট একদল হইতে গুলি ছোড়া হয়। ইহার পর জনতা পলাইতে আরম্ভ করে।"৬৬

ঘটনার সময় কোন পুরুষ নেতা সানেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন না। নেতৃস্থানীয় যে মহিলারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সুষমা দে অন্যতমা। একটি লিখিত বিবরণীতে তিনি নিম্নলিখিতভাবে ১৮ই তারিখে সানেশ্বরের ঘটনার বর্ণনা দান করেন:

তারপর ১৭ই অগাষ্ট ১৯৪৯ ইং। ঘরে ঘরে মনসাদেবীর পূজা হইতেছে। শুনা গেল লাউতার জমিদার বাড়ীতে সিলেটের **D. C., S. P.** এবং **D. S. P.** বহু সংখ্যক **armed Police** নিয়া জমায়েত হইয়াছেন এই গ্রামগুলিকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে। সবাই চিন্তিত। ঐ

দিন রাত্রেই আশে পাশের সমস্ত গ্রামের লোকেরা একত্র জড় হইল। তাহাদের এক কথা। তাহারা আর গ্রামে সিপাহী ঢুকিতে দিবে না। এই বিরাট বাহিনী গ্রামে ঢুকিলে গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। চোখের সামনে নীরব দর্শক হইয়া আর তাহারা এই বীভৎস অত্যাচার দেখিতে পারিবে না। তাই তাহারা ঠিক করিল পরদিন ভোরে মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে সবাই একটি নির্দিষ্ট ধান ক্ষেতকে ঘেরাও করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে যাহাতে গ্রামে আর সিপাহী ঢুকিতে না পারে। তাহাদিগকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বুঝানো গেল সশস্ত্র বাহিনীর সম্মুখে শুধু হাতে যাওয়ার অর্থ অনিবার্য মৃত্যু। তাহাদের এক কথা, "আমাদের ঘরে বসিয়াও মৃত্যু। তাই আজ সামনাসামনি দুই একটা কথা বলিয়া না হয় মরিব। চোখের সামনে ত আর এই বীভৎস অত্যাচার দেখিব না।" চরিত্র নামক একজন কৃষকের কথা আজও কানে ভাসে। ও বলিয়াছিল, "কাল ভোরে আমরা মরিতে যাইব।" কৃষকদেরে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিল, "তোমরা কি ভয় পাও? তোমরা কি আমাদের সঙ্গে যাইবে না?"

ঐ দিন গ্রামে কোন পুরুষ কৃষক নেতা ছিলেন না। কমরেড অর্পণা পাল, অমিতা পাল ও সুষমা দে উপস্থিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কৃষকরা বলিতে লাগিল, "আপনারা ভয় পাইতে পারেন, আমরা মরিতে ভয় পাই না। তাহাদের এই মরণপণ দৃঢ়তার কাছে সমস্ত যুক্তি হার মানিল। পরদিন অন্ধকার থাকিতেই আশে পাশের সমস্ত গ্রাম হইতে হাজার হাজার লোক বাহির হইয়া আসিল। একদিকে ছিল নদী, নদীর অপর পারেও বহুলোকের জমায়েৎ। নির্দিষ্ট পথে স্বয়ং D.C., S.P এবং D.S.P. তাহাদের সশস্ত্র বাহিনী নিয়া জনতা হইতে ৭০।৮০ গজ দূরবর্ত্তী স্থানে সমস্ত সিপাহী দিগকে লাইন করাইয়া দাঁড় করাইয়া জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন কেন তাহারা এখানে জমায়েৎ হইয়াছে? তখন জনতা হইতে উত্তর আসে যে, গ্রামে সিপাহী ঢুকিলে গ্রাম তাহারা একেবারে ধ্বংস করিয়া দেয়। তাই তাহারা স্বয়ং জেলাধিকর্ত্তার নিকট তাহাদের বক্তব্য পেশ করিতে চায়। পুলিশ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত ঘর দরজা শুধু স্বয়ং D.C., S.P. এবং D.S.P. আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন; কিন্তু সিপাহী ঢুকিতে দেওয়া যাইবে না। এইরূপ আলোচনা চলাকালে সরকার

পক্ষ হইতে বলা হয়, "তোমরা কি পাকিস্তান চাও না? যদি চাও তবে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি উঠাও।" তখন জনতা হইতে উত্তর আসে আমরা পাকিস্তান চাই। এবং আওয়াজ উঠে, "গরীবের পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"

এই আওয়াজ শোনার পর D.C. জনতাকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। ১৪৪ ধারা জারী করিয়া এবং মুহূর্তে বিলম্ব না করিয়া গুলীবর্ষণের আদেশ দেন। D.C.-র Order এর সংগে সংগেই অর্পণা পাল সিপাহীদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, "তোমরা আজ সিপাহী, কিন্তু তোমাদের রক্ত কৃষকের। তোমরা আজ কাহার উপর গুলী করিতেছ।" কিছু সংখ্যক সিপাহীর মনে দাগ কাটিলেও কার্যতঃ গুলীবর্ষণ চলিতে লাগিল। সংগে সংগে আমাদের তরফ হইতে মাটিতে শুইয়া পড়িতে বলায় অনেকে বাঁচিয়া পলায়ন করিতে পারিল। কিন্তু প্রথম গুলীর আঘাতে শহীদ হন সেই চরিত্র দাস। ৪।৫ জন নিহত হন। এক-জনের নাম কুটুমনি। ১৮।১৯ বৎসরের ছেলে অমূল্য। তার আঘাত লাগে সামান্যই। কিন্তু এই নরপিশাচরা পৈশাচিকভাবে হত্যা করিয়াছে।

গুলী করার পরই সিপাহীরা মাঠে ছড়াইয়া পড়ে। সে কি বীভৎস তাণ্ডব নৃত্য। যাহাকেই ধরিয়াছে তাহাকেই অত্যাচার করিয়াছে প্রচুর। কয়েকজন মহিলা কৃষকসহ অর্পণা পাল, অসিতা পাল ও সুষমা দে এদেরে চুলের মুঠি ধরিয়া লাথি মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। বুট জুতার আঘাতে এদের প্রত্যেকের শরীরের রক্ত জমিয়া নীলাভ হইয়া যায়। অর্পণা পাল অন্তঃস্বত্বা ছিলেন। সংগে সংগে গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। যাহাদেরে ধরিল সবাইকে নৌকায় করিয়া জমিদার বাড়ীতে আনা হইল। নৌকায় উঠানো এবং নামানো সে আরো এক বিসদৃশ্য ব্যাপার। আহত অবস্থায় যাহাদের চলাফেরার ক্ষমতা নাই তাহাদিগকে টানিয়া ছেচড়াইয়া নামানো ও উঠানো হইল। তাহাতে শরীরের ছাল চামড়া উঠিয়া যে অবস্থা হইল তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। জমিদার ঘাটে নৌকা লাগিল। সেখানে হাজার গুণ্ডার সমাবেশ। তাহাদের অশ্লীল শ্লোগান। এবং মেয়েদের তাহারা টানিয়া নিতে প্রস্তুত। এই mob সরানোর ক্ষমতা সেইদিন এই সরকারের নাই। এই পরিবেশে মেয়েরা নৌকা হইতে নামিতে

নারাজ হওয়ায় জনতা ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর জমিদার বাড়ীতে উঠা হইল। ধৃত ছেলেরা এবং লাশের খবর এখন জানাই।

পরের দিন লাশের নৌকায় সমস্ত ধৃত কৃষক। তাহার মধ্যে চরিত্র দাসের ৯৫ বৎসরের বাবাও আছেন। পাশাপাশি আরও একটি নৌকা চলিয়াছে তাহাতে মেয়েরা। মরার পচাগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। ঐ নৌকায়ই ১৮।১৯ বৎসরের অমূল্য। এই বীভৎস দৃশ্যে ছেলে জ্ঞানহারা। পাশের নৌকা হইতে তাহার কাতর গোঙানি শোনা যাইতেছিল। অনেক বলার পর মেয়েদের নৌকায় তাহাকে আনা হয়। সিলেট জেল গেটে আসিলে পর অমূল্যকে জেল সিপাহীরা ধাক্কা মারে নামার জন্য; কিন্তু তাহার কোন সম্বিত নাই। তারপর টানিয়া তাহাকে নামানো হয়। ঐ রাত্রেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।"*৬৪

সানেশ্বরে কৃষক-পুলিশ সংঘর্ষের পরবর্তী পর্যায়ে ধৃত মহিলা ও অন্যান্য-দের প্রতি পুলিশ ও মুসলিম লীগের লোকেরা কিরূপ আচরণ করে সুষমা দের উপরোক্ত বিবরণ থেকে তা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে মুসলিম লীগের আরজদ আলী (যিনি নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন) মিথ্যায় পরিপূর্ণ এক বিবরণ দিয়ে তাঁর বিবৃতিতে বলেন:

তখন (অর্থাৎ গুলি চালনার পর—ব.উ.) পুলিশ দল ও জনসাধারণের কতেক লোক অগ্রসর হইয়া আহতদিগকে উঠাইয়া ও পলায়মান ব্যক্তি-দের মধ্য হইতে পাঁচ জন মহিলাকে গ্রেফতার করিয়া নিয়া আসে এবং আহতদিগকে নৌকায় উঠাইয়া নিয়া আসা হয়। পুরুষ লীডারদের মধ্যে কেহ ধরা পড়ে নাই। বিদ্রোহী জনতার এক জন দৌড়িয়া গিয়া পাশের গ্রামের স্কুলে ও একদল নদীর অপর পারে জড় হইতে থাকে। ইহার পর ধৃত লোকগুলোকে নৌকায় উঠাইয়া বাহাদুরপুর ক্যাম্পে চলিয়া আসা হয়। মহিলাদের হেফাজতের প্রতি বিশেষ

---

* লাউতা বাহাদুরপুরে নানকার আন্দোলনের নেতা: বীরেশ মিশ্র, অজয় ভট্টাচার্য, বারীন দত্ত, নৈমুল্লা, তরুন মোল্লা, জীতেন ভট্টাচার্য, সুধন্যা দে, ইসাক মিঞা, দেদার বখত, নীরেন দে, ইসমাইল আলী।

পরবর্তী পর্যায়ে সানেশ্বরে নানকার আন্দোলনের নেতা: সুরত পাল, স্বদেশ পাল, যজ্ঞেশ্বর, বিজয়মরী কর, ভারত নমশূদ্র, অর্পণা পাল (স্ত্রী সুরত পাল), অমিতা পাল (বোন সুরত পাল), সুষমা দে (স্ত্রী লালা শরদিন্দু দে), প্রফুল্ল দাস, পবিত্র দাস, অমূল্য দাস, চটুই দাস, কুটুমনি দাস।৬৬

নজর দেওয়া হইয়াছিল। ধৃত মহিলাদের বাচনীক জানা যায় ইহার পর কমিউনিষ্টদের ব্যাপক আক্রমণ করার ব্যবস্থা আছে। গুলির বদলা তাহারা লইবে।[৬৫]

মুসলিম লীগের এই ধরনের পাণ্ডা ব্যক্তি ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট-কেই ভিত্তি করে ১৯৪৯ এর ১৮ই নভেম্বর পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন ব্যবস্থা পরিষদে সমগ্র ঘটনাটি সম্পর্কে এক বিকৃত ও মিথ্যায় পরিপূর্ণ বিবরণ প্রদান করেন।

১৯শে অগাষ্ট ই. পি. আর. এর সিপাইরা ধৃত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে বাহাদুরপুর ক্যাম্পে উপস্থিত হলে আরজদ আলী বিয়ানী বাজারের মুসলিম লীগ নেতাদেরকে সাথে নিয়ে সেখানে যান এবং পরবর্তী কর্ত্তব্য সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেট আব্দুল লতিফের সাথে আলোচনা করেন। এই আলোচনায় বিদ্রোহীদেরকে আত্মসমর্পনের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। লাউতার জমিদার শ্যামাপদ, আরজদ আলী প্রভৃতি ২০শে অগাষ্ট গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষকদেরকে আত্মসমর্পন করার প্রস্তাব দেন এবং তার ফলে তাঁরা শান্তভাবে আত্মসমর্পন করতে থাকেন। এই সময় আত্মসমর্পনকারীদের দুই লাইনে দাঁড় করিয়ে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে নির্দোষী বলে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং অন্যদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।[৬৬]

এ ব্যাপারে জমিদার শ্যামাপদ এবং মুসলিম লীগ নেতাদের প্রসংশা করে আরজদ আলীর বিবৃতিতে বলা হয়:

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই ব্যাপারে মুসলিম লীগ ও জনসাধারণ যে কর্ত্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহার ফল সুদূরপ্রসারী বলিয়াই মনে হয়। শ্যামাপদবাবু যেভাবে অক্লান্ত পরি-শ্রম করিয়া এই শান্তি কাজে সাহায্য করিয়াছেন তাহাও প্রশংসনীয়।[৬৭]

ঘটনাটির পর স্থানীয় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দাবী জানান হয়: (১) বড়লিখা থানায় যোগ্য ও শিক্ষিত পুলিশ অফি-সারের দরকার। কোন পুলিশ অফিসার কমিউনিষ্টদের নিকট হইতে কোন ঘুষ না লইতে পারে কিম্বা কোন গ্রাম্য টাউট এ কাজে সাহায্য করিতে না পারে তৎপ্রতি সতর্কতা ও কঠোরতা অবলম্বন করা দরকার। (২) পুলিশ ক্যাম্প বাহাদুরপুর হইতে উঠাইয়া অন্যত্র সরাইয়া নেওয়া দরকার। (৩) বিদ্রোহীদের গ্রামের এলাকায় শক্তিশালী ক্যাম্প বসানো দরকার।[৬৮]

আরজদ আলীর বিবৃতি নওবেলালে প্রকাশিত হয় ১লা সেপ্টেম্বর। কিন্তু ১৮ই অগাষ্টের পর থেকে প্রায় দশ দিন সানেশ্বর-লাউতা বাহাদুরপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে ব্যাপক, প্রচণ্ড, অবাধ ও নির্বিচার পুলিশী ও ই. পি. আর বাহিনীর নির্যাতন চলে সে বিষয়ে বিবৃতিটিতে কোন উল্লেখই নেই। তবে একটি বিষয় বিবৃতিটিতে লক্ষ্যণীয়। ১৮ই অগাষ্টের পর ২০ তারিখের মধ্যে যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় শান্তি স্থাপিত হয়েছিলো অর্থাৎ কৃষকদের পক্ষ থেকে কোন প্রতিআক্রমণ অথবা প্রতিরোধ হয় নি তার স্বীকৃতি বিবৃতিটির মধ্যে আছে। অথচ তা সত্ত্বেও ২১শে থেকে শুরু করে বিশেষতঃ ২৪শে অগাষ্ট সমগ্র অঞ্চলে জমিদার ও পুলিশের নির্যাতন সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে অবাধ ও বেপরোয়াভাবে চালানো হয়।

শুধু আরজদ আলীর বিবৃতিই নয়। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ এর নওবেলালে 'সানেশ্বরের প্রতিক্রিয়া' নামে যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় তার মধ্যেও এসব ঘটনার বিন্দুমাত্র উল্লেখ থাকে না। উপরন্তু তাতে স্থানীয় মুসলিম লীগের পক্ষে সরকারের কাছে আরজদ আলীর সুপারিশকেই সমর্থন জানিয়ে কমিউনিষ্ট ও স্থানীয় অমুসলমান কৃষকদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে গিয়ে বলা হয়:

> সানেশ্বর ঘটনার পর সাধারণ পাকিস্তানীর মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে কম্যুনিজমের নামে সিলেট পাকিস্তানভুক্তির যাহারা বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাহাদেরই একাংশ আজ পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। বিয়ানীবাজার এলাকার জনগণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ছুটিয়া যাওয়ার একমাত্র কারণ ইহাই। সমস্ত সিলেট জেলা ব্যাপী পুলিশের গুলিতে হতাহত ব্যক্তিদের প্রতি সামান্যতম সহানুভূতি না থাকার কারণও ইহাই।[৬১]

১৮ই অগাষ্টের ঘটনার পর সানেশ্বর-লাউতা বাহাদুরপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার হিন্দু মুসলমান জমিদাররা মুসলিম লীগ, পূর্ব বাঙলা সরকারের পুলিশ, আনসার বাহিনী ও ই. পি. আর বাহিনীর সহায়তায় সমগ্র অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার এক চক্রান্তমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবং সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ঐ সব এলাকায় শান্তি বিরাজ করা সত্ত্বেও তারা পরিকল্পিতভাবে গ্রামবাসীদের ওপর চড়াও হয়ে তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এই সব গ্রামের

অধিবাসীরা অধিকাংশ নমশূদ্র হওয়ায় স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার তুফান তুলে তাদেরকেও নিজেদের চক্রান্তমূলক পরিকল্পনায় সামিল করতে সে সময়ে তারা অনেকাংশে সফল হয়।

সানেশ্বরের ঘটনার ওপর পূর্ব বাঙলা পরিষদে ১৮ই নভেম্বর ১৯৪৯ তারিখে যে বিতর্কমূলক আলোচনা হয় তাতে সেই সময়কার অনেক ঘটনার তথ্য বিবরণ পাওয়া যায়।* আলোচনাকালে নরেন্দ্রনাথ দেব ১৯৪৯ এর গোড়ার দিকের একটি ঘটনার উল্লেখ করেন।[৭৩] তিনি বলেন যে, এই সময় বাহাদুরপুরে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর পর নানকার জমিদার পুলিশ সম্পর্কের এত বেশী অবনতি ঘটে এবং উত্তেজনা সে সময় এমন বৃদ্ধি পায় যে, সরকার বিবাদের মীমাংসার জন্যে একটা তদন্ত কমিটি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তার ফলে পরিস্থিতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। এই সময়ে জমিদারদের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় যে, গ্রামের ভিতর দিয়ে নৌকো করে আসার সময় প্রজাদের একটা দল কোন এক জমিদার পরিবারের জনৈক সদস্যকে অপমান করেছে। এই কাহিনী প্রচারের মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সানেশ্বরের কাছে একটি ফেরী নৌকায় জুন মাসের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় এক জন কৃষক নিহত হন।** দুই দিন পরে কিছুদূরে নদীর নিম্নপ্রবাহে তাঁর দেহ আবিষ্কৃত হয়। প্রজারা ব্যাপারটি পুলিশে রিপোর্ট করেন এবং পোষ্ট মর্টেম পরীক্ষার জন্যে দেহ সিলেট নিয়ে যান। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রজারা খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং ঘটনার যথোপযুক্ত তদন্ত দাবী করতে থাকেন। সানেশ্বর বাজারে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সভার পর সভা হতে থাকে এবং এই পর্যায়েই সামরিক বাহিনী এবং একজন ম্যাজিষ্ট্রেটসহ উচচ পদস্থ পুলিশ অফিসারদেরকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করা হয়।

১৮ তারিখে সংঘর্ষের পর সানেশ্বর, মেহারী, উলূরী, কান্তিগাঁও ও সানেশ্বর বাজারের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে পুলিশ, ই. পি. আর বাহিনী যথেচ্ছ

---

* ১৮ থেকে ২৪শে অগাষ্ট সানেশ্বর ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় পুলিশের কৃষক বিরোধী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের পর কংগ্রেসী পরিষদ সদস্য নরেন্দ্রনাথ দেব (হবিগঞ্জ দক্ষিণ), পূর্ণেন্দ্র কিশোর সেনগুপ্ত (দক্ষিণ সিলেট, পূর্ব), বলরাম সরকার (করিমগঞ্জ দক্ষিণ) ও যতীন্দ্র নাথ ভদ্র (সুনামগঞ্জ) সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করেন।

** পূর্বোদ্ধৃত 'জনৈক নানকার প্রজা'র পত্র যে সময় (২৮.৪.৪৯) নও বেলালে প্রকাশিত হয় তার অল্পকালের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটে। পত্রটিতে জমিদারদের উস্কানীমূলক তৎপরতার যে উল্লেখ করা হয়েছিলো তা এক্ষেত্রে স্মরিতব্য।

SAVE BENGALS FROM THE CLUTCHES OF RIOT-MONGERS

Both Bengals are in the grip of communal hysteria. First round of riot has already taken place. Thousands have been killed. Many more have been rendered homeless. Those who have escaped death, are flying in panic. Preparations for the second are going ahead with a feverish speed. 'Inter-Dominion war', 'Defence of the fatherland,' 'Independent territory for the minority in the other dominion, 'exchange of population'—such and other slogans are raised to prepare the ground for a second round of riot. League leaders in Pakistan say that all the atrocities are being committed in Indian Union, whereas incidents in East Bengal which were few and minor, were the 'inevitable repercussion' of the massacres of Muslims in India. Congress leaders in India say that the trouble started in Pakistan, where thousands of Hindus were butchered and what happened in West Bengal was a repercussion of the same. Both the Congress and League leaders say that they are dealing the situations with an iron hand. Both appeal to the people to remain peaceful and not to be provoked by what is happening on the other side of the border. Congress and League press follow the same line. One-sided news of the atrocities in the other dominion is published and then the people are asked to remain unprovoked.

One only wonders that if both the Congress and League Governments are bent upon keeping peace in their

পূর্ব্ব পাকিস্তানের নাগরিকগণের নিকট আবেদন

ভ্রাতৃগণ,

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে দুই শত বৎসরের গোলামীর পরে আমরা আজাদী লাভ করিয়াছি। এই আজাদী জিহাদের প্রধান সেনানী কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ মরহুম আমাদিগকে বলিয়াছেন, "আমি পাকিস্তানের ভিত্তি পত্তন করিলাম, তোমরা পাকিস্তানের নাগরিকগণ ইহার উপর ইমারত গঠন করিবে।" এই গঠন কার্য্যের জন্য অত্যাবশ্যক" দেশে শিক্ষা, শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির সমুন্নতি সাধন। ইহার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন দেশে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করা। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় পশ্চিম বঙ্গের কতিপয় স্থানে বিশেষতঃ কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক আমাদের এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ পূর্ব্ব বাঙ্গালাতেও অশান্তি দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি উৎপীড়ন যেমন আমরা ঘৃণা করি, পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি উৎপীড়নও আমরা সেইরূপই ঘৃণা করি। আমাদের মহামান্য কায়েদে আজম মরহুম, পাকিস্তানের বড় লাট মাননীয় জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন, প্রধান মন্ত্রী মাননীয় জনাব লিয়াকত আলী খান, পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় জনাব নূরুল আমিন, পূর্ব্ব পাকিস্তানের জমিয়তে উলামায়ে ইস্‌লামের সভাপতি মৌলানা আতহার আলী প্রভৃতি গণ্যমান্য মহোদয়গণ অন্য রাষ্ট্রের মুসলমানগণের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ আমাদের রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু নিঃসহায় শান্ত জনগণের উপর লওয়ার প্রবৃত্তিকে এক বাক্যে নিন্দা করিয়াছেন। আমরা আমাদের মুসলমান ভাইগণকে সবিনয়ে দৃঢ়ভাবে বলিব যে এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা পরোক্ষভাবে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহারা ভারতের ৪ চারি কোটী মুসলমানের ধনপ্রাণ বিপন্ন করিয়া তুলিতেছেন এবং পাকিস্তানের অশেষ ক্ষতি সাধন করিতেছেন। এ প্রকার কার্য্যের ফলে আকস্মিক লোক বিনিময়ে রাষ্ট্রের উপর এমন চাপ পড়িবে যে তার ফলে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবে। উচ্ছৃঙ্খল কার্য্য কলাপের ফলে শিল্প, বাণিজ্য, এবং স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটী প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হইয়া উভয় রাষ্ট্রই অচল হইয়া পড়িবে যার ফলে আমাদের এই সাধের আজাদী বিপন্ন হইবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ধর্ম্ম বিশ্বাসী মুমিনগণকে বলিতেছেন, "ওহে ধর্ম্ম বিশ্বাসী মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহের কথা মান, রসূলের, এবং তোমাদের মধ্যে আজ্ঞাদাতা নেতাদের কথা মান।" (কুরআন্ সূরাঃ নিসা, 'রুকু' ৮)। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, "যে ব্যক্তি হত্যাকারি কিংবা পৃথিবীতে উৎপাতকারি ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণকে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মনুষ্য জাতিকে হত্যা করে," (কুরআন, সূরাঃ মাইদাঃ, রুকু ৫)। হজরত রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "উৎপীড়িত (মজলুম) যদিও বিধর্ম্মী হয়, তাহার আর্ত্তনাদ হইতে সাবধান হও।" তিনি আরও বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি কোন জিম্মীকে (মুসলমান রাজ্যের অমুসলমানকে) কষ্ট দেয়, সে নিশ্চয়ই আমাকে কষ্ট দেয়।"

পাকিস্তানের প্রত্যেক মুসলমানের মনে রাখা উচিৎ যে কলিকাতা বা হিন্দুস্থানের কোন অংশে হিন্দুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কোন অন্যায়ের জন্য এ দেশের হিন্দুদের কিছুতেই দায়ী করা চলে না। মুসলমানদের ন্যায় তারাও স্বাধীন পাকিস্তানের নাগরিক এবং পাকিস্তান সরকার যখন তাহাদের নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তখন জান মালের নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের ন্যায় তাহাদেরও রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণ দাবী আছে। এ-কথা প্রত্যেক মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিৎ যে পাকিস্তানের হিন্দুরা হিন্দুস্থানের মুসলমানদের বিনিময়ে জামানত হিসাবে বাস করিতেছে না। তাহারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকারের বলেই বাস করিতেছে। অতএব একজন মুসলমানের যে তারই মত একজন পাকিস্তানের স্বাধীন নাগরিক এমন একজন হিন্দুর উপর কোন অবস্থাতেই অন্যায় উৎপীড়ন করার অধিকার নাই। প্রত্যেক শিক্ষিত ও বিবেচক মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিৎ যে পশ্চিম বঙ্গের দাঙ্গার প্রতিবাদে এখানে নিরাপরাধ হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহাতে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের কোনই উপকার হইবে না। বরং বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশে এখনও যে সব কোটী কোটী মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে সুখে শান্তিতে বাস করিতেছে তাহাদের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িবে। দেশে শান্তি রক্ষার দ্বারা পাকিস্তানের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার দ্বারাই একমাত্র হিন্দুস্থানের মুসলমানদের আপনারা সত্যিকার উপকার করিতে পারেন।

হিন্দু ভাইগণকে আমরা বলিব, আপনারা "জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী," সেই জন্মভূমিকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সহসা পরিত্যাগ করিবেন না। আপনারা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণে হিন্দু মুসলমানের মিলনমন্ত্র গ্রহণ করিয়া কম্ম বা·

ক্রোধকে দমন করুন এবং সাহস সহকারে বিপদ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করুন। আপনারা নিশ্চয় জানিবেন রাষ্ট্রের সর্ববিধ সাহায্য ও সহানুভূতি সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল সময়ে আপনারা পাইবেন। পাকিস্তানের দৃঢ় অথচ সহৃদয় সরকার সর্বদা আপনাদিগকে সাহায্য ও রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে এবং রাষ্ট্রের সমস্ত হিতকামী নাগরিক ও ধর্মনিষ্ঠ মুমিন মুসলমান আপনাদের সহিত আছেন। ইহার প্রমাণ আপনারা বর্তমানে পাইয়াছেন এবং আশা করি ভবিষ্যতে ও পাইবেন। আপনারা লক্ষ্য রাখিবেন, আপনাদের মধ্য হইতে আত্মীয় স্বজন ফেলিয়া যাহারা পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম প্রভৃতি ভারতীয় রাজ্যে চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহারা যেন সেখানে যাইয়া অতিরঞ্জিত কোন কথা না বলেন বা উত্তেজনামূলক কোন গুজব না রটান, অথবা এখান হইতে কেহ কোন মিথ্যা সংবাদ সংবাদ পত্রে কিংবা চিঠিপত্রের মারফতে কাহারও নিকট না পাঠান। কারণ তাহাতে সেখানে উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে এখানেও হইতে পারে এবং তার ফলে উভয় রাজ্যেই অশেষ অঘটন ঘটিতে পারে। যদি কেহ তাহা করেন, তবে নিজের আত্মীয় গোষ্ঠীরই অনিষ্ট করিবেন। সকলের মঙ্গলের জন্য শান্তির পথই একমাত্র পথ।

আমরা আমাদের হিন্দু মুসলমান ভাইগণকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতে চাই যে, অতীতে পরস্পরের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ প্রচার ও ঘৃণা প্রদর্শনের ফলে আমরা বহু কষ্ট পাইয়াছি, বর্তমানেও পাইতেছি,—অনেক হইয়াছে, আর নয়। আমরা স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীনতার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। সুতরাং এ বিষয়ে সকলকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, কেহ যেন দায়ীত্বহীন সংবাদ পত্রের প্রচারণায় কিংবা লোকের গুজব কথায় বিশ্বাস করিয়া আতঙ্কগ্রস্ত বা উত্তেজিত না হন। সকল সময়ে আপনারা আমাদের সরকারের অনুমোদিত সংবাদের উপর নির্ভর করিবেন এবং আমাদের নেতাদিগের নির্দেশের অনুসরণ করিবেন।

আমরা পুনরায় আমাদের দেশবাসী ভাইগণের নিকট আমাদের সবিনয় আরজ জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন সকলেই এখন হইতে নিজদিগকে পাকিস্তানী বলিয়া বিবেচনা করেন এবং পরিচয় দেন এবং ইংরেজের বিভেদাত্মক ভাবের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকেন। আমরা আরও জানাইতেছি যে অন্য রাষ্ট্রে যাহাই ঘটুক না কেন আমরা পাকিস্তানে অখণ্ড শান্তি বিরাজমান দেখিতে চাই যাহাতে আমাদের প্রিয় পাকিস্তান সর্বপ্রকারে পৃথিবীর একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রেসিডেন্ট)
ডাঃ এস, এন, রায় ,,
হামিদুল হক চৌধুরী এম, এল, এ
আলি আহমদ খান ,, (সম্পাদক)
বসন্ত কুমার দাস ,,
ফরিদ আহমদ চৌধুরী ,,
আনোয়ারা খাতুন ,,
আবদুল খালেক ,,
খয়রাত হোসেন ,,
আবদুল হাকিম ,,
সামছুদ্দিন আহমদ চৌধুরী ,,
(প্রিন্সিপাল) এব্রাহিম খান সদস্য পাক গণপরিষদ
ভবেশচন্দ্র নন্দী ,, ,, ,,
(প্রচার সম্পাদক)
আতাউর রহমান এডভোকেট
মুঃ নূরুল হুদা ,,
কফিল উদ্দিন চৌধুরী ,,
আলী আমজাদ খান ,,
(খান বাহাদুর) আওলাদ খান – কোষাধ্যক্ষ
(রায় বাহাদুর) আর, পি, সাহা – কোষাধ্যক্ষ

সূর্য্যকুমার বসু (ঢাকেশ্বরী কটন মিল)
মীর্জা আবদুল কাদের
আলমাছ আলী
এম, এ, আউয়াল (প্রচার সম্পাদক)
এম, এ, ওয়াহেদ
(সহ সম্পাদক)
কে, জি, মহবুব
তফাজ্জল হোসেন (অফিস সম্পাদক)
খালেক নেওয়াজ খান (ই, পি এম, এস, এফ)
এম, এ আজিজ
আজিজুল হাকিম
ঊষা রায় (আনন্দ বাজার)
আবদুল ওহাব (ষ্টেটসম্যান)
এস, কে, চ্যাটার্জ্জি (অমৃত বাজার)
এন, সি, সাহা
পি, কে, ব্যানার্জ্জি
জাফর করিম
ক্ষেত্র মোহন বণিক
খান বাহাদুর মাওলানা ... (partially illegible)
সামছুল হক

পূর্ব্ববঙ্গ শান্তি ও পুনর্বসতি কমিটির পক্ষে।

পাইওনিয়ার প্রেস, ঢাকা

রাজসাহী কলেজে দলাদলি

গত এক বছর ধরিয়া রাজসাহী কলেজের গুটিকয়েক ছাত্র যে দলাদলি সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে তাহা আমরা, সাধারণ ছাত্ররা,-গভীর দুঃখের ও উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।

পাকিস্থানের উজিরে আজম জনাব লিয়াকৎ আলী খানের সহিত তাঁহার রাজসাহী পরিদর্শন কালে ৮ জন ছাত্রদের একটি ডেপুটেশন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে। কতিপয় ছাত্র এই ডেপুটেশনে স্থান না পাইয়া ইহার প্রতিবাদে ২৪ শে নভেম্বর সভা আহ্বান করিতে ও মিছিল বাহির করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করে। ইহার ফলে ভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্রদের সহিত সংঘর্ষ বাঁধিবার উপক্রম হয়। পরিস্থিতি ঘোরালো হইয়া পড়ে। কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। ডেপুটেশনে যাওয়ার অতি তুচ্ছ ব্যপার লইয়া যে জঘন্য মারামারি ও দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে আমরা ইহার তীব্র নিন্দা করি। আরো ক্ষোভের ব্যপার হইতেছে যে এক শ্রেণীর প্রচারণা বিশেষতঃ হিন্দুস্থান হইতে আগত সংবাদ পত্র এই তুচ্ছ দলাদলির ঘটনাটীকে বিভিন্ন রংএ ও রূপে ফাঁপাইয়া তুলিয়াছে। অবশ্য তাহাদের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়।

এ ব্যপারে ছাত্র ফেডারেশনের (কম্যুনিষ্ট পন্থী) সভাপতি ও সম্পাদক ৩।১।৪৯ তারিখে "ইত্তেহাদের" মারফতে প্রদেশ ব্যপী "দমননীতি বিরোধী দিবস" পালনের জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানাইয়াছে। ইহা শঙ্কার কথা যেহেতু তাহাদের উদ্দেশ্য ও আমরা জানি। অত্যন্ত লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হয় কতিপয় মুস্‌লিম ছাত্র অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করিয়া দায়িত্বহীনের মত উক্ত কম্যুনিষ্ট পন্থীগণের সহযোগিতায় 'দমননীতি বিরোধী দিবস' আহ্বান করিয়াছে।

আমরা বুঝিতে পারিলাম না ইহা কার বিরুদ্ধে 'দমননীতি বিরোধী দিবস' এবং কিসের জন্য দমননীতি বিরোধী দিবস। রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপের জন্য জেলখানায় যাহারা আশ্রয় লাভ করিয়াছে— তাহাদেরকে ও এই সুযোগে জেলখানা হইতে উদ্ধার করিয়া এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার জন্য ছাত্র-ফেডারেশন ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে।

এই তথাকথিত দমনীতি বিরোধী দিবস অন্য কোথায় সফলতা লাভ করিবে কিনা আমরা জানি না তবে আমরা চ্যালেঞ্জ দিয়া বলিতেছি: রাজসাহীতে ইহা কখনই সফল হইবে না। কারণ শিক্ষায়তনের মধ্যে পূর্ণশান্তি ও পবিত্রতার আবহাওয়া কখনই বিনষ্ট হইতে আমরা দিতে পারি না। তা ছাড়া প্রকৃত ঘটনার সম্পর্কে আমাদের বাস্তব সচেতনতা রহিয়াছে।

আমরা শান্তিপ্রিয় সাধারণ ছাত্র। শান্তিপূর্ণভাবে আমরা এই বিশ্রী ব্যপারের অবসান চাই। যাহারা দলাদলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করিবার জন্য অনর্থক হৈ চৈ করিতেছে তাহাদের প্রতি আমাদের কোনই সমর্থন নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র-বন্ধুগণ অন্ধ মোটেই নহেন এবং তাহারা পর্য্যপ্ত পরিমানে বিবেকসম্পন্ন এবং এই ব্যপারে মুক্ত দৃষ্টি ভংগী লইয়া প্রকৃত ঘটনাটীকে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। কর্তৃপক্ষের অন্যায় অবিচার আমরা কখনই বরদাস্ত করি নাই এবং করিতে রাজীও নই অপর পক্ষে দোষীর সাজা আমরা সবাই চাই।

আজাদ পাকিস্তান-জিন্দাবাদ

মুছলিম ছাত্র-সংহতি-জিন্দাবাদ

ভ্রান্ত প্রচারণা হইতে-দূরে থাকুন।

আরজ গোজার

মোঃ মোতাহার হোসেন
ভাইস প্রেসিডেণ্ট, রাজসাহী
কলেজ ইউনিয়ন।

মোঃ আবুহেনা মহসিন
জেনারেল সেক্রেটারী
রাজসাহী কলেজ ইউনিয়ন।

মোঃ জিল্লুর রহমান।
" গোলাম কবির খান।
" জহুরুল হক।
" আখতার আহাদ।
" আবদুল হাদী।
" আবদুল মতিন।

রাজসাহী কলেজে দলাদলি। পৃষ্ঠা ৩৬৯-৩৭০।

ভাবে লুটতরাজ, মারপিট, ধর্ষণ ইত্যাদি চালায়। কিন্তু তারপর ঐ অঞ্চলে কৃষকরা কোন প্রতিরোধের চেষ্টা করেন না এবং সংঘর্ষমূলক কোন ঘটনাও সেখানে ঘটে না। সমস্ত অঞ্চলে এক ব্যাপক ও গভীর আতঙ্ক বিরাজ করতে থাকে। ঠিক সেই সময় ২১শে তারিখে ই. পি. আর, বাহিনী অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঐ অঞ্চলে আবার উপস্থিত হয়। তাদের এই উপস্থিতিতে শুধু কৃষকরাই নন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকরাও আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁরা একত্রিত হয়ে বাহাদুরপুরের জমিদার ও সিপাই-দের নায়েকের সাথে পরামর্শ করে সানেশ্বর, মেহারী প্রভৃতি গ্রামবাসী-দেরকে দরজা বন্ধ করে নিজ নিজ ঘরে থাকতে এবং তাঁরা গিয়ে যখন ডাক দেবেন একমাত্র তখনই বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পন করতে পরামর্শ দান করেন। সেই অনুযায়ী কৃষকরা ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকেন ও স্থানীয় মাতব্বরদের কথামত আত্মসমর্পন করেন। কিন্তু এই আত্মসমর্পনের পর তাঁদের প্রতি ভালো ব্যবহারের পরিবর্ত্তে শুরু হয় নির্মম অত্যাচার। সানেশ্বর, মেহারী, উজিরপুর প্রভৃতি গ্রামে শুরু হয় অবাধ লুটতরাজ, মারপিট, ধর্ষণ ও গ্রেপ্তার। এর পরও জমিদাররা সশস্ত্র পুলিশের সহায়-তায় স্থানীয় অবস্থাপন্ন লোকদেরকে মামলার আসামী করবে বলে ভয় দেখিয়ে অনেক টাকা আদায় করে। রাস্তা ঘাটে লোক আটক করে তারা বেপরোয়াভাবে তাদের থেকেও টাকা আদায় করতে দ্বিধাবোধ করে না।[৭২]

এর পর ঐ অঞ্চলে ঘটনা ঘটে ২৪শে অগাষ্ট। সানেশ্বর বাজার থেকে তিন মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে হরকুঞ্জী নামে একটি গ্রাম আছে। তার পার্শ্ববর্ত্তী দুটি গ্রামের নাম যুগীরকুনা ও পানিসাইল। হরকুঞ্জী গ্রামে ৪৫ ঘর নমশূদ্রের বাস এবং তারা সকলেই বাহাদুরপুরের মুসলমান জমি-দারদের প্রজা। প্রায় বারো বৎসর ধরে খাজনার হার নিয়ে জমিদারদের সাথে এই প্রজাদের মামলা চলছিলো। ঘটনার অল্প কিছু কাল পূর্বে হাইকোর্ট প্রজাদের পক্ষেই রায় দেন এবং ২৸০ হারে খাজনা নির্দিষ্ট হয়। এই হাইকোর্ট রায়ের পর প্রজারা বকেয়া খাজনা পরিশোধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। নানকার আন্দোলনের সাথে তাঁদের কোন সম্পর্ক না থাকলেও একদল ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলের লোক সহ বাহাদুরপুরের জমিদাররা তাঁদের ওপর ২৪শে অগাষ্ট এক বর্বর আক্রমণ চালায়। সানেশ্বর বাজার থেকে মাইল তিনেক দূরবর্ত্তী হরকুঞ্জী গ্রামটিকে পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার তিন

চার শত মুসলমান অধিবাসী সহ ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলের ২৫।৩০ জন লোক ঘেরাও করে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই এই বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে প্রাণ ভয়ে মাঠের মধ্যে পলায়ন করলো। যারা সেভাবে পলায়ন করতে পারলো না তাদেরকে অমানুষিকভাবে মারপিট এবং মেয়েদেরকে ধর্ষণ করা হলো। গ্রামবাসীর যা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি গরু ছাগল, ধান চাল, কাপড় চোপড়, ঘটিবাটি সবকিছুই তারা লুণ্ঠন করলো। সোনার গহনা এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিষপত্রের আশায় তারা কাঠের বাক্স হাঁড়ি পাতিল ভেঙে তছনছ করে দিলো।[৭৩]

মহেন্দ্র নমশূদ্রের বাড়ীতে তারা বিশাহরার মূর্ত্তি চূর্ণ করলো, নবরাম নমশূদ্রকে এমনভাবে মারা হলো যে ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁর হাত ফুলে ছিলো। নবরামের স্ত্রীকে ধর্ষণ করার সময় তাঁর গালে সিপাইরা এমন-ভাবে কামড় দিয়েছিলো যে তাঁর গালে দাঁতের দাগ বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত ছিলো। এই বাড়ীতে ই. পি. আর, এর সৈনিকটি তার ব্যাজ ফেলে গিয়েছিলো এবং সেটি সিলেটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এর কাছে জমা দেওয়া হয়েছিলো। ধানীরাম নমশূদ্র নামে খুব অসুস্থ একজনকে এমন প্রহার করা হয়েছিলো যে সেই আঘাতের ফলে তার চার দিন পর তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই ধানীরামের বৃদ্ধামাতাকেও মারপিট করা হয় এবং তাঁর কাছে টাকা দাবী করা হয়। তাঁকে টেনে হেঁচড়ে এবাড়ী থেকে ও বাড়ী নিয়ে গিয়ে শেষে উলঙ্গ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঈশ্বর নমশূদ্রের পুত্রবধূকে তাঁর স্বামী এবং শ্বশুরের সামনেই ধর্ষণ করা হয়।[৭৪]

দুই ঘণ্টা ধরে হরকুঞ্জী গ্রামে লুঠতরাজ করার পর তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম যুগীরকুনা এবং পানিসাইল গ্রামে প্রবেশ করে। এই দুই গ্রামের লোকেরা বাহাদুরপুর জমিদারদের প্রজা ছিলেন না কিন্তু তা সত্ত্বেও বাহাদুরপুর জমিদাররা পূর্ব বাঙলা সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় তাঁদের ওপরেও নির্বিচারে নির্যাতন চালায়।[৭৫]

যুগীরকুনা গ্রামের আটটি বাড়ী লুট করা হয়েছিলো। এই গ্রামের অধিকাংশ লোকই ছিলো নাথ সম্প্রদায়ের। তাদের বাড়ী থেকে প্রচুর পরিমাণ সুতো, তাঁতের কাপড়, তাঁতের জিনিষপত্র ইত্যাদি লুট করা হয়েছিলো। এই গ্রামের লোকজনও প্রাণ ভয়ে মাঠের দিকে পলায়ন করে। কিন্তু যারা পলায়ন করতে সক্ষম হয় না তাদের মধ্যে পুরুষ-দেরকে মারপিট এবং মেয়েদেরকে মারপিট ও ধর্ষণ করা হয়। বয়স্কা

মহিলারাও এই নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পান না। পানিসাইলের দুলাল ও কাতান নমশূদ্রের বাড়ী লুট করা হলো, অভিরাম নমশূদ্রের স্ত্রী ধর্ষিতা হলেন, নরেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে একজন সৈনিক প্রবেশ করে বিশাহরির মূর্ত্তি চূর্ণ করলো। এই সব কর্মকাণ্ডের পর সন্ধ্যা নামার অল্প একটু পূর্বেই হুইস্‌ল্ বাজিয়ে তারা লুণ্ঠিত জিনিষপত্র নৌকোয় তুলে নিয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করে গেলো।[৭৬]

বিয়ানীবাজার থেকে দশ মাইল দূরবর্তী গোলাপগঞ্জ থানার অধীনে ৩৪ নম্বর সার্কেলের সারপাঞ্চ মৌলভী মোকাদ্দাস আলী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশের কর্ত্তাদেরকে জানান যে, ২৭শে অগাষ্ট দুপুরের পূর্বে কয়েক-জন স্থানীয় মুসলমানকে সাথে নিয়ে হাতে বন্দুক সহ ইউনিফরম্ পরিহিত তিনজন সিপাহী রাংঝিআইল, আনন্দপুর ও সুপাতক গ্রামে প্রবেশ করে গুলি করার ভয় দেখিয়ে পনেরোটি বাড়ী লুট করে, কয়েকজন লুটতরাজ প্রতিরোধ করতে গেলে তাদেরকে প্রহার করে এবং তাদের ধানচাল, কাপড় চোপড় ইত্যাদি নিয়ে যায়। গরু ছাগল পর্যন্ত তারা দখল করে কিন্তু পরে টাকার বিনিময়ে তারা সেগুলি মালিকদেরকে ফেরৎ দেয়।[৭৭]

১৮ই নভেম্বর পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে সানেশ্বর ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার ঘটনাবলী সম্পর্কে যে আলোচনা হয় তাতে কংগ্রেস দলীয় সদস্য-দের রিপোর্ট থেকে অনেক সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের দ্বারা সমগ্র ঘটনাবলীর সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টার ফলে তার মূল্য অনেকখানি কমে যায় এবং সিলেটের মঈনুদ্দীন আহমেদ চৌধুরীর মতো সদস্যের পক্ষে পরিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ভঙ্গিতে সমগ্র ঘটনাটিকে বিকৃত করে পরিষদে বক্তৃতা দানের পথ প্রশস্ত হয়। শুধু তাই নয়। এদিক দিয়ে নূরুল আমীনেরও অনেক সুবিধা হয়। তিনি একদিকে হিন্দু এবং অন্যদিকে কমিউনিষ্টদের ওপর একতরফা দোষারোপ করে লুণ্ঠন, মারপিট, ধর্ষণ ইত্যাদির কথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন।

বিরোধী দলের কয়েকজন সিলেটি সদস্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দান করেন এবং ঘটনাবলীর বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেন। কিন্তু নূরুল আমীন বিচার বিভাগীয় তদন্তের পুঁথি-গত ব্যাখ্যা উপস্থিত করে পরিষদকে বলেন যে, যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা কমিশনার দ্বারা অনুষ্ঠিত তদন্তকেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত বলা চলে। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার নিজে সিলেটে গিয়ে তদন্ত করেছেন

এবং নিজের রিপোর্ট তাঁদের কাছে প্রদান করেছেন। কমিশনারের সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই নূরুল আমীন ঘটনা সম্পর্কে পরিষদে নিজের রিপোর্ট পেশ করেন।[৭৮]

১৯৪৯ এর অগাষ্ট মাসে সানেশ্বরের ঘটনাবলী এবং তার পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে নূরুল আমীন তাঁর পরিষদ বিবৃতিতে বলেন:

> যদিও এই এলাকা কংগ্রেসের একটা শক্তিশালী এলাকা ছিলো তথাপি দেশভাগের পূর্ব থেকেই সেখানে কমিউনিষ্টদেরও তৎপরতা ছিলো। ১৯৩৭ সালে বীরেশ চন্দ্র মিশ্র নামক জনৈক সক্রিয় কমিউনিষ্ট এলাকাটিতে আবির্ভূত হয়ে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেন। তিনি আসাম ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী বাবু রবীন্দ্র নাথ আদিত্যের বিরুদ্ধে এই এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বাহাদুরপুরের মুসলমান জমিদারদের সহায়তায় কংগ্রেস প্রার্থী বীরেশ চন্দ্র মিশ্রকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করেন।* কিন্তু তার পরও শরৎ পাল চৌধুরী (সুরত পাল—ব. উ.), অজয় ভট্টাচার্য ও শিশির ভট্টাচার্য প্রভৃতি কিছু সংখ্যক স্থানীয় লোকদের সহায়তায় বীরেশের তৎপরতা অব্যাহত থাকে। আমি এই সব লোকদের নাম উল্লেখ করছি এজন্যে যে, এদের পরিবারের স্ত্রীলোকেরাই এখন এই ঘটনায় নেতৃত্ব দান করছে। ১৯৪০ সালে কয়েকজন সহচরসহ বীরেশ মিশ্র আসাম সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং কমিউনিষ্টরা যুদ্ধে সহায়তা দানের পক্ষে থাকার জন্যে একটা সাধারণ নীতি হিসেবে ১৯৪২ সালে তাদেরকে মুক্তি দান করা হয়। স্বাভাবিকভাবে এই সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার তারা করে। বিগত যুদ্ধ সাফল্যের সাথে পরিচালনার জন্যে মিত্রশক্তির সাথে সহযোগিতার কথা প্রচারের সাথে সাথে তারা কমিউনিষ্ট ভাবধারাও প্রচার করতে থাকে এবং বিয়ানীবাজার, বড়লেখা ও পার্শ্ববর্তী থানাসমূহের মেহারী, সানেশ্বর, দাসেরবাজার, ভাটশী, উলূরী, সিলকুরা, চাঁদপুর, উজিরপুর, উকিরকুণ্ডী, নাজিরপুর, ফারিংগা, ছাংগুন প্রভৃতি গ্রামে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বীরেশ আবার আদিত্য-

* কমিউনিষ্ট বিরোধিতার ক্ষেত্রে কংগ্রেস লীগভুক্ত ও হিন্দু মুসলমান জমিদারদের ভ্রাতৃত্বমূলক ঐক্য এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়।—ব.উ.

বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তিনি জয়লাভে সমর্থ হলেও এই এলাকার অধিকাংশ ভোট বীরেশ মিশ্রের পক্ষেই প্রদান করা হয়। কংগ্রেসের প্রভাব যে দোদুল্যমান এর থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিলো। জমিদারী ও নানকার প্রথা উচ্ছেদের আবরণে এই কমিউনিষ্টরা কিছু সংখ্যক মুসলমান নানকার প্রজারও সমর্থন লাভ করে। কিন্তু তাদের প্রধান কাজকর্ম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং জনগণকে আইন ও শৃঙ্খলা বিরোধী ধ্বংসাত্মক কাজে প্ররোচিত করাতেই নিয়োজিত ছিলো। যেহেতু জমিদাররা ছিলো মুসলমান সেজন্যে আসামের কংগ্রেসী সরকার এবং কংগ্রেসী কর্মীরা এ ব্যাপারের দিকে কোন খেয়াল করেনি এবং আন্দোলনের মোকাবেলার কোন সক্রিয় ব্যবস্থাও তারা গ্রহণ করে নি। সচরাচর কমিউনিষ্টরা জমিদারদেরকে বয়কট, খাজনা বন্ধ, লুট, হিংসাত্মক কার্যকলাপ এবং অন্যান্য যে কাজগুলি তাদের প্রধান উদ্দেশ্য অসন্তোষ সৃষ্টি ও আইনানুগ কর্তৃপক্ষকে ধিকৃত ও দুর্নামগ্রস্থ করার জন্যে ব্যবহার করে থাকে এই আন্দোলনেও তাই করতো। আসাম সরকার এখানে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করে। ২৬টি অপরাধমূলক মামলাসহ বহুসংখ্যক মামলা দেশভাগের পূর্ব্বে দায়ের করা হয়েছিলো* কিন্তু গণভোটের সময় মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সাথে কমিউনিষ্টদের সহযোগিতার সময় সেগুলি তুলে নেওয়া হয়।

সিলেটের পাকিস্তানভুক্তির পর বীরেশচন্দ্র মিশ্র সীমান্ত অতিক্রম করেন এবং পাকিস্তানে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে নিজের অনুচরদের অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। মুসলিম লীগ কর্মীগণ কর্তৃক নানকার সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধানের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করে তারা গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচারণা চালায় যে, পূর্ব পাকিস্তান দুর্বল এবং তার পক্ষে কোন সুসংগঠিত ঘোরতর আন্দোলন ঠেকানো সম্ভব নয়। নৈরাজ্য বিস্তার এবং কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণকেও তারা উৎসাহ প্রদান করে। জনগণকে আরও

* এই এলাকাতে আসাম সরকার কর্তৃক সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন এবং বহু সংখ্যক মামলা কৃষকদের বিরুদ্ধে জমিদার শ্রেণী কর্তৃক সরকারী সহায়তায় দায়ের করাকে যথেষ্ট মনে না করে নূরুল আমীন ইতিপূর্বে তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে, আসামের কংগ্রেস সরকার কমিউনিষ্টদেরকে দমনের ব্যাপারে উদাসীন ছিলো।—ব.উ.

বলা হয় যে, চীন ও বার্মার মত পূর্ব পাকিস্তানও কমিউনিষ্টদের কর্তৃত্বে এসে যাবে। চীন ও বার্মায় কমিউনিষ্টদের সাফল্য উদযাপনের উদ্দেশ্যে এই এলাকায় তারা অনেকগুলি সভার অনুষ্ঠান করে। হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্যে জনগণকে তারা উত্তেজিত করে। এর ফলে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোকদেরকে ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তারা অনেক অপরাধমূলক কাজ করে। আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে তারা পুলিশকে আক্রমণ করে তাদেরকে আইনসঙ্গত কর্তব্য কাজ থেকে বিরত করতে থাকে। এবার আমি কতকগুলি কেসের উল্লেখ করবো।

১৯৪৭ সালের ২০শে নভেম্বর ৪ জন আসামীকে উদ্ধার করার চেষ্টায় ৫০০ সশস্ত্র ব্যক্তি কর্তৃক বাহাদুরপুরের পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করা হয়। দাঙ্গা ও খুন খারাবীর সাথে জড়িত কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্যে ১৯৪৮ সালের ২৭শে মার্চ বাহাদুরপুর ক্যাম্পের নিকটেই বিয়ানীবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে আক্রমণ করা হয়। দাঙ্গা ও বেআইনী আটকের দায়ে অভিযুক্ত কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের সময় ১৯৪৮ সালের অগাষ্ট মাসের প্রথম দিকে কয়েকজন পুলিশ কনষ্টেবল একটি সশস্ত্র দলের দ্বারা আক্রান্ত ও আহত হয়। এর ফলে গুলি চালাতে হয় এবং তাতে এক ব্যক্তি (মুসলমান) নিহত হয়।

গুলি চালনায় প্রধানতঃ মুসলমানরা জড়িত থাকায় তাদের ওপর ঘটনাটির একটা স্বাস্থ্যকর প্রভাব পড়ে। কিন্তু সরকার ও পাকিস্তান রাষ্ট্রকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে অমুসলমানদের মধ্যে কমিউনিষ্ট অনুপ্রাণিত পাকিস্তানবিরোধী কার্যকলাপ অব্যাহত থাকে। যারা খোলাখুলিভাবে ধ্বংসাত্মক এবং রাষ্ট্র-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলো ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে তাদের কিছু সংখ্যককে গ্রেফতার এবং কিছু সংখ্যকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এরপর অল্প কিছু কালের জন্যে এলাকাটি শান্ত থাকে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে বড়লেখা থানায় পাকিস্তান বিরোধী কার্যকলাপ আবার শুরু হয়। অধিকতর সশস্ত্রভাবে তৎপর কমিউনিষ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা শুরু করা হলেও স্থানীয় ব্যক্তিরা তাদেরকে আশ্রয় দান করার এবং তাদের পক্ষে সীমান্ত পার হয়ে

আসামে পলায়ন সহজ হওয়ার কারণে তাদেরকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় না। এলাকাটিতে নানকিং ও সাংহাইয়ের পতন ব্যাপকভাবে উদযাপন করা হয় এবং সানেশ্বরে জনসভা ও মিছিল হয়। ব্যাঙ্গাত্মক পাকিস্তান বিরোধী ধ্বনি অতীব উৎসাহের সাথে সচীৎকারে প্রদান করা হয় এবং জনগণকে বলা হয় যে, পাকিস্তানেরও পরিণতি চীন ও বার্মার মতো হবে এবং তা আগতপ্রায় কমিউনিষ্ট মহাপ্রবাহে নিমজ্জিত হবে। কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু তার কোন ফল দেখা যায় না। কারণ এর পরই একটি মিছিল বের হয় এবং তাতে মেহারী, উলূরী, চাঁদপুর, সিনকুরিয়া ও সানেশ্বরের গ্রামবাসীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এখানেও পাকিস্তান বিরোধী ধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং কর্তৃপক্ষের অবমাননা ও সশস্ত্র সংগ্রামের কথা খোলাখুলিভাবে প্রচার করা হয়।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এবার আমি আসছি ১৯৪৯ সালের ১২ই থেকে ১৮ই অগাষ্টের মধ্যবর্তী ঘটনাসমূহে। ১২ই অগাষ্ট, ১৯৪৯, কমিউনিষ্টরা সানেশ্বরে একটি বিরাট সভার আয়োজন করে। এই সভাতে আসাম থেকে আগত কিছুসংখ্যক কমিউনিষ্ট কর্মীও উপস্থিত ছিলো। এই সমস্ত সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ১৯৪৯ এর ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে পাকিস্তান বিরোধী মিছিল সংগঠিত করা (সরকারী বেঞ্চের দিক থেকে একজনের চীৎকার: Shame, Shame)। যারা তাদের সাথে যোগদান করেনি অথবা তাদের প্রতি অনুগত নয় বলে যাদের প্রতি সন্দেহ ছিলো তাদের বাড়ী ঘর লুণ্ঠন করার জন্যেও কমিউনিষ্টরা জনগণকে প্ররোচিত করেছিলো। সেই অনুযায়ী এন্থনী নামে এক জন খ্রীষ্টান এবং রাজেন্দ্র পাতনী নামে সানেশ্বরের এক জন হিন্দুর বাড়ী লুণ্ঠন করা হয়েছিলো। তাদের মাধ্যমে পুলিশের কাছে সংবাদ পৌঁছাতে পারে এই সন্দেহে কয়েকজন হিন্দুকে বেআইনী ভাবে আটক রাখা হয়েছিলো এবং যে পর্যন্ত না তারা কমিউনিষ্টদের পক্ষে যাবে এই মর্মে তাদের থেকে জোরপূর্বক মুচলেকা আদায় হয়েছিলো সে পর্যন্ত তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয় নি। ১৯৪৯ সালের ১৪ই অগাষ্ট সানেশ্বর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে পাকিস্তান বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়েছিলো, বাড়ীর ছাদে কালো পতাকা ওড়ানো হয়ে-

ছিলো এবং "পাকিস্তান ধ্বংস হোক" এর মতো পাকিস্তান বিরোধী ধ্বনি উৎসাহের সাথে দেওয়া হয়েছিলো। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ১৯৪৯ এর ১৫ই অগাষ্ট তারা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছিলো এবং সেই উদ্দেশ্যে লাল পতাকার নীচে সানেশ্বর বাজারে বহুসংখ্যক লোকের একটি সভা হয়েছিলো। পরবর্তী দুই দিনই বিভিন্ন জায়গায় ঐ একই ধরনের সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এবং জ্বালাময়ী বক্তৃতার দ্বারা তাদেরকে হিংসার পথে প্ররোচিত করে জনগণের উত্তেজনাকে একটা উচচ পর্যায়ে তোলা হয়েছিলো। মহিলা কর্মী-দের মধ্যে কয়েকজন মিছিলে খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে-ছিলো। এই আন্দোলনের দ্বারা বিয়ানীবাজার ও বড়লেখা থানার ১৫টি গ্রাম খুব গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলো। সেখানে মারপিট ও লুণ্ঠন হয়েছিলো। জনতা কর্ত্তৃক যাদের বাড়ী ঘর লুণ্ঠিত হয়ে ছিলো সে-রকম কিছু সংখ্যক ব্যক্তি পুলিশের কাছে নালিশ জানিয়ে-ছিলো। হত্যা প্রচেষ্টা এবং বেআইনী আটকের কেসও রেজিষ্ট্রী করা হয়েছিলো।

১২ই অগাষ্ট, ১৯৪৯ এর সভা ও মিছিলের ব্যাপারটির প্রতি লক্ষ্য রাখার এবং কয়েকটি ক্রিমিনাল কেসের জনকয়েক পলাতক আসামীকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে ঐ দিন একটি পুলিশ পার্টি অগ্রসর হলে জাঠা, শুলপি, দা ও লাঠি দ্বারা সশস্ত্রভাবে সজ্জিত প্রায় এক হাজার লোক তাদের দিকে এগিয়ে এসে তাদেরকে বাধা দেয়। এই জনতাকে নেতৃত্ব দান করে অসিতা পাল চৌধুরী নামে এক মহিলা।

এই এলাকায় নৈরাজ্য এবং সন্ত্রাসের রাজত্বের সংবাদ পেয়ে এক জন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে সাথে নিয়ে হেড কোয়ার্টার থেকে এক দল পুলিশ এই জায়গার দিকে রওয়ানা হয়। ১৬ই অগাষ্ট, ১৯৪৯ তারিখে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও বিয়ানীবাজার যান। তাঁর মতে এই অঞ্চলে নৈরাজ্য এত ব্যাপক ছিলো এবং তা এত বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছিলো যার ফলে তিনি সশস্ত্র বাহিনীকে তলব করেছিলেন। একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও দুইজন ডেপুটি পুলিশ সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্টকে সাথে নিয়ে এই বাহিনী ১৮ই অগাষ্ট, ১৯৪৯, তারিখে সানেশ্বরের দিকে রওয়ানা হয়ে সেদিনই সেখানে উপস্থিত হয়। তারা বন্দুকসহ সব রকমের অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত দুই হাজারেরও অধিক

লোকের এক জনতাকে দেখতে পায়। সুষমা দে, অপর্না পাল ও অসিতা পাল চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন এই জনতা কমিউনিষ্ট ও পাকিস্তান বিরোধী ধ্বনি দিচ্ছিলো। তারপর পুলিশ পার্টি তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে কথা বলা যায় এমন দূরত্বে দাঁড়ালো। বিভিন্ন দিক থেকে জনতা পুলিশ পার্টিকে আক্রমণ করার জন্যে হুমকির মনোভাব নিয়ে সবেগে ধাওয়া করতে শুরু করলো। ম্যাজিষ্ট্রেট বৃথাই তাদের-কে শান্ত করার চেষ্টা করলেন এবং পরিশেষে তাদেরকে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। তারা তাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি সেই সমা-বেশকে বেআইনী ঘোষণা করে আবার তাদেরকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। এক রাউণ্ড ফাঁকা আওয়াজে কোনই ফল হলো না। বিপরীতপক্ষে জনতা ক্ষেপে গেলো এবং অসিতা পাল চীৎকার করে বলতে থাকলো যে এর দ্বারা তার এই কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে পুলিশের কাছে কোন গুলি নেই। এই বলে সে পুলিশকে আক্রমণ করার জন্যে তাড়া দিতে থাকলো। এই সময়ে একটা বন্দুকের গুলি ছোঁড়া হলো মেহারী গ্রামের দিক থেকে। এক বিরাট জনতা সেদিক থেকে লাল পতাকা উড়িয়ে আক্রমণের উদ্দেশ্যে পুলিশ পার্টির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। পুলিশ পার্টিকে ঘেরাও হতে দেখে এবং পরাজয়ের বিপদ আশঙ্কা করে ম্যাজিষ্ট্রেট সেই বেআইনী সমাবেশ ভঙ্গের জন্যে তাদেরকে আর একবার সতর্ক করলেন কিন্তু এবারও তা কেউ গ্রাহ্য করলো না। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন পুলিশকে গুলির আদেশ দিলেন যার ফলে এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই নিহত হলো। কিন্তু পিছিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে জনতা দুবার গুলি ছুঁড়লো এবং পাশ ও পেছনে থেকে পুলিশ পার্টিকে আর একবার আক্রমণের দৃঢ় প্রচেষ্টা নেওয়া হলো। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন আর এক রাউণ্ড গুলির আদেশ দিলেন। এই গুলির ফলে ঘটনাস্থলে দুই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলো। পরে আরও দুইজন আহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। কাজেই মৃতের সংখ্যা মোট দাঁড়ায় পাঁচ। মেয়েদের মধ্যে কাউকেই আঘাত করা হয় নি এবং কেউ আহতও হয় নি। এরপর জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং ছয়জন মহিলা সহ দশজনকে গ্রেফতার করা হয়।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সরকার নামের যোগ্য কেউই নিকটে অথবা দূরে, মুসলমান অথবা অ-মুসলমান অধ্যুষিত কোন এলাকায়,

এই ধরনের পরিস্থিতিকে চলতে দিতে পারে না। যত সংক্ষিপ্ত সময়ে সম্ভব আইনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা দরকার ছিলো। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে স্থানীয় লোকদের স্বার্থেই তার প্রয়োজন ছিলো। যারা সক্রিয়ভাবে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ও সাধারণতঃ খুবই উচচ কণ্ঠ তারা যে এ নিয়ে মহা চীৎকার শুরু করবে তাতে আর বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অতীতের হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে স্থানীয় পুলিশকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন ছিলো। সুতরাং সরকারকে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলের একটি কনটিনজেণ্টসহ অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করতে হয়েছিলো। এই এলাকায় অতীতে ক্রমাগত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণের ইতিহাসের কথা বিবেচনা করে একথা বলতে আমার বিন্দুমাত্র কোন দ্বিধা নেই যে, এই এলাকায় পরিপূর্ণ শান্তির কারণে স্থানীয় লোকদের আইন মেনে চলার ইচ্ছা নয়। তার কারণ যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতি ও গতিবিধি। কমিউনিষ্টদের এবং এই এলাকার ও ভারতীয় ডমিনিয়নের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে যারা আশ্রয় দান করেছে ও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে সে রকম বিপুল সংখ্যক লোকদের ভয়ে আইনের প্রতি অনুগত যে সমস্ত লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রস্থ থেকেছেন তাঁদের মধ্যে নিরাপত্তার মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দায়িত্বশীল অফিসারদের নেতৃত্বে পুলিশকে সমগ্র এলাকায় ঘুরতে হয়েছিলো। এই এলাকাটি কিয়দংশে কমিউনিষ্টদের ঘাঁটি 'এলাকায় পরিণত হয়েছিলো এবং এটা এভাবে চলতে দেওয়া যেতো না।[৭৯]

সানেশ্বরের ঘটনার প্রায় একমাস পর 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 'সিলেট জেলায় কমিউনিষ্টদের অশান্তি সৃষ্টি' এই শিরোনামায় এই রিপোর্টটিতে বলা হয় : যে সকল কমিউনিষ্ট নেতা সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার এবং বড়লেখা থানার কতকগুলি গ্রামে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা পলায়ন করিয়া নিকটবর্তী ভারতীয় এলাকায় আশ্রয় লইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

চট্টগ্রাম বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং কমিশনার ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে উপক্রত এলাকা সফর করিয়া জানান যে, পরি-

স্থিতি এখন শান্ত রহিয়াছে। গ্রামবাসীগণ বিপুল সংখ্যায় সমবেত হইয়া আনুগত্য জ্ঞাপন করে এবং অশান্তিসৃষ্টিকারী কমিউনিষ্টদের দমনে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়।

জানা গিয়াছে যে, সিলেটে গণভোটের সময় এই এলাকার যথেষ্ট সংখ্যক অধিবাসী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল। অতএব তাহারা সহজেই অশান্তি সৃষ্টিতে সহযোগিতা করিবে বলিয়া কমিউনিষ্টগণ মনে করিয়াছিল। যে সব লোক তাহাদের আন্দোলন প্রতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং কমিশনার ইহা সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপে ব্যাপৃত হওয়ার পর আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়া কোন লাভ হইবে না।[৮০]

১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে সংশ্লিষ্ট এলাকার দুইটি থানার বহুসংখ্যক গ্রাম কয়েক ঘণ্টায় সফরকালে শাসক-শোষক শ্রেণীর আজ্ঞাবাহী চট্টগ্রামের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ও কমিশনার স্থানীয় পুলিশ ও ই. পি. আর অফিসার, জেলা কর্তৃপক্ষ এবং জমিদারদের থেকে সংগৃহীত "তথ্যের" ভিত্তিতে ঢাকায় সাংবাদিকদের কাছে উপরোক্ত রিপোর্ট পেশ করে। এদের এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ অভিযানকেই আবার "বিচার বিভাগীয় তদন্ত" আখ্যা দিয়ে সেই "তদন্তের" ভিত্তিতে পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন ব্যবস্থা পরিষদে তাঁর উপরোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

সানেশ্বরের ঘটনার পর নানকার আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল বিয়ানীবাজার ও বড়লেখা থানায় বিপুলভাবে ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্ ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে পূর্ব বাঙলা সরকার এক পরিপূর্ণ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। অমানুষিক মারপিট, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, জেল, জরিমানা মামলা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃষ্ট এক নৈরাজ্যিক পরিস্থিতিতে সমগ্র এলাকা নেতৃস্থানীয় কর্মীশূন্য হয়ে পড়ে এবং বাইরে থেকে কারও প্রবেশ সেখানে হয় একেবারেই অসম্ভব। এই সুযোগে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা চালিয়ে স্থানীয় মুসলমান জনগণের মধ্যেও তারা আন্দোলন বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে অনেকাংশে সমর্থ হয়। এরপর সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ বিয়ানীবাজার ও বড়লেখা থানায়, মুসলিম লীগ সভা সমাবেশের অনুষ্ঠান করতে থাকে এবং নানকারদের হিতাকাঙ্খী সেজে, সরকারের

কাছে নানকার প্রথা উচ্ছেদের দাবী তোলে। এই ধরনের সভা সমিতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীর মতো স্থানীয় জমিদারদের সহায়তাতেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। এগুলিতে মাহমুদ আলী, নূরুর রহমান, আরজাদ আলী প্রভৃতি মুসলিম লীগের জেলা ও মহকুমা নেতৃবৃন্দ সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করছিলেন।[৮১]

সিলেটের নানকার আন্দোলনের অবস্থা এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে নানকারদের মধ্যে কমিউনিষ্টদের প্রভাব লক্ষ্য করে মুসলিম লীগ সরকার নানকার প্রথা উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। আন্দোলন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জমিদাররাও এক্ষেত্রে কোন কঠিন বিরোধিতা করতে সাহস না করে এবং মন্দের ভালো হিসেবে যতদূর সম্ভব তাদের দিকে তাকিয়ে নানকার প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। শুধু তাই নয়। যে সমস্ত জমিদার মিরাশদাররা পুলিশ ও ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সহায়তায় নানকার এলাকাসমূহে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছিলো তারাই আবির্ভূত হয় নানকার প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায়।

এইভাবে একদিকে সন্ত্রাসের ফলে ১৯৪৯ সালের অগাষ্টের পর থেকে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে নানকার আন্দোলনের বিপর্যয় ও ১৯৫০ এর প্রথম দিকে কমিনফর্মের থিসিস অনুযায়ী কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক সশস্ত্র আন্দোলন প্রত্যাহার এবং অন্যদিকে ১৯৫০ সালে পূর্ব বাঙলার মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক নানকার প্রথা উচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ণের পর সিলেটের নানকার আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৫

ময়মনসিংহ জেলায় জমিদারী ও টঙ্ক প্রথা বিরোধী আন্দোলন

১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের পূর্বেই ময়মনসিংহ জেলা জমিদারী প্রথা বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিলো। আন্দোলনের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহের এই অগ্রগতির জন্যে ১৯৪৫ সালে সারা ভারত কিষাণ সভার বার্ষিক সম্মেলন নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬—৪৭ সালে বাঙলাদেশের ১৯টি জেলা ব্যাপী যে ব্যাপক ও

তুমুল তেভাগা আন্দোলন চলে সারা ময়মনসিংহ জেলায় তা কৃষকদের মধ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং 'আধি নাই, তেভাগা চাই', 'জান দেবো তবু ধান দেবো না,' 'লাঙল যার জমি তার' ইত্যাদি ধ্বনি তুলে কৃষকরা কিষাণ সভার পতাকাতলে দলে দলে সমবেত হতে থাকেন। এই জেলায় তেভাগার দাবী ছাড়া নেত্রকোনার পাহাড়ীয়া অঞ্চলে ফসলে খাজনা দেওয়ার প্রথা বা টংক প্রথার বিরুদ্ধেও ব্যাপক ও জঙ্গী আন্দোলন হয়।[১]

১৯৪৭ সালে আগষ্ট মাসে দেশভাগের পর কৃষক আন্দোলনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি ও কিষাণ সভা এই পরিবর্তিত অবস্থায় নোতুন সরকারকে কিছু সময় ও সুযোগ দানের পক্ষপাতী হন এবং সরকারের সাথে কিছুটা সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেন। এ সবের ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলন মোটামুটি বন্ধ থাকে। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি ও কিষাণ সভা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেও তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার তাঁদের থেকে সহযোগিতা না নেওয়ারই সিদ্ধান্ত করে। যে সমস্ত কমিউনিষ্ট কর্মী ও নেতারা ইংরেজ আমলের জেলখানায় বন্দী ছিলেন তাঁদেরকে মুক্তি দান করতেও সরকার অস্বীকার করে। এ ব্যাপারে পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ১৯৪৮ এর মার্চ মাসেই এক পরিষদ বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাবে রাজবন্দীদের সম্পর্কে তাঁর নীতি ঘোষণা করে বলেন যে,

> ময়মনসিংহে অল্প কিছু সংখ্যক ব্যতীত প্রায় সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দান করা হয়েছে। আমি যতদূর জানি কতকগুলি বিশেষ কারণে—কারণ তারা খুবই গুরুতর ধরনের অপরাধ করেছিলো—তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। ঐ বিশেষ এলাকাতে পরিস্থিতি এমন ছিলো না যাতে করে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারতো। কিন্তু একথা আমি আপনাদেরকে বলতে পারি যে, তারা সকলেই হচ্ছে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য।[২]

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে সারা ভারত কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি নোতুনভাবে কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত করার চিন্তা ভাবনা শুরু করে। কিন্তু পাকিস্তানউত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে সময় কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টি সরাসরিভাবে বেআইনী ঘোষিত-

না হলেও মুসলিম লীগ তাদেরকে খোলাখুলি কাজ করতে দেওয়ার, বিশেষতঃ কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করতে দেওয়ার, তীব্র বিরোধী ছিলো। এ-জন্যে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরা তো বটেই, এমনকি কৃষক সমিতির অধিকাংশ কর্মীকেই তখন আত্মগোপন করে থাকতে হচ্ছিলো।

এই পরিস্থিতিতেই ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রংপুরের লালমনিরহাট অঞ্চলের একটি গ্রামে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত জেলা কৃষক প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের পর মনি সিং, খোকা রায়, নগেন সরকার, প্রমথ গুপ্ত প্রভৃতি ময়মনসিংহ জেলার নেতৃবৃন্দ নিজেদের এলাকায় ফিরে আসেন এবং কিশোরগঞ্জ মহকুমার সরারচর গ্রামে জেলা কৃষক প্রতিনিধিদের এক গোপন সভা করেন। সেই সভায় লালমনিরহাট সম্মেলনের প্রস্তাব সমূহের ওপর আলাপ আলোচনা হয় এবং প্রথমে তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান এলাকা কিশোরগঞ্জ থেকেই আন্দোলনের ঢেউ তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৩]

দ্বিতীয় কংগ্রেসের নোতুন লাইন অনুযায়ী কিশোরগঞ্জের কৃষকদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠনের উদ্দেশ্যে কৃষক সমিতির নেতারা যখন সভা সমিতি ও বৈঠক শুরু করেন তখন তেভাগা এলাকার একদল কৃষক বলেন: আমরা কি করে আপনাদেরকে বিশ্বাস করবো? তেভাগা আন্দোলন করলাম, জেলে গেলাম, মার খেলাম। সরকার জোতদার দুর্বল হয়ে এলো। তখন আপনারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন।" অন্যদল বলেন: "আপনারা বলছেন মুসলিম লীগ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক। তারা কিছু করবে না। কিন্তু তাদেরকে সময় দেন। এই মুহূর্তে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যাওয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া আপনারা বলছেন লড়াই করতে হবে। এদের পেছনে আপনারা বলছেন সাম্রাজ্যবাদ। এদের মোকাবেলার জন্য অস্ত্র ও প্রস্তুতি দরকার। কোথায় পাবেন?" কৃষকদের এই সব বক্তব্যের কারণ ১৯৪৭ সালে কিশোরগঞ্জে তেভাগা আন্দোলন জমিদার জোতদার ও সরকারকে দুর্বল করে যখন দাবী আদায়ের পর্যায়ে এসে গিয়েছিলো, কৃষকরা নিজেরাও যখন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিলেন যে তাঁদের দাবীর আইনগত স্বীকৃতির আর দেরী নেই তখন আকস্মিকভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি কর্তৃক আন্দোলন প্রত্যাহার। এই প্রত্যাহারের ফলে কৃষকদের এত সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ তাঁদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা না করে জোতদারদেরকে তাদের পূর্ব অধিকারে বহাল থাকতেই

শক্তি ও সাহায্য যুগিয়েছিলো। আন্দোলনের এই পরিণতিও সেক্ষেত্রে তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষকসভার ভূমিকা রাতারাতি কৃষকদের ভুলে যাওয়ার কথা ছিলো না।[৪]

পাকিস্তানউত্তরকালে ১৯৪৮ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত কৃষক আন্দোলনের মূল ধ্বনি তেভাগা অঞ্চলে ছিলো জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ। এই আন্দোলনের সপক্ষে কৃষকদের সম্মতি নেওয়া এবং কৃষক সমিতির পতাকাতলে তাঁদেরকে সমবেত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের জুন-জুলাই মাসে কৃষক সমিতি কিশোরগঞ্জ মহকুমার করিমগঞ্জ বাজার থানায় একটি সভার আয়োজন করার সময় সরকার সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করলো। কৃষক সমিতি সিদ্ধান্ত নিলো ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার এবং পুলিশ বাধা দিতে এলে তাদের সাথে লড়াই করার। কৃষকদেরকে বলা হলো পুলিশ আক্রমণ করতে এলে তাদেরকেও আক্রমণ করে তাদের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিতে হবে।[৫]

সভার উদ্দেশ্যে সকলে যে সময় দলে দলে সভাস্থলের দিকে যাচ্ছেন তখন পুলিশ সেখানে এসে ১৪৪ ধারা জারীর নোটিশ দিলো। ঠিক হলো বেশী লোককে সেই সভার ব্যাপারে জড়িত না করে যতদূর সম্ভব অল্প সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দিয়ে সভার কাজ পরিচালনা করা। কাজেই সেই সভায় সভাপতি ও বক্তা হলেন একই ব্যক্তি—কিশোরগঞ্জ মহকুমা কৃষক সমিতির সভাপতি নগেন সরকার। পুলিশের প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে সভার কাজ চললো। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ এবং 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই নীতির উপর ভিত্তি করে কৃষকের জমি দখলের পক্ষে ধ্বনি উঠলো। পুলিশ সেদিনকার সেই সভায় কোন বাধা দিল না, কাউকে গ্রেফতারও করলো না।[৬]

এর ফলে কৃষক সমিতির নেতাদের ধারণা জন্মালো যে জনতার সামনে পুলিশ দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। রণদীভের রাজনৈতিক সংগ্রামের লাইনও যে সঠিক একে তার একটা প্রমাণ হিসেবে তাঁরা মনে করলেন। কাজেই প্রাথমিক এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তাঁরা এর পর জেলা কৃষক সম্মেলন আহ্বান করলেন কিশোরগঞ্জ শহর থেকে মাইল দুই দূরবর্ত্তী যশোদল বাজারে।[৭]

সম্মেলনের জায়গায় ১৯৪৮ এর সেপ্টেম্বরে সমগ্র জেলার কর্মীদেরকে জমায়েত করা হলো। সম্মেলন যাতে না হতে পারে তার জন্যে সরকারও

ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করলো। তারা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করলো এবং কৃষক নেতৃবৃন্দকে জানালো যে তারা এবার কিছুতেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে দেবে না। তাঁরা এবারের ১৪৪ ধারাকে যদি করিমগঞ্জের মতো মনে করেন তাহলে ভুল করবেন। কিন্তু এই সরকারী হুমকী সত্ত্বেও কৃষক সমিতি স্থির করলো সম্মেলন বাদ দেওয়া যাবে না। সম্মেলনের তিনদিন পূর্বে ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স্ এলো। পরিস্থিতি রীতিমতো গুরুতর আকার ধারণ করলো।[৮]

সম্মেলনের ঠিক পূর্বদিন বিরাট এক সশস্ত্র বাহিনী যশোদল মাঠে উপস্থিত হয়ে সেখানে ছাউনী ফেললো। তরাইল, করিমগঞ্জ, নীলগঞ্জ, মুসুলী, রশিদাবাদ, চোদ্দশ' বাজিতপুর, বানীগ্রাম প্রভৃতি গ্রাম থেকে যশোদল আসার সমস্ত পথ তারা অবরোধ করলো। কোন সংগঠিত জাঠা যাতে সভাস্থলে পৌঁছাতে না পারে তার জন্যে গৌরীপুর জংশন ভৈরব রেল ষ্টেশন থেকে আসার পথে সমস্ত রেল ষ্টেশনগুলিতে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হলো।[৯]

করিমগঞ্জের সভার মতো এক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত হলো পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও জটিলতার জন্যে বেশী লোককে সম্মেলনে জড়িত না করে নগেন সরকারকেই সভাপতি ও বক্তা হিসেবে দাঁড় করানো। সে সময়ে কৃষক সমিতিকে সম্পূর্ণ একটি গুপ্ত প্রতিষ্ঠান যাতে সরকার না বলতে পারে তার জন্যে সিদ্ধান্ত হয়েছিলো অল্প কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে প্রকাশ্য-ভাবে কাজ করতে দেওয়া। নগেন সরকার এঁদেরই একজন ছিলেন। সম্মেলনের পূর্বদিন কিশোরগঞ্জ থেকে তিনি যশোদলের দিকে রওয়ানা হওয়ার পর শহরের কাছাকাছি জায়গাতেই একদল পুলিশ তাঁর দিকে এগিয়ে এসে তাঁকে আদাব জানিয়ে বললো, "আপনাকে থানায় যেতে হবে।" নগেন সরকার তাদেরকে বললেন যে, তিনি কাজে যাচ্ছেন কাজেই তখন তাঁর থানায় যাওয়ার সময় নেই। কিন্তু পুলিশের সংখ্যা বাড়লো এবং বোঝা গেলো তিনি স্বেচ্ছায় না গেলে তাঁকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যাবে। পুলিশ বললো, "মাত্র দুই তিন মিনিটের ব্যাপার। সম্মেলনের ব্যাপারেই আলাপ।" থানায় যাওয়ার পর মহকুমা হাকিম ও ময়মনসিংহের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনুরোধ জানালেন যাতে কৃষক সমিতির যশোদল সম্মেলন করা না হয়। কারণ সরকারী নির্দেশ আছে সম্মেলন হলে বাধা দিতে হবে এবং তার ফলে রক্তারক্তি হবে। নগেন

সরকার তাদের সেই প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে বললেন, সম্মেলন বাদ দেওয়া যাবে না, কৃষক সমিতির সিদ্ধান্ত হয়েছে সম্মেলন করার এবং সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হবে। নগেন সরকারের এই জবাবের পর তারা সেখানেই তাঁকে গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠিয়ে দিলো।[১০]

এর পর 'ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্' ব্যাপক গ্রেফতার, ও ফাঁকা গুলির আওয়াজ করে চারিদিকে ত্রাসের সঞ্চার করলো। প্রায় ৩০ জন কর্মীসহ ময়মনসিংহ জেলার কৃষক নেতা ধরণী বণিক এবং ওয়ালী নেওয়াজও গ্রেফতার হলেন এবং সম্মেলনে যে সমস্ত কৃষকরা দূর দূরান্ত থেকে পূর্বেই জমায়েত হয়েছিলেন তাঁরা চারিদিকে পলায়ন করতে শুরু করলেন। কোথাও কোথাও তাঁদের সাথে সশস্ত্র পুলিশের ছোট খাট সংঘর্ষও হলো। এর ফলে সম্মেলন শেষ পর্যন্ত আর অনুষ্ঠিত হতে পারলো না। মণি সিং এ সময়ে কিশোরগঞ্জেই আত্মগোপন করে ছিলেন। এর পর তিনি অন্যত্র চলে যান।[১১]

সম্মেলনের ব্যাপারে কৃষক জনগণের পক্ষ থেকে আবার সমালোচনা হলো : "তোমরা সিদ্ধান্ত কর, তারপর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করো। তেভাগার সময়েও তাই করেছিলে। এখানে 'ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্' এলো, তোমরা ঠিক করলে তা সত্ত্বেও সম্মেলন করবে। কিন্তু তারপর আর সভা হলো না।" যশোদলের এই ঘটনার পর স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে একটা নৈরাশ্য এবং হতাশার ভাব এসে গেলো। কৃষক সমিতির নেতৃত্বের ওপর আস্থাও অনেকখানি কমে এলো। অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং নেতাও এর পর এলাকা পরিত্যাগ করে পশ্চিম বাঙলায় চলে গেলেন। যাঁরা থাকলেন তাঁরাও অল্প কিছুদিন দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় থেকে পরবর্তীকালে পশ্চিম বাঙলা চলে গেলেন। কিন্তু তাঁদের স্থান পূরণ করার জন্যে পশ্চিম বাঙলা থেকে কেউ এলেন না। এই সমস্ত কারণে কিশোরগঞ্জে আন্দোলন দ্রুতগতিতে স্তিমিত হয়ে এলো।[১২]

কিন্তু কিশোরগঞ্জে এই অবস্থা দাঁড়ালেও এর পর জেলার কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল স্থানান্তরিত হলো নেত্রকোণা মহকুমার হাজং অধ্যুষিত অঞ্চলে। সেখানে সরকারী 'লেভীর' বিরুদ্ধে এবং টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের এক ব্যাপক সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হলো।

সারা পূর্ব বাঙলায় ১৯৪৭-৪৯ সালে এক বিরাট খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তার ফলে সরকার লেভীর মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।* এই লেভী আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীরা কৃষকদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্যাতন শুরু করে। তাছাড়া লেভী ধানের সরকার প্রদত্ত দর তৎকালীন বাজার দর থেকে অনেক কম হওয়া এবং লেভী ধানের টাকা সরকারের থেকে পাওয়ার জন্যে চালান বা চেক জমা দেওয়া ইত্যাদি নিয়মের জন্যে শহরে যাওয়ার হয়রানির কারণে কৃষকরা লেভীর বিরুদ্ধে খুব বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কিন্তু কৃষকদের কোন আপত্তির প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি জ্ঞাপন না করে যান্ত্রিক এবং আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারী কর্মচারীরা সর্বত্র লেভী ধান আদায় করতে কৃত সংকল্প হয়। কৃষকরা সাধারণভাবে লেভীর বিরুদ্ধে ছিলেন না। তাঁদের দাবী ছিলো সারা বৎসরের খোরাকী না রেখে ধান নেওয়া চলবে না, বাজার দরের থেকে অল্প দরে ধান নেওয়া চলবে না, চালান বা চেকের পরিবর্তে নগদ মূল্যে ধানের দাম পরিশোধ করতে হবে। এই সব দাবীর ভিত্তিতে নেত্রকোণা মহকুমার হাজং এলাকায় ১৯৪৮ সালেই ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়।

এই অবস্থায় ১৯৪৮ সালের নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে নাগের পাড়া (হালুয়া ঘাট) গ্রামে জেলা কৃষক সমিতির নেতাদের এক গোপন সভা হয়। সেই সভায় জমিদারী প্রথা বিরোধী ও আমলাতান্ত্রিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক প্রশ্নকে এই সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে যুক্তি হিসেবে গ্রহণ না করারও সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করেন। এই সভায় জেলা নেতৃত্বের মধ্যে কতকগুলি দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও প্রশ্ন দেখা দেয়। সুনির্মল সেন বলেন, 'সদ্য স্বাধীনতা লব্ধ পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কৃষকদেরকে আন্দোলনে নিক্ষেপ করা এখনই ঠিক হইবে না। লীগ সরকার সাধারণ মুসলমান জনতাকে ভুল বুঝাইতে সুযোগ পাইবে।' প্রমথ গুপ্ত বলেন, 'এই মুহূর্তে শুধুমাত্র সুসংগঠিত হাজং অঞ্চল হইতে সংগ্রাম শুরু করিলে "ভ্যানগর্ডিজম" করা হইবে।' জলধর পাল বলেন, 'কোন কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করার বাস্তব সংগঠন নাই। এই জন্য সময় ও প্রস্তুতির প্রয়োজন।' এই সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও প্রশ্ন সত্ত্বেও আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত হয় এবং সমগ্র হাজং অধ্যুষিত

* প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

এলাকায় লেভী ও টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র ও ব্যাপক কৃষক আন্দোলন প্রায় দেড় বৎসর পর্যন্ত জারী থাকে।

টঙ্ক প্রথা :

আসাম ও বাঙলাদেশ সীমান্তে ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশ ঘেঁষে গারো পাহাড়। এই পাহাড়ীয়া অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে সুসং দুর্গাপুরের জমিদারীর অন্তর্গত। এই অঞ্চলে তেমন কোন চাষ আবাদ না হলেও জমিদাররা ছিলো এখানকার বিপুল অরণ্য সম্পদের মালিক। এছাড়া হাতীর ব্যবসা করেও তারা প্রভূত ধন সম্পদ উপার্জন করতো। এখানকার আদিবাসী হাজংরা সমতল অঞ্চলের মতো চাষ আবাদ জানতো না। তারা প্রতি বৎসর একই জমি আবাদ না করে 'ঝুম' প্রথায় চাষাবাদ করতো। জমিদারকে তাদের কোন নির্দিষ্ট খাজনা দিতে হতো না কিন্তু তার পরিবর্তে হাতি খেদার সময় তাদের ডাক পড়লে বিনা পারিশ্রমিকে তাদেরকে কায়িক শ্রম দান করতে হতো। এছাড়া জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সে সময়ে ফসল অথবা টাকা পয়সার কোন আদান প্রদান ছিলো না।

এই হাতি খেদাকে কেন্দ্র করেই এই অঞ্চলে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। হাতি বিক্রয় করে জমিদাররা প্রভূত ধন উপার্জন করতো এবং কৃষকদেরকে উপরোক্তভাবে এ কাজে শ্রম নিয়োগ করতে বাধ্য করতো। যারা এ ব্যাপারে অবাধ্য হতো তাদের ওপর অমানুষিক উৎপীড়ন চালানো হতো। এর ফলে উত্তরোত্তরভাবে জমিদারদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ১৮৩০ এর দিকে হাজং কৃষকরা জঙ্গলের মধ্যে স্থায়ী খেদাগুলি নষ্ট করে দিয়ে জমিদারদের এই ব্যবস্থা উচ্ছেদ করেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি এই অঞ্চলের প্রতি বৃটিশ বণিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তারা এলাকাটিকে জমিদারদের হাত থেকে নিজেদের দখলে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। মোগল আমলের কাগজ পত্র নিয়ে জমিদাররা প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত মামলা চালায় এবং তাদের পক্ষেই রায় হয়। কিন্তু পরে ১৮৬৯ সালে 'গারো পাহাড় এ্যাক্ট' প্রণয়ন করে বৃটিশ ভারতীয় সরকার সমস্ত গারো পাহাড় অঞ্চলকে বৃটিশ সরকারের অধিকারভুক্ত করেন।

এর পরবর্তী পর্যায়ে জমিদাররা নিজেদের আয়ের অন্য কোন পথ না দেখে আদিবাসী গারো হাজং ইত্যাদি প্রজাদের থেকে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করলো। স্থির হলো প্রত্যেক পরিবারের থেকে পৃথকভাবে খাজনা আদায় না করে গ্রাম ভিত্তিতে খাজনা আদায় হবে। গ্রামের

মোড়লরা কৃষকদের থেকে খাজনা আদায় করে জমিদারের পাওনা মিটিয়ে দেবে। এই আকস্মিক খাজনা ধার্যের বিরুদ্ধে প্রজারা ক্ষিপ্ত হলো এবং বিদ্রোহ করলো। ১৮৯০ এর দিকে সংগঠিত এই সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে জমিদাররা সমগ্র অঞ্চলে হাজং রক্তের বন্যা বইয়ে দিলো। হাজংরা জমিদারের খাজনার দাবীকে বাধ্য হয়েই স্বীকার করলেন।

এই অঞ্চলে জমিদারদের খাজনার দাবী স্বীকৃত হওয়ার পর পতিত জমিতে তারা নোতুন নোতুন প্রজা পত্তন করতে থাকে। এই সব জমির খাজনা অল্প হলেও জমি নেওয়ার সময় প্রজাদেরকে মোটা সালামী দিতে হতো। এই মোটা সালামী দিতে অধিকাংশ কৃষকই অক্ষম হওয়ার ফলে তাদের সাথে জমিদারদের ব্যবস্থা হয় যে, জমির জন্যে কৃষককে টাকায় খাজনা দিতে হবে না। তারা ফসলে খাজনা দান করবে কিন্তু সেই খাজনা টাকায় খাজনার মতো নির্দিষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ ফসলের উৎপাদনের ওপর তা নির্ভরশীল না থেকে জমি বিলির সময়েতেই নির্দিষ্টভাবে ধার্য হবে। অনাবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদির জন্যে যদি ফসল নাও হয় তাহলেও কৃষকরা প্রজা হিসেবে জমিদারকে খাজনা দিতে বাধ্য থাকবেন। নির্দিষ্ট ফসলে দেয় এই খাজনা প্রথাকেই বলা হয় টঙ্ক প্রথা।

কিন্তু টঙ্ক খাজনা দানকারী কৃষক বা টঙ্কাদারের কোন জোত স্বত্ব এর দ্বারা স্বীকৃত হয় নি। তার ফলে জমিদার প্রতি বৎসরই নোতুন নোতুন কৃষককে ইচ্ছেমতো হারে খাজনা নির্দিষ্ট করে জমি বিলি করতে পারতো এবং কার্যতঃ করতোও তাই। কিন্তু এই টঙ্ক প্রথায় জমির ওপর পুরুষানুক্রমিক তো নয়ই, এক পুরুষেরও কোন জোতস্বত্ব না থাকলেও টঙ্ক ধানের ঋণের বোঝা মৃত কৃষকদের সন্তানদেরকে বইতে হতো। কৃষকদের জমির কোন স্বত্ব না থাকলেও তাই তাদের ঋণের দায়িত্ব ছিলো পুরুষানুক্রমিক।

টঙ্ক প্রথায় নির্দিষ্ট ফসলে যেভাবে কৃষককে খাজনা দিতে হতো তাতে খাজনার হার উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের কম হতো না। ১৯৩৭-৩৮ সালের কৃষক আন্দোলনের পর ১৯৪০ সালের ফজলুল হক মন্ত্রীসভার আমলে টঙ্কাদারদেরকে জমিতে স্বত্ব কিছুটা দান করা হয় এবং তার ফলে টঙ্ক খাজনার হারও কিছুটা কমে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালের হিসেবে একর প্রতি টঙ্ক খাজনা যেখানে পড়তো ৪০৲ টাকা হইতে ৭০৲ টাকা সেখানে সাধারণ প্রজাদের খাজনা দাঁড়াতো ৬৲ টাকা মাত্র। ১৯৫০ সালে

পূর্ব বাঙলার রাজস্ব মন্ত্রী তফজ্জল আলী পরিষদে যে হিসেব দেন তাতে টঙ্কাদারদের একর প্রতি ধানী খাজনা দেখা যায় ৩ মণ ৩৩ সের, নগদ অর্থে যার পরিমাণ তৎকালীন মূল্য অনুযায়ী দাঁড়ায় ঐ অঞ্চলে অন্যান্য প্রজাদের দেয় রাজস্বের ৮ গুণ।[১৩]

হাজং অধ্যুষিত এলাকায় টঙ্ক বিরোধী আন্দোলনের সূচনা ও বিকাশ

১৯৩৭ সালের শেষ দিকে সুসঙ দুর্গাপুরের জমিদারদের ভাগ্নে মণি সিং জেল থেকে মুক্তি লাভের পর তাঁকে দুর্গাপুরে অন্তরীণ রাখা হয়। মনি সিং ইতিপূর্বে মেটিয়াবুরুজে কেনারাম সূতাকলের শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন, কৃষক আন্দোলনের কোনরূপ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিলো না। কিন্তু এই অন্তরীণ অবস্থায় তিনি দুর্গাপুরের পার্শ্ববর্তী দশাল গ্রামের কয়েকজন কৃষকের সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকদের বহুবিধ সমস্যা, বিশেষতঃ টঙ্ক প্রথার উৎপীড়নের সাথে পরিচিত হন। স্থানীয় কৃষকদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা তাঁকে সুসঙ-দুর্গাপুর অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। কৃষক আন্দোলনের কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় মণি সিং প্রথমে কৃষকদের এই প্রস্তাবে সম্মত হতে দ্বিধাবোধ করলেও তাঁদের উপর্যুপরি অনুরোধে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে নিয়ে জমিদারী ও টঙ্কপ্রথা বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করতে সম্মত হন।[১৪]

১৯৩৭ সালেই নেত্রকোণার অন্যান্য অঞ্চলে নগেন সরকার, জ্যোতিষ রায়, ক্ষীরোদ রায় প্রভৃতিও টঙ্ক প্রথা বিরোধী আন্দোলনে নামেন এবং মনি সিং সহ তাঁরা কয়েকজন তিনটি মূল দাবীকে কেন্দ্র করে সুসঙ-দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা থানায় আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই তিনটি দাবী হলো: টঙ্ক প্রথা উচ্ছেদ করে তার পরিবর্তে টাকায় খাজনা চালু করতে হবে, খাজনার হার কমাতে হবে এবং জোত-স্বত্ব দিতে হবে।[১৫]

প্রায় দুই বৎসর উপরোক্ত এলাকায় সংগঠনের প্রাথমিক কাজ চলার পর ১৯৩৯ সালে কিশোরগঞ্জে ময়মনসিংহ জেলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে হাজার হাজার হাজং কৃষক সুদূর পাহাড় অঞ্চল থেকে দলে দলে মিছিল সহকারে যোগদান করেন। কৃষক সমিতির একটানা কাজের

মধ্যে দিয়ে কলমাকান্দা, সুসঙ-দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নলিতাবাড়ী ও শ্রীবর্দী— এই পাঁচটি হাজং অধ্যুষিত থানায় টঙ্ক প্রথা বিরোধী আন্দোলনের অনেকখানি অগ্রগতি হয়। এই সব এলাকায় প্রধানতঃ হাজংদের বাস হলেও হিন্দু মুসলমান বাঙালী কৃষকদেরও এখানে বসবাস ছিলো এবং তাঁরাও এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে কৃষক সমিতি কর্তৃক সংগঠিত হন।[১৬]

এই অঞ্চলের গারো অধিবাসীরা আদিবাসী হলেও তাঁদের মধ্যে টঙ্ক প্রথা বিরোধী আন্দোলন প্রসার লাভ করে নি। তার মূল কারণ গারোদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো খৃষ্টান এবং খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রভাব তাদের ওপর ভয়ানক কার্যকর ছিলো। এই পাদ্রীরা সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসেবে গারোদেরকে সর্বপ্রকার আন্দোলন থেকে সরিয়ে রেখে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে সারা অঞ্চলে অক্ষুন্ন রাখতে অবিরাম সচেষ্ট থাকতো এবং সেই অনুযায়ী প্রচারণা চালাতো।[১৭]

১৯৪৩ সালের মে মাসে নলিতাবাড়ীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার অধিবেশন হয়। তারপর ১৯৪৫ সালের ৮-৯ই এপ্রিল নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন। এই সম্মেলনকে সফল করার জন্যে কয়েক শত হাজং কর্মী কয়েক সপ্তাহ অবিরাম পরিশ্রম করেন এবং পাহাড়িয়া অঞ্চল থেকে প্রবল জলধারার মতো মিছিল করে নেমে এসে তাঁরা সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলন একদিকে যেমন হাজং কৃষকদের মধ্যে জাগিয়েছিলো অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা তেমনি সম্মেলনে আগত দূর দূরান্তের কৃষক কর্মী ও নেতারা আদিবাসী হাজংদের রাজনৈতিক চেতনার মান লক্ষ্য করে হয়েছিলেন বিস্মিত এবং উদ্দীপ্ত।[১৮]

১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে ময়মনসিংহ জেলায় কৃষক আন্দোলন যথেষ্ট সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সেই সময় ব্যাষ্টিনকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট করে সেখানে পাঠানো হয়। নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর মহকুমার সংগঠিত কৃষক অঞ্চলগুলিতে, বিশেষতঃ সীমান্তের পাহাড় অঞ্চলগুলিতে, ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যাষ্টিন সামরিক ও পুলিশ বাহিনীকে মোতায়েন করে। এই সব অঞ্চলে কিষাণ সভার পরিচালনাধীনে জনগণের যে সব নির্বাচিত কমিটির মাধ্যমে ইউনিয়ন ট্যাক্স, জমিদারদের টঙ্ক ধান, বকেয়া খাজনা, মহাজনদের ঋণ ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো সেগুলিকে ধ্বংস করবার জন্যে ব্যাষ্টিন স্থানীয় ক্যাথলিক

মিশনগুলির সাহায্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলো এবং কৃষকদেরকে নানাভাবে ভীতিপ্রদর্শন শুরু করলো। অসংখ্য কৃষক কর্মী ও নেতাদের নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হলো এবং কৃষকদেরকে জমিদারদের টঙ্ক ধান, মহাজনের ঋণ, ইউনিয়ন ট্যাক্স ইত্যাদি পরিশোধের হুকুম জারী করলো। কৃষকরা কিন্তু ব্যাষ্টিনের সমস্ত দাবী প্রত্যাখ্যান করে তাকে জানালেন যে, যে টঙ্ক প্রথাকে তাঁরা ইতিমধ্যে উচ্ছেদ করে দিয়েছেন নোতুন করে তা প্রবর্তন করতে তাঁরা দেবেন না। তাছাড়া খাজনা, ঋণ ইত্যাদি ব্যাপারেও তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং কর্মসূচীই বহাল থাকবে। তবে টঙ্ক ধানের পরিবর্তে অনুমোদিত ব্যবস্থা অনুযায়ী নোতুন হারে টাকায় খাজনা দিতে তাঁদের আপত্তি নেই।

এই প্রতিরোধের মুখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যাষ্টিন সামরিক বাহিনী ও পুলিশের সাহায্যে ১৯৪৭ এর জানুয়ারী মাসে এই এলাকায় ব্যাপক লুট-তরাজ, মারপিট ও ধর্ষণ চালায়। কৃষকদের টঙ্ক ধান তাদের নিজেদের খামার থেকে জোরপূর্বক লুণ্ঠন করে তারা আন্দোলনের মেরুদণ্ড চূর্ণ করার প্রচেষ্টা করে। কিন্তু আন্দোলনের পরিস্থিতি তখন এমনই ছিলো যে, কোন প্রকার নির্যাতনই তৎকালীন কৃষক কর্মী ও সংগ্রামী কৃষক জনতাকে দমন করতে সক্ষম হয় নি। উপরন্তু কৃষকরা নিজেদের ক্ষেত ও খামারের ধান এবং নিজেদের ইজ্জত রক্ষার সংগ্রামে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং প্রাণপণ করে আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখেন ও সম্প্রসারিত করেন। ১৯৪৭ এর ৩১শে জানুয়ারী 'ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স্‌' এর একটি বাহিনী সোমেশ্বরী নদীর তীরে বাহেরাতলী গ্রামে প্রবেশ করে মারপিট ধর্ষণ ইত্যাদি শুরু করে। স্থানীয় নেতৃত্ব সে সময় চিন্তা করছিলেন প্রকাশ্য দিবালোকে বাহিনীটিকে আক্রমণ করা সঠিক হবে কিনা। কিন্তু স্থানীয় কৃষকদের সংগ্রামী চেতনা ও প্রতিরোধের স্পৃহা তখন এমন এক পর্যায়ে ছিলো যে, নেতাদের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করে মহিলা কৃষক বাহিনীর রাসিমনি ও তাঁর সাথীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই সামরিক বাহিনীর দিকে দা, কুড়ুল ইত্যাদি হাতে নিয়ে অগ্রসর হন এবং সৈনিকদের সাথে হাতাহাতি লড়াই শুরু করেন। যে সৈনিকটি স্থানীয় কৃষক বধু কুমুদিনী (সরস্বতী)কে ধর্ষণ করেছিলো রাসিমনি স্বহস্তে দাএর আঘাতে তার মুণ্ডচ্ছেদ করেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই অপর একটি সৈনিকের গুলিতে ঘটনাস্থলেই রাসিমনি নিহত হন। রাসিমনির সাথী সুরেন্দ্র হাজং তখন

সেই ঘাতক সৈনিকটির বক্ষদেশ বর্শাবিদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন। কিন্তু পরক্ষণেই অপর একজন সৈনিকের গুলিতে সুরেন্দ্রের মৃত্যু ঘটে। সামরিক বাহিনীর নির্যাতন সত্ত্বেও এই দুই আত্মত্যাগী কৃষক কর্মীর মৃত্যু সমগ্র এলাকায় আন্দোলনকে পরাস্ত না করে তাকে আরও ব্যাপক, দৃঢ় এবং গভীর করে। ১৯৪৭ এর ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যাষ্টিনের পরিচালনায় সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতন এক চরম আকার ধারণ করা সত্ত্বেও সোমেশ্বরীর তীরে তীরে জমিদারী ও টঙ্ক প্রথা বিরোধী আন্দোলন অদমিত থাকে। শুধু সোমেশ্বরীর তীরবর্তী অঞ্চল নয়, সমগ্র ময়মনসিংহ জেলায় ধান ও জমির লড়াই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত থেকে কৃষক সংগ্রামের এক নোতুন দিগন্ত রচনা করে।[১৯]

এর পর ১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মাসে ভারত বিভক্ত হয়ে উত্তরের পাহাড়ী অঞ্চল সহ ময়মনসিংহ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঠিক পরবর্তী পর্যায়ে এই এলাকার আন্দোলন কিছুদিনের জন্যে স্তিমিত থাকলো। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলো না। মুসলিম লীগের নির্যাতনমূলক শাসন শোষণ এবং এই এলাকায় টঙ্ক প্রথা, লেভী ও সাধারণভাবে জমিদারী অত্যাচার এত বৃদ্ধি লাভ করলো যে, ১৯৪৯ সালের গোড়া থেকেই কৃষক আন্দোলনের এই এলাকায় দ্রুতগতিতে এক সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো।

পাকিস্তানোত্তরকালে হাজং অধ্যুষিত অঞ্চলে লেভীর জুলুম এবং জমিদারী ও টঙ্ক প্রথা বিরোধী আন্দোলন

১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাস থেকেই হাজং অঞ্চলে লেভীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন উর্ধ্বগতি লাভ করলো। কৃষকদের সম্মিলিত জাঠা মার্চ শুরু হলো এবং দিকে দিকে আওয়াজ উঠলো: 'জান দিব তবু ধান দিব না,' 'কৃষকদের উদ্বৃত্ত ধান নগদ মূল্যে ক্রয় কর', 'লেভীর জুলুম বন্ধ কর', 'টঙ্ক ও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করো।' পূর্ব বাঙলা সরকার এই পরিস্থিতিতে আনসার বাহিনী ও পুলিশের সাহায্যে লেভী ধান আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের বাহিনীকে সেখানে প্রেরণ করলো এবং সেই বাহিনী তাদের অভ্যস্ত পদ্ধতিতে সমগ্র এলাকায় জোর জুলুম, মারপিট, ধর্ষণ ইত্যাদির সাহায্যে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলো। এই

সন্ত্রাস কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষকদেরকে দমিত না করে তাঁদের মধ্যে বিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিলো, প্রতিরোধের সংকল্পকে দৃঢ়তর করলো।

১৯৪৯ সালের ৮ই জানুয়ারী জমিদারের লোকেরা কলমাকান্দা থানার চৈতন্যনগরের নীলচাঁদ হাজং এর বিশ মণ টঙ্ক ধান নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসীরা তাদেরকে বাধা দিয়ে ধান ছিনিয়ে নিলেন এবং তা আবার নীলচাঁদের গোলায় তুলে দিলেন। ধান রক্ষার সংগ্রামে এই সাফল্য প্রচার বাহিনীর মাধ্যমে চারিদিকে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়লো এবং সমগ্র এলাকায় এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করলো।[২•]

এর পর ১৫ই জানুয়ারী বটতলা গ্রামের টঙ্ক ধান নেওয়ার সময় সেখানেও বাধা পড়লো। জমিদারের লোকেদের এইভাবে পর্যুদস্ত ও ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ পেয়ে কলমাকান্দা থানার দারোগা ৬ জন সশস্ত্র পুলিশ, কয়েকজন চৌকিদার ও আনসার বাহিনীসহ বটতলা উপস্থিত হয়ে ৫ জন কৃষককে গ্রেফতার করে নির্মম প্রহার শুরু করলো। প্রহারে জর্জরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের একজন পুলিশকে ধানের সন্ধান বলে দেওয়ার পর দারোগা ২৫ মণ টঙ্ক ধান গরুর গাড়ী বোঝাই করে রওয়ানা হলো। কিন্তু গাড়ী অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই কৃষকরা তা ঘেরাও করে ধান ফেরৎ চাইলেন। জবাবে আনসাররা লাঠি চালনা করে কয়েকজন কৃষককে আহত করলো। এই আক্রমণের ফলে গ্রাম বাসীরাও উত্তেজিত হয়ে আনসারদেরকে আক্রমণ করলেন এবং পরস্পরের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই শুরু হলো। এর পর পুলিশ ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্দেশ্যে গুলি চালনা করলো কিন্তু কৃষকরা মাটিতে শুয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করলেন। এর পর তাঁরা আওয়াজ তুললেন, 'জান দিব তবু ধান দিব না।' পুলিশ দুইজন কৃষককে গুলি করে আহত করলো। কিন্তু তবু সংগ্রামী কৃষকরা গাড়ীর ধান বেহাত হতে দিলেন না। রাত্রির অন্ধকার ঘনায়মান দেখে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ ও আনসার বাহিনী দ্রুতগতিতে ঘটনাস্থল পরিত্যাগ করলো। ধানের গাড়ী টানা হেঁচড়ার মধ্যে গ্রাম অতিক্রম করে মাঠের মধ্যে এসে পড়েছিলো। কৃষকরা তখনকার মতো ধানের গাড়ী মাঠের মধ্যে রেখে আহত দু'জন সাথীকে নিয়ে গ্রামে ফিরলেন। বটতলার এই গুলিবর্ষণের খবর দাবানলের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। পরদিন লেঙ্গুরা কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে ৪০ জন জঙ্গী কৃষকের একটি বাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র সহ অন্যান্য হাতিয়ার এবং ঔষধপত্র নিয়ে বটতলায় উপস্থিত হলেন এবং মাঠ থেকে

ধানের গাড়ি গ্রামে ফিরিয়া আনলেন। আহত কৃষক দুজনকে তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন নিরাপদ আশ্রয়ে।[২১]

চৈতন্যগড়ে সুসঙ্গ জমিদারের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের একটা নোতুন কাছারীবাড়ী বসানো হয়েছিলো। ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৯, তারিখে সেই কাছারীবাড়ী লেঙ্গুরা মৌজার কৃষকরা দখল করেন। ২৭শে জানুয়ারী সকালে কাছারী প্রাঙ্গণে এক বিরাট কৃষক সমাবেশ হয় এবং সেখানে গণআদালত প্রতিষ্ঠা করে একজন তহশীলদার ও পাঁচজন বন্দী পেয়াদা ও পিওনের বিচার হয়। কাছারীর যাবতীয় আসবাব পত্র আটক করা এবং কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার পর সমগ্র মৌজার টঙ্ক ধান ও বকেয়া খাজনা রহিত ঘোষণা করা হয়। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার পুলিশের সাহায্যে কাছারী দখল করার চেষ্টা করলেও কাছারীর দখল কৃষকদের হাতেই থাকে। শুধু এই কাছারী বাড়ীই নয়। এর ফলে সমগ্র লেঙ্গুরা ইউনিয়নে কৃষকদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় কালিকাপুরে বিশ জন হাজং রমনী জমিদারদের দুই গাড়ী টঙ্ক ধান আটক করেন। গাড়ীর গাড়োয়ান ছিলেন একজন সহানুভূতিশীল বিহারী। তিনি কোন প্রকার আপত্তি না করে তাঁদের নির্দেশিত স্থানে ধান তুলে দেন। সুসঙ্গ দুর্গাপুর থানার মাইজপাড়া ইউনিয়নের চারুপাড়া গ্রামে বিশ্বেশ্বর সরকারের ১০০ মণ লেভী ধান সরকারী কর্মচারীরা জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়ার সময় কৃষকরা সম্মিলিতভাবে বাধা দেন এবং বিশ্বেশ্বরের কথা মতো তা স্থানীয় গরীব হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করেন। জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে এবং প্রায় প্রতিদিনই গোড়াশাও, গৌরীপুর, কালিকাপুর, গোপালপুর, ছনগড়া, ভেদীকুড়া, বগাঝোরা, জাঙ্গালিয়া, কমলপুর, বাগপাড়া, কাশীপুর, কালিকাবাড়ি প্রভৃতি গ্রামে মহাজনদের ধান, টঙ্ক ধান ও লেভী ধান কৃষকরা আটক করতে থাকেন। ফলে এই এলাকায় সরকার ও জমিদার মহাজনদের সর্বপ্রকার আদায় বন্ধ হয়ে যায়।[২২]

লেঙ্গুরা পুলিশ ক্যাম্পের সামনের ময়দানে ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৪৯, তারিখে ৫ হাজার কৃষকের এক বিরাট সভা হয়। শুধু পার্শ্ববর্ত্তী এলাকা থেকে নয়, দূর দূরান্ত থেকেও কৃষকরা এই সভায় যোগদান করেন। সভায় বক্তারা বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, টঙ্ক প্রথা রদ, সরকারের রাজস্ব ও কর আদায় এবং খাদ্য সংগ্রহের কাজে স্থানীয় কমিটিগুলির

সহযোগিতা গ্রহণ ইত্যাদির দাবী জানান এবং সেই মর্মে প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় এবং লিখিত ভাবে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান হয়। এইভাবে বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক জমিদারী ও টঙ্ক প্রথা বিরোধী সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই সময় সারা ময়মনসিংহ জেলার হিন্দু-মুসলমান কৃষকরা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবীতে যশোদলে এক সভা করেন। এর পর করিমগঞ্জ, তরাইল, যশোদল, নিয়ামতপুর, ঝাউগড়া, বালী, বাংলা প্রভৃতি স্থানের কৃষকরাও উপরোক্ত দাবীর ভিত্তিতে সংগ্রাম ঘোষণা করেন।[২৩]

১৯৪৭ সাল থেকে রাসিমণি ও সুরেন্দ্রের স্মৃতি উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে ৩১শে জানুয়ারীকে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হতো। ১৯৪৯ এর ৩১শে জানুয়ারীও শহীদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। বর্শার মাথায় লাল ঝাণ্ডা বেঁধে সেদিন বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষকরা চারুয়াপাড়ায় রাসিমনি ও সুরেন্দ্রের সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তার পর বিভিন্ন এলাকায় প্রচারের জন্যে তাঁরা দলবদ্ধভাবে বের হন। ঘোষগাঁও হাটের দিকে রওয়ানা হওয়া এই রকম একটি কৃষক প্রচার বাহিনী হাটের দেড় মাইল দক্ষিণে ভালুকাপাড়া গীর্জার সামনে পথ অতিক্রমের সময় একদল সরকারী সিপাহী তাঁদের পথ রোধ করে এবং কৃষক বাহিনীর কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার করে কলসিন্ধুর পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জবরদস্তি করতে থাকে। শান্তিপূর্ণ প্রচার দলটির পক্ষ থেকে তখন সিপাহীদেরকে বলা হয়, "আজ আমরা কোন বিরোধ করিতে আসি নাই, শান্তিপূর্ণভাবে শহীদ দিবস প্রচার করিতে আসিয়াছি।" কিন্তু কৃষক বাহিনীকে নিরস্ত্র ও দুর্বল মনে করে সিপাহীরা তাঁদেরকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নিজেদের বন্দুকে বেয়নেট পরাতে শুরু করলো। এই পরিস্থিতিতে হাজং কৃষক নেতা নয়ান হাজং সাথীদেরকে ঝাণ্ডা খুলে বর্শা ধরতে নির্দেশ দিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিস্থিতি পরিবর্ত্তিত হয়ে গেলো। একজন সিপাহীর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে তাঁরা তার বুকে বেয়নেট বসিয়ে দিলেন। কৃষক ও সিপাহীদের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই শুরু হলো। এর পর অন্য দুইজন সিপাহীও কৃষকদের হাতে নিহত হলো কিন্তু কৃষক পক্ষে কোন ক্ষয়ক্ষতি হলো না। দুটি রাইফেল তাঁরা সিপাহী-দের থেকে হস্তগত করলেন। এই ঘটনা সমগ্র এলাকায় আন্দোলনের উর্দ্ধগতি নির্ণয়ে সহায়ক হলো, কৃষকদের সংগ্রামী উদ্দীপনা অনেক বাড়লো।

আন্দোলনের ঢেউ সারা এলাকাকে প্লাবিত করলো। কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নলিতাবাড়ী থানার উত্তরে অসংখ্য গ্রাম কৃষক সংগ্রামের শক্তিশালী দুর্গে পরিণত হলো। সমগ্র পাহাড় অঞ্চল কৃষক জনতার রাজনৈতিক কর্তৃত্বে চলে এলো।[২৪]

১লা ফেব্রুয়ারী কৃষক কর্মীদের একটি দল কলসিন্দু পুলিশ ক্যাম্পের নিকটবর্তী নিতাই নদীর পাড়ে তাঁদের প্রচার কার্য চালাবার সময় প্রায় ৩০ জন সিপাহী ও ৫০ জন আনসারের এক বিরাট বাহিনীর দ্বারা আকস্মিকভাবে ঘেরাও হন। কৃষকরা সঙ্গে সঙ্গে ঝোপঝাড়, নদীর বাঁক ও আলের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করে আক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন। কৃষকদের এই ক্ষিপ্রগতি প্রস্তুতি দেখে সিপাহীরা তাদের অস্ত্রের জোর এবং সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও আর অগ্রসর হতে সাহস না পেয়ে দূর থেকেই তাদেব প্রতি গুলিবর্ষণ শুরু করলো। সেই গুলিতে দলের কারও কোন ক্ষতি না হলেও কলসিন্ধুর হাট থেকে ফেরার পথে জাঙ্গালিয়া পাড়ার রাসমণি ও রামচরণ নামে দুজন কৃষক সিপাহীদেব গুলিতে নিহত হন।[২৫]

২৮শে জানুয়ারী লেঙ্গুরা পুলিশ ক্যাম্পেব সামনের ময়দানে কয়েক হাজার কৃষক এক সভা করেছিলেন। এব সাতদিন পর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এখানেই হাজং আন্দোলনের ইতিহাসে সব থেকে বিখ্যাত কৃষক-সিপাহী সংঘর্ষ ঘটে। লেঙ্গুরার যে স্থানটিতে হাট বসে ঠিক তার পাশেই পরিখা ব্যারিকেড ইত্যাদি রচনা করে আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত ১৫ জন পাঞ্জাবী সিপাহী সহ ৩০ জন সিপাহীর ক্যাম্প। এই সিপাহীরা তাদের ক্যাম্পের সামনে অনুষ্ঠিত সভার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করলেও ২৮শে জানুয়ারী তারা কৃষকদেরকে আক্রমণ করে না এবং কৃষকরাও তাদের প্রতি কোন দৃষ্টি দেন না। দুই পক্ষই নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান এইভাবে রক্ষা করার জন্যে সেদিন কোন সংঘর্ষ ছাড়াই সেই কৃষক সভার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু ৪ঠা জানুয়ারী হাটের দিন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলো। সেদিন খুব ভোরে স্থানীয় দুজন দালাল ক্যাম্পের সুবেদারকে এই মর্মে মিথ্যা সংবাদ দেয় যে, পূর্ব রাত্রে টঙ্ক চাষীরা দলবদ্ধভাবে ক্যাম্প আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিয়েছে এবং হাট বসার পর সুবিধামতো কোন এক সময়ে তারা সেই আক্রমণ চালিয়ে ক্যাম্পের অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠন করবে। এই সংবাদ পুলিশ ক্যাম্পে যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করলো এবং যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে—এই আশঙ্কা করে তারপর থেকেই পাঞ্জাবী সুবেদারের নেতৃত্বে সিপাহীরা সশস্ত্রভাবে প্রস্তুত থাকলো।

প্রতি হাটবারের মতো ৪ঠা ফেব্রুয়ারীও বেলা ১১টার দিকে হাট বসলো। এই সময় ২৫ জন টংক চাষীর একটি প্রচার বাহিনী উত্তর দিক থেকে ধীরে ধীরে হাটের নিকটবর্তী হতে শুরু করলো। দা, ভোজালী ইত্যাদিতে সজ্জিত এই কৃষকরা হাতে লাল ঝাণ্ডা, পোষ্টার, ড্রাম, বিউগল ইত্যাদি নিয়ে হাটের কাছাকাছি এসে আওয়াজ তুললো: 'জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কর', 'ধান সিজ বন্ধ কর', 'জান দিব তবু ধান দিব না', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। হাটের কৃষক জনসাধারণও প্রচার দলটির এই আওয়াজের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রচার দলটির সাথে নিজেদের একাত্মতা ঘোষণা করলেন। এর পর হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রচার বাহিনীটির অধিনায়ক মঙ্গলচান এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন, "ভাইসব! স্বাধীনতা লাভের পরও আমরা অতীতের দুই শত বৎসরের মতোই পরাধীনতার জ্বালা যন্ত্রণা, অত্যাচার, অবিচার ভোগ করিতেছি। আজও জমিদারী উচ্ছেদ হইল না। শুধু তাহাই নহে, ৭ বৎসর আগে আমরা যে জমিদারী জুলুম গ্রাম হইতে দূর করিয়াছিলাম, আজ তাহাই আবার দেখা দিয়াছে। আবার নতুন করিয়া পুলিশ ক্যাম্প বসানো হইয়াছে। জুলুম করিয়া লেভী ধান আদায় করা হইতেছে। তাই আসুন আমরা আওয়াজ তুলি— জমিদারী প্রথার অবসান হোক, গরীব চাষীর ধানে লেভী নেই, এলাকার উদ্বৃত্ত নগদ মূল্যে ক্রয় কর।"

বক্তৃতা শেষ করে মঙ্গল চান হাট পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যে পথ ধরে তাঁরা অগ্রসর হবেন সেটি পুলিশ ক্যাম্পের ধার ঘেঁসে, প্রায় ২০।২৫ গজ দূর দিয়ে। প্রচার বাহিনীটি যখন ঠিক সেই পরিমাণ দূরত্বে উপস্থিত হলো ঠিক তখনই পুলিশ ক্যাম্প থেকে তাদের ওপর গুলি বর্ষিত হলো। ঘটনার আকস্মিকতায় হাটের লোকেরা যে যে দিকে পারলো পালাতে শুরু করলো। মাঠের মধ্যে কোন আড়াল না থাকায় অন্য উপায় না দেখে প্রচারবাহিনীর লোকেরা মাটির ওপর শুয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করলেন। বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে মঙ্গলচান সাথীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'ভাইসব! আজ আমাদের বিপ্লবী জীবনের কঠিন পরীক্ষা, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার একমাত্র উপায় শত্রুকে প্রতি আক্রমণ করা। সুতরাং চল আমরা বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হই।" বুকে হেঁটে এবং হামাগুড়ি দিয়ে মঙ্গলচান ক্যাম্পের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছাতেই এক ঝাঁক গুলি এসে তাঁর সারা শরীরে বিদ্ধ হলো।

তিনি চীৎকার করে একবার আহ্বান জানালেন, "অগ্রসর হও।" তার পরই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটলো। মঙ্গলচানের মৃত্যুর পর অগেন্দ্র অন্যান্য সাথীদেরকে চীৎকার করে বললেন, "মঙ্গলদার রক্তের প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর হও।" সকলেই সেই নির্দেশ মতো অগ্রসর হয়ে ক্যাম্পের খুবই কাছাকাছি পেঁৗছালেন। কিন্তু ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে সিপাহীদের সাথে হাতাহাতি লড়াই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হলো না। অগেন্দ্রও অল্প-ক্ষনের মধ্যেই গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সাথীদের প্রতি আহ্বান জানালেন: "আমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিও, লাল ঝাণ্ডা তুলিয়া ধর।"

হাটের মধ্যেও অনেকে সিপাহীদের এলোপাথাড়ী গুলিতে আহত হলেন। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে হাটের লোকদের পক্ষে সমবেতভাবে পুলিশ ক্যাম্পে চড়াও করা সম্ভব হলো না। প্রচার বাহিনীর জঙ্গী কৃষকরাও ক্যাম্পের দিকে আর অগ্রসর হতে না পেরে মাটিতে মাথা নীচু করে কোনমতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকলেন।

ইতিমধ্যে মঙ্গলচান ও অগেন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ ও লড়াইয়ের সংবাদ বিদ্যুৎবেগে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচারিত হলো। দলে দলে জঙ্গী কৃষকরা লাঠি, জাঠা, দা, কুড়ুল, বর্শা ইত্যাদি হাতে নিয়ে হাটের দিকে দৌড়ে আসতে শুরু করলেন। তাঁরা আওয়াজ তুললেন: "হত্যার প্রতিশোধ চাই।" বেলা তিনটার দিকে সমগ্র পুলিশ ক্যাম্পটি চতুর্দ্দিক থেকে জঙ্গী কৃষকদের দ্বারা অবরুদ্ধ হলো। এই পরিস্থিতিতে সিপাহীরা স্থান ত্যাগ করে নিরাপদ হওয়ার জন্যে পলায়নের চেষ্টা শুরু করলো। ৩০।৪০ জন কৃষক তাদের সামনাসামনি অবস্থানে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখে পুলিশ ক্যাম্পটির ওপর দা, কুড়ুল, বর্শা, ইত্যাদি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সিপাহীরাও আত্মরক্ষার জন্যে মরিয়া হয়ে অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ করে চললো। অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের সাথে সেই সম্মুখ যুদ্ধে একে একে কৃষক বাহিনীর লোকেরা মৃত্যু বরণ করতে থাকলেন, কিন্তু পলায়ন অথবা পশ্চাদপসরণের চিন্তা কেউ করলেন না। হাজং মেয়েরাও এই লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করছিলেন। সংঘর্ষে শঙ্খমনি নামক এক হাজং বধু আহত হলে তাঁর স্বামী তাঁকে তাড়াতাড়ি সাহায্য করতে অগ্রসর হলে তিনি স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "মোকে না চা, শত্রুকে মার, ওলা রক্ত লা" (আমার দিকে তাকাইও না, শত্রুকে মার,

তাহার রক্ত লও)। তিন চার ঘণ্টা এইভাবে লড়াই চলার পর শঙ্খমনি, রেবতী, সারথী, যোগেন, বদক, স্বরাজ প্রভৃতি ১৫ জন বিপ্লবী কৃষক একে একে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বরণ করলেন। কিন্তু এত ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও কৃষকরা পিছু হটলেন না। সিপাহীরা পুলিশ ক্যাম্পে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েই থাকলো।

সন্ধ্যা নামার পর লড়াই থামলো এবং সেই সুযোগে অন্ধকারের মধ্যে সিপাহীরা পলায়ন করে সুসং দুর্গাপুরের পথে রওয়ানা হলো। ১২ জন দুর্দ্ধর্ষ গেরিলা দুই দলে বিভক্ত হয়ে তাদের পলায়নের পথে ওঁৎ পেতে বসে ছিলেন। জিগাতলার মাঠ অতিক্রম করে কলিকাপুরের মাঠে এসে পৌঁছাতেই তাঁরা বোমার সাহায্যে সিপাহীদের ওপর আক্রমণ চালালেন। এই আক্রমণের ফলে একজন সিপাহী নিহত হলো, আহত হলো ছয় জন। গেরিলা দলটির কোন ক্ষয়ক্ষতি হলো না এবং সিপাহীরা অন্ধকারের মধ্যে পলায়ন করলো। পরদিনই সমগ্র সুসং পরগনায় শতাধিক সিপাহীর সমাবেশ করা হলো।

ময়মনসিংহের হাজং অঞ্চলের জমিদারী ও টঙ্ক বিরোধী আন্দোলন এবং কৃষকদের সাথে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষের কোন সংবাদই প্রকৃত-পক্ষে পূর্ব বাঙলার তৎকালীন সংবাদ পত্রগুলিতে প্রকাশিত হতো না। কাজেই এই অঞ্চলের ঘটনাসমূহের সাথে দেশের জনগণের কোন পরিচয়ই তৎকালে ছিলো না বলা চলে। মাঝে মাঝে অবশ্য দুই একটি ঘটনা লোকমুখে রাজধানী ঢাকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে সরকারী মহল এবং জমিদার জোতদার মহাজনদের অনুগত পত্র পত্রিকায় বিকৃত-ভাবে সেগুলি সম্পর্কে সংবাদ প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত এবং আন্দো-লন থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা করা হতো। ৪ঠা ফেব্রুয়ারীতে লেঙ্গুরা হাটের সামনে যে কৃষক-সিপাহী সংঘর্ষ হয় সে বিষয়ে ময়মনসিংহ থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রেরিত দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিবরণটি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য:

> জানা গিয়াছে যে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মোমেনশাহী জেলার আসাম পূর্ব্ববঙ্গ সীমান্তবর্ত্তী এলাকাবাসী হাজং ও আদিবাসীগণ লাঠি তীর ধনুক বর্শা ও রামদা লইয়া লেঙ্গুরাস্থিত পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে। হাজংদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বলিয়া প্রকাশ। তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পুলিশদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু পুলিশের পাল্টা

আক্রমণ ও গুলিচালনার ফলে হটিয়া যায়। গুলিবর্ষণের ফলে ১০ জন হাজং নিহত ও আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে। পরে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করা হয় এবং অবস্থা আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পুলিশ হাজংদের কযেকটি গ্রামে হানা দিয়া ২৮ জনকে গ্রেফতার করিয়াছে এবং বহু তীর, ধনুক ও বর্শা উদ্ধার কবিযাছে। জানা গিয়াছে যে হাজংরা কিছুকাল যাবৎ সরকারের টঙ্ক ও কর সংগ্রহ পরিচালনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে। 'টঙ্ক' ব্যবস্থা অনুসারে নগদ টাকাব পবিবর্তে উৎপন্ন শস্যের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ জমিদাবগণকে দিতে হয়।

প্রকাশ যে, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পূর্বে উক্ত একই এলাকাব অন্তর্গত বালিগঞ্জে সীমান্ত বাহিনীর একজন সৈন্য নিহত হয়।[২৭]

৪ঠা ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর কৃষকরা উপলব্ধি করলেন যে সরকারী বাহিনীকে সশস্ত্রভাবে মোকাবেলা কবতে হলে শুধুমাত্র দা. কুড়ুল, বর্শা তীব ধনুক. ইত্যাদি দেশীয অস্ত্র দ্বাবা সেটা সম্ভব নয। তাব জন্যে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার অপবিহার্য। কাজেই এবপব থেকে তাঁবা পূর্ববর্ত্তী সংগ্রামের সময সংগৃহীত আগ্নেযাস্ত্রগুলি ব্যবহাবের জন্যে প্রস্তুতি শুরু করলেন। লেঙ্গুবা হাটেব ঘটনা দুর্গাপুব, নলিতাবাড়ী, শেবপুব ইত্যাদি কযেকটি লাগাতাব থানা অঞ্চলে কৃষক জনতাব সংগ্রামী চেতনাকে আরও উচচ পর্যাযে নিয়ে গেলো এবং কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকেও প্রচাব কার্যকে ব্যাপক ও গভীর কবাব উদ্যোগ গৃহীত হলো। এব ফলে চারিদিকে প্রচার বাহিনীর তৎপবতাও বৃদ্ধি পেলো।

৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে একদল জঙ্গী কৃষক কাকরকান্দী, বন্নিবাড়ী, কাউকালারা প্রভৃতি গ্রামে প্রচাব কার্য চালিয়ে শালমারা উপস্থিত হতেই আকস্মিকভাবে তাঁরা সিপাহীদেব একটি দলের মুখোমুখি পড়লেন। প্রচাব বাহিনীকে দেখা মাত্রই বিনা প্ররোচনায় সিপাহীরা গুলি বর্ষণ শুরু করতেই কৃষকরা বিরাট বিরাট শাল গাছের আড়ালে চলে গিয়ে তীর ধনুক বর্শা ইত্যাদি তাদের দিকে নিক্ষেপ করতে থাকলেন। এই সংঘর্ষ চলাকালে আরও ১৫ জন সিপাহী বহু আনসার এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সিপাহীদের শক্তি বৃদ্ধি করলো। সেই অবস্থায় চতুর্দ্দিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখে কৃষকরা সংঘর্ষ বন্ধ রেখে আত্মরক্ষার জন্যে

তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করলেন। এই লড়াইয়ে কৃষক দলের নেতা সতীন্দ্র ডালু মৃত্যু বরণ করলেন এবং চোখে গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্ধ অবস্থায় শচীন্দ্র ঘোষ সিপাহীদের হাতে বন্দী হলেন।[২৮]

ময়মনসিংহ থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী প্রেরিত এবং 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে ৯ই ফেব্রুয়ারীর দুটি ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়:

জানা গিয়াছে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী মোমেনশাহী জেলার পূর্ব পাক আসাম সীমান্তবর্ত্তী উত্তর এলাকার গারো হাজং কমিউনিষ্টগণ লাঠি, তীর, ধনুক, বর্শা ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দুর্গাপুর থানার নিকটস্থ 'সেঙ্গু' এবং হালুয়াঘাট থানার উপকণ্ঠস্থ 'পুলিশ ক্যাম্প' আক্রমণ করিলে, পুলিশ বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করিয়া গুলি চালায়। ফলে, হালুয়াঘাট থানার নিকটস্থ ঘটনাকেন্দ্রে কমিউনিষ্ট পক্ষের ১ জন নিহত এবং ৬ জন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। লেঙ্গুরাস্থ ঘটনা কেন্দ্রের হতাহতের খবর এখন পাওয়া যায় নাই। প্রকাশ পূর্ব প্রকাশিত সরকারের টঙ্ক ও খাদ্য সংগ্রহনীতির বিরুদ্ধাচরণই এই সমস্ত সংঘর্ষের মূল কারণ। আর এক খবরে প্রকাশ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হালুয়াঘাট, নলিতাবাড়ী এবং শ্রীবর্দী থানাত্রয়ে ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। আরও প্রকাশ অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী এবং ই. বি. রেজিমেণ্ট রাইফেল্‌স্ উক্ত অঞ্চলে প্রেরণ করা হইয়াছে। বর্তমান অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত।[২৯]

ময়মনসিংহের হাজং অঞ্চলে কৃষক-সিপাহী সংঘর্ষ এবং সিপাহীদের কৃষক নির্যাতন সম্পর্কে এই সময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' ইত্যাদি পত্রিকায় মন্তব্যসহ কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সব সংবাদের প্রতিবাদ করে পূর্ব বাঙলা সরকার ১৬ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রেস নোট জারী করেন:

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রকাশিত ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার একটি খবরের প্রতি পূর্ববঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। মোমেনশাহী জেলার আংশিক বহির্ভুত এলাকায় সাম্প্রতিক গোলযোগ সম্পর্কে উক্ত সংবাদে মিথ্যা

বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে বাধ্যতামূলক ধান্য সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান দিতে অস্বীকার করায় প্রায় একশত জনেরও অধিক কৃষককে গুলি করিয়া নিহত করা হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনাটি এইরূপ:

উক্ত এলাকার হাজংদের আন্দোলন প্রায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্যস্বরূপ। ১৯৪৬ সালে একবার তাহাদের আন্দোলন এত ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল যে, অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনিতে বাংলা সরকারকে পুলিশ প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। জনসাধারণের 'অনুন্নত অবস্থার সুযোগে টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে পুরাতন আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে হাজংরা কয়েকটি সভা ও শোভাযাত্রায় টঙ্কপ্রথা, খাজনা ও ধান্য সংগ্রহের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। তাহারা বর্শা, দাও প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। কয়েকবার তাহারা ধানও লুঠ করে। ২৮শে জানুয়ারী সীমান্ত পুলিশ দলের জনৈক নায়েক তাহাদের হস্তে নিহত হয়। একজন পুলিশ কনষ্টেবলকেও হাজংরা বেদম প্রহার করে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কম্যুনিষ্ট হাজংদের এক বিরাট জনতা বর্শা ও দাও প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া লেঙ্গুরা থানার পুলিশ ক্যাম্পটি পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে। পুলিশ তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়া গুলি চালায়।

দুই ঘণ্টা পর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আরেকটি জনতা ঐ স্থানে জমায়েত হয়। পুলিশ তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য আবার গুলি চালায়। ৯ই ফেব্রুয়ারী দুর্গাপুর ও হালুয়াঘাট থানায় দুইটি স্থানেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ বারবার সাবধান করে। জনতা যখন ভীতি প্রদর্শন করে এবং অবস্থা যখন আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, তখনই পুলিশ গুলি করে। এ পর্যন্ত মোট ১৩ জন নিহত হইয়াছে। বর্তমানে অবস্থা শান্ত।[৩০]

বেসরকারী অথবা সরকার বিরোধী সংবাদপত্র সমূহের কণ্ঠরোধ, সাংবাদিকদের ওপর যথেচ্ছ নির্যাতন, রাজনৈতিক কর্মীদেরকে অবাধে কারাগারে নিক্ষেপ ইত্যাদি বিবিধপ্রকার জোরজুলুমের মাধ্যমে ১৯৪৯-এর দিকে পূর্ব বাঙলা সরকার সব রকম বিরোধী শক্তিকে দমন করতে কৃতসঙ্কল্প ছিলো। সেই পরিস্থিতিতে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে হাজংদের ওপর নির্যাতনের

কোন প্রতিবাদ কারো পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এবং সে চেষ্টা কেউ করলে তাদেরকে সরকার ও সরকার প্রতিপালিত সংগঠনগুলির দ্বারা নির্যাতিত হতে হতো। ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯, এ ধরনেরই একটি ঘটনা ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র ফেডারেশনের* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ময়মনসিংহের হাজং কৃষকদের ওপর পুলিশের গুলি বর্ষণ ও কৃষক হত্যার প্রতিবাদে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি ছাত্র সভা আহ্বান করে। মোহাম্মদ বাহাউদ্দীনের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হওয়ার পরই দেখা যায় একদল ছাত্র** জোরপূর্বক সভা ভেঙ্গে দিতে বদ্ধপরিকর। এদের মধ্যে একজন 'সভা কে আহ্বান করেছে' সেটা জানতে চায় এবং সভাপতির হাত ধরে টেনে তাঁকে চেয়ার থেকে ফেলে দেয় এবং অন্য একজন সভাপতির চেয়ারটি পার্শ্ববর্ত্তী পুকুরে নিক্ষেপ করে। এর পর সেই গুণ্ডা ছাত্রদল সভাটির উদ্যোক্তাদের উপর ইচ্ছেমতো কিল, চড়, ঘুষি ইত্যাদি চালাতে থাকে। ফলে সভাস্থলে এক দারুণ হট্টগোল গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় এবং সভার কাজ চালানো আর সম্ভব হয় না। এই গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে অবশ্য সভাস্থলেই একদল ছাত্র তীব্র প্রতিবাদ জানান।[৩১] এঁদের একজনের একটি পত্র নওবেলালে প্রকাশিত হয় এবং তাতে তিনি বলেন,

> সবাই বুঝিতে পারেন, যাহারা গুণ্ডামী করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেন তাহারা শুধু ছাত্র ফেডারেশনেরই শত্রু নন, তারা প্রত্যেকটি গণতন্ত্রকামী ছাত্র আন্দোলনেরই দুষমন। এরাই বাংলা ভাষা আন্দোলনে সরকারের দালাল সাজিয়া ছিলেন। এরাই জমিদারী উচ্ছেদ ব্যাপারে সরকারের

---

* দেশ বিভাগের পুর্বে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিষ্ট প্রভাবাধীন একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে এমনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে তার অস্তিত্ব রক্ষা আর সম্ভব হয় না এবং অল্পকাল পরেই তার বিলুপ্তি ঘটে।—ব.উ.

** এই ধরনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান তখন ঢাকাতে একটিই ছিলো। তার নাম নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ। সরকার ও মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংগঠনের ছাত্ররাই বিরোধীদলের সভাগুলিতে সুপরিকল্পিতভাবে গুণ্ডামী করতো। এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেই দবিরুদ্দীন নঈমুদ্দীন আহমদ, আজিজ আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, শেখ মুজিবর রহমান, আবদুল মতিন প্রভৃতি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' নামে একটি নোতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

জমিদার পোষণ নীতির সমর্থন করেন। সর্বোপরি এরা হাজং চাষীদের উপর গুলি বর্ষণ নীতির দিক দিয়া সমর্থন করেন।[৩২]

১৯৪৯ এর ফেব্রুয়ারী মাসেই সুসং দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট ও নলিতাবাড়ী থানায় সর্বমোট ২৫টি পুলিশ ক্যাম্পে সশস্ত্র সিপাহীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলো। এ ছাড়া আনসার বাহিনীকেও সেখানে মোতায়েন করা হলো। এইসব সিপাহী ও আনসারেরা দরিদ্র কৃষক জনগণের ওপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করলো। এই পরিস্থিতিতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১টার দিকে একজন উচচ পদস্থ পুলিশ কর্মচারী বহু সংখ্যক সিপাহী ও আনসার সাথে নিয়ে নলিতাবাড়ী এলাকায় আন্দোলনের গোপন কেন্দ্রস্থল হলদিগ্রাম ঘেরাও করে সকালের দিকে আক্রমণের প্রতীক্ষায় থাকলো। গোপন কেন্দ্রে এই সংবাদ কমিউনিষ্ট পার্টির সংবাদবাহকদের মাধ্যমে রাত্রেই পেঁৗছালো। সেখানে যে সমস্ত নেতারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা তৎক্ষণাৎ স্থির করলেন যে, ভোরের জন্য অপেক্ষা না করে রাত্রিকালেই তাঁরা তাঁদের গোপন কেন্দ্র পরিত্যাগ করে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবেন। দুই দলে বিভক্ত হয়ে পাহাড়িয়া পথে জঙ্গী এবং অভিজ্ঞ গেরিলাদের সামনে রেখে তাঁরা শত্রুপক্ষের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থান লক্ষ্য করে অগ্রসর হলেন। মেয়েরাও পুরুষদের ছদ্মবেশে দুই দলেই বিভক্ত থাকলেন। অল্প কিছুদূর অগ্রসর হতেই একজন স্থানীয় চৌকিদার তাঁদের গতিবিধি অনুমান করে সিপাহীদেরকে সতর্ক করার সাথে সাথে সিপাহীরা তাঁদের ওপর টর্চের আলো নিক্ষেপ করে গুলি ছুঁড়লো। বিদ্রোহীরাও তার পাল্টা জবাব দিলেন। কিন্তু জবাব দিলেও তাঁরা কোন সরাসরি সংঘর্ষের মধ্যে না গিয়ে অভিজ্ঞ স্থানীয় কৃষকদেরকে অনুসরণ করে পাহাড়ের আড়ালে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে সমর্থ হলেন। এই দলে ছিলেন নেতাদের মধ্যে জিতেন মৈত্র এবং মহিলা কর্মী কণা পাল। রবি নিয়োগী ও জলধর পালের নেতৃত্বাধীন দলটি সিপাহীদের ব্যূহ ভেদ করতে সমর্থ হলেন না। তাঁদের সাথে সিপাহীদের সংঘর্ষ হলো এবং রবি নিয়োগী ও জলধর পালসহ কৃষক পক্ষের অনেকেই আহত হলেন। সিপাহীরাও অনেকে আহত হলো। পরদিন পুলিশ সমগ্র গ্রামটি জ্বালিয়ে দিয়ে এলাকা পরিত্যাগ করলো।[৩৩]

এই সংঘর্ষ এবং জখম ও গ্রেফতারের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে স্থানীয় জনগণের বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করলো এবং ১৬ই

ফেব্রুয়ারী সকালে তাঁরা নন্নী, বারোয়ামারী ও নলিতাবাড়ী সিপাহী ক্যাম্প আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। গুলি বর্ষণের দ্বারা পুলিশ বাহিনী এই বিক্ষুব্ধ জনতার মোকাবেলা করলো এবং গুলির সামনে আর অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। ক্রোধোন্মত্ত জনতা তখন জীপ ট্রাক ইত্যাদির সাহায্যে সিপাহীদের গমনাগমনে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পথের সেতু চূর্ণবিচূর্ণ করলেন। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে এই এলাকায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল ও পুলিশ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করে জনগণের ওপর অবাধ নির্যাতন শুরু হলো। ২৫ জন কৃষককে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করা হলো। লেঙ্গুরা হাটের ঘটনার পর থেকে প্রায় এক হাজার সিপাহীর এক সশস্ত্র বাহিনী সমগ্র অঞ্চলটিকে ঘেরাও করে রেখে কৃষকদের গৃহ লুণ্ঠন, তাঁদের ওপর সর্বপ্রকার শারীরিক নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, গৃহদাহ ইত্যাদির দ্বারা চারিদিকে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো। বিদ্রোহী কৃষকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে হাজং, গারো ও মুসলমান কৃষকদের নখের মধ্যে সূঁচ বিদ্ধ করে তারা স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা চালালো। টংক চাষীদের গবাদি পশু ও খাদ্যশস্য জোর পূর্বক দখল, ঘরদুয়ার ভেঙে তছনছ এবং পাইকারীভাবে জরিমানা আদায় করলো। সামান্য বকেয়া খাজনার দায়ে কৃষকদের অনেক টাকার সম্পত্তি ক্রোক করে তাঁদেরকে নিঃস্ব করলো। মার্চ মাসের এক ভোরে লক্ষ্মীকুড়া গ্রামে স্বয়ং ময়মনসিংহের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এক ট্রাক পুলিশ সাথে নিয়ে জীপে করে উপস্থিত হলেন এবং স্থানীয় নেতা চন্দ্র সরকারের বাড়ী ঘেরাও করলেন। চন্দ্র সরকার বাড়ীতে না থাকায় তিনি কোথায় আছেন সে বিষয়ে খবরাখবরের জন্যে তিনি বাড়ীর স্ত্রীলোকদের ওপর জোর জুলুম শুরু করে আসবাবপত্র চুরমার করলেন এবং চুলের মুঠি ধরে স্ত্রীলোকদেরকে টানতে টানতে ধান ক্ষেতের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ক্রন্দনরত শিশুদেরকে সিপাহীরা বুটের লাথি মেরে শায়েস্তা করার চেষ্টা করলো। কিন্তু এত নির্যাতন সত্ত্বেও চন্দ্র সরকারের কোন খবর তারা পেলো না।[৩৪]

১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে এইভাবে গ্রামবাসীদের ওপর সরকারী পুলিশ ও সিপাহীদের নির্যাতন ব্যাপক ও চরম আকার ধারণ করার পর বিদ্রোহী কৃষকরা সংগ্রামের কৌশল পরিবর্তন করলেন। তাঁরা আর গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে না থেকে বিভিন্ন এলাকায় কতকগুলি গেরিলা ক্যাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত করলেন। দুর্গম পাহাড়ী এলাকার মধ্যে তাঁরা সশস্ত্র

প্রতিরোধের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানগুলিতে পরিখা খনন ও শালের খুঁটির বেষ্টনী রচনা করে অম্বুলুকা, দাম্বুক, বেড়াখালি, মেলেং, পানিহাটা, রাংটিয়া, চান্দুভুঁই হালচাটি প্রভৃতি স্থানে ৯টি গেরিলা ক্যাম্প স্থাপন করলেন। এই সব অঞ্চলে আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের জন্যে তাঁরা তিনটি কারখানাও স্থাপন করলেন। এই সব কারখানাতে গাদা বন্দুক, দেশী পিস্তল, বড় বড় গাদা কামান এবং বিভিন্ন ধরনের হাত বোমা তৈরীর কাজ শুরু হলো। এই অঞ্চলের গেরিলাদের অন্যতম প্রধান অস্ত্র শিক্ষক ছিলেন শচী রায়। তিনি নিজ হাতে গোপন কামার শালায় ও কারখানায় বোমা বন্দুক ইত্যাদিও তৈরী করতেন। একদিন এইভাবে বোমা তৈরীর সময় বিস্ফোরণের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর সহকর্মী পূর্ণ হাজং আহত হয়ে পরে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েন। ডক্টর অমিয় দাসগুপ্তের নেতৃত্বে চিকিৎসার জন্যে সাজ সরঞ্জাম, ঔষধপত্রাদিরও ব্যবস্থা যথাসম্ভব করা হলো। এ ছাড়া সারা বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যও এই ক্যাম্পগুলিতে তাঁরা সংগ্রহ করলেন। গ্রামের সাধারণ কৃষকগণও যথাসম্ভব একত্রে বাস করার জন্যে কয়েকটি জন-ক্যাম্প গঠন করলেন। এই সময় দিবাভাগে তাঁরা চাষাবাদ করতেন এবং সিপাহীদের আগমন যথাসময়ে জানা ও তাদের অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে পাহারা ও সঙ্কেতের ব্যবস্থা রাখতেন। এই সময় কৃষক সংগ্রাম সমগ্র এলাকাতে এমনভাবে সংগঠিত হয়েছিলো যে, গ্রামের ছোট ছোট শিশু ও বালকরাও সিপাহীদের আগমন লক্ষ্য করে গাছে চড়ে ও বাঁশি বাজিয়ে গ্রামবাসীদেরকে সতর্ক করে দিতো। ১৯৪৯ সালের মে মাসের দিকেই সংগ্রামী কৃষকদের প্রাথমিক প্রস্তুতি শেষ হলো এবং তারপর তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন বিভিন্ন এলাকার পুলিশ ক্যাম্প ও দালালদের আস্তানাগুলি রাত্রিকালে অতর্কিতে আক্রমণ করার। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমেই তাঁরা সানখোলা, সারনৈ ও হাতি পাগারের তিনটি ক্যাম্প রাইফেল, ষ্টেনগান, গাদা বন্দুক ও বোমার সাহায্যে আক্রমণ করলেন এবং তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। এরপর সিপাহীরা ক্যাম্পের চারিদিকে পেট্রোম্যাক্স লাইট জ্বালিয়ে ও সেণ্ট্রিবক্স স্থাপন করে পাহারার ব্যবস্থা করলো।[৩৫]

১৯৪৯ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে কৃষক বাহিনী ও সিপাহীদের মধ্যে ছোট বড়ো অসংখ্য সংঘর্ষ হলো। সরকারী সিপাহী পুলিশদের নির্যাতন যেমন অধিকতর ব্যাপক ও তীব্র

আকার ধারণ করলো তেমনি কৃষকদের প্রতিরোধও হলো পূর্বের থেকে অনেক বেশী সক্রিয় এবং সংগঠিত। আমীর খাঁ কুড়া থেকে জবরদস্তি-মূলকভাবে ধান আদায় করে নিয়ে যাওয়ার সময় দুজন আনসার কৃষকদের হাতে নিহত হলো। তাদের লাশ বস্তার মধ্যে পুরে সেই ধানের গাড়িতেই তাঁরা ফেরৎ পাঠালেন। খারনৈ, ঝলঝলিয়া, জামগড়া, সন্ধ্যাকুড়া, কাংসা প্রভৃতি গ্রামে ২৫টি মহাজনের খামারের ধান দখল করে সেগুলি দরিদ্র গারো ও মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হলো। বাগপাড়ায় মহাজনের খামারটিকে আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করা হলো। খিলাগড়ার মাঠে হাল চাষ করার সময় সিপাহীদের সাথে লড়াইয়ে ভীম, বদক ও রহিম নামক তিন জন কৃষক নিহত হলেন। দুইজন সিপাহী আহত হলো। এইভাবে মাঠে, হাটে, পথে প্রায়ই কৃষক-সিপাহী সংঘর্ষ অব্যাহত থাকলো। কুমার-গাতি কৃষক সমিতির সামনের মাঠে, ভূষণ-কুড়া গ্রামে, গোড়াগাওএ একের পর এক সংঘর্ষ হলো এবং উভয় পক্ষেই বহু লোক আহত হলেও অনেক কৃষককে সিপাহীরা গ্রেফতার করে জেলে পাঠালো। ভূবন কুড়া ইউনিয়নে সরকারী কর্তৃপক্ষ পাইকারী জরিমানা করলো। সেই জরিমানার ধান জোর পূর্বক আদায় করে নিয়ে যাওয়ার পথে গেরিলা নায়ক সুদর্শন মাত্র ৭ জন গেরিলা সাথী নিয়ে কড়ইতলা গ্রামের একটি ঝোপের আড়াল থেকে তিন চারটি হাত বোমা নিক্ষেপ করে পাঁচ সাত জন সিপাহীকে আহত করলেন। আনসার ও গাড়োয়ানেরা ভীত হয়ে দৌড় দিয়ে পলা-য়ন করলো কিন্তু ২০ জন সশস্ত্র সিপাহী ঝোপটি লক্ষ্য করে অজস্র গুলি বর্ষণ করতে থাকলো। এই গুলি বর্ষণের ফলে ঐ ঝোপের মধ্যেই সুদর্শন ও হরি সিং ডালু মৃত্যু বরণ করলেন।[৩৬]

যে সমস্ত স্থানীয় দালালরা পুলিশ ক্যাম্পে খবরাখবর সরবরাহ করতো তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। প্রয়োজনবোধে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হতো। কালিকাপুর, মাইজপাড়া, খিলাবই, কাংসা, চারুয়াপাড়া, ঘোষগাও, খারনৈ, রামচন্দ্র কড়া, মায়ধাসী, বিক্রিকুড়া, ধান-শাইল প্রভৃতি গ্রামের ৩০।৩৫ জন দালালকে এইভাবে গণআদালতের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাদের অস্থাবর সম্পত্তি জনগণের মধ্যে বিলি করা হয়, তাদের বাড়ী লুট করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র গেরিলারা দখল করেন। এইভাবে দালালদের নিকট থেকে গেরিলারা ২৫টির মতো বন্দুক দখল করতে সমর্থ হন।

কিন্তু যে সমস্ত জমিদার জোতদাররা কৃষকদের সাথে তৎকালীন পরিস্থিতিতে শত্রুতামূলক আচরণ করতো না তাদের কোন ক্ষতি করা হতো না। শেরপুরের এক জমিদার এই সব ঘটনার সময় একবার পাইক বরকন্দাজসহ বান্দরকাটা কাছারিতে খাজনা আদায়ের জন্য আসে। স্থানীয় প্রজারা কৌশলের সাথে তাকে বন্দী করে গেরিলা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেন। সেখানে গণআদালতের সামনে জমিদারটি প্রতিজ্ঞা করে যে, সে অথবা তার কোন বংশধর কোনদিনই আর সেই জমিদারীর উপস্বত্ব ভোগ দখল করতে আসবে না। এই প্রতিজ্ঞার পর গেরিলারা জমিদারটিকে মুক্তি দান করেন এবং নিরাপদে তাকে নিজেদের এলাকার বাইরে পাঠিয়ে দেন।[৩৭]

এই সংগ্রামের সময়কার জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটে কলমাকান্দা থানার জাগীরপাড়া গ্রামে। এক গভীর রাত্রে প্রায় ৫০০ শত সিপাহী, পুলিশ ও আনসার গ্রামটিকে ঘেরাও করে। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়ার ফলে কৃষকেরা পলায়ন অথবা প্রতিরোধের কোন সুযোগ পেলেন না। এই অবস্থায় রাত্রির অন্ধকারে শিশু বৃদ্ধ নারী নির্বিশেষে ৪০ জন গ্রামবাসীকে ঘুমন্ত থাকা কালেই হত্যা করা হয়। এইভাবে হত্যা, লুটতরাজ ইত্যাদির দ্বারা সরকার যে শুধু গেরিলাদের মোকাবেলার চেষ্টা করছিলো তাই নয়। তারা গেরিলাদের আশ্রয়দাতা গ্রামবাসীদেরকে সমূলে একের পর এক গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার অহরহ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলি দখল অথবা সেগুলির ওপর আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করতে অক্ষম হয়ে তারা সাধারণ গ্রামবাসীদেরকে আঘাত করে গেরিলাদেরকে দুর্বল করার নীতিই গ্রহণ করেছিলো। এজন্যে দিনের পর দিন গ্রামবাসীদের লাঞ্ছনা, অবমাননা ও নির্যাতনের অন্ত ছিলো না। সমগ্র এলাকায় এই অবস্থায় কৃষি কার্য প্রায় অচল অবস্থায় উপনীত হয়েছিলো এবং জনগণের অর্থনৈতিক জীবন পর্যুদস্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো। এই পরিস্থিতিতেই গ্রামবাসী ও গেরিলাদের ধৈর্যচ্যুতির ফলে রাণীপুরে সংঘটিত হয় এই এলাকার সর্ববৃহৎ সংঘর্ষ।[৩৮]

চেরাখালির জনক্যাম্পটি পাহাড়ের বাঁকে খুব সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলো এবং তারই কাছাকাছি পাহাড়ের অভ্যন্তরে ছিল গেরিলা ঘাঁটি। একদিন সিপাহীরা নলগড়া, কমলপুর, সোহাগীপুর প্রভৃতি গ্রাম এলাকা লুটতরাজ করে চেরাখালির নিকটেই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে দূরবীনের সাহায্যে চেরাখালীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলো। সিপাহীদেরকে ঐ

অবস্থায় দেখে গ্রামবাসীরাও কৌতুহলী হয়ে গ্রামের প্রান্তে এসে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে দাঁড়াতেই সিপাহীরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করলো। গুলির দ্বারা কেউ আহত না হলেও বিনা প্ররোচনায় এই গুলিবর্ষণ কৃষকদের মধ্যে ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি করলো। গ্রামের পশ্চাদভাগে অবস্থিত গেরিলা ক্যাম্প থেকেও গুলির আওয়াজ শুনে বিশ জন গেরিলা জঙ্গী কৃষকদের মধ্যে উপস্থিত হলেন। গেরিলা ও কৃষক-দের এই গতিবিধি লক্ষ্য করে সিপাহীরা তাদের অবস্থান পরিবর্ত্তন করে কিছুটা পিছু হটে রাণীপুরের খোলা মাঠে গিয়ে দাঁড়ালো। উত্তেজিত কৃষকরা এবং তাঁদের সাথে গেরিলারাও পরিণাম বিবেচনা না করেই খোলা মাঠে গিয়ে সিপাহীদের মুখোমুখি অবস্থান নিলেন। এই সুবিধা-জনক পরিস্থিতিতে সিপাহীরা কৃষক ও গেরিলাদের লক্ষ্য করে আবার গুলি বর্ষণ করলো। মাটিতে শুয়ে আত্মরক্ষা করলেও তাঁরা দেখলেন যে, সিপাহীরা তাঁদের দিকেই এগিয়ে আসছে। এরপর তাঁরা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই সিপাহীদের গুলি আবার বর্ষিত হলো। জঙ্গী কৃষকরা আবার মাটিতে শুয়ে আত্মরক্ষা করলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ এইভাবে আত্ম-রক্ষা সম্ভব হল না। বাধ্য হয়েই তাঁদেরকে বন্দুক, বোমা, তীর, বর্শা, দা ইত্যাদি নিয়ে সিপাহীদের মুখোমুখি হয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়াতে হলো। দুই পক্ষে শুরু হলো তুমুল লড়াই। এইভাবে এক ঘণ্টাকাল লড়াইয়ের পর গেরিলাদের হাত বোমা ও বন্দুকের কার্তুজ প্রায় শেষ হয়ে এলে, পাঁচ সাত জন উভয় পক্ষে হতাহত হলো। দূর পাল্লার লড়াই ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে পড়ায় গেরিলারা দ্রুতগতিতে সিপাহীদের নিকটবর্ত্তী হলেন। গেরিলা দলের নায়ক দুবরাজ ও ক্ষিরোদ সিপাহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চার পাঁচ জন সিপাহীকে গুরুতরভাবে আহত করলেন। এরপর সুবেদার নিজ হাতে রিভলবারের গুলি ও বেয়নেটের দ্বারা তাঁদের উভয়কেই হত্যা করলো। এই সময়ে অনন্ত ও চন্দ্র উভয়ে মিলিতভাবে একজন সিপাহীকে হত্যা করলেন। অনন্ত মৃত সিপাহীর রাইফেলটি নিয়ে দৌড় দিতেই একজন সিপাহীর গুলিতে নিহত হলেন। রাজেন্দ্র এবং অনু সুবাদারকে আক্রমণ করলেন কিন্তু তাঁরা উভয়েই গুলিতে তৎক্ষনাৎ নিহত হলেন। এরপর একের পর এক নীরেন্দ্র, বীরঙ্গ, রমেশ ও অতুল অপূর্ব সাহস ও বীরত্বের সাথে লড়াই করে মৃত্যু বরণ করলেন। সিপাহীদের মধ্যে নিহত হলো তিন জন। উভয় পক্ষে আহতের সংখ্যা দাঁড়ালো দশ পনেরো জন।[৩৯]

রাণীপুরের এই সংঘর্ষের পর এক বিপুল সংখ্যক সরকারী বাহিনী চেরাখালী জন-ক্যাম্প ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ দখল করে সেখানকার বাসিন্দাদের ওপর তাদের অভ্যস্ত পদ্ধতিতে অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে। গ্রামবাসীদের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করে, তাদেরকে যথেচ্ছভাবে মারপিট করে, নারী ধর্ষণ করে তারা সমগ্র অঞ্চলটিতে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। পঞ্চাশ জন কৃষককে তারা গ্রেফতার করে ময়মনসিংহ জেলে আটক রাখে এবং আটক অবস্থাতেই তাঁদের মধ্যে সাত জনের মৃত্যু ঘটে।[৪০]

১৯৪৯ এর অগাষ্ট মাসে ময়মনসিংহে বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্মী গ্রেফতার হন। ৭ই অগাষ্ট রাত্রে কোতোয়ালী পুলিশ ভ্রাম্যমান অবস্থায় মহম্মদ ওয়াজেদ আলী, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, রমেশ আচার্য্য ও রতুরাম চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। এর পর দিন, ৮ই অগাষ্ট সোমেশ আচার্য্য, বেনীমাধব রায় ও সুবোধ রায় পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেফতার হন। এঁদের থেকে পুলিশ কিছু সরকার বিরোধী কমিউনিষ্ট সাহিত্য, একটি ড্যাগার ও একটি ছুরি হস্তগত করে।[৪১]

এর পরবর্ত্তী পর্যায়ে আন্দোলন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এলেও সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচী ১৯৫০ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত বাতিল হয় নি। সে সময় ময়মনসিংহের উত্তর অঞ্চলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দলিল ও সংবাদ বহন করার সময় অশ্রুমনি, ভদ্রা ও রাহেলা নামে তিনজন মহিলা কর্মী সোমেশ্বরী নদী পার হওয়ার সময় গ্রেফতার হন। পুলিশ তাঁদেরকে নিজেদের ক্যাম্পে আটক রেখে সর্বপ্রকার নির্যাতনের দ্বারা তাঁদের থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। সে চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তারা তাঁদেরকে ময়মনসিংহ জেলে পাঠায়। পরে সেখান থেকে তাঁদেরকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে গিয়ে বহুদিন পর্যন্ত আটক রাখা হয়। এই সময় এক গভীর রাত্রে গোপন সংবাদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের রসদ বহন করার সময় রমনী কর কংস নদীর পাড়ে আকস্মিকভাবে সিপাহীদের হাতে ধরা পড়েন। সিপাহীরা তাঁর দেহ তল্লাসী করে পাঁচ হাজার নগদ টাকা পায়। সেই টাকা নিজেরা হস্তগত করার উদ্দেশ্যে রমনী করের গ্রেফতার সম্পর্কে কোন ডায়েরী না করে মাঠের মধ্যেই তাঁকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহ গোয়াতলার হাওড়ে নিক্ষেপ করে।[৪২]

৩১শে জানুয়ারী শহীদ রাসিমনি ও সুরেন্দ্রের মৃত্যু দিবস। ১৯৫০ সালে এই দিনটিকে পূর্ববর্ত্তী কয়েক বৎসরের মতো আবার শহীদ দিবস

হিসেবে পালনের ব্যবস্থা হলো। প্রথম শহীদ দিবস পালনের পর থেকে আরো অসংখ্য সংগ্রামী পার্টি কমরেড ও সাধারণ গরীব কৃষক ইতিমধ্যে শহীদ হয়েছেন। তাঁদের সকলেরই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এবার শহীদ দিবস খুব বিরাট আকারে পালন করার কর্মসূচী গৃহীত হলো। এবং তার ফলেই ঘটলো এই অঞ্চলের সংগ্রামী কৃষকদের সর্ববৃহৎ সশস্ত্র সমাবেশ।

সশস্ত্র বাহিনীর এই সমাবেশের স্থান নির্দিষ্ট হলো চান্দুভুঁই গ্রামের পাহাড় ঘেরা বিরাট উন্মুক্ত মাঠে। সমগ্র অঞ্চলের গেরিলা দলসমূহকে এই সমাবেশে সশস্ত্র অবস্থায় যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হলো। জঙ্গী কৃষক ও জনগণকেও নির্দেশ দান করা হলো যথা সম্ভব সশস্ত্র অবস্থায় সভায় যোগদান করতে। ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৫০, তারিখে দশজন করে গঠিত ৩০টি গেরিলা দল সভাস্থলের চারিদিকে রাইফেল, ষ্টেনগান, কার্তুজ বন্দুক, গাদা বন্দুক, হাত বোমা ইত্যাদি নিয়ে সতর্কভাবে পাহারা দিলেন এবং সেই সতর্ক পাহারার মধ্যে দেড় হাজার কৃষক নিজ নিজ দেশীয় অস্ত্র ও হাতিয়ার নিয়ে অসংখ্য লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে সভায় যোগদান করলেন। দূর থেকে এই অসংখ্য লাল ঝাণ্ডা দেখে সিপাহীরা দ্রুতগতিতে সভাস্থলের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতেই গেরিলারা দূর পাল্লার রাইফেল, বন্দুক ও বোমার আওয়াজ করলেন। এই পরিস্থিতিতে সিপাহীরা আর অগ্রসর হতে সাহস করলো না। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা ধরে চাঁন্দু ভুঁইয়ের মাঠে সমবেত কৃষকরা শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন এবং জমিদারী ও টংক প্রথার অবসান না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা নিলেন। সভা শেষ হওয়ার পর সাড়ে তিন শত আগ্নেয়াস্ত্র এক সাথে পর পর তিন তিনবার ফায়ার করা হলো এবং তার সাথে যুক্ত হলো বোমার আওয়াজ। দূর দূরান্ত থেকে যে সমস্ত কৃষক ও গেরিলারা এসেছিলেন তাঁরা সভাশেষে নিজ নিজ গ্রাম ও এলাকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এরপর সভার প্রস্তাব-সমূহ বিভিন্ন স্থান থেকে ডাক মারফৎ সরকারের কাছে পাঠানো হলো।[৪৩]

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বনবিভাগের এক গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়ে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর দুইশত সিপাই নালিতাবাড়ীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত রাংটিয়া পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত একটি গেরিলা ঘাঁটি আক্রমণ করলো। দশজন গেরিলা এই ঘাঁটিটিকে রক্ষার জন্যে বহুক্ষণ সেই বিরাট সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

গেরিলা নায়ক কালিয়া গুরুতরভাবে আহত ও কিশোর যোগেন্দ্র হাজং নিহত হওয়ার পর প্রতিরোধ অসম্ভব হয়ে পড়ায় তাঁরা পিছু হটতে বাধ্য হন এবং সরকারী সৈন্যবাহিনী ঔষধপত্র ও খাদ্য সামগ্রী সহ গেরিলা ঘাঁটিটি দখল করে। ফেব্রুয়ারী মাসেই সুসং এর বগাউড়া পাহাড়ের ওপর থেকে গেরিলারা বোমা নিক্ষেপ করে সিপাহীদের একটি চলন্ত মোটর ট্রাক বিধ্বস্ত করেন। এই আক্রমণে আট দশজন সিপাই আহত হয়। সুসং এর উত্তরে অবস্থিত ভবানীপুর পাহাড় থেকে আকস্মিকভাবে রাইফেল ও ষ্টেনগান চালিয়ে গেরিলারা একদল টহলদারী সিপাইকে আক্রমণ করে তাদের দুইজনকে হত্যা করেন। এইভাবে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত গেরিলারা নিজেদের অবস্থান রক্ষা করে সরকারী সিপাইদের বিরুদ্ধে খণ্ড খণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করেন।[৪৪]

এর পর তিনটি কারণে ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চলের হাজং অধ্যুষিত এলাকার এই জমিদারী ও টংক প্রথা বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রথমতঃ সরকার কর্তৃক জমিদারী ক্রয় আইন পাশ ও টংক প্রথার অবসান; দ্বিতীয়ত, ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা* এবং তৃতীয়তঃ কমিনফর্মের বক্তব্য অনুযায়ী কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক সশস্ত্র সংগ্রাম প্রত্যাহার।**

১৯৫০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাঙলা সরকার ঢাকা গেজেটের একটি বিশেষ সংখ্যায় ময়মনসিংহ আংশিক বহির্ভুত এলাকায় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯, প্রকাশ করেন। এই আইনের মাধ্যমে টংক প্রথার উচ্ছেদ করা হয়। ১৯৫০ সালের ১০ই মার্চ এই মর্মে রাজস্ব মন্ত্রী পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন:

> "স্যার, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকে উদ্ভূত প্রজাদের একাংশের খাজনা বিরোধী মনোভাব এবং সেই ভুল ধারণা নিরসনের জন্যে সরকারী পদক্ষেপের বিষয় আমি গত বৎসর আমার বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে সরকারের সেই সতর্কবাণীর ফলাফল আশানুরূপ হয়েছে এবং যে বৎসর সম্পর্কে আমরা পর্যালোচনা করছি (১৯৪৯—৫০) সে বৎসরে এ বিষয়ে একমাত্র ময়মনসিংহের আংশিক বহির্ভূত এলাকার হাজং

* চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

** 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'র প্রথম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

হাঙ্গামা ব্যতীত অন্য কোন এলাকা থেকে এ বিষয়ে কোন গণ্ড-গোলের সংবাদ আসেনি। স্যার, এই পরিষদের জানা আছে যে, ময়মনসিংহের আংশিক বহির্ভূত এলাকায় কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ প্রধানতঃ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শত্রুদের দ্বারা সৃষ্ট এবং এই দুষ্কৃতির মোকাবেলার জন্যে সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে আমি পরে পরিষদকে অবগত করছি।[৪৫]

"স্যার, আমার এই বক্তৃতার গোড়ার দিকে আমি ময়মনসিংহ জেলার আংশিক ধহির্ভূত এলাকায় হাজং হাঙ্গামার উল্লেখ করেছিলাম। টংকাদার নামে সাধারণভাবে পরিচিত ফসলে খাজনাদানকারী এই অঞ্চলের প্রজারাই প্রধানতঃ এই হাঙ্গামার সাথে জড়িত ছিলো। এই হাঙ্গামা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলো কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রজাদের বিক্ষোভের কিছু কারণও আছে। ১৮৮৫ সালের বাঙলাদেশ প্রজাস্বত্ব আইনের আওতার মধ্যে ময়মন-সিংহ আংশিক বহির্ভুত এলাকা প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪০, এর মাধ্যমে টংকাদারদেরকে প্রজার মর্যাদা দান করা হয়েছিলো এবং সেই আইনের ১১২ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার একটি বিশেষ সংশোধনমূলক জরীপ কার্যের মাধ্যমে টংকাদারদের দেয় ফসলে খাজনা কিছু পরিমাণে হ্রাস করা হয়েছিলো। কিন্তু এই হ্রাস সত্ত্বেও টংকাদারদেরকে গড়ে একর প্রতি বাৎসরিক ৩ মণ ৩৩ সের হারে ধান ফসলে খাজনা হিসেবে দিতে হয় যার মুদ্রামূল্য দাঁড়ায় ঐ এলাকায় প্রচলিত টাকায় খাজনার প্রায় আট গুণ। এটা স্বাভাবিকভাবেই টংকাদারদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে ও তাদের মধ্যে হাঙ্গামার উস্কানী দানের এবং অবাধ্যতার মনোভাব জাগিয়ে রাখার একটা তৈরী ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। এজন্যে সরকার টঙ্কাদারদের মধ্যে অসন্তোষের মূল উৎপাটনের প্রয়োজন বোধ করে তাদের ফসলে খাজনাকে ন্যায়ানুগ ও সঙ্গত টাকায় খাজনায় রূপান্তরিত করে সেই ধরনের হাঙ্গামার পুনরাবৃত্তি রোধের স্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সেই অনুযায়ী ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইনের ৯২ ধারার (২) উপধারা যে ভাবে গৃহীত হয়েছে তার অধীনে ময়মনসিংহ আংশিক বহির্ভূত এলাকা প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯, জারী করা হয়েছে যাতে করে টংকাদারদের দেয় ফসলে খাজনাকে এমনভাবে ন্যায়ানুগ ও সঙ্গত টাকায় খাজনাতে রূপান্তরিত করা যায় যাতে করে তা সংশ্লিষ্ট

জমির বাৎসরিক মোট উৎপন্নের এক অষ্টমাংশের বেশী না হয়। এই আইন ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০, এর বিশেষ ঢাকা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে এবং এই আইন অনুযায়ী কাজ যথাশীঘ্র সম্ভব শুরু করা হবে।'[৪৬]

৬

নাচোল কৃষক বিদ্রোহ

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, শিবগঞ্জ ও নাচোল—মালদহ জেলার এই পাঁচটি থানা রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এগুলিকে নিয়েই গঠিত হয় নবাবগঞ্জ মহকুমা। ১৯৪৭ সালে সারা বাঙলাদেশে তেভাগা আন্দোলন শেষ হওয়ার পর কোন জায়গাতেই সেই আন্দোলন আর পুনর্গঠিত হয় নি। এদিক দিয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলো নাচোল। সমগ্র নাচোল থানায় ছিলো বহুসংখ্যক সাঁওতাল কৃষকের বাস। প্রধানতঃ এই সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যেই গড়ে উঠেছিলো ১৯৪৮-৫০ সালের নোতুন পর্যায়ের তেভাগা আন্দোলন।

এই আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিলো নাচোল থানার চণ্ডীপুর—সাঁওতাল নেতা মাতলা সরদারের গ্রাম। মাতলা সরদারকে অবলম্বন করেই এই এলাকার কৃষক সংগঠন এবং আন্দোলন গড়ে ওঠে। তাঁর সহায়তায় অন্যান্য কর্মীরা সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যে ঘরোয়া বৈঠক ও রাজনৈতিক সভাসমিতি করতেন। মাতলা সরদারও সাঁওতালী ভাষাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দাবী ও বক্তব্যকে জনগণের সামনে খুব স্পষ্ট এবং জোরালো ভাষায় প্রকাশ করতেন। নাচোলের সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য। মাতলা সরদার ছাড়াও নবাবগঞ্জ মহকুমা ও রাজশাহী জেলার অন্যান্য এলাকার যে কয়েকজন নেতা এই এলাকার কৃষক সংগঠন ও আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁরা হলেন রমেন মিত্র, ইলা মিত্র, অনিমেষ লাহিড়ী, শিবু কোড়ামুদি, বৃন্দাবন সাহা, আজহার হোসেন ও চিত্ত চক্রবর্তী। পূর্ব বাঙলার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এঁদের সকলকেই আত্মগোপন করে থেকে সাংগঠনিক

কাজ চালাতে হতো। কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের সমগ্র অঞ্চলটিতে কৃষক সমিতির আধিপত্য অতি অল্প সময়েই যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তার ফলে তাঁদের চলাফেরা ও রাজনৈতিক কাজের স্বাধীনতা অনেকখানি প্রসারিত হয়েছিলো। শুধুমাত্র সাঁওতালরাই নয়, হিন্দু মুসলমান সাধারণ কৃষকরাও এই আন্দোলনের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকার ফলেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব সম্ভব হতে পেরেছিলো। কৃষক ঐক্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সমগ্র এলাকাতে কোন ফাটল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। নাচোলের তেভাগা আন্দোলন যেভাবে দ্রুতগতিতে বিকাশ ও পসার লাভ করেছিলো এবং কৃষকরা যেভাবে শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীলতার সাথে সমগ্র অঞ্চলকে আলোড়িত করেছিলেন তার দ্বারা কৃষকের বিপ্লবী শক্তির একটা নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায়। হাজার হাজার কৃষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজে যোগদান করেন। তীর, ধনুক, দা, বল্লম, সড়কি ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তাঁরা গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে বেড়ান, বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন, শান্তি যাতে অনর্থক বিঘ্নিত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল চণ্ডীপুরে ভলান্টিয়ারদের প্রধান ক্যাম্পে প্রতিদিন তখন চার পাঁচ শো ভলান্টিয়ার দুই বেলা আহার করতেন। এই ব্যয়বহুল ক্যাম্প চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও প্রধানতঃ বহন করতেন কৃষক ভলান্টিয়াররাই। আন্দোলন ও সংগঠনের এই অবস্থার জন্যে সমগ্র এলাকাটিতেই বেসরকারীভাবে তেভাগার রাজত্ব কায়েম হয়ে গেলো। নাচোলের এই অঞ্চলটিতে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের কর্তৃত্ব বাস্তবতঃ অসম্ভব শিথিল হয়ে এলো। জোতদাররা তেভাগার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা অথবা আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করার সব রকম ক্ষমতাই হারিয়ে ফেললো।[১]

এই অবস্থায় ১৯৫০ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে কৃষক সমিতির নেতারা আমন ধান কাটার উদ্দেশ্যে সকলকে বিভিন্ন এলাকায় সমবেত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানান। এই আহ্বান অনুযায়ী স্থানীয় কৃষকরা ৫ই জানুয়ারী দলে দলে সমবেত এবং ঐক্যবদ্ধভাবে ফসল তুলতে উদ্যোগী হন।[২]

স্থানীয় জোতদাররা এই উদ্যোগে আতঙ্কিত হয়ে থানায় খবর পাঠানোর পর নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা তফিজউদ্দীন তিন জন কনস্টেবলসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।[৩]

সমবেত সাঁওতাল কৃষক জনতা পুলিশের এই উপস্থিতিতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাদেরকে সরাসরি আক্রমণ না করে কৃষকরা পিছু হটে তাদেরকে নিজেদের এলাকার মধ্যে আরও কিছুটা প্রবেশ করার সুযোগ দেন। এইভাবে সাঁওতাল কৃষক এলাকায় অনেকখানি ভিতরে প্রবেশ করার পর কৃষকরা পুলিশ দলটিকে চারিদিক থেকে ঘেরাও করে তাদের মোকাবেলার জন্যে অগ্রসর হন। পুলিশরা কৃষকদেরকে বাধা দানের চেষ্টা করলে উত্তেজনা ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত এই উত্তেজনা এত বেড়ে ওঠে যে কারো পক্ষেই জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না এবং পুলিশ তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে একজন সাঁও-তালকে হত্যা করে।[৪] এরপর কৃষকরা এ. এস. আই সহ অন্য তিনজন কনষ্টেবলকে বন্দী করে তাদের রাইফেল কেড়ে নেন এবং তাদেরকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেলেন।[৫]

থানার দারোগা এবং কনষ্টেবলদের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর পেয়ে রাজশাহী জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার একদল সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশ-সহ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং স্থানীয় সাঁওতাল ও কৃষকদের উপর নির্মম নির্যাতন শুরু করে। মৃত চারজন পুলিশের লাশ তারা স্থানীয় কিছু লোকের সহায়তায় মাটি খুঁড়ে বের করে এবং রাজশাহী সদরে পাঠিয়ে দেয়।[৬]

নাচোল থেকে আট মাইল দূরে আমনূরা রেল ষ্টেশনে নামার পর থেকেই সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী নাচোল পর্যন্ত সমস্ত গ্রামের ওপরই নির্মম নির্যাতন চালিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু পুলিশদের লাশ রাজশাহীতে চালান দেওয়ার পরই শুরু হয় তাদের আসল অত্যাচার। গ্রামের পর গ্রাম নির্বিচারে জ্বালিয়ে দিয়ে, নির্মমভাবে কৃষকদেরকে মারপিট করে, সাঁওতাল নারীদেরকে যথেচ্ছভাবে ধর্ষণ করে, লুণ্ঠনকে অবাধ করে, তারা সমগ্র এলাকাটিতে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। পুলিশ হত্যার "উপযুক্ত" প্রতিশোধ নিতে তারা মরীয়া হয়ে ওঠে।[৭]

৫ই জানুয়ারীর এই ঘটনার সময় নেতাদের সকলে একই জায়গায় ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে যাঁরা নাচোলে তখন উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে ইলা মিত্র অন্যতম। রমেন মিত্র ছিলেন অন্যত্র। তিনি মাতলা সরদার সহ কয়েকশ জঙ্গী সাঁওতাল কৃষককে সাথে নিয়ে দ্রুত গতিতে সীমান্ত পার হয়ে ভারতীয় এলাকায় নিরাপদ হলেন।[৮] আজহার হোসেন

এবং অনিমেষ লাহিড়ী কয়েকদিন পর আজহার হোসেনের বাড়ীতে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।[৯] বদরপুর গ্রামে সাঁওতালদের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় চিত্ত চক্রবর্ত্তীকে পুলিশ ৮ই জানুয়ারী গভীর রাত্রিতে গ্রেফতার করে।[১০] ঐ একই দিন পুলিশের অত্যাচারে নাচোল এবং নবাবগঞ্জ পরিত্যাগ করে ট্রেনযোগে পলায়নের সময় একদল সাঁওতাল কৃষক রাজশাহীর কাছাকাছি গ্রেফতার হন।[১১]

কয়েকজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় কর্মীসহ তিন চারশো জঙ্গী সাঁওতাল কৃষকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ইলা মিত্র সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় এলাকার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু পথ সম্পর্কে তাঁর নিজের অথবা তাঁর সঙ্গীদের কারও নির্দ্দিষ্ট কোন ধারণা ছিলো না। এজন্যে তাঁরা সদলবলে রোহনপুর রেলষ্টেশনের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানেই সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অস্থায়ী আস্তানা করা হয়েছিলো সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে। দলটিকে সহজেই চিনতে পেরে সৈন্যবাহিনী তাঁদের সকলকেই গ্রেফতার করলো। ইলা মিত্র নিজে সাঁওতাল রমণীর বেশে সজ্জিতা ছিলেন। কিন্তু তাঁকেও সনাক্ত করতে তাদের কোন অসুবিধা হলো না।[১২]

এইভাবে ইলা মিত্রকে সদলবলে গ্রেফতার করার পর তাঁদেরকে নাচোল থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ তাঁদের ওপর কি নির্যাতন করেছিলো ইলা মিত্র নিম্নোক্ত ভাষায় তার বর্ণনা দান করেন :

> "ওরা প্রথম থেকেই নির্দয়ভাবে মারতে শুরু করল। শুধু আমাকে নয়, আমাদের সবাইকেই। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে এলো নাচোলে। আমি মারপিটের ফলে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম, আমার সর্বাংগে বেদনা। ওরা আমাকে একটা ঘরের বারান্দায় বসিয়ে রাখল। আমাদের সঙ্গে যে সকল সাঁওতাল কর্মীরা ছিল, আমার চোখের সামনে তাদের সবাইকে জড় করে তাদের উপর বর্বরের মত মারপিট করে চলল। আমি যাতে নিজের চোখে এই দৃশ্য দেখতে পাই, সেজন্যই আমাকে তাদের সামনে বসিয়ে রাখা হয়েছিল।
>
> ওরা তাদের মারতে মারতে একটা কথাই বারবার বলছিল, আমরা তোদের মুখ থেকে এই একটা শুনতে চাই, বল, ইলা মিত্র নিজেই পুলিশদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। এই কথাটুকু বললেই

তোদের ছেড়ে দেব। কিন্তু যতক্ষণ না বলবি, এই মার চলতেই থাকবে। মারতে মারতে মেরে ফেলব, তার আগে আমরা থামব না।
কথাটা তারা যে শুধু ভয় দেখাবার জন্য বলছিল, তা নয়, তারা মুখে যা বলছিল, কাজেও তাই করছিল। ও সে কি দৃশ্য। আর সেই দৃশ্য আমাকে চোখ থেকে দেখতে হচ্ছিল। এ কি শাস্তি! কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই হিংস্র পশুর দল আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে। রক্তে ওদের গা ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু কারু মুখে কোন শব্দ নাই, একটু কাতরোক্তি পর্যন্ত না। ওরা নিঃশব্দ হয়েছিল, কিন্তু দেখতে দেখতে কেঁদে ফেললাম আমি। এই দৃশ্য আমি আর সইতে পারছিলাম না। মনে মনে কামনা করছিলাম, আমি যেন অজ্ঞান হয়ে যাই। কিন্তু তা হলনা, আমাকে সজ্ঞান অবস্থাতেই সব কিছু দেখতে হচ্ছিল, কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না, এত দুঃখের মধ্যেও আমাদের এই বীর কমরেডদের জন্য গর্বে ও গৌরবে আমার বুক ভরে উঠছিল। একজন নয়, দুজন নয়, প্রতিটি মানুষ মুখ বুজে নিঃশব্দ হয়ে আছে। এত মার মেরেও ওরা তাদের মুখ খোলাতে পারছে না। এমন কি করে হয়! এমন যে হতে পারতো এতো আমি কল্পনাও করতে পারিনি।.. .. .. ..

প্রচণ্ড তর্জন গর্জনের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম, চেয়ে দেখি, হয়েককে দলের মধ্যে থেকে মারতে মারতে বার করে নিয়ে আসছে। ওদের মুখে সেই একই প্রশ্ন, বল, ইলা মিত্র সেই পুলিশদের হত্যা করবার আদেশ দিয়েছিল। না বললে মেরে ফেলব, একদম মেরে ফেলব। আমি চেয়ে আছি হয়েকের মুখের দিকে। অদ্ভুত ভাববিকারহীন একখানি মুখ। অর্থহীন দৃষ্টিতে শূণ্যপানে তাকিয়ে আছে। ওদের এত সব কথা যেন তার কানেই যাচ্ছে না। ক্ষেপে উঠল ওরা। কয়েক জন মিলে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। তারপর ওরা ওদের মিলিটারী বুট দিয়ে তার পেটে বুকে সজোরে লাথি মেরে চলল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, হয়েকের মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তার পর তার উপর ওরা আরও কতক্ষণ দাপাদাপি করল। একটু বাদেই এক খণ্ড কাঠের মত স্থির হয়ে পড়ে রইল হয়েক। ওদের মধ্যে একজন তাকে নেড়ে চেড়ে দেখে বলল, ছেড়ে দাও ওর হয়ে গেছে। এই বলে ওরা আর একজনকে নিয়ে পড়ল।"[১৩].. .. .. ..

খাদ্য এবং পানীয় ছাড়াই বন্দীদেরকে নাচোল থানা হাজতে আটকে রেখে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। বন্দীদের হাত পা বেঁধে রেখে পুলিশ কনস্টেবলরা প্রায় সারাক্ষণই স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে তাঁদেরকে নির্মমভাবে মারপিট করতে থাকে। ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং অমানুষিক প্রহারের ফলে ২৪ জন সাঁওতাল নাচোল থানা হাজতেই মৃত্যু মুখে পতিত হন।* নবাবগঞ্জে যখন তাঁদেরকে স্থানান্তরিত করা হয় তখনও তাঁদের ওপর অত্যাচার সমানে চলতে থাকে এবং সেখানেও বহুসংখ্যক সাঁওতাল মারা যান।[১৪] এর পর সাঁওতাল রাজবন্দীদের পুরোদলটিকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে অত্যাচার তাঁদের ওপর অব্যাহত থাকে। রাজশাহী জেলেতেও একটি ছোট ঘরের মধ্যে বিনা চিকিৎসায় রেখে, আধপেটা খাইয়ে এবং ক্রমাগত অত্যাচার করে অনেককে তারা হত্যা করে। কিন্তু সাঁওতাল রাজবন্দীদেরকে মারপিট করে তাঁদের হাড় গুঁড়ো করে দিলেও তাঁদের মধ্যে একজনের থেকেও পুলিশ কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে সক্ষম হয় না।[১৫] এদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাঁওতাল কমরেডদের এই অতীব বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা যে কতখানি গৌরবের বিষয় সে কথা বলাই বাহুল্য।

নাচোল থেকে রাজশাহী জেলের অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে ইলা মিত্র এবং এই সাঁওতালেরা যে শুধু পুলিশের দ্বারা নির্যাতিত নিগৃহীত হয়েছেন তাই নয়, স্থানীয় জনসাধারণ এবং জেলের অন্যান্য সাধারণ কয়েদীরা পর্যন্ত তাঁদের প্রতি অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করেছে। পাকিস্তান বিরোধী, হিন্দুস্থানের বাহিনী এবং শত্রুপক্ষের লোক এই সরকারী প্রচারণার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত এবং মুসলিম লীগের লোকজনদের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে এই মৃত্যু পথযাত্রী দেশ প্রেমিক সাঁওতালদেরকে তারা খাওয়ার পানি পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে স্পর্শ করতে দেয় নি।[১৬]

নবাবগঞ্জ থেকে ইলা মিত্র এবং অন্যান্য রাজবন্দীদেরকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলো। এই সময় থেকে শুরু করে এগারো মাস ইলা মিত্রকে একটি নির্জন সেলে একাকী বন্দী রাখা হয়েছিলো। ইলা মিত্র সহ সমস্ত সাঁও-তাল রাজবন্দীদের সপক্ষে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন কুমিল্লার

* সাঁওতালদের ওপর এই অত্যাচারের ব্যাপারে আমি নবাবগঞ্জের অনেক স্থানীয় লোকজনের সাথেও আলাপ করেছি। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায় একইভাবে অত্যা-চারের এই বর্ণনা দিয়েছেন।

উকিল ও রাজনৈতিক নেতা কামিনী দত্ত। মামলার দিন এগিয়ে আসছিল কিন্তু আদালতের সামনে জবানবন্দী দিতে গিয়ে ঠিক কি বলবেন সে বিষয়ে ইলা মিত্র কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না। এই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি রাজশাহী জেলেরই জানানা ফটকে আটক বরিশালের মনোরমা বসু, খুলনার ভানু দেবী প্রভৃতির কাছ থেকে গোপন পথে একটি যুক্ত চিঠি পেলেন যার মর্মার্থ হলো : 'পাকিস্তান সরকারের চরিত্র উদঘাটন করে দেবার পক্ষে এটাই সব চেয়ে বড় সুযোগ। আপনি এই সুযোগ কিছুতেই নষ্ট করবেন না। আদালতে আপনার জবানবন্দী দেবার সময়, আপনার ওপর যত কিছু অত্যাচার হয়েছে, আপনি তার সব কথা পরিস্কারভাবে খুলে বলবেন। মেয়েদের সংস্কার এবং লজ্জা যেন আপনাকে সেই সত্য কথাগুলি স্পষ্ট ভাষায় বলতে কোন রকম বাধা না দিতে পারে।' রোহনপুর ষ্টেশনে ইলা মিত্রকে গ্রেফতারের পর তাঁকে নাচোল থানা হাজতে নিয়ে গিয়ে তাঁর ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের নূরুল আমীন-লিয়াকাত আলী সরকারের পুলিশ যে চরম নির্যাতন করে সেই নির্যাতনের চিত্র রাজশাহী আদালতের সামনে নিজের জবানবন্দীতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত পত্রটি খুবই সহায়ক হয়।[১৭] নীচে ইলা মিত্রের সেই জবানবন্দীটি হুবহু তুলে দেওয়া হলো :

"কেসটির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। বিগত ৭-১-৫০ তারিখে আমি রোহনপুরে গ্রেফতার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোল নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধোর করে এবং তারপর আমাকে একটা সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সবকিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে এই বলে এস. আই. আমাকে হুমকি দেখায়। আমার যেহেতু বলার মতো কিছু ছিলো না, কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড় চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দী করে রাখে।

আমাকে কোন খাবার দেওয়া হয় নি, একবিন্দু জল পর্যন্ত না। সেদিন সন্ধ্যেবেলাতে এস. আই. এর উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। সে সময়ে আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। এরপর আমার কাপড়-চোপড় আমাকে ফেরৎ দেওয়া হয় এবং রাত্রি প্রায় বারোটার সময়

সেল থেকে আমাকে বের করে সম্ভবতঃ এস. আই. এর কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে এ ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম না। যে কামরাটিতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে তারা নানারকম অমানুষিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালালো। দুটো লাঠির মধ্যে আমার পা দুটি ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিলো এবং সে সময় চারিধারে যারা দাঁড়িয়েছিলো তারা বলছিলো যে আমাকে "পাকিস্তানী ইনজেকশন" দেওয়া হচ্ছে। এই নির্যাতন চলার সময় তারা একটা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে দিয়েছিলো। জোর করে আমাকে কিছু বলাতে না পেরে তারা আমার চুলও উপড়ে তুলে ফেলছিলো। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো কারণ সেই নির্যাতনের পর আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব ছিলো না।

সেলের মধ্যে আবার এস. আই. সেপাইদেরকে চারটে গরম সিদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিলো এবং বললো, "এবার সে কথা বলবে।" তারপর চার পাঁচজন সেপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চীৎ করে শুইয়ে রাখলো এবং একজন আমার যৌনঅঙ্গের মধ্যে একটা গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিলো। আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

৯-১-৫০ তারিখে সকালে যখন আমার জ্ঞান হলো তখন উপরোক্ত এস. আই. এবং কয়েকজন সেপাই আমার সেলে এসে তাদের বুটে করে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করলো। এর পর আমার ডান পায়ের গোঁড়ালীতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। সে সময় আধা সচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এস. আই. কে বিড়-বিড় করে বলতে শুনলাম: আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না করো তাহলে সিপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাত্রিতে এস. আই. এবং সিপাইরা ফিরে এলো এবং তারা আবার সেই হুমকি দিলো। কিন্তু আমি যেহেতু তখনো কিছু বলতে রাজী হলাম না তখন তিন চার জন আমাকে ধরে রাখলো এবং একজন সেপাই সত্যি সত্যি আমাকে ধর্ষণ করতে শুরু করলো। এর অল্পক্ষণ পরই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। পরদিন ১০-১-৫০ তারিখে যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি

দেখলাম যে আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে এবং আমার কাপড় চোপড় রক্তে সম্পূর্ণভাবে ভিজে গেছে। সেই অবস্থাতেই আমাকে নাচোল থেকে নবাবগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হলো। নবাবগঞ্জ জেল গেটের সিপাইরা জোর ঘুঁষি মেরে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো। সে সময় আমি একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলাম কাজেই কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন সিপাই আমাকে একটা সেলের মধ্যে বহন করে নিয়ে গেলো। তখনো আমার রক্তপাত হচ্ছিলো এবং খুব বেশী জ্বর ছিলো। সম্ভবতঃ নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালের একজন ডাক্তার সেই সময় আমার জ্বর দেখেছিলেন ১০৫ ডিগ্রী। যখন তিনি আমার কাছে আমার দারুণ রক্তপাতের কথা শুনলেন তখন তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, একজন মহিলা নার্সের সাহায্যে আমার চিকিৎসা করা হবে। আমাকে কিছু ওষুধ এবং দুই টুকরো কম্বলও দেওয়া হলো।

১১-১-৫০ তারিখে সরকারী হাসপাতালের নার্স আমাকে পরীক্ষা করলেন। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে কি রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেটা আমি জানি না। তিনি আসার পর আমার পরনে যে রক্তমাখা কাপড় ছিলো সেটা পরিবর্ত্তন করে একটা পরিস্কার কাপড় দেওয়া হলো। এই পুরো সময়টা আমি নবাবগঞ্জ জেলের একটি সেলে একজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলাম। আমার শরীরে খুব বেশী জ্বর ছিলো, তখনো আমার দারুণ রক্তপাত হচ্ছিলো এবং মাঝে মাঝে আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম।

১৬-১-৫০ তারিখে সন্ধ্যা বেলায় আমার সেলে একটা ষ্ট্রেচার নিয়ে আসা হলো এবং আমাকে বলা হলো যে পরীক্ষার জন্যে আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। খুব বেশী শরীর খারাপ থাকার জন্যে আমার পক্ষে নড়াচড়া সম্ভব নয় একথা বলায় লাঠি দিয়ে আমাকে একটা বাড়ি মারা হলো এবং ষ্ট্রেচারে উঠতে আমি বাধ্য হলাম। এর পর আমাকে অন্য এক বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি সেখানে কিছুই বলিনি কিন্তু সেপাইরা জোর করে একটা সাদা কাগজে আমার সই আদায় করলো। তখন আমি আধা-অচেতন অবস্থায় খুব বেশী জ্বরের মধ্যে ছিলাম। যেহেতু আমার অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছিলো সেজন্যে পরদিন আমাকে নবাবগঞ্জ সরকারী হাস-

প্যাতালে পাঠানো হলো। এর পর যখন আমার শরীরের অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হলো তখন আমাকে ২১-২-৫০ তারিখে নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে সেখানকার জেল হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হলো।

কোন অবস্থাতেই আমি পুলিশকে কিছু বলি নি এবং উপরে যা বলেছি তার বেশী আমার আর বলার কিছুই নেই।*

ইলা মিত্র রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বদলী হওয়ার পরই খুলনার এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই বাঙলাতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে** এবং রাজশাহী জেলের মধ্যেও তার প্রভাব বিস্তৃত হয়। এর ওপর আর এক উপসর্গ জোটার ফলে জেলের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অনেকখানি বেশী অবনতি ঘটে।

নাচোলে সাঁওতাল কৃষকদের সাথে সংঘর্ষে যে দারোগাটি নিহত হয় তার স্ত্রী এই সময় প্রত্যেক দিন রাজশাহী জেল গেটে এসে বহুক্ষণ ধরে নিয়মিত বসে থাকতো এবং হিন্দু ও সাঁওতালদেরকে গালাগালি করে নাচোলের ঘটনা সম্পর্কে নানা প্রকার ভুল কাহিনী এবং বিকৃত তথ্য বিবৃত করতো। এ সবের দ্বারা সে জেলের সেপাই এবং বিশেষ করে কয়েদী ও অন্যান্য কর্মচারীদের একথাই বোঝাতে চাইতো যে, হিন্দুরা একজোট হয়ে মুসলমান হত্যা করেছে। কাজেই তার প্রতিশোধ নেওয়া দরকার। এই সাম্প্রদায়িক প্রচারণা এবং উত্তেজনা বৃদ্ধির ব্যাপারে মান্নান নামে রাজশাহীর তৎকালীন জেলার সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করতো এবং নিহত দারোগার স্ত্রীটিকেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দিতো।[১৮]

ইলা মিত্রকেও এই সময় মাঝে মাঝে জেল গেটে নিয়ে গিয়ে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় হাজির করা হতো এবং সাধারণ কয়েদীদেরকে দেখিয়ে তারা বলতো, "তোমরা রাণীকে দেখো। ইনি আবার রাণী হয়েছিলেন।"[১৯]***

এই সমস্ত কারণ মিলে জেলের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির এমন অবনতি ঘটে যে হিন্দু নামধারী রাজবন্দীরা তখন নিজেদের ওয়ার্ডের

* এই জবানবন্দীটি কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হওয়ায় ইস্তাহারের আকারে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি সেটি ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন স্থানে বিলি করেছিলো। ইস্তাহারটির একটি ছবি এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে।-ব. উ.

** চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

*** সাঁওতালরা ইলা মিত্রকে রাণী বলতো।-ব. উ.

বাইরে বের হতে পারতেন না। ঘরের সামনে সামান্য একটু বেড়ানোর যে সুযোগ ছিলো সেটাও তাঁদের জন্যে এইভাবে বন্ধ হয়ে গেলো।[২০]

এই অসহ্য অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্যে রাজবন্দীরা তখন ১৫ দিনের নোটিশ দিয়ে পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের কাছে একটা মেমোরেণ্ডাম দেন। তাতে বলা হয় যে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে তাঁরা সেই অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে অনশন ধর্মঘট করতে বাধ্য হবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নূরুল আমীনের কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে ১৯৫০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের রাজবন্দীরা আবার অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। সেই ধর্মঘট চলার নবম দিনে অর্থাৎ ১০ই ফেব্রুয়ারী রাজশাহীর জেলা শাসক রাজবন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদেরকে বলেন, "আপনারা নিশ্চিন্ত হোন। আমরা অবস্থা পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করছি।" এর পর তারা পূর্বোক্ত নিহত দারোগার স্ত্রীর জেল গেটে আসা বন্ধ করে দিলো এবং সেই সাথে জেলার মান্নানও তার বিকৃত সাম্প্রদায়িক বক্তব্য জাহির করা থেকে বিরত হলো।[২১]

নাচোলের ঘটনাবলীর এবং তার পরবর্ত্তী নির্যাতনের কাহিনী তৎকালীন কোন সংবাদপত্রে তো প্রকাশিত হয়ই নি, এমনকি প্রধান মন্ত্রী নূরুল আমীন সে সম্পর্কে কোন আলোচনা প্রাদেশিক বিধান পরিষদে পর্যন্ত হতে দেন নি।

প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, গোবিন্দ লাল ব্যানার্জী এবং মনোহর ঢালী এ ব্যাপারে কতকগুলি মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারকে দিয়েছিলেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০, বিধান পরিষদে তাঁরা এই মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিশের সম্পর্কে স্পীকারকে প্রশ্ন করেন। স্পীকার এই মুলতুবী প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে দেওয়ার ব্যাপারে খুব বেশী গররাজী ছিলেন না কিন্তু প্রধান মন্ত্রী নূরুল আমীন প্রবলভাবে সেটা উত্থাপনের বিরোধিতা করায় তিনি শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যান।[২২]

নূরুল আমীন তাঁর বিরোধিতার সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন যে, একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং তিন জন কনষ্টেবলের মৃত্যু সম্পর্কিত ব্যাপারটি আদালতের বিচারাধীন, কাজেই সে বিষয়ে কোন আলোচনা পরিষদে হতে পারে না।[২৩]

এর জবাবে প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী বলেন যে, তিনি পুলিশ অফিসারের হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করতে চান না। তিনি আলোচনা করতে চান

ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে ঐ এলাকায় পুলিশ ও মিলিটারীর নির্যাতনের ব্যাপার।[২৪] নূরুল আমীন কিন্তু তাঁর পূর্বোক্ত যুক্তি আঁকড়ে থেকে বলেন যে, মূল ঘটনাকে বাদ দিয়ে পরবর্তী ঘটনার আলোচনা সম্ভব নয়, কাজেই মূল ঘটনার প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে এসেই পড়বে। কাজেই সে ধরনের কোন বিতর্ক সেই অবস্থায় পরিষদে সম্ভব নয়।[২৫]

বিরোধী দলের নেতা বসন্ত কুমার দাস নূরুল আমীনের এই যুক্তির বিরোধিতা করে বলেন যে হত্যার পর পুলিশ, মিলিটারী, ই.পি.আর. এবং আনসারেরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে। তাঁদের অভিযোগ হলো এই যে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে তারা জনসাধারণের ওপর দারুণভাবে অত্যাচার করেছে। এটা মূল ঘটনা থেকে একটি পৃথক ব্যাপার এবং সেই হিসেবেই তাঁরা সেটিকে আলোচনা করতে চান।[২৬]

এর পর পরিষদের স্পীকার, শিক্ষা মন্ত্রী আব্দুল হামিদ এবং অন্যান্যেরা নূরুল আমীনের সুরে সুর মিলিয়ে ক্রমাগতভাবে মুলতুবী প্রস্তাবগুলি আলোচনার বিপক্ষে নানারকম কুযুক্তি দিতে থাকেন এবং মূল ঘটনাকে বাদ দিয়ে কোন আলোচনা এ ব্যাপারে সম্ভব নয় এই যুক্তিকেই খুঁটি হিসেবে আঁকড়ে ধরেন।[২৭]

আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে পরিষদ সদস্যেরা বিভাগপূর্ব ভারতীয় এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধান পরিষদে এ ধরনের ঘটনা আলোচনার পূর্ব উদাহরণ উল্লেখ করেন কিন্তু সেগুলির কোনটিই নাচোলের ঘটনার সাথে তুলনীয় নয় বলে নূরুল আমীন এবং স্পীকার সুস্পষ্ট রায় দেন।[২৮]

এক পর্যায়ে মনোরঞ্জন ধর প্রশ্ন তোলেন যে, পুলিশ অফিসার এবং কনষ্টেবলদের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনাটির ওপর পুলিশী তদন্ত চলছে তার অর্থ এই নয় যে সেটি কোর্টে বিচারাধীন আছে। পুলিশ তদন্ত এবং কোর্টের সামনে বিচার এক জিনিষ নয়। ব্যাপারটি যে সত্যি সত্যিই কোর্টের বিচারাধীন এর উপযুক্ত প্রমাণ দাখিলের জন্যে তিনি প্রধান মন্ত্রী নূরুল আমীনকে আহ্বান জানান। কিন্তু অনুগত স্পীকার নূরুল আমীনকে সে রকম কোন বিপদের মধ্যে না ফেলে সরাসরি বলেন যে তিনি প্রধান মন্ত্রীকে এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ দাখিল করার কথা বলতে পারেন না। সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে নূরুল আমীনের বক্তব্যই তাঁকে মানতে হবে।[২৯] এইভাবে কিছুক্ষন বিতর্ক চলার পর অবশেষে স্পীকার রায় দেন

যে, নাচোলের ঘটনা ও পুলিশী নির্যাতনের ব্যাপারে তিনি কোন মূলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করতে ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতে দেবেন না।[৬০]

এইভাবেই সংবাদপত্র, এমনকি প্রাদেশিক বিধান পরিষদেরও টুঁটি টিপে নূরুল আমীন সরকার নাচোলের অসংখ্য সাঁওতাল কৃষকের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, সমগ্র এলাকায় লুটতরাজ, ধর্ষণ, গৃহদাহ এবং নানা ধরনের নির্মম নির্যাতনের ঘটনাবলীকে জনসাধারণের থেকে লুকিয়ে রেখে নিজে-দের "ভদ্র" চেহারাকে দেশের সামনে টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখলো না।

৭

অন্যান্য অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন

১৯৪৭ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি ও কিষান সভা কর্তৃক তেভাগা আন্দো-লন প্রত্যাহার এবং দেশবিভাগের পর সিলেট, ময়মনসিংহ ও নাচোলের মত ব্যাপক ও সংগঠিত সশস্ত্র সংগ্রাম পূর্ব বাঙলার অন্য কোন অঞ্চলে সম্ভব হয় নি। কমিউনিষ্ট পার্টি সারা পূর্ব বাঙলায় সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলো তা বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি এলাকায় স্থানীয় জমিদার-জোতদারদের দালাল ও পুলিশের সাথে ছোট খাট সংঘর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু সেই সব সংঘর্ষ কোন ক্ষেত্রেই ব্যাপক-ভাবে কৃষকদেরকে আন্দোলনে শরীক করতে সমর্থ হয় নি। নোতুন রণনীতির দ্বারা কৃষকরা উদ্বুদ্ধ হন নি।

উপরোক্ত তিনটি অঞ্চলের বাইরে খুলনা জেলার কয়েকটি এলাকাতে কমিউনিষ্ট পার্টির সংগ্রাম অন্য জেলাগুলির বিভিন্ন এলাকার তুলনায় কিছুটা সংগঠিত ও ব্যাপক হয়েছিলো। ১৯৪৮-৫০ সালে খুলনার যে এলাকাগুলিতে এই আন্দোলন হয়েছিলো সেগুলি হলো: শোভনা, ধানিবুনিয়া, কালশিরা, মৌভাগ, ঘাটভোগ, ডোবা, চিতলমারী ও মোল্লা-হাট।[১] এই এলাকাগুলির মধ্যে শোভনা, ধানিবুনিয়া, কালশিরা এলাকায় আন্দোলন সশস্ত্র রূপ নিয়েছিলো।[২]

এই আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক ধ্বনি ছিলো 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়', রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিলো পাকিস্তান রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে রাষ্ট্র ক্ষমতা

দখল। মূল অর্থনৈতিক সমস্যা ছিলো বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, খাজনা হ্রাস, জোতদারী ও মহাজনী শোষণ অত্যাচার বন্ধ করা, খাস জমি কৃষকদের ফেরৎ দেওয়া, উল্টো তেভাগা* বন্ধ, অকৃষকদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে খোদ কৃষকদের ভিতর সেই জমি বণ্টন করা। 'লাঙল যার জমি তার'—এই ধ্বনির মাধ্যমে কৃষকদেরকে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ করে জমি দখলের মাধ্যমে সংগ্রামকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে গিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলই ছিলো এই সময়কার আন্দোলনের গৃহীত লাইন।[৩]

কিন্তু আন্দোলনের নীতি, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তা হলেও এই আন্দোলনের নেতৃত্ব মূলতঃ ছিলো মধ্যবিত্ত ও ধনী কৃষকদের হাতে। ব্যাপকভাবে ক্ষেত মজুর অথবা গরীব কৃষকরা এই আন্দোলনে সমবেত অথবা ঐক্যবদ্ধ হন নি।[৪] শোভনা, ধানিবুনিয়া অঞ্চলে অবশ্য আন্দোলন খুব সাময়িকভাবে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো এবং জোতদার জমিদার ও তাদের দালালরা ব্যতীত সাধারণভাবে তা জনগণের সমর্থন লাভ করেছিলো।[৫]

তখনকার দিনে অকমিউনিষ্ট কোন ব্যক্তি কৃষক সমিতির কাজে এগিয়ে আসতেন না। সেজন্যে বাস্তবক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির মধ্যে কোন তফাৎ লোকে করতো না এবং প্রকৃতপক্ষে সে রকম কোন তফাৎ ছিলোও না। কৃষক আন্দোলন কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা ও কর্মীদের দ্বারাই পরিচালিত হতো।** প্রয়োজনীয় অর্থ মূলতঃ কৃষক দরদীদের থেকেই সংগৃহীত হতো। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও সরবরাহ ছিলো কমিউনিষ্ট পার্টির দায়িত্ব।[৬]

* তেভাগা আন্দোলন প্রত্যাহার ও দেশ বিভাগের পর জোতদাররা অনেক এলাকায় উল্টো তেভাগা অর্থাৎ জমির মালিকের দুই ভাগ ও বর্গাদারের এক ভাগ চালু করেছিলো।

** তৎকালে খুলনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম উল্লেখযোগ্য: বিষ্ণু চ্যাটার্জী, শচীন বসু, কুমার মিত্র, সমর মিত্র, রতন সেন, কামাখ্যা রায়চৌধুরী, সুধন্ব রায়, অক্ষয় মণ্ডল, বিভূতি রায়, ডাঃ আব্দুর রহিম, নগেন সরকার, নকুল মল্লিক, নিখিল ঘোষ, আফসার মোড়ল, কেরামত মোড়ল বিলায়েত মোড়ল, বীরেন বিশ্বাস, চাঁদমনি মণ্ডল, নলীনি মণ্ডল, বিষ্ণু বৈরাগী, নগেন বিশ্বাস, শরৎ সরকার, সুধীর চ্যাটার্জী, অনিল চক্রবর্তী স্বরেশ বসু, সন্তোষ দাসগুপ্ত, ডাঃ অতুলেন্দ্র দাস, গোপীনাথ ব্যানার্জী, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র কাঞ্জীলাল, সতীশ হালদার, নগেন মল্লিক। এঁদের প্রায় প্রত্যেকের ওপর সে সময় গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়।[১০]

আন্দোলনের এলাকাগুলিতে সরকার পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করে এবং শোভনা, ধানিবুনিয়া ও কালশিরা এলাকায় ব্যাপকভাবে গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, তল্লাশী, মারপিট ও নারী ধর্ষণ চালায়। এ ব্যাপারে স্থানীয় কিছু দালালও গোয়েন্দাগিরি ইত্যাদির দ্বারা পুলিশের সাথে সহযোগিতা করে। এই ধরনের দালালদেরকে অনেক জায়গায় খতম করা হয় এবং দালাল খতমের পর এলাকাগুলিতে পুলিশী নির্যাতন আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে।[৭] রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের মতো খুলনা জেলেও কর্তৃপক্ষ ১৯৪৯ এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে রাজবন্দীদের ওপর হামলা চালায় এবং লাঠি চার্জের দ্বারা বিষ্ণু বৈরাগীকে হত্যা করে।[৮]

পুলিশের সাথে কৃষক কর্মীদের সরাসরি সংঘর্ষের ফলে শোভনায় হাজারী বালা এবং ধানিবুনিয়ায় সতীশ বাইন ও রমাকান্ত নিহত হন।[৯] ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ডুমুরিয়া থানায় পুলিশ ও জনতার মধ্যে যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয় খুলনা জেলার মধ্যে সেটা ছিলো বৃহত্তম।[১০] ঘটনাটির সরকারী প্রদত্ত ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ হলো নিম্নরূপ:

> সরকারী মহল হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার অন্তর্গত কোনও এক স্থানে জনতা ও পুলিশের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে পুলিশ গুলি চালাইতে বাধ্য হয়। ইহাতে জনতার মধ্য হইতে ৩ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে এবং ৩ জন পুলিশ কর্মচারীসহ প্রায় দশ জন আহত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে পুলিশ দারুবুনিয়া গ্রামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া বেতেবুনিয়া গ্রামে আরও দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার সময় যখন সেদিকে যাইতেছিল তখন প্রায় ৫।৬ শত লোক তাহাদিগকে বাধা দেয়। জনতার মধ্যে প্রায় ১০।১২ টি বন্দুক ছিল বলিয়া প্রকাশ। তাহারা ধৃত ব্যক্তিদিগকে ছিনাইয়া লয়। এইভাবে সশস্ত্র জনতার নিকট বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পুলিশ বলপ্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়, তথায় বহু রাউণ্ড গুলি চলে। তিনজন আহত পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। তাহাদের দুইজনের অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক। ডুমুরিয়া ও বটিয়াঘাটা থানায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে।[১১]

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯, বাগেরহাট মহকুমার কালশিরা গ্রামে পুলিশের একজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সাব-ইন্সপেক্টর তিনজন কনষ্টেবলসহ জয়দেব ব্রহ্ম

নামে একজন কমিউনিষ্ট কর্মীর গৃহ তল্লাসী করতে গেলে তারা জনতার দ্বারা আক্রান্ত হয়। কনষ্টেবলদের মধ্যে একজন ছিলো সশস্ত্র। সে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং অন্যান্য পুলিশেরাও আহত হয়। আনসার ও স্থানীয় কিছু লোকজনের সহায়তায় তারা প্রাণে রক্ষা পায় এবং পলায়ন করে।*[১২]

অন্যান্য অঞ্চলের মতো খুলনা জেলাতেও সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন ১৯৫০ এর গোড়ার দিকেই সম্পূর্ণ শেষ হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাষ্টের পর থেকে বহু সংখ্যক হিন্দু নামধারী কমিউনিষ্টের দেশ ত্যাগ, কমিউনিষ্ট পার্টির 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' রাজনৈতিক ধ্বনি ও হঠকারী রাজনৈতিক লাইনের ফলে কৃষক আন্দোলনকে আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেও এই সময় বামপন্থী হঠকারী ও সংস্কার-বাদী এই দুই চিন্তা কর্মী ও নেতাদেরকে বিভক্ত করে এবং সংস্কারবাদীরা পার্টিগতভাবে পৃথক না হলেও আন্দোলন থেকে দূরে থাকেন। ১৯৫০ এর গোড়ার দিক থেকে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব ও সরকারী নির্যাতনের মাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি একেবারে বিনষ্ট হয়।[১৩]

ভূমি সমস্যা সম্পর্কে আসলে এ সময় কমিউনিষ্ট পার্টিরও কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা ও নীতি ছিলো না। খুলনা জেলায় ১৯৪৮-১৯৫০ এর মধ্যে কোন এলাকাতেই জোতদারদের খাস জমি দখলে আনা এবং ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বণ্টন ইত্যাদি কিছুই করা হয় নি।[১৪]

১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মাসের পর যশোর জেলায় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নড়াইল মহকুমা কৃষক সম্মেলন হয়। এর পর ঐ বৎসরই জুন মাসে নড়াইলে একটি কৃষক সমাবেশ হয়। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন গৃহীত হওয়ার পর কৃষক সমিতির কার্যকলাপ বস্তুতঃপক্ষে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগা আন্দোলনের সময় গ্রামে গ্রামে কৃষক সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিলো এবং সেগুলিই ছিলো আন্দোলনের প্রাণ-কেন্দ্র। কিন্তু রণদীভে লাইন অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করার ক্ষেত্রে

---

* এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তান সরকার কিভাবে পশ্চিম বাঙলা ও পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে ব্যাপক হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিলো তার বিবরণের জন্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সেরকম কোন গ্রাম কৃষক কমিটি গঠনের চিন্তা হয় নি এবং তৎকালীন অবস্থায় তা সম্ভবও ছিলো না। এজন্যে পূর্বে ছোট ছোট গ্রাম্য জমায়েতের মাধ্যমে কৃষকদেরকে যেভাবে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হতো এবং সংগঠিত করা হতো সে সময় সেটা সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ সব কিছুই অতি গোপনীয়তার মধ্যে করতে হওয়ায় কাজের এলাকা স্বাভাবিকভাবেই ভয়ানক সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং কমিউনিষ্ট পার্টির কৃষক আন্দোলন কোন ব্যাপক ভিত্তি লাভ করতে সমর্থ হয় না।[১৫]

পুলিশী হামলা এই পর্যায়ে কমিউনিষ্টদের ওপর এবং কৃষক আন্দোলনের কর্মীদের ওপর অব্যাহত থাকে কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের সময় পুলিশী হামলার মোকাবেলা যেভাবে ব্যাপক গণ-প্রতিরোধের মাধ্যমে করা হতো সেটা ছিলো এক্ষেত্রে অচিন্তনীয়। পুলিশী হামলার মোকাবেলা করতে গিয়ে যশোর জেলায় পুলিশের সাথে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ ঘটে নি। কিন্তু দালাল খতম কিছু কিছু হয়েছিলো। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চাঁদপুর গ্রামে পুলিশী হামলার সময় পুলিশের সহযোগী নূরুল হুদাকে কর্মীরা অপহরণ করে হত্যা করেন। নড়াইল এলাকার বাকড়ী গ্রামে আরও একজন পুলিশের সহযোগিকে খতম করা হয়।[১৬]

এই ধরনের রাজনৈতিক কাজ কৃষকদের ওপর পুলিশী নির্যাতনকে বৃদ্ধি করে এবং তা জনগণকে উৎসাহিত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। গণ-সংগঠন ও প্রচার আন্দোলন সক্রিয় না থাকায় কমিউনিষ্ট ও কৃষক কর্মীরা জনগণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এর ফলে 'আশ্রয় ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতার অভাবে অধিকাংশ কর্মী ১৯৪৯ সালের মধ্যেই পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ১৯৪৯ সালে কৃষক সমিতির পরিবর্তে ক্ষেত মজুরদের সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী ১৯৪৯ সালের ১৪-১৫ই সেপ্টেম্বর ঝিকরগাছা থানার পানিসরা গ্রামে একটি জেলা ক্ষেতমজুর সম্মেলন গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালে যশোর জেলায় কৃষকদের মধ্যে কোন প্রকার সাংগঠনিক কার্যকলাপ চালাবার এটাই সর্বশেষ প্রচেষ্টা।[১৭]

ক্ষেত মজুরদের আন্দোলন কোন জায়গাতেই তেমন দানা বাঁধে নি। বিচ্ছিন্নভাবে পূর্ব বাঙলার কোন কোন ছোট খাট এলাকায় কিছুটা হয়েছিল। সাধারণভাবে এই আন্দোলনের মূল দাবী ছিলো দৈনিক তিন

টাকা মজুরী ও তিন বেলা খোরাকী। কৃষকরা নিজেরা কিন্তু এ দাবীকে অবাস্তব এবং এই লক্ষ্য অর্জনকে অসম্ভব মনে করেছিলেন। এজন্যে এ দাবীর ভিত্তিতে তাঁদেরকে কিছুতেই আন্দোলনে টেনে আনা যায় নি। এই ধরনের দাবীকে কমিউনিষ্ট পার্টিও অর্জনযোগ্য মনে করতো না। তারা এটা উত্থাপন করেছিলো সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্যে। তাদের ধারণা ছিল যে এই ধরনের দাবীর মাধ্যমে কৃষকদেরকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করা এবং দাবী আদায় না হলে আন্দোলনকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি করে জমি ও তার পর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। কিন্তু কৃষকরা এ সবের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। উপরন্তু এ ধরনের দাবীর ফলে জোতদাররা অক্ষমতার কারণে অনেক জায়গাতেই মজুর নেওয়া বন্ধ করলো এবং তার ফল দাঁড়ালো বিপরীত। কর্মহীন হয়ে ক্ষেত মজুরদের জীবন ধারণই অসম্ভব হয়ে পড়লো এবং তাঁরা কৃষক সমিতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, এমনকি তার বিরোধিতা করতে শুরু করলেন।[১৮]

ফরিদপুর জেলায় কিন্তু পরিস্থিতি ততখানি খারাপ হয় নি। কারণ এখানে স্থানীয়ভাবে দৈনিক এক টাকা মজুরী এবং এক বেলা খোরাকীর দাবীতে ক্ষেতমজুর আন্দোলন করা হয়। এই লক্ষ্য অর্জন তৎকালীন পরিস্থিতিতে অসম্ভব ছিলো না এবং ক্ষেত মজুররাও তার বিরোধী ছিলেন না। ফলে ক্ষেতমজুরদের আন্দোলন এখানে কিছুটা সফল হয়। আন্দোলন ফরিদপুর জেলায় কোন ব্যাপক আকার ধারণ না করলেও অন্যান্য অনেক জেলা এবং অঞ্চলের মতো এখানকার মুসলমান এলাকাগুলিতে আন্দোলন উচ্ছেদ হয়ে ভয়ানক কোন বিপর্যয় সৃষ্টি করে নি।[১৯]

ফরিদপুর জেলায় দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য সংকটের সময় অবশ্য কৃষকদের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছিলো নৌকা থেকে ধান চাল ইত্যাদি জোর করে নামিয়ে নিয়ে জনগণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার। কিন্তু কৃষকরা তাতে সম্মত হন নি। বস্তুতঃপক্ষে কোন রকম হঠকারী লাইনই কৃষকরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে সম্মত হননি। তাছাড়া 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' ধ্বনিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে খুবই মারাত্মক হয়েছিলো। কারণ সাধারণ কৃষকরা মুসলিম লীগ শাসনে দুঃখ কষ্ট পেলেও পাকিস্তান উচ্ছেদ করার জন্যে তৎকালে তাঁরা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না।[২০]

১৯৪৮-৪৯ সালের কর্ডন বিরোধী আন্দোলনে কমিউনিষ্ট পার্টি ফরিদপুরে কোন অংশ গ্রহণ করে নি। শেখ মুজিবর রহমান সে সময়ে গোপালগঞ্জ এলাকায় কৃষকদেরকে এই আন্দোলনে কিছুটা নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এই সময়েই এ অঞ্চলে তিনি কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেন।[২১]

দেশ বিভাগের সময় জলপাইগুড়ি জেলার তেঁতুলিয়া, বোদা ও পচাগড় থানা পূর্ব দিনাজপুর (পূর্ব পাকিস্তান) জেলার এবং দেবীগঞ্জ পাটগ্রাম থানা রংপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই এলাকাগুলিসহ দিনাজপুর ও রংপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন কিছুটা হলেও ১৯৪৬-৪৭ এর তেভাগা আন্দোলনের মতো জোরদার আন্দোলন সেখানে সম্ভব হয় নি। পূর্ব বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলগুলিতেও যে কারণে আন্দোলন সাধারণভাবে স্তিমিত হয়ে আসে এই সব অঞ্চলেও সেই একই কারণে আন্দোলন পূর্বের মতো আর দানা বাঁধতে পারেনি। ঢাকা ও বরিশালে ধান করাড়ী প্রথার* বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র আকারে কিছু কিছু আন্দোলন হয়। ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রাম জেলাতেও ক্ষুদ্র আকারে কোন কোন এলাকায় কৃষক আন্দোলন হয়। মাদোরাশায় এই সময় ফসল রক্ষা করতে গিয়ে কৃষকদের সাথে পুলিশের এক সংঘর্ষ ঘটে এবং পুলিশের গুলিতে ১২ জন কৃষক নিহত হন।[২২]

৮

পূর্ব বাঙলা সরকারের কমিউনিষ্ট বিরোধী নীতি ও প্রচারণা

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের তৎকালীন অনুসৃত নীতি অনুযায়ী পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের প্রতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেও মুসলিম লীগ সরকার স্বাভাবিক কারণেই প্রকৃতপক্ষে কমিউনিষ্টদেরকে কোন প্রকার সহযোগিতামূলক কাজে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলো না। উপরন্তু তারা প্রথম থেকেই কমিউনিষ্ট পার্টি ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলিকে আক্রমণ ও ধ্বংস করার নীতিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো। এজন্যে ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাষ্টের পর বৃটিশ আমলে ধৃত অনেক রাজবন্দীকে তারা মুক্তি দান করলেও নাজি-

* নির্দিষ্ট ধানী খাজনায় জমির মালিকের প্রাপ্য পরিশোধ করার প্রথা। অনেকটা টঙ্ক প্রথার মতো। এই প্রথা বিচ্ছিন্ন ভাবে পূর্ব বাঙলার প্রায় সর্বত্রই কিছু কিছু ছিলো।

মুদ্দীন সরকার কমিউনিষ্ট রাজবন্দীদেরকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করে এবং এ ব্যাপারে তাদের নীতি সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করে।[১] শুধু তাই নয়। ১৯৪৮ এর মার্চ এপ্রিলের পর থেকে একদিকে কমিউনিষ্ট পার্টির সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচী এবং অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত অবস্থা ও মুসলিম লীগের দ্রুত অপস্রিয়মান জনপ্রিয়তার ফলে বিপ্লবের ভয়ে ভীত হয়ে নিজেদের শোষণমূলক শাসনের হাজার ব্যর্থতাকে ধামা 'চাপা দিয়ে জনগণের মধ্যে নিজেদের পূর্ব প্রভাবকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তারা উত্তরোত্তরভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি ও কমিউনিজম বিরোধী দমন নীতি ও প্রচারণায় লিপ্ত হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের নীতি ও কর্মকাণ্ডের যে কোন বিরোধী সমালোচনাকে তারা পাকিস্তান বিরোধী ও কমিউনিষ্ট-প্ররোচিত আখ্যা দিয়ে এমনভাবে অহরহ প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকে যার ফলে মুসলিম লীগ মহলেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং সেই সব প্রতিক্রিয়া মুসলিম লীগ সমর্থক পত্র পত্রিকাতেও প্রতিফলিত হয়।

'বাঁচিবার পথ' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে ১৯৪৮ সালের মে মাসে মুসলিম লীগ সমর্থক সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' দেশের পরিস্থিতি ও সরকারের কমিউনিজম বিরোধী প্রচারণার স্বরূপ সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্যের মাধ্যমে সরকারকে সতর্ক করেন:

> "আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপে এবং বিভাগের জন্য পাকিস্তানের আর্থিক কাঠাম ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; মানুষের ক্রয় ক্ষমতা সাধারণভাবে নীচে নামিয়া আসিতেছে, এবং দ্রব্য মূল্য দ্রুত বাড়িতে থাকিয়া দেশ জুড়িয়া এক অবিশ্বাস, ভয়, সন্দেহ এবং অসন্তোষের বিষ ছড়াইতেছে। এই অবস্থাকে অধিক দিন চলিতে দিলে দেশের অসন্তুষ্টি আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য—যাহা হয়ত বা গণবিপ্লবের পর্যায়েও নামিয়া আসিতে পারে। এই অবস্থা না দেশের পক্ষে না জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক, বরং ইহাতে পাকিস্তানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।
>
> পাকিস্তান সরকারও যে অনুরূপ সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত নহেন তাহা নহে, বরং মধ্যে মধ্যে দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের বিবৃতি এবং বক্তৃতা হইতে ইহা স্বাভাবিকভাবেই ধরিয়া লওয়া যায় যে দেশ দ্রুত এক গণবিপ্লবের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং পাকিস্তান বিপন্নের ইসলাম

বিপন্নের ধুয়া তুলিয়া সেই বিপ্লবের পথরোধের চেষ্টা চলিতেছে। মন মন কমিউনিষ্ট বিরোধী বিবৃতির ইহাই সার কথা।

আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি এই সকল বিবৃতি দেশের জনগণের মনে কোন ক্রিয়াই করিতে পারিতেছে না। বরং স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানীরা আজ প্রশ্ন করিতেছে বাঁচিয়া থাকিবার কোন ব্যবস্থা পাকিস্তানে সম্ভবপর কিনা ?—

কমিউনিজম ভীতি প্রচারে সরকার আজ এমনই মাতিয়া উঠিয়াছেন, যে, ইহা দ্বারা কমিউনিষ্ট ভীতিকে জনমন হইতে পরিপূর্ণভাবে মুছিয়া ফেলা হইতেছে।"

কমিউনিষ্ট বিরোধী দমননীতি ও প্রচারণা সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয়তে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় বলা হয়:

আমাদের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিতে চাই যে, আতঙ্কগ্রস্ততা ও দমননীতির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল না হইয়া তাঁরা দেশ হইতে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও সামাজিক ভেদ বৈষম্য দূর করিবার কাজকে ত্বরান্বিত করুন। ইহা করিতে পারিলেই পাকিস্তানে কমিউনিজমের দূরতম এবং ক্ষীণতম সম্ভাবনাও চিরদিনের জন্য দূব হইয়া যাইবে।

১৯৪৯ সালেব মার্চ মাসেই 'দমননীতি' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' ঐ একই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন:

আজ জনসাধারণের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক যাহারা কঠোব দমননীতি চালাইযা যাইবার জন্য সরকারকে চাপ দিতেছেন তাহাবা প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজমের কাজ আগাইয়া দিতেছেন। তাঁহাবা যদি সত্যসত্যই কমিউনিজম বিরোধী হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের উচিত দেশেব প্রধান প্রধান সমস্যা যথা—শিক্ষা সমস্যা, খাদ্য সমস্যা মানুষ মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার সমস্যা ইত্যাদির আশু এবং উপযুক্ত সমাধান করিবার জন্য সরকারফে বাধ্য করা।[৪]

১৯৪৯ সালের মে মাসে পূর্ব বাঙলা সরকার 'কম্যুনিজমের স্বরূপ' নামক একটি ইস্তাহার* পূর্ব বাঙলার সর্বত্র জনগণের মধ্যে প্রচার করেন। এই ইস্তাহারটিতে কৃষক শ্রমিক ছাত্র শিক্ষক সহ সর্বস্তরের জনগণের কাছে কমিউনিজমের 'স্বরূপ' উদঘাটনের উদ্দেশ্যে তারা প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িকতার

---

* ইস্তাহারটির নম্বর: EBGP (wari)—49/50-967W-10M

আশ্রয় গ্রহণ করে। বিভিন্ন কারণে নিম্নোদ্ধৃত ইস্তাহারটি খুবই উল্লেখ-যোগ্য :

এই প্রদেশে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব ও কর্ম্মতৎপরতা বর্ত্তমানে প্রায় নাই বলিলেই চলে। কিন্তু প্রদেশের পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলিতে কম্যুনিষ্ট তৎপরতার ফলে পরিস্থিতির যে অবনতি ঘটিয়াছে, বিশেষতঃ চীন ও ব্রহ্মদেশে কম্যুনিষ্টগণ কর্ত্তৃক শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করার প্রচেষ্টার পরিণাম ব্যাপকভাবে ও বহু বর্ষব্যাপী যে গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাত শুরু হইয়াছে এবং ভারতে গত কিছুদিন হইতে কম্যুনিষ্টদের উপদ্রব যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া এই প্রদেশের জনগণকে কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ ও এই সব প্রতিষ্ঠানের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য সদস্যদের সম্ভাব্য অনাচার সম্বন্ধে সতর্ক করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সত্য যে, পাকিস্তানের মুসলিম জনসাধারণ কোনদিনই কম্যুনিষ্ট-দের ইসলাম বিরোধী মতবাদ সমর্থন করিবে না। কিন্তু এই বিশ্বাসই পাকিস্তানের জনগণকে তাহাদের রাষ্ট্রের প্রতি কম্যুনিষ্টদের সম্ভাব্য হামলা সম্পর্কে অসতর্ক করিয়া দেওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এই প্রদেশের সীমান্তে সম্প্রতি যে সব ঘটনা সঙঘটিত হইয়া গিয়াছে এবং প্রদেশের ভিতরেও বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন জায়গায় যে সব ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হইতেই রাষ্ট্রের এই সব শত্রুর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপন্থার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

যেসব প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা দ্বারা পরিষ্কারই বুঝা যায় যে প্রদেশের বাহির হইতেই কম্যুনিষ্ট দল প্রেরণা ও নির্দ্দেশ লাভ করি-তেছে এবং পাকিস্তানকে ধ্বংস করিয়া দিয়া সমগ্র পাক্-হিন্দ উপ-মহাদেশে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়াই ইহাদের উদ্দেশ্য। যদিও বাহ্যতঃ কম্যুনিষ্টরা হিন্দু মহাসভার বিরোধী তথাপি প্রায় সকল কম্যুনিষ্টই হিন্দু বলিয়া তাহারা তাহাদের মুসলিম বিরোধী মনোভাব বর্জ্জন করিতে পারে নাই। এই জন্যই ভারত ও পাকিস্তানকে পুনরায় মিলিত করিয়া প্রকারান্তরে পাকিস্তানকে ধ্বংস করিতে এবং সারা উপ-মহাদেশের মুসলমানগণকে সংখ্যাধিক হিন্দুদের পদানত করিয়া দেওয়ার জন্য মহাসভার অনুসৃত নীতি এইসব কম্যুনিষ্টও সমর্থন করিতেছে।

পাকিস্তানের অন্যান্য শত্রুদের সহিত কম্যুনিষ্টদের মতবিরোধ শুধু মাত্র কর্ম্মপন্থা লইয়া। আমাদের অন্যান্য দুশ্‌মনরা পাকিস্তান ও ভারতের পুনর্ম্মিলনে পাকিস্তানকে বাধ্য করার জন্য এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ কিম্বা আর্থিক অবরোধ জারী করার পক্ষপাতী; কিন্তু কম্যুনিষ্টরা রাষ্ট্রের ভিতরে ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ চালাইয়াই এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে চায়। জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা ছাড়াও কম্যুনিষ্টরা রাষ্ট্রের ভিতরে যে ধ্বংসাত্মক নীতি কার্যকরী করিতে চায় তজ্জন্য প্রধানতঃ জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করিতেই তাহারা চেষ্টিত। ভারতে অবস্থিত কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গেও রেল-ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠানের যে হাস্যকর প্রচেষ্টা হইয়াছিল এবং এই প্রদেশের মুসলমানগণ কম্যুনিষ্টদের ফাঁদে পা দিতে রাজী না হওয়ায় যে প্রচেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তাহা হইতে কম্যুনিষ্টদের বদ-মতলবের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্টগণ প্রকৃত ঘটনার বিকৃত বর্ণনা প্রদান করিতে ও বেপরোয়া মিথ্যা প্রচারে একেবারে সিদ্ধহস্ত। জমিদারের খাজনা ও সরকারী ট্যাক্স প্রদান না করার জন্য এবং সর্ব্বপ্রকার আইন ও কর্ত্তৃত্ব অমান্য করার জন্য এই কম্যুনিষ্টরা দেশের জনগণকে উস্কানী দিয়া থাকে। অশান্তি-উপদ্রব সৃষ্টি ও ধ্বংসাত্মক কার্য্য সাধনের জন্য ইহারা জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান করে এবং দলের অর্থ-ভাণ্ডার শক্তিশালী করার জন্য অপরের বাড়ীতে ডাকাতি করার পরামর্শ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির জন্যও চেষ্টা করা হইয়া থাকে। অসম্ভব রকম বেতন বৃদ্ধির দাবী উত্থাপন করিতেই এই সব দুষ্টবুদ্ধি লোক সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে প্ররোচিত করিয়া থাকে—যদিও ইহারা নিজেরাই জানে যে এরূপ অসম্ভব দাবী পূর্ণ করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করার যে উদ্দেশ্য, এরূপ অসম্ভব দাবীর দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় বলিয়াই কম্যুনিষ্টরা জানিয়া শুনিয়া এরূপ দাবী উত্থাপনের প্ররোচনা যোগায়। অনুরূপভাবেই শ্রমিকদিগকেও অসম্ভব রকম মজুরী দাবী করিতে এবং দাবী পূর্ণ না হইলে ধর্ম্মঘট করিতে উৎসাহ

দেওয়া হইয়া থাকে। এখানেও প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে—শ্রমিকদের কল্যাণ নয়, বরং তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়া দেশের উৎপাদন হ্রাস করা, অথবা একান্ত জরুরী ব্যবস্থা সমূহকে নষ্ট করিয়া দিয়া দেশবাসীকে ব্যাপকভাবে অসুবিধার সম্মুখীন করা।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা মারাত্মক ধরনের আক্রমণ পরিচালনারও চেষ্টা চলিতেছে। ভাবপ্রবণ ছাত্র সমাজের মধ্যে ঢুকিয়া দেশের যুবশক্তির মানসিকতাকে বিষাক্ত করিয়া তোলার প্রচেষ্টাই এই আক্রমণের ধারা। পূর্ব্ব পাকিস্তান মোসলেম ছাত্রলীগ ও পূর্ব্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন —এই উভয় প্রতিষ্ঠানেই এমন সব কম্যুনিষ্ট রহিয়াছে, যাহাবা ভারতের হিন্দু কম্যুনিষ্টদের সহিত একযোগে কাজ করিতেছে। এখানেও কম্যুনিষ্টদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে—দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভবসা স্থল তরুণ সমাজের মধ্যে যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে অসন্তোষ ও ব্যর্থতার ভাব আনিয়া দেওয়া। তাহাদের প্ররোচনায় ছাত্রগণ তাহাদের পিতামাতা ও শিক্ষকদের আদেশ অমান্য করিতে উৎসাহিত হইয়া থাকে। সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপে যোগ দিয়া তাহাদের লেখাপড়ায় অবহেলা করিতেও তাহাদের উৎসাহ যোগানো হয়। তাহাদের অভিভাবকগণ তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া থাকেন রাষ্ট্র গঠনের কার্য্যে যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য উপযুক্ত জ্ঞান সঞ্চয় করিবার উদ্দেশ্যে কিন্তু তাহারা তাহাদের এই কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া সময়ের অপব্যবহার করিতে ও রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত থাকিতে প্ররোচিত হইয়া থাকে। এই সব কার্য্যে উৎসাহ দিতে গিয়া কম্যুনিষ্টরা যে কিরূপে সীমা ছাড়াইয়া পর্যন্ত যাইতে পারে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাম্প্রতিক ধর্ম্মঘট* তাহার একটি দৃষ্টান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতম চাকুরীয়াদের ধর্ম্মঘটের সঙ্গে ছাত্রদের পড়াশোনার কোনই সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। কম্যুনিষ্টরাই ছিল উক্ত ধর্ম্মঘটের প্রকৃত উস্কানীদাতা। অধিকাংশ ছাত্রই এইরূপে অনর্থক সময় নষ্ট করার বিরোধী ছিল। কিন্তু তাহাদিগকেও এই ধর্ম্মঘট সমর্থন করিবার জন্য বাধ্য করা হয়। আমাদের যুবকদের ভাগ্য লইয়া কম্যুনিষ্টদের খেলা এরূপভাবেই চলিতেছে।

---

* পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।—ব. উ.

জনগণের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করিবার ব্যাপারেও কম্যুনিষ্টরা নির্ম্মম। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পশ্চিম বাঙলার দমদমে অবস্থিত জেসপ কোম্পানীর কারখানায় কম্যুনিষ্টরা যে আক্রমণ চালায়, তাহাতে তাহারা তিন জন কর্ম্মচারীকে পোড়াইয়া মারে। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী রংপুরেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে। সুধীর মুখাৰ্জ্জী নামক এক ব্যক্তির পরিচালনায় একদল কম্যুনিষ্ট কিশোরগঞ্জ থানার যোগেশ সরকারের ধান প্রভৃতি লুট করিবার উদ্দেশ্যে তাহার বাড়ী আক্রমণ করে। বহু মুসলমান গ্রামবাসী আক্রমণকারীদিগকে বাধা দেওয়ার জন্য সমবেত হয। হাবু শেখ নামক এক ব্যক্তি আক্রমণকারী দলের নেতাকে আক্রমণ করে। তখন একজন কম্যুনিষ্ট একরকমের রাসাযনিক দ্রব্যের সাহায্যে হাবুর চোখে আগুন ধরাইয়া দেয়। তাহাতেও খুশী না হইয়া উক্ত ব্যক্তি হাবুকে ছোরার আঘাতে হত্যা করে।

৯ই মার্চ ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিতে এখানকার কম্যুনিষ্টগণ রেল ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে। এই সময়ে তাহারা পুবাইল টঙ্গি ষ্টেশনের মধ্যে রেল লাইন উপড়াইয়া ফেলে। সৌভাগ্যক্রমে কোন দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্বেই ইহা কর্তৃপক্ষের নজরে আসে এবং আবশ্যকীয় মেরামত কার্য্য সারিয়া ফেলা হয। এখন বিবেচ্য—দুর্ঘটনা ঘটিলে কি হইত? নিরীহ যাত্রিগণই প্রাণ হারাইত, সন্দেহ নাই। কম্যুনিষ্ট আদর্শে মুসলিম জনগণ অনুপ্রাণিত হয না দেখিয়া এক্ষণে কম্যুনিষ্টদের অনেকেই মুসলমানের ছদ্মবেশ ধারণ করিতেছে। সম্প্রতি দিনাজপুর ও যশোহরে কয়েকজন মুসলমান নামধারী কম্যুনিষ্ট ধৃত হইয়াছে। পরে পরিচয় লইয়া জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ছিল হিন্দু এবং এই প্রদেশের বাহিরের কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতেই তাহারা কাজ করিতেছিল। কম্যুনিষ্টদের কর্ম্মপন্থা বিবেচনা করিলে মনে করা চলে যে, পাকিস্তানের দুশমনদের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। তাহারা হিতাহিত বিচারশূন্যও বটে। তাহারা যেসব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করিয়া থাকে, তাহা মনোজ্ঞ বুলি দ্বারা সতর্কভাবে আবৃত করিয়া রাখা হয়। গরীব ও সরল প্রকৃতির লোকদিগকে এই প্রলোভনে ভুলান হয় যে, যদি তাহারা তাহাদের উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করে তাহা হইলে তাহাদের সকল দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যাইবে।

ইহার পর যখনই কোন কম্যুনিষ্ট সহানুভূতিময় মিষ্টি বুলি লইয়া আপনার নিকট আসিবে এবং জানাইবে যে তাহার উপদেশমত কার্য্য করিলে আপনার দুঃখ-কষ্ট দূর হইবে, তখনই এই কথা স্মরণ রাখিবেন যে, সে আপনার বা আপনার দেশের কাহারও বন্ধু নয়। আপনার রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা, পাকিস্তানকে ধ্বংস করা এবং এই দেশ হইতে ইসলামের প্রভাব নির্ম্মূল করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য; কারণ সে খোদা-তালার উপর বিশ্বাস করে না। বাহিরে যে যতই বন্ধুত্ব দেখাক, স্মরণ রাখিবেন যে সে এমন একটি দলের সদস্য—যাহা পাকিস্তানের সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছে এবং যে দল সাধারণ লোককে পোড়াইয়া মারিয়া থাকে, যাহারা দরিদ্র হাবুর চোখ পোড়াইয়া দিয়াছিল এবং যাহারা রাষ্ট্রনাশক কার্য্য করিতে গিয়া নিরীহ রেল যাত্রীদিগকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

পাকিস্তানের নাগরিকগণ এই সব দুষ্কৃতিকারী সম্বন্ধে সাবধান হউন। তাহারা আপনার রাষ্ট্রের শত্রু। যেখানেই তাহাদিগকে দেখুন না কেন, কোন রকমেই তাহাদের প্রশ্রয় দিবেন না। তাহাদের অধিকাংশই অমুসলমান। কিন্তু কতিপয় বিপথগামী ও স্বার্থান্বেষী মুসলমানও তাহাদের ফাঁদে পা দিয়াছে। কিন্তু মুসলমানই হউক, আর অমুসলমানই হউক, তাহারা রাষ্ট্রের দুশ্মন এবং তাহাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত।

কমিউনিষ্ট পার্টি ও কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে সরকারী প্রচারণার একটি সামগ্রিক পরিচয় উপরোক্ত ইস্তাহারটির মধ্যে পাওয়া যায়। এই ধরনের প্রচারণা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে সরকারের পক্ষে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিলো তা বলা চলে না। উপরন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির নানান হঠকারিতার ফলে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা কমিউনিষ্ট বিরোধী হাতিয়ার হিসেবে অনেকাংশে কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়।

পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় মধ্যশ্রেণীভুক্ত ছাত্র, শিক্ষক ও যুবকদের ওপর কমিউনিষ্টদের প্রভাব বৃদ্ধি লাভ করছে এই আশঙ্কা করে ১৯৪৯ সালের অগাষ্ট মাসে কমিউনিষ্ট প্রভাব দমন ও দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে "যথোপযুক্ত" ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ বিষয়ে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় নিম্নলিখিত রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়:

যাহারা স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মারফৎ এছলাম বিরোধী কম্যুনিষ্ট নীতি প্রচারের দ্বারা জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মন বিষাক্ত করিয়া জাতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং নানাপ্রকার ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপের দ্বারা সরকারকে 'সাবোটাশ' করিবার মতলবে আছে, পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য ব্যবস্থাবলম্বন করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আরও জানা গিয়াছে যে যাহাতে কোন ছাত্র বা শিক্ষক পাকিস্তান বিরোধী ধ্বংসমূলক কার্য্যে লিপ্ত হইতে না পারে তজ্জন্য সরকার অতঃপর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর কড়া নজর রাখিবেন। যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপে লিপ্ত আছে, তাহা হইলে সেগুলির সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং সরকারী সাহায্য না পাইলে অনুমোদন বাতেল করিয়া দেওয়া হইবে। অপর পক্ষে সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষক বা ছাত্র অনুরূপ দোষে অভিযুক্ত হইলে তাহাদিগকে যথাক্রমে বরখাস্ত ও প্রতিষ্ঠান হইতে বহিস্কার করিয়া দেওয়া হইবে। উপরন্তু যদি কোন ছাত্র ধ্বংসমূলক কার্য্যে লিপ্ত আছে বলিয়া জানা যায়, তবে তাহার সরকারী চাকুরী লাভের পথ বন্ধ হইবে।

এই প্রসঙ্গে আরও জানা গিয়াছে যে, অতঃপর সরকারী চাকুরীর জন্য যদি কেহ আবেদন করেন, তবে তাঁহাকে অন্যান্য সার্টিফিকেটের সহিত এই মর্ম্মে আরও সার্টিফিকেট দিতে হইবে যে তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় রাষ্ট্রবিরোধী ধ্বংসমূলক কোন কার্য্যকলাপে তিনি লিপ্ত ছিলেন না। সার্টিফিকেট সমূহে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ত্তৃপক্ষের স্বাক্ষর থাকা চাই। রাজনীতির ছাত্র হিসাবে সরকারী কার্য্যকলাপের যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা করায় কোনরূপ নিরুৎসাহ প্রদান করা হইবে না তবে কোন শিক্ষক বা ছাত্র ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপে লিপ্ত কোন পার্টি বা সঙ্ঘের সদস্য হইলে পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণায় উৎসাহ যোগাইলে এবং প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপে উদ্যোগী হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।*

কমিউনিষ্টদের ভয়ে সরকার কতখানি ভীত ছিলো এবং কমিউনিষ্টদেরকে দমনের ক্ষেত্রে তারা কত কঠোর ও সুদূরপ্রসারী নীতি গ্রহণ করেছিলো এই সরকারী নির্দেশের মধ্যেও তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

৯

সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণ

১৯৪৮-৫০ সালে পূর্ব বাঙলায় সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম শুধু যে ব্যর্থ হয়েছিলো তাই নয়, তার ফলে পূর্ব বাঙলায় কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিলো। এই বিপর্যয়ের পরিণতিতে এদেশে পরবর্ত্তী দশ বারো বৎসর কৃষক আন্দোলনের কোন অস্তিত্বই বস্তুতঃপক্ষে ছিলো না এবং পরবর্ত্তীকালেও সে আন্দোলন কিছুটা সাংগঠনিক চরিত্র পরিগ্রহ করতে আরও কয়েক বৎসর সময় লেগেছিলো। এজন্যে এই ব্যর্থতার কতকগুলি কারণ এখানে উল্লেখ করা দরকার।

প্রথমতঃ, যে পর্যায়ে 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলে পাকিস্তান রাষ্ট্র উৎখাতের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিলো সে পর্যায়ে পূর্ব বাঙলার জনগণ স্বাধীনতাকে 'ঝুটা' মনে করতে এবং পাকিস্তানকে উৎখাত করতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। উপরন্তু আজাদীকে 'সাচ্চা' মনে করে তাঁরা পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে তাকে আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে নিজেদের ভাগ্যের উন্নতির চিন্তা করছিলেন। এজন্যে মুসলিম লীগের নির্যাতন ও কুশাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের অনেক বিক্ষোভ থাকলেও এবং মুসলিম লীগ সরকারের পরিবর্ত্তন তাঁরা চাইলেও কমিউনিষ্ট পার্টির পাকিস্তান উৎখাতের ধ্বনি তাঁদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো। সরকারও এই সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহারকে অবহেলা না করে তাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিলো।

দ্বিতীয়তঃ, সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিলো খুবই আকস্মিকভাবে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাষ্ট সরকারের সাথে সীমাবদ্ধ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে যাঁরা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির কথা বলেছিলেন তাঁরাই মাত্র ছয় মাসের মধ্যে যখন নিয়মতান্ত্রিক পথকে বর্জন করে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানালেন তখন জনগণের চেতনার স্তরকে বিচার না করেই তাঁরা তা করলেন। এর ফলে কমিউনিষ্ট পার্টির সশস্ত্র আন্দোলন প্রথম থেকেই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই শুরু হলো এবং সেই বিচ্ছিন্নতা ক্রমাগত এবং দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করলো।

তৃতীয়তঃ, এই বিচ্ছিন্নতা শুধু যে কমিউনিষ্ট পার্টিকে জনগণ থেকেই বিচ্ছিন্ন করলো তাই নয়, পার্টি সংগঠনকেও তা দ্রুতগতিতে ধ্বংস করে-দিলো। পূর্ব বাঙলার সর্বত্র মধ্যশ্রেণীভুক্ত হিন্দু সমাজ থেকে আগত পার্টি সদস্যেরা এই বিচ্ছিন্নতার ফলে দলে দলে দেশ ত্যাগ করে চলে গেলেন। শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী সদস্যেরা এই শ্রেণীগত ও ধর্মীয় পটভূমি থেকেই এসেছিলেন এবং তার ফলে ১৯৪৮ সালের মধ্যেই পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো প্রায় চুরমার হয়ে গিয়েছিলো।

চতুর্থতঃ, কমিউনিষ্ট পার্টির এই সশস্ত্র সংগ্রাম দেড় দুই বৎসর কেবল-মাত্র অমুসলমান প্রধান এবং নমঃশূদ্র আদিবাসী অঞ্চলগুলিতেই হয়েছিলো। এর ফলে সরকার সমগ্র কৃষক আন্দোলনকে "হিন্দুদের" আন্দোলন হিসেবে চিত্রিত করে সাম্প্রদায়িকতাকে বিপ্লবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছিলো।

পঞ্চমতঃ, কতকগুলি সংগঠিত এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে তাকে সারা পূর্ব বাঙলায় ছড়িয়ে দেওয়ার যে চিন্তার ওপর ভিত্তি করে সংগ্রামের এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিলো, সে চিন্তা ছিলো নিতান্তই ভ্রান্ত। ব্যাপক গণ আন্দোলনের শীর্ষে সশস্ত্র সংগ্রামের চিন্তা না করে সশস্ত্র সং-গ্রামের মাধ্যমে গণআন্দোলন সৃষ্টির প্রচেষ্টা মূলতঃ সন্ত্রাসবাদী হওয়ার ফলে আন্দোলনের বিকাশ না ঘটে সংগঠিত এলাকাগুলিই স্বল্পকালের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো।

ষষ্ঠতঃ, কতকগুলি এলাকাতে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে সারা দেশব্যাপী কৃষক সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলিকে ভিত্তি করে তাঁরা এমন কোন নির্দিষ্ট ধ্বনি ও কর্মসূচী কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণভাবে শোষিত জনগণের সামনে রাখতে পারেন নি যা তাঁদেরকে সংগ্রামের জন্যে উপযুক্ত ভাবে উদ্বুদ্ধ এবং উজ্জীবিত করতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—১৯৫০

১

সূত্রপাত

পুলিশের একজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সাব-ইন্‌সপেক্টর একজন সশস্ত্র কনষ্টেবলসহ তিনজন কনষ্টেবলকে সাথে নিয়ে জয়দেব ব্রহ্ম নামক একজন কমিউনিষ্ট কর্মীকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৫০, তারিখে খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার কালশিরা গ্রামে উপস্থিত হয়। জয়দেব ব্রহ্মব বাড়ীতে খানা তল্লাশীর সময় অন্যান্য নির্যাতনের সাথে তারা মহিলাদেরকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। এই সময় তারা কমিউনিষ্ট সমর্থক এক বিরাট জনতার দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই জনতার অধিকাংশই ছিলো নমঃশূদ্র। উভয় পক্ষের সংঘর্ষের ফলে সশস্ত্র পুলিশ কনষ্টেবলটি ঘটনাস্থলেই নিহত এবং অফিসার সহ অন্য দুইজন পুলিশ আহত হয়। সংঘর্ষ চলা কালে স্থানীয় আনসার বাহিনী পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের কিছু সংখ্যক মুসলমান গ্রামবাসীকে সাম্প্রদায়িক প্রচারণার দ্বারা উত্তেজিত করে তাদেরকে সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং তাদেব সহায়তায় আহত তিন জন পুলিশ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পলায়ন কবে। এর পর এলাকাটিতে পুলিশ বাহিনীর যথারীতি নির্যাতন শুরু হয় এবং কালশিরা, ঝালোরডাঙ্গা ও অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের অমুসলমান গ্রামবাসীরা তাদের বহনযোগ্য কিছু কিছু মালপত্র সাথে নিয়ে দ্রুতগতিতে এলাকা পরিত্যাগ করতে থাকে। এর পর তাঁদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ী স্থানীয় কিছু সংখ্যক মুসলমানদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়।[১] কিন্তু এই সংঘর্ষের সময় স্থানীয় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কিছুটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সাময়িকভাবে সৃষ্টি হলেও সে সময়ে অথবা তার পরবর্ত্তী পর্যায়ে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেখানে ঘটে না।* সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত এবং ৩০শে ডিসেম্বর খুলনা থেকে

* এই অঞ্চলে সে সময় প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলতে যা বোঝায় সে রকম কিছু না ঘটার ফলে দাঙ্গার কোন সংবাদ পূর্ব বাঙলা অথবা ভারতের কোন

প্রেরিত একটি সংবাদে বলা হয় যে, সে পর্যন্ত কালশিরার ঘটনার সাথে সম্পর্কিত ২০ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে এবং সশস্ত্র কনষ্টেবলটির মৃতদেহের কোন সন্ধান তখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।[২]

ভারতে 'সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ কাউন্সিল' (**council for the protection of Rights of Minorities**) ও হিন্দু মহাসভা ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে তাঁদের সাম্প্রদায়িক প্রচারণা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করে এবং তাদের এই প্রচারণা ভারতীয় সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র সমূহের মাধ্যমে যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করে।[৩] ১৯৪৯ সালের ২৪–২৬শে ডিসেম্বর কলকাতায় ভারতীয় হিন্দু মহাসভার একটি মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডক্টর এম. বি. খারে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয়লাভকারী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্যে পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি জেলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেন। এই দাবী আদায়ের জন্যে পাকিস্তানের ওপর বলপ্রয়োগের হুমকীও তিনি প্রদান করেন। এছাড়া মহাসভার একটি প্রস্তাবে পাকিস্তানকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও বলা হয়।[৪] হিন্দু মহাসভার এই সর্বভারতীয় সম্মেলনের পর মহাসভা নেতারা পাকিস্তান এবং বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যা লঘিষ্ঠদের দুরবস্থা এবং তাদের ওপর মুসলমানদের নির্যাতন সম্পর্কে আরও জোরেশোরে প্রচারণা শুরু করেন এবং সেই সব বক্তব্য কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য এলাকায় সাম্প্রদায়িক পত্রিকাগুলির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এই বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক প্রচারণার মধ্যে যে জিনিষটি প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় তা হলো এই যে, তার মধ্যে কালশিরায় "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার" বিন্দুমাত্র কোন উল্লেখ ছিলো না।[৫] এদিকে পূর্ব বাঙলাতেও ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে কলকাতা এবং পশ্চিম বাঙলার অন্যান্য

পত্রিকায় প্রায় এক মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। দুই দেশের মধ্যে কোন দেশের কোন সাম্প্রদায়িক নেতারাও তাঁদের অসংখ্য সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা বিবৃতিতে এর কোন উল্লেখ করেন নি। এর মূল কারণ এই সংঘর্ষ ছিলো পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় কমিউনিষ্ট বিরোধী অভিযান ও নির্যাতনেরই একটি ঘটনামাত্র। এদিক দিয়ে কালশিরার ঘটনার কোন বিশেষত্ব ছিলো না। বস্তুতঃ পক্ষে এই ধরনের কমিউনিষ্ট বিরোধী সরকারী অভিযানের সময় সিলেট জেলার সানেশ্বরে ১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাসের ঘটনার সময় তুলনায় অনেক বেশী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি আরও অনেক ব্যাপক এলাকায় হয়েছিলো, যদিও সেখানেও কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় নি।

স্থানে হিন্দুদের দ্বারা মসজিদ নষ্ট হওয়ার কাহিনী 'মর্নিং নিউজ' ও 'দৈনিক আজাদের' মত সাম্প্রদায়িক পত্রিকায় প্রচার এবং বিভিন্ন জায়গায় তার বিরুদ্ধে সভা সমিতি হতে থাকে।[৬] তাছাড়া হিন্দু মহাসভার কলকাতা সম্মেলনের বক্তব্য এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক বক্তৃতা বিবৃতি এবং সম্পাদকীয়ও পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই সময় বিশেষ স্থান লাভ করে।[৭] হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে পাকিস্তানেব ভারতভুক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে উভয় দেশে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যে ১লা জানুয়ারী, ১৯৫০, এই প্রস্তাবেব উল্লেখ কবে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে বলতে হয় যে, "আজ আমি স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, ভারতের সহিত পাকিস্তানের সংযুক্ত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।"[৮] পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন ৩রা জানুয়ারী হিন্দু মহাসভার প্রস্তাব উল্লেখ কবে এক বিবৃতিতে বলেন, "আমি দৃঢ় নিশ্চিত যে, পাকিস্তানকে যাহারা আক্রমণ করিবে পূর্বে বঙ্গে তাহাবা ষ্ট্যালিনগ্রাডের সাক্ষাৎ পাইবে। আমাদের রাষ্ট্রের দুশমনদের প্রতি আমাব উপদেশ: পাকিস্তান থেকে দূরে থাক।"[৯] ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বোম্বাইয়ের চৌপট্টি ময়দানে এক দীর্ঘ এবং তীব্র সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা দেন ও ভারতেব সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও অসুবিধাব জন্যে পাকিস্তানকে দায়ী করেন। তিনি তাঁর এই বক্তৃতায় পাকিস্তানের প্রতি অস্ত্রের হুমকিও প্রদান কবেন।[১০] প্যাটেলের এই বক্তৃতার পর পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন মহল ও এলাকায় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয় এবং সাম্প্রদায়িক 'দৈনিক আজাদ' ৬ই ও ৭ই জানুয়ারী তারিখে এ সম্পর্কে উপ-সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। ১৪ই জানুয়ারী কুমিল্লা বীরচন্দ্র সাধারণ পাঠাগার ও টাউন হলের সদস্যেরা এক বিশেষ সাধাবণ সভায় উক্ত ভবন থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি অপসারণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সেই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ কার্যকর করা হয়। সেই সাথে 'আনন্দমঠ' ও 'রাজসিংহ' উপন্যাস গ্রন্থ দুটিও পাঠাগার হোতে অপসারণ করা হয়।[১১] ১৫ই জানুয়ারী সর্দার প্যাটেল কলকাতার গড়ের মাঠে এক বিরাট জনসমাবেশ বক্তৃতা প্রসঙ্গে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং কলকাতা ও নোয়াখালী দাঙ্গার উল্লেখ করেন। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই যে দাঙ্গা হয় তারও উল্লেখ তাঁর বক্তৃতায় থাকে এবং এ সব কিছুর জন্যে তিনি মুসলমানদেরকে পুরোপুরিভাবে দায়ী করেন। সর্বোপরি তিনি

বলেন যে, পশ্চিম বাঙলা ও পূর্ব বাঙলার সীমানা "কৃত্রিম" এবং সেই সীমানা পূর্ব বাঙলার ভাইদেরকে সাহায্য করার জন্যে পশ্চিম বাঙলা ও ভারতের হিন্দুদের সেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে না।[১২] সর্দার প্যাটেলের এই উগ্র সাম্প্রদায়িক বক্তৃতার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব অথবা পশ্চিম কোন বাঙলাতেই কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে নি। কিন্তু প্যাটেলের বক্তৃতার পর পশ্চিম বাঙলার সাম্প্রদায়িক পত্র পত্রিকাগুলি পূর্ব বাঙলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে উত্তেজনাপূর্ণ মন্তব্য ও কাহিনী প্রকাশ করতে শুরু করে। ঠিক এই সময়েই সাম্প্রদায়িক প্রচারণার সুবিধার জন্যে সর্বপ্রথম কলকাতার সংবাদপত্রে কালশিরায় ২০শে ডিসেম্বরের ঘটনাকে বিকৃত করে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেখানে ব্যাপক হত্যা, লুটতরাজ, মারপিট ও ধর্ষণের কাহিনী বিবৃত করা হয়।[১৩] ১৮ই জানুয়ারী কালশিরার এক মাস পূর্বে সংঘটিত ঘটনাটির ওপর 'যুগান্তর' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' সম্পাদকীয় প্রকাশ করে তার মাধ্যমে মুসলমান বিরোধী তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়। এইভাবে হিন্দু প্রধান একটি এলাকায় পূর্ব বাঙলা সরকারের কমিউনিষ্ট নির্যাতনের একটি এলাকায় পূর্ব বাঙলা সরকারের কমিউনিষ্ট নির্যাতনের একটি ঘটনাকে সর্দার প্যাটেলের বক্তৃতার পরই তাঁর "আদর্শে" অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতার পত্রপত্রিকাগুলি "উপযুক্তভাবে" ব্যবহার করে পশ্চিম বাঙলায় এক ব্যাপক দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। বস্তুতঃপক্ষে ১৯শে জানুয়ারীর পর থেকেই পশ্চিম বাঙলার কোন কোন এলাকায় দাঙ্গা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বনগাঁ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে 'সংখ্যা লঘু অধিকার সংরক্ষণ কাউন্সিল' ও হিন্দু মহাসভা একক ও যৌথভাবে ২১শে থেকে ২৪শে জানুয়ারী সাম্প্রদায়িক সভা সমাবেশ শুরু করে এবং তার পর পরই বনগাঁ, বহরমপুর, গোরাবাজার, মুর্শিদাবাদ, উল্টোডাঙ্গা এবং কলকাতার মানিকতলা ও বেলেঘাটাতে দাঙ্গা শুরু হয়। ২৯শে জানুয়ারী 'কাউন্সিল' বাটানগরে একটি জনসভা করে এবং তার পর সেখানে এক ব্যাপক ও ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়। এই সব দাঙ্গার খবর লুফে নিয়ে ঢাকার 'দৈনিক আজাদ' 'মর্নিং নিউজ' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা পূর্ব বাঙলায় দাঙ্গা সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকে।[১৪] পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী দলের নেতা বসন্ত কুমার দাস দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন[১৫] যে, "পশ্চিম বঙ্গের সাম্প্রতিক হাঙ্গামা পূর্ব বঙ্গে দাঙ্গা

বাধার অন্যতম কারণ।" তিনি আরও বলেন যে, "পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রের বিভিন্ন সংবাদ ও মন্তব্য দাঙ্গা বাধার অন্যতম কারণ।"

কিন্তু শুধু সংবাদপত্রই নয়, বেতারের মতো সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থার ভূমিকাও এক্ষেত্রে কি ছিলো তার একটি উদাহরণ কুমিল্লায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি অপসারণকে অবলম্বন করে 'আল ইণ্ডিয়া রেডিও'র অপপ্রচার। এই অপপ্রচার চালাতে গিয়ে বলা হয় যে, ৪ শত মুসলমান হল আক্রমণ করে এবং মুসলমানরা ২ শত হিন্দু পরিবারের বাড়ী লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করে। এই মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ করে কুমিল্লার বিখ্যাত উকিল, কংগ্রেস নেতা ও পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য কামিনী কুমার দত্ত এবং পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলীয় উপ-নেতা ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত বিবৃতি প্রদান করেন।[১৬] এছাড়া ত্রিপুরা সাংবাদিক সংঘের সভাপতি রজত নাথ নন্দী একটি পৃথক প্রতিবাদমূলক বিবৃতিতে এ প্রসঙ্গে বলেন, "হিন্দুস্থানী বেতারে প্রচারিত এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ইহার ফলে শুধু উভয় দেশের পরস্পরিক সৌহার্দ্যই বিনষ্ট হইবে না বরং পাকিস্তানে হিন্দুদের অবস্থাও সংকটাপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।"[১৭] বস্তুতঃপক্ষে পশ্চিম বাঙলায় ও সমগ্র ভারতে অধিকতর ব্যাপক আকারে দাঙ্গা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারতীয় সরকার ও তাদেব সমর্থক সাম্প্রদায়িক পত্র-পত্রিকাসমূহ এই সময় মরীয়া হয়ে ওঠে এবং সেই উদ্দেশ্যে কাল্পনিক দাঙ্গার কাহিনী প্রচারের দ্বারা তারা প্রকৃত দাঙ্গা সৃষ্টিব সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

পূর্ব বাঙলায় সে পর্যন্ত কোন দাঙ্গা সংঘটিত না হলেও পশ্চিম বাঙলা ও ভারতের সরকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রচারযন্ত্রগুলিব সাম্প্রদায়িক প্রচারণার মধ্যে পূর্ব বাঙলার মুসলিম লীগ সরকার ও আমলাতন্ত্র পূর্ব বাঙলায় দাঙ্গা সৃষ্টির এক অপূর্ব সুযোগ দেখতে পায়। নানা উপায়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সৃষ্টির সরকারী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তানোত্তবকালে পূর্ব বাঙলায় সে পর্যন্ত কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় নি। এবার পূর্ব বাঙলা সরকার সর্দার প্যাটেল প্রদত্ত এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সতর্ক ও যত্নবান হলো।

১০ই মার্চ, ১৯৫০, তারিখে নূরুল আমীন দাঙ্গা সম্পর্কিত তাঁর পরিষদ বক্তৃতায়[১৮] বলেন যে, কালশিরার ঘটনাকে যে পশ্চিম বাঙলার সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মহল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদ্দেশ্যে ব্যবহার

করছে সেটা তাঁর সরকার জানুয়ারীর শেষের দিকে উপলব্ধি করেন, তার পূর্বে নয়। এবং সেজন্যেই তাঁরা ৩রা ফেব্রুয়ারী কালশিরার প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করে ৩রা ফেব্রুয়ারী একটি প্রেস নোট প্রকাশ করেন। 'যুগান্তর' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকার' ১৮ই তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও বিভিন্ন মিথ্যা কাহিনী প্রচারিত হওয়ার পর দুই সপ্তাহ পর্যন্ত পূর্ব বাঙলা সরকার এ ব্যাপারে কিছুই উপলব্ধি করতে পারেন নি, এ কথা যে কোন সাবালক ব্যক্তির পক্ষেই যে বিশ্বাসযোগ্য নয় তা বলাই বাহুল্য। আসল ব্যাপার হলো এই যে, কালশিরার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় অপপ্রচারের ফলে পশ্চিম বাঙলায় দাঙ্গা সৃষ্টি হয়ে পূর্ব বাঙলাতেও দাঙ্গা সৃষ্টির যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিলো তা উপলব্ধি করেই পূর্ব বাঙলা সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুই সপ্তাহ তাদের অর্থপূর্ণ নীরবতা পালন করে। সরকারের এই নীরবতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ৩রা ফেব্রুয়ারী 'ভারতীয় প্রচারের স্বরূপ' নামক একটি তীব্র সাম্প্রদায়িক সম্পাদকীয়তে দৈনিক আজাদের মতো একটি পত্রিকাতে পর্যন্ত বলা হয় :

> "বাগেরহাটের ব্যাপার সম্বন্ধে সরকারী নীরবতার আমরা প্রতিবাদ আগেই করিয়াছি, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। আজ এই নীরবতার সুযোগ লইয়া সারা ভারতবর্ষে পাকিস্তান বিরোধী প্রচারের প্লাবন দেখা দিয়াছে। যথা সময়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া জানাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। যা হোক আমরা পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে এসব প্রচারের স্বরূপ উদঘাটন করিয়া দিতে আশু তৎপর হইতে বলি। যথাসময়ে ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে আমাদের সে ক্ষতি হয়ত পূরণ করাই কঠিন হইবে।"

এর পর ঐ দিনই অর্থাৎ ৩রা ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাঙলা সরকার কালশিরার ঘটনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রেস নোট প্রকাশ করেন :

> গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে একজন সহকারী পুলিশ সাবইন্সপেক্টর এবং ৩ জন কনষ্টেবল লইয়া গঠিত একটি পুলিশ দল একজন আসামীর বাড়ী তল্লাসী করিবার জন্য বাগেরহাটের অন্তর্গত কালশিরার গ্রামে গেলে তাহারা অকস্মাৎ কম্যুনিষ্ট প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ সশস্ত্র নমশূদ্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়। একজন কনষ্টেবল ঘটনাস্থলে নিহত হয় এবং পুলিশ দলের অবশিষ্ট লোকগুলি গুরুতর রূপে জখম হয়। নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে আনসার দল এবং গ্রামবাসীরা সময় মত তাহাদিগকে

৮ই জানুয়ারী সাধারণ ধর্ম্মঘট জয়যুক্ত হউক !

দমননীতি বন্ধ কর—ছাত্রদাবী মানতে হবে !!

নতুন বছরে স্কুল কলেজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ঢাকার বুকে ছাত্র আন্দোলনের প্রবল জোয়ার বহিয়া চলিয়াছে। দীর্ঘ দেড় বছর হইতে চলিল অভাব অনটন ও শিক্ষা সংকটের দহনে দগ্ধ হইয়া ছাত্রজীবনের প্রতিক্ষেত্রে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত ছিল। ধনিক সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বর্ব্বর অভিযান মুখ বুজিয়া তাহারা সহ্য করিয়াছে দমন নীতির রথচক্রে দলিত হইয়াছে। কিন্তু নতুন বছরে স্কুল কলেজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের নওজোয়ানের তরুণ সুস্থ মন স্বতঃ স্ফূর্তভাবে দৈন্য ও সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করিয়াছে।

যত দিন যাইতেছে ততই লীগ নেতৃবৃন্দ গালভরা উপদেশ দিতেছেন - পাকিস্তানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর; অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়া পাকিস্তানকে গড়িয়া তোল। অথচ দেশকে গড়িয়া তুলিতে পারে যে সকল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র তাহাদের পড়াশুনা ও সমাজ সেবার সুযোগ সুবিধার ন্যূনতম দাবীকে নেতৃবৃন্দ অগ্রাহ্য করিতেছেন। পাকিস্তানের মজলুম জনসাধারণ যখন বিনা চিকিৎসায় বিনা শুশ্রূষায় রোগে শীতে ধরে ধরে মারা যাইতেছে তখন চিকিৎসার জন্য বহু দিনের কষ্ট সাধনায় ও জনগণের সমবেত দানে গঠিত ঢাকার সহরের জাতীয় স্বার্থের প্রতীক ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল স্কুলের হাসপাতালটিকে সরকারী প্রয়োজনে দখল করা হইয়াছে। এবং ৩০০ শত চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছাত্রের সমাজ সেবা হইতে বঞ্চিত করিতেছে। শিক্ষা ও ছাত্র সমাজের প্রতি সরকারের দরদ এইখানেই শেষ হয় নাই। যেখানেই শিক্ষার বিরুদ্ধে এই অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ মাথা তুলিয়া দাড়াইয়াছে সেখানেই সরকার সভ্যতার শেষ আবরণটুকু ফেলিয়া নিঃসংকোচে নিষ্ঠুরভাবে দমন করিয়াছে। সম্প্রতি রাজসাহী কলেজের ছাত্রদের ৪ জনকে কর্ত্তৃপক্ষ সামান্য অজুহাতে বহিষ্কারের আদেশের প্রতিবাদে ১৯ জন ছাত্র যে অনশন ধর্ম্মঘট করে তাহাদের ধর্ম্মঘটের ৫ দিন পরে ৪ জন ধর্ম্মঘটী ছাত্রকে শীতের রাত্রে অজ্ঞান অবস্থায় উলঙ্গ করিয়া যে ভাবে শালদহের সীমানায় নিয়া ছাড়িয়া দেয় এবং রাজসাহী কলেজের হোষ্টেলের প্রতিটি ঘরে পুলিশ কর্ডন করিয়া প্রতিটি ছাত্রকে যেভাবে পুলিশ উৎপীড়নের তাণ্ডবলীলা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার নজীর একমাত্র ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আমলেই মিলে। এই ত সেদিন ঢাকা জিলায় নারায়ণগঞ্জে তরুণ কিশোর বাহিনীর উদ্যোগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নাটক অভিনয়কে শেষ মুহূর্ত্তের আদেশে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জে শিক্ষা সমস্যার উপর বৈঠকের আয়োজনের অজুহাতে স্কুলের ছাত্র সফি ও মোতা মিঞাকে গ্রেপ্তার করিয়া নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে দীর্ঘ ৩ মাস যাবত আটক রাখা হইয়াছে তাহা আজও দেশবাসীর মনে জাগ্রত আছে।

ছাত্র সমাজ ইহাতে বিস্মিত হইবেনা। কারণ ছাত্র সমাজ জানে পাকিস্তানের বর্ত্তমান সরকারের রূপ কি, কি ভাবে সমাজের শোষক শ্রেণীর স্বার্থে পুষ্ট, জমিদার জোতদার ও মিল মালিকের [illegible] পরিচালিত। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হইতে সুরু করিয়া ঢাকা পুলিশ ধর্ম্মঘট, নাদেরপাড় বীর কৃষকের লড়াইর ন্যায় প্রতিটি গৌরবময় ন্যায্য আন্দোলনের বহু শহীদের বুকের রক্তে বর্ত্তমান সরকারের হাত রঞ্জিত। যতদিন বর্ত্তমান সরকার গদিতে থাকিবে ততদিন সে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী, কায়দায় [illegible]

জুলুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে ছাত্র ফেডারেশনের ইস্তাহার।

৮ই জানুয়ারী—শনিবার

জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন করুন

রাজশাহী, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ও অন্যান্য জেলায় ছাত্রদের উপর অকথ্য জুলুমের প্রতিবাদে—

শিক্ষায়তন সমূহে ধর্মঘট করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল সহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বেলা বারটায় সভায় যোগদান করুন।

জুলুম প্রতিরোধ সাব কমিটি
পূর্ব্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ।

• ছাত্র সংহতি বিনষ্টকারী কায়েমী স্বার্থবাদীদের দালালদিগের মিথ্যা প্ররোচনায় ভুলবেন না।

৮ই জানুয়ারী, শনিবার, জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালনের বিজ্ঞাপন

ছাত্র সমাজের উপর দমননীতির ষ্টীমরোলার

আজাদী লাভের মূলে রয়েছে কায়েদে আজমের সুদৃঢ় সেনানায়কত্ব এবং ছাত্র সমাজের বলিষ্ঠ তৎপরতা, একনিষ্ঠ সাধনা, ত্যাগ ও প্রেরণা। যে ছাত্র সমাজ পাকিস্তান সংগ্রামের সময় শিক্ষা দীক্ষা বন্ধ করে আহার নিদ্রা ও আরামকে হারাম করে উল্কার মত ছুটে চলেছিল গ্রামে গ্রামে, আজ তাদের উপরই চলছে নির্যাতন ও নিষ্পেষণের ষ্টীম রোলার। যে ছাত্র সমাজ এবং অগণিত জনসাধারণ জাতির দুশমন বাতিলকে সাত সমুদ্র তের নদী পার করেছে তাদের কর্মপ্রেরণাই আজ স্বার্থপরদের মধ্যে এক ভয়ংকর ত্রাসের সঞ্চার করেছে। জাতির পিতা, পাকিস্তানের স্রষ্টা কায়েদে আজম হতে শুরু করে সমস্ত লীগ নেতৃবৃন্দ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, পাকিস্তান অর্জনে ছাত্রদের দান অপরিসীম। তা হোলে পাকিস্তান অর্জনের পর পাকিস্তানের বীর সেনানীদের উপর নির্যাতন চলছে কেন? আজ আমাদের নেতারা ও উর্দ্ধতন কর্মচারীবর্গ মনে করেন পাকিস্তান কেবল তাদেরই, এতে অন্য কারও ভাগ নেই। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, জন সাধারণের অন্নবস্ত্রের সমস্যার ভিতর দিয়াই আজ এটা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

দেশের গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থা আজ ভাঙনের মুখে, ছাত্র আছে ছাত্রাবাস নেই, স্কুল কলেজ আছে শিক্ষক নেই, যে কয়জন শিক্ষক আছেন তাঁদের পেটে ভাত পরনে কাপড় নেই। শিক্ষা দপ্তর আছে শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা নেই, দপ্তর আছে কিন্তু দপ্তরখানায় "বাংলা ভাষা কমিটির ও ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের ফাইল নেই" উধাও হয়ে যায়। শিক্ষা সংকোচের উৎসাহে সরকারী মহল উন্মত্ত। ছাত্রেরা যখনই বলেন 'শিক্ষা সংকোচ চলবে না, শিক্ষকদের উপযুক্ত মাইনা দিতে হবে, শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার চাই, ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করতে হবে, তখনি ফতুয়া দেওয়া হয় "সব ঠিক হায়, ছাত্রলোগ গোলমাল করতা হায়।" পূর্ব্ব পাকিস্তানের অগণিত জনসাধারণ যখন অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় তখন সরকারী কর্মচারী ও দালালদের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের ধান চাল বে-আইনীভাবে হিন্দুস্থানে হু হু করে চলে যায়। কেও কি কসম করে বলতে পারেন যে বরিশাল উত্তর বঙ্গ ও অন্যান্য উদ্বৃত্ত জেলার চাল কোনো এলাকায় এক সপ্তাহ খেয়েছেন? তবে চাল ধান যায় কোথায়? ছাত্রেরা যখনই এ ব্যাপারে মুখ খুলেন তখনই তাঁরা পান "রাষ্ট্রের দুশমন খেতাব। আজ নিজেদের উর্দ্ধতন কর্মচারীরা মনে করেন ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই। কাজেই যারা পাক ভূমিকে অত্যাচার অনাচার, অবিচার, ঘুষখোর ও চোরাকারবারী মুক্ত করে সত্যিকারের পাকিস্তানে পরিণত করতে চান তাদের উপর চলে ঘুষখোর ও পাকিস্তানের ধ্বংসকারীদের অবিরাম অত্যাচার।

এরই জন্য আজ চলছে রাজশাহী, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল ও ফরিদপুরের, ছাত্রদের উপর অসহনীয় নির্যাতন। ছাত্রাবাসের দাবী করার জন্য কুষ্টিয়ার প্রায় দেড় ডজন ছাত্রের উপর এই সেদিনও জুলুম চালান হোল। রাজশাহী কলেজের ৪ জন ছাত্রকে কলেজ ও জেলা হোতে বহিষ্কার করা হয়েছে, ২৫ জন ছাত্রকে হোষ্টেল ও সহর ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। আরও ৬০ জনকে বের করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। যে দুর্বৃত্তেরা মিছিল আক্রমণ করল তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি, হয়েছে ছাত্রদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা। যে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করল তাদের শাস্তির কি ব্যবস্থা করা হয়েছে? সরকারী কলেজ হোষ্টেলকে সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে দু দুবার ঘিরে ফেলা, হোষ্টেলের কামরায় কামরায় খানাতল্লাসী চালান, বিনা ওয়ারেন্টে হোষ্টেল হতে ছাত্র গ্রেপ্তার করা, ২৭ ঘণ্টা অনশন কারীদের ঠেঙিয়ে পুলিশ দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়ার মত সাহস সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ আমলেও কোন জেলা কর্তৃপক্ষ করেনি। অথচ আজ এ সাহস কেন? শিক্ষা মন্ত্রী ঠিকই বলেছেন "জেলা কর্তৃপক্ষ এমন একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর আত্মীয় যার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করবার আগে ভেবে দেখতে হবে"। সরকারী কর্মচারীরা কি তবে মন্ত্রী সাহেবানদের সিংহাসন টলটলায়মান করতে পারেন? ছাত্রদের আমরা জিজ্ঞাসা করি আপনারা কি কাউকে দেখে ভয় করেন? নিশ্চয়ই না। তবে আমাদের প্রতিনিধিরা ভয় করেন কেন? বেসরকারী তদন্তের দাবীতে রাজী হোতে মন্ত্রীসাহেবানরা সাহস করেন না কেন? অন্যান্য উপরোক্ত জেলাগুলোতে ঠিক একই ভাবের জুলুম চলছে। কাজেই জুলুম প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। পূর্ব্ব পাকিস্তানের সমগ্র নাগরিক, বিশেষ করে ছাত্রবন্ধুগণ "জুলুম প্রতিরোধ দিবস' ৮ই জানুয়ারীকে সমবেতভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। মনে রাখবেন রাষ্ট্র আমাদের—পাকিস্তান অর্জনের পথে আমাদের মূল্য দিতে হয়েছে প্রচুর। সচেতন থাকবেন রাষ্ট্রের শত্রুরা আমাদের ন্যায্য আন্দোলনকে যেন বিপথে চালিত করতে না পারে। শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল, মিছিল ও সভা সমিতি করাই হবে আমাদের চরম লক্ষ্য। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

সাব কমিটি জুলুম প্রতিরোধ দিবস
পূর্ব্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ

জুলুম প্রতিরোধ দিবস-উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ইস্তাহার, ছাত্র সমাজের উপর দমন নীতির ষ্টীম রোলার।

বিরাট প্রতিবাদ সভা

সভাপতি : অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী

জনাব এ, কে, ফজলুল হক

স্থান—ভিক্টোরিয়া পার্ক

তারিখ—১২ই আগষ্ট, শুক্রবার

বৈকাল ৪-৩০ (সাড়ে চারি ঘটিকা)

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ মানে জনগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। পূর্ব্ববঙ্গ সরকার ইত্তেহাদ এবং অপরাপর পত্রিকার পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে জনগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছেন। পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে আপনারা এই বিরাট প্রতিবাদ সভায় দলে দলে যোগদান করুন।

নিবেদক,

পাকিস্তান ছাত্র র‍্যালী

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের প্রতিবাদে 'পাকিস্তান ছাত্র র‍্যালীর' সভার বিজ্ঞাপন। পৃষ্ঠা ৩৫৭।

উদ্ধার করিতে আসায় তাহাদের জীবন বাঁচে। ফলে পুলিশের অত্যাচার ও পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে কালশিরা এবং ঝালডাঙ্গা গ্রামের অধিবাসীরা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পালায়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা এই সুযোগে গৃহত্যাগীদের পরিত্যক্ত কোন কোন জিনিষ চুরি করে। স্থানীয় মুসলমান এবং অমুসলমান অধিবাসীদের সাহায্যে পুলিশ উক্ত জিনিষ উদ্ধার করিয়া তাহা মালিকদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছে।

তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল কর্তৃক প্রচারিত নারী ধর্ষণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ অথবা প্রতিমা অপবিত্রকরণের সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেবলমাত্র দুইটি ক্ষেত্রে নারী নিগ্রহের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং এ সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

এই সকল গ্রাম পরিত্যাগকারী ব্যক্তির এবং পুলিশের ওপর আক্রমণ সংঘটনকারী কম্যুনিষ্টরা পশ্চিমবঙ্গে যাইয়া খুলনায় হিন্দুদের ওপর সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের কাহিনী ছড়াইতেছে এবং প্রতিশোধ দাবী করিতেছে। সীমান্তের বাহিরে কম্যুনিষ্টরা অনুরূপভাবে হিন্দুদিগকে পাঁচ মাস পূর্বে বিয়ানীবাজার (সিলেট) থানা এবং ২ মাস পূর্বে রাজশাহী থানা* আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করে।[১৯]

এইভাবে পূর্ব বাঙলা সরকার উপরোক্ত প্রেসনোটটিতে সুন্দরভাবে পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলার দাঙ্গা পরিস্থিতির দায়িত্ব কমিউনিষ্টদের ওপর আরোপ করে এক ঢিলে দুই পাখী মারার ব্যবস্থা করেন।

ইতিমধ্যে পশ্চিম বাঙলায় কালশিরার ঘটনা পত্রপল্লবে বিকশিত হয়ে মহীরুহের আকার ধারণ করেছিলো কাজেই পূর্ব বাঙলা সরকারের এই প্রেস নোটে প্রদত্ত বিবরণ সেখানে কেউ গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো না এবং কেউ যাতে তা গ্রহণ না করে তার জন্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রচারণাও সক্রিয় ছিলো। কাজেই প্রেস নোটটি প্রকাশিত হওয়ার পরই পশ্চিম বাঙলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় সেটিকে সম্পূর্ণ বানোয়াট বিবরণ হিসেবে বর্ণনা করে তার সত্যতাকে অস্বীকার করেন।[২০] সেখানকার পত্র-পত্রিকাগুলি শোরগোল তুলে তাঁর সাথে সুর মেলায়। ফলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে।

* অর্থাৎ নাচোল। —ব. উ.

৬ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বাঙলা সরকার এক প্রেস নোট[২১] প্রকাশ করে পশ্চিম বাঙলায় বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা স্বীকার করেন। কিন্তু পূর্ব বাঙলায় তখনো পর্যন্ত কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না ঘটা সত্ত্বেও প্রেস নোটটিতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলা হয় যে, পূর্ব বাঙলার বরিশাল, যশোর, রাজশাহী, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলেই পশ্চিম বাঙলার দাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি ও দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে।

এই ধরনের সরকারী প্রেস নোট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কলকাতা সফররত মৌলানা আজাদ ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে বলেন যে, এই ধরনের বিবৃতির দ্বারা নিজেদের দোষ স্খালন করার চেষ্টা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রবোচনাই যোগানো হয়, কোন সুফল তার দ্বারা অর্জিত হয় না।[২২]

৬ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী দলীয় নেতা বসন্ত কুমার দাস পূর্ব বাঙলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, বিশেষত: নাচোল ও বাগেরহাটের ঘটনার ওপর বিতর্ক দাবী করেন।[২৩] তিনি বলেন যে, বাগেরহাটের ঘটনার ফলে পূর্ব বাঙলায় সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং নাচোলের ঘটনা পশ্চিম বাঙলায় কিছুটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেস দলীয় পরিষদ সদস্য সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস আনসারদের দ্বারা প্রহৃত হয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।[২৪]

প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন বিতর্ক সম্পর্কিত বসন্ত দাসের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন যে, বাগেরহাট ঘটনার ওপর সরকার ইতিপূর্বে প্রেস নোট প্রকাশ করে সকল তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কাজেই সে বিষয়ে বিতর্কের কিছু নেই। এর পর তিনি পশ্চিম বাঙলার দাঙ্গা এবং সেখানে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের 'হৃদয় বিদারক' ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বলেন যে, সেই অবস্থায় পূর্ব বাঙলায় শান্তি রক্ষা করা তাঁদের পক্ষে খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ছে।[২৫] বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতে না পারার প্রতিবাদে কংগ্রেস দলীয় সদস্যেরা ঐ দিন পরিষদ কক্ষ পরিত্যাগ করেন।

পরদিন অর্থাৎ ৭ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার পত্রপত্রিকায় কংগ্রেস দলের পরিষদ কক্ষ ত্যাগ, এবং নূরুল আমীনের 'হৃদয় বিদারক' ঘটনাবলী সংক্রান্ত বক্তব্য মন্তব্যসহ ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। এবং তার ফলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আরও উচ্চ মার্গে ওঠে।

৭ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে বসন্ত দাস তাঁদের পরিষদ কক্ষ ত্যাগের ওপর এক বিবৃতি দেন। তাতে তিনি আবার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ওপর বিতর্ক এবং বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলীর তদন্ত দাবী করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব বাঙলায় দাঙ্গা শুরু হয়েছে এবং সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও বলপ্রয়োগের সংবাদ তাঁদের কাছে আসছে। তারিখ অনুযায়ী ঘটনার বিকাশের দিকে সঠিকভাবে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে যে, তাঁর এই 'সংবাদ' পশ্চিম বাঙলার সাম্প্রদায়িক প্রেস কর্তৃক সরবরাহকৃত সংবাদ ব্যতীত অন্য কিছুই ছিলো না। বসন্ত দাস তাঁর পরিষদ বক্তৃতায় আর একটি দাবী উত্থাপন করে বলেন যে, পূর্ব বাঙলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে, তার প্রকৃত তদন্ত একমাত্র সম্ভব একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হলো এই যে, বিরোধী কংগ্রেস দলীয় নেতা বসন্ত কুমার দাস মুসলিম লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের সাথে কমিউনিষ্ট বিরোধিতার ক্ষেত্রে একাত্মতা ঘোষণা করে তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, "তদন্ত দাবী করতে গিয়ে নাচোল ও বাগেরহাটে পুলিশ হত্যার জন্য যারা দায়ী তাদের আচরণের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে বিবেচনা করি।"[২৬]

পূর্ব বাঙলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষদে বিতর্ক হলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে এই যুক্তি দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন বিতর্ক সম্পর্কিত বিরোধী দলীয় প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন।[২৭] এর পর দ্বিতীয় বারের মতো কংগ্রেস দলীয় সদস্যেরা আবার প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে পরিষদ কক্ষ পরিত্যাগ করেন।[২৮] বসন্ত কুমার দাসের আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের দাবী, কংগ্রেস দলের দ্বিতীয়বার পরিষদ কক্ষ ত্যাগ ও নূরুল আমীনের বক্তৃতা ৮ই ফেব্রুয়ারীর দৈনিক আজাদ, মর্নিং নিউজ প্রভৃতি পত্রিকায় আবার মন্তব্যসহ ফলাও করে ছাপা হয়।

পূর্ব বাঙলার সরকার, সংবাদপত্র ও সাম্প্রদায়িক মহলের হাত জোরদার করার জন্যে এবং পূর্ব বাঙলায় দাঙ্গা বাধাবার উদ্দেশ্যে পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা চলাকালীন অবস্থাতেই ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রধান মন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় প্রাদেশিক পরিষদে এক উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেন।[২৯] শুধু তাই নয়, ৯ই ফেব্রুয়ারী আবার এক দুরভিসন্ধিমূলক প্রেস নোট জারী করে পশ্চিম বাঙলা সরকার এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, শীঘ্রই পূর্ব

বাঙলায় সাম্প্রদায়িক শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।[৩০] পশ্চিম বাঙলার এই প্রচারণার এবং বিহার, পশ্চিম বাঙলা ও আসাম থেকে বিরাট আকারে উদ্বাস্তুদের পূর্ব বাঙলা প্রবেশের দ্বারা ভীত হয়ে ইতিমধ্যে হাজার হাজার হিন্দু নিজেদের ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে পশ্চিম বাঙলায় উপস্থিত হতে থাকেন। ইংরেজ আমলে বরদলুইয়ের কংগ্রেসী সরকারের বাঙালী খেদান নীতির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে এবং সাম্প্রদায়িক বিবেচনার দ্বারা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে আসাম সরকার এই সুযোগে ব্যাপক হারে বাঙালী, অর্থাৎ এক্ষেত্রে মুসলমান বাঙালী, খেদার পরিকল্পনা সুচারুভাবে সম্পন্ন করে। এর ফলে ৩রা ফেব্রুয়ারী থেকে আসামের বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গা শুরু হয় এবং ট্রেন বোঝাই হয়ে ও পায়ে হেঁটে হাজার হাজার উদ্বাস্তু পূর্ব বাঙলায় প্রবেশ করতে থাকেন। লুমডিং থেকে মুসলমান উদ্বাস্তু বোঝাই একটি ট্রেনের যাত্রীদেরকে ৩রা ফেব্রুয়ারী ট্রেন থামিয়ে নৃশংসভাবে মারপিট ও হত্যা করা হয়। তাদের মালপত্রও আক্রমণকারীরা লুণ্ঠন করে।

কলকাতা, বাটানগর ও পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল, বিহার এবং আসামের বিভিন্ন এলাকায় যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপকতম বিস্তৃতি ঘটেছে এবং পূর্ব বাঙলা সরকার যখন পূর্ব বাঙলায় দাঙ্গা পরিস্থিতিকে পরিণত অবস্থায় এনে সমগ্র প্রদেশকে দাঙ্গার চৌকাঠে হাজির করেছে তখন ৯ই ফেব্রুয়ারী ঢাকাতে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার চীফ সেক্রেটারীদের দুই দিন ব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়। দাঙ্গা প্রতিরোধ কল্পে চীফ্ সেক্রেটারী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সমূহ স্থানীয় সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হয় ১২ই ফেব্রুয়ারী।

যৌথ প্রেস নোটটির[৩১] মূল সিদ্ধান্তগুলি হলো (ক) জনসভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা (খ) সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধিকর সর্বপ্রকার পুস্তিকা, প্রাচীর পত্র ইত্যাদির মুদ্রন ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা এবং (গ) সাম্প্রদায়িক ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে বা আতঙ্কের সৃষ্টি হতে পারে সে রকম কোন গুজব বা সংবাদ প্রকাশ যাতে না করা হয় তার জন্যে উভয় দেশের সংবাদপত্রসমূহের সহযোগিতা প্রার্থনা। যে পর্যায়ে এই সব সিদ্ধান্তের সামান্যতম মূল্যও থাকতো সে পর্যায়ে এই সিদ্ধান্ত সমূহের বিপরীত সিদ্ধান্তসমূহকে চক্রান্তমূলকভাবে কার্যকর করার পর দাঙ্গা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং দাঙ্গার ব্যাপারে উভয় দেশের জনগণকে ধোকা দেওয়ার ক্ষেত্রে উভয়

দেশের পারস্পরিক অলিখিত সহযোগিতা চীফ সেক্রেটারী সম্মেলনের পর এই প্রেস নোটটির মধ্যেই একটা পরিণতি লাভ করে।*

২

পূর্ব বাঙলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ঢাকায় চীফ সেক্রেটারী সম্মেলন শুরু হওয়ার দিন অর্থাৎ ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী এক চরম উত্তেজনাপূর্ণ সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা প্রদান করেন। পূর্ব বাঙলায় সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি দাঙ্গার প্রান্ত-সীমায় যখন উপনীত হয়েছে সেই মুহূর্তে এই ধরনের একটি বক্তৃতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপ ব্যতীত অন্য কোন হিসেবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তৎকালীন পরি-স্থিতিতে এই বক্তৃতার যে স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত পরিণতি তাই ঘটলো। ১০ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে শুরু হলো পাকিস্তানোত্তর পূর্ব বাঙলার সর্ব বৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ও নাশকতামূলক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

ঢাকার এই দাঙ্গা সম্পর্কে ১০.২.১৯৫০ তারিখে তাজউদ্দীন আহ-মদের ডায়েরীতে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়:

> দুপুর একটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত নবাবপুর, সদরঘাট, পাটুয়াটুলী, ইসলামপুর, ডিগবাজার, ইংলিশ রোড, বংশাল, চক ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ঘুরে মুসলমানরা হিন্দুদের যে ক্ষয়ক্ষতি করেছে তা দেখে বেড়ালাম। রাত্রি যাপন করলাম কমরুদ্দীন সাহেবের বাসায়।
>
> **বিশেষ নোট:** স্বাধীনতার পর এই সর্বপ্রথম আজ দুপুর ১২টা থেকে ঢাকা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করছে। এর কারণ কল-কাতার হাঙ্গামা, বিশেষতঃ গত ৩।৪ দিনের। উদ্বাস্তুরা, বিশেষতঃ বিহারীরা, এই গণ্ডগোলের জন্যে দায়ী। স্থানীয় লোকেরা বিরুদ্ধে না থাকলেও উদাসীন ছিলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত লুটতরাজ, হত্যা এবং অগ্নি-দাহ অপ্রতিরোধ্যভাবে চললো। এ সব থামাবার জন্যে পুলিশ

* ১৯৫০ সালে পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলার দাঙ্গা পরিস্থিতির ক্রমবিকাশ ও দাঙ্গার ঘটনাবলী সম্পর্কিত বিস্তারিত রিপোর্টের জন্য দ্রষ্টব্য: ইংলণ্ডের Manchester Guardian ও Economist এর প্রতিনিধি Taya Zinkin এর 'Reporting India' (Chatto and Windus)—ব.উ.

কিছুই করলো না। অবাঙালী পুলিশেরা উৎসাহ দিলো। সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলো। সন্ধ্যা বেলায় সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন জারী করা হলো কিন্তু কার্যকর করা হলো না।

বর্ত্তমান হাঙ্গামার কারণ নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় ইউনিয়ন, বিশেষতঃ পশ্চিম বাঙলার ঘটনাবলীর মধ্যেই নিহিত। এটা নিশ্চিতভাবে কলকাতার মুসলমানদের ওপর যা হয়েছে, বিশেষতঃ গত এক সপ্তাহ ধরে, তারই প্রতিক্রিয়া। পূর্ব বাঙলা পরিষদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী এম. এল. এ. দের পদক্ষেপ তা অবিবেচনামূলক অথবা পরিকল্পিত যাই হোক, পরিস্থিতিকে আরও গুরুতর করলো। পরিষদের আলোচনায় তাঁদের অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত এবং পূর্ব বাঙলার সংখ্যালঘুদের "নিরাপত্তার" জন্যে জাতিসঙ্ঘের কাছে তাঁদের আবেদনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই প্রদেশের মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিলো। যারা সরল বিশ্বাসে অথবা বিশুদ্ধ নাগরিক চেতনা থেকে—যে কারণেই তাঁরা তা করে থাকুন, তার বিরুদ্ধে যাঁরা সব থেকে উদারতাবাদী তাঁরাও বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ভারতীয় হাই কমিশনের সামনে এবং আমাদের চীফ সেক্রেটারীর সাথে আলোচনারত পশ্চিম বাঙলার চীফ সেক্রেটারী মিষ্টার এস, সেনের সামনে বিক্ষোভ প্রকাশ করার জন্যে ভারতীয় রিপাবলিক থেকে আগত সেক্রেটারিয়েটের কেরানীরা যখন মিছিল বের করলো তখন তাদের এই অচিন্তিত পদক্ষেপটি পরিপূর্ণ বোঝাই বারুদের ঘরে আগুনের ফুলকীর মতই কাজ করলো। যে সমস্ত মোহাজেররা, বিশেষতঃ বিহারীরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে এই ধরনের একটি সুযোগের অপেক্ষা করছিলো তারা এই পরিস্থিতিকে ব্যবহার করলো। দরিদ্র কেরাণীরা, যারা শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে একান্তভাবে ইচ্ছুক ছিলো, তারা তাদের চারিপাশে মোহাজেরদের দ্বারা গঠিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হলো। তার ফলে প্রথমে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি এবং পরে তাদের নিজেদের ওপর জনতার আক্রমণ শুরু হলো।

উত্তরোত্তর জোরালোভাবে হত্যা চলতে থাকলো। ইতিমধ্যে দোকান পাট সমস্ত লুট হয়ে যাওয়ায় দুষ্কৃতিকারীদের সমস্ত দৃষ্টি গিয়ে পড়লো

হিন্দুদের জীবনের ওপর। যে খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে কিছু সংখ্যক পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে হত্যা করা হয়েছে। বিক্ষিপ্ত আক্রমণের ঘটনার সংখ্যা অসংখ্য। চলন্ত ট্রেনের কামরায় হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

কতকগুলি কেন্দ্রে বিচ্ছিন্ন হিন্দু পরিবারগুলিকে স্থান দেওয়ার জন্যে সরকার ব্যবস্থা করেছে। প্রধান প্রধান সড়কগুলি সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বাড়িয়ে সন্ধ্যা ৫টা থেকে সকাল ৮টা করা হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বেপরোয়াভাবে হত্যা-কাণ্ড চলছে। সরকারী নীতিকে সাহায্য করার জন্যে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে কেউ সাহস করছে না।

১০.২.৫০ তারিখে থেকে জীবনের ওপর আক্রমণ চলছে। হ্রাস পাওয়ার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, যদিও বিশৃঙ্খল জনতার গুণ্ডামী কমেছে।*

১৩ই ফেব্রুয়ারী বরিশালে গুজব ছড়ায় যে ফজলুল হককে কলকাতায় হত্যা করা হয়েছে। এই গুজব ছড়ানোর সাথে সাথে সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সদর মহকুমার ঝালুকাঠি ও নলছিটি থানার কতকগুলি এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে লুটতরাজ, অগ্নিদাহ এবং হত্যা চলে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী নূরুল আমীন শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে গৌরনদীতে দুটি জনসভা করেন। ১৩ই ফেব্রু-য়ারী সন্ধ্যা থেকে নোয়াখালী জেলার ফেণীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় এবং ১৬ তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে দাঙ্গা শুরু হয়ে তা পরদিন পর্যন্ত চলে। চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গার কিছুটা বিস্তৃতি ঘটে। ময়মনসিংহের জামালপুরে দাঙ্গা শুরু হয় ১৬ই ফেব্রুয়ারী এবং পরে তা কেন্দুয়া ও শেরপুরেও বিস্তৃত হয়। ১৮ তারিখের মধ্যে সেখানকার অবস্থা আয়ত্বে আসে। সিলেটের কয়েকটি এলাকায় দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় ১৬ই ফেব্রুয়ারী। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভৈরবে হিন্দু উদ্বাস্তু যাত্রী বোঝাই একটি ট্রেন সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং যাত্রীদের জিনিষপত্র লুণ্ঠিত হয় ও বহু সংখ্যক যাত্রীকে

* এই বিশেষ নোটটি ১০.২.৫০ তারিখের নীচে শুরু হলেও পরবর্তী দুই দিনের অর্থাৎ ১১.২.৫০ ও ১২.২.৫০ এর নীচে পর্যন্ত অর্থাৎ পর পর তিন দিনের রোজনামচার নীচে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর থেকে মনে হয় এটি ১২.২.৫০ তারিখে লেখা। নোটটির শেষ প্যারার বক্তব্য থেকেও তাই মনে হয়। —ব. উ.

হত্যা করা হয়। সান্তাহারে ট্রেনের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটে ২৮শে ফেব্রুয়ারী।[১]

কুমিল্লায় বসবাসকারী ফরাসী জমিদার পিয়ের ডিলানীর* সাথে এক সাক্ষাৎকারের পর লণ্ডন ইকনমিষ্ট ও ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়েনের প্রতিনিধি তায়া জিনকিন কুমিল্লার পরিস্থিতি ও ভৈরব সেতুর কাছে উদ্বাস্তু ট্রেন যাত্রীদের হত্যা সম্পর্কে লেখেন:

> এর ফলে কুমিল্লায় কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা হয নি কিন্তু চারিদিকে এমন ভীতির সঞ্চার হয়েছিলো যে তা তেলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং অনেক হিন্দু ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলো। তিনি (পিয়ের) তাদেরকে থেকে যাওয়ার জন্যে অনুনয় বিনয় করেছিলেন কিন্তু তারা শুনতে চায় নি। বোধহয তারাই সঠিক ছিলো কারণ তিনি নিজেও তো সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন, কাজেই তারা যখন গাদাগাদি করে ট্রেনে চড়ে ভারতের দিকে রওয়ানা হচ্ছিলো তখন তিনি তাদেরকে বিদায় জানালেন। ট্রেনটি নদী পার হয়ে যখন ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে প্রবেশ করলো তখন সেটিকে সেতুর ওপরই ঘেরাও করা হলো। ইঞ্জিনের ড্রাইভার ইচ্ছে করেই ট্রেনটা থামিয়ে দিয়েছিলো। সেতুটির দুই দিক থেকেই খুনীর দল যাত্রীদেরকে আক্রমণ করলো। যারা নিরাপত্তার জন্যে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সাঁতরে তীরের দিকে যেতে চেষ্টা করলো তাদের মাথায় ইঁট মেরে তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হলো। পিযেরের মতে প্রায় ১000 হিন্দু সেইভাবে নিহত হয়েছিলো; তাঁর ধারণা মতে সমগ্র পূর্ব বাঙলায় নিহতের সংখ্যা হলো ৩000 এবং ধর্ষনের সংখ্যা ২00।[২]

২০শে ফেব্রুয়ারীর দিকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো। কিন্তু ২0 তারিখের থেকেই পশ্চিম বাঙলার পত্র-পত্রিকাগুলি দুই চীফ সেক্রেটারীর চুক্তির সর্তগুলির খেলাফ করে আবার উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ ও বক্তৃতা বিবৃতি প্রকাশ করতে শুরু করে। ঐ দিন কলকাতার পত্রিকাগুলি সারা ভারত কংগ্রেসের সম্পাদকের একটি উত্তেজনাপূর্ণ সাম্প্রদায়িক বিবৃতি প্রকাশ করে। তাতে এমন কথাও বলা হয় যে, কলকাতার

* পিয়ের ডিলানীর পূর্ব পুরুষরা নেপোলিয়নের সময় কুমিল্লায় জমিদারী ক্রয় করে বসতি স্থাপন করেন। শিক্ষা এবং বিবাহের জন্য তাঁরা বরাবর ফ্রান্সে গেলেও প্রায় দেড়শত বৎসর তাঁরা কুমিল্লারই অধিবাসী (Reporting India. p. 45)।

মুসলমানরা হিন্দুদেরকে "উত্তেজিত করছে।" ২১শে ফেব্রুয়ারী অমৃত-বাজার পত্রিকায় পশ্চিম বাঙলার মন্ত্রী কালীপদ মুখার্জীর একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক বিবৃতি প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। সর্বোপরি ভারতীয় 'অসাম্প্রদায়িক জাতীয় রাষ্ট্রের' প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ২৩শে তারিখে ভারতীয় পার্লামেণ্টে সর্দার প্যাটেলের ১লা জানুয়ারীর কলকাতা বক্তৃতার সাথে তাল রেখে এক ভয়ানক উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেন এবং পাকিস্তানকে হুমকী প্রদান করে বলেন যে পাকিস্তান যদি তার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে না পারে তাহলে তাদের নিরাপত্তার জন্যে ভারত "অন্য ব্যবস্থা" গ্রহণ করবে।[৩] ভারতও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্রে তার নিজের সংখ্যালঘুদেরকে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের থেকে যে অধিকতর নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হয় নি, চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তার কোন উল্লেখ নেহরু তাঁর বক্তৃতায় করেন নি। ভারতীয় এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে সেখানকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সেই সময়ে কি মনোভাব পোষণ করছিলো তার একটি উদাহরণ হলো ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রীর কাছে পশ্চিম বাঙলার প্রধানমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের একটি পত্র। এই পত্রে তিনি কলকাতার মানিকতলা এলাকায় আশ্রয় শিবিরের প্রায় পনেরো হাজার মুসলমান উদ্বাস্তুকে পূর্ব বাঙলায় নিয়ে যাওয়ার দাবী জানান কারণ তারা সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঐ এলাকায় থাকলে তা ভবিষ্যতে নোতুন হাঙ্গামার কারণ হতে পারে।[৪] নিজেদের দেশের নাগরিকদেরকে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে অন্য একটি দেশের সরকারের প্রতি এই ধরনের এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভূত দাবী যে ভারতীয় সরকারের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের মুখোস সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত করেছিলো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

২৮শে ফেব্রুয়ারী করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকাত আলী খান নেহরুর ২৩শে তারিখের পার্লামেণ্ট বক্তৃতার জবাব দিতে গিয়ে সমগ্র ঘটনার জন্যে হিন্দু মহাসভা ও সর্দার প্যাটেলকে দায়ী করে বলেন যে, "ভারত যদি যুদ্ধ চায় তাহা হইলে তাহারা আমাদিগকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত পাইবে।"[৫]

উপরোক্ত উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা, বিবৃতি ও প্রচারণার ফলে ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে কলকাতায় আবার একবার দাঙ্গা হয় এবং এই সময় থেকে শুরু করে মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে আসামের কামরূপ ও

গোয়ালপাড়া এবং জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়।[৬] পূর্ব বাঙলাতেও, বিশেষতঃ উত্তর বাঙলার দিনাজপুর, সান্তাহার ইত্যাদি এলাকায় মার্চের ২ তারিখ পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু হাঙ্গামা হয়।

বিহার, আসাম এবং দুই বাঙলার এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ভারত ও পূর্ব বাঙলায় এক বিরাট উদ্বাস্তু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পূর্ব বাঙলা সরকার ১০ই মার্চ, ১৯৫০, তারিখে পূর্ব বাঙলায় প্রবেশকারী রেজিস্ট্রীকৃত উদ্বাস্তুদের যে তালিকা দেন তা হলো এই: জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বনগাঁ, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগতের সংখ্যা ৩৮,৩৪০; কাছাড় জেলা থেকে সিলেটে আগতদের সংখ্যা ২৩,১১৫; গোয়ালপাড়া থেকে রংপুরে আগতদের সংখ্যা ৫৪,৫৬৯।[৭] এই সংখ্যা যখন দেওয়া হয় তখনও পশ্চিম বাঙলা ও আসামের আশ্রয় শিবিরে অসংখ্য উদ্বাস্তু পূর্ব বাঙলায় প্রবেশের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন এবং ট্রেন, ষ্টীমার ও প্লেন ভর্তি হয়ে প্রতিদিনই বিরাট সংখ্যায় পূর্ব বাঙলায় প্রবেশ করছিলেন। পূর্ব বাঙলা থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুদের কোন সংখ্যাই পূর্ব বাঙলা সরকারের সূত্র থেকে পাওয়া যায় না। তবে সে সংখ্যা যে কয়েক লক্ষ ছিলো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৩

দাঙ্গা ও আমলাতন্ত্র

আমলাতন্ত্রের প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব পূর্ব বাঙলায় এই সময় কতখানি ছিলো এবং পর্দার অন্তরালে থেকে প্রধান মন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য নির্বাচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কার্যকলাপের উপর তাদের কি পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ছিলো তার কয়েকটি উদাহরণ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।*

লণ্ডনের ইকনমিষ্ট ও ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়েন পত্রিকার প্রতিনিধি তায়া জিনকিন ১৯৫০ সালের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় জানুয়ারী —ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত ও পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে

*আমলাতন্ত্র ও মন্ত্রীদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে এই বইয়ের অন্যত্র আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে।—ব.উ.

সফর করেন। ঢাকায় চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জাকির হোসেন প্রভৃতির সাথে এই সময় তিনি একাধিকবার সাক্ষাৎ করেন।

নিজেদের বিভিন্ন অসুবিধা এবং বাঙালী সরকারী অফিসার ও সাধারণ ভাবে বাঙালীদের সম্পর্কে আজিজ আহমদের বক্তব্য তায়া জিনকিন এই-ভাবে লিপিবদ্ধ করেন:

> আজিজ আহমদ খুব খেয়াল করে শোনার পর নিজের অসুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। এ পর্যন্ত ৭00,000 হিন্দু ভারতে চলে গেছে এবং সমসংখ্যক মুসলমান ভারত থেকে এসেছে। তিনি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করছিলেন যে ইসলাম বিপন্ন। কিন্তু তিনি কি করতে পারেন? ....তাঁর প্রশাসন ব্যবস্থার, তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, প্রায় কোন অস্তিত্ব নেই এবং স্থানীয়দের মধ্যে যারা আছে, তারা ভয়ানক অযোগ্য। অধিকাংশ কেরাণীই ছিলো হিন্দু এবং তারা সকলেই চলে গেছে। একজনই মাত্র উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলো যে বাঙালী, বাকীরা সব অন্যত্র থেকে এসেছে, অধিকাংশই পাঞ্জাব থেকে এবং তারা কেউ বাংলা বলে না, বলে উর্দু অথবা হিন্দি। সৈন্যবাহিনী ছোট এবং সীমান্ত বরাবর নিয়োজিত। বাঙালীরা পশ্চাদপদ এবং উশৃঙ্খল; তারা আরবী জানে না বলে বাংলাতে নামাজ পড়ে। তাদের এবং প্রশাসনব্যবস্থার মধ্যে কোন সাধারণ ভাষা নেই। এমনকি শপথ নেওয়ার সময় তারা কালী ও দুর্গার (বাঙলাদেশের প্রিয় উপাস্য দেবী) নাম নেয়—তিনি বললেন গভীর বিতৃষ্ণার সাথে। যদিও তিনি পূর্ব বাঙলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটা কলোনী হিসেবে আখ্যায়িত করলেন না তবু তাঁর সমগ্র দৃষ্টি-ভঙ্গিটি ছিলো একজন ঔপনিবেশিক প্রশাসকের। এ বিষয়ে তিনি একজন পাকা পশ্চিম পাকিস্তানী।"[১]

পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন সম্পর্কে পূর্ব বাঙলার চীফ সেক্রে-টারীর ধারণা ও মন্তব্য তায়া জিনকিনের নিম্নলিখিত রিপোর্টটিতে পাওয়া যাবে:

> আমি তাঁর নিজের হিন্দুদের প্রসঙ্গে ফিরে এলাম: 'আপনাদের এখান থেকে উদ্বাস্তুদের বিপুলসংখ্যায় দেশত্যাগের সাথে নিশ্চয়ই গোয়াল-পাড়ার কোন সম্পর্ক নেই। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের একটা

উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন কেন?' তাঁর প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের উল্লেখমাত্রেই আজিজ ফেটে পড়লেন, 'তাঁর কাছ থেকে কি আশা করতে পারেন? তিনি একটা গাধা এবং বাঙালী। যাই হোক, তিনি যাই বলুন কলকাতার সংবাদপত্র মহল তাঁকে আরও খারাপভাবে দেখিয়েছে এবং ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার তাই নিয়ে শোর-গোল ও নাচানাচি করেছেন। এবং তাই যদি হয় তাহলে সর্দার প্যাটেলের হুমকীমূলক বক্তৃতা সম্পর্কে কি বলবেন?'[২]

নূরুল আমীনের ওপর ৯ই ফেব্রুয়ারীর বক্তৃতার সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেও একথা নিতান্তই অবিশ্বাসযোগ্য যে, যে প্রধানমন্ত্রীকে একজন বিদেশী সাংবাদিকের কাছে আজিজ আহমদ "গাধা" বলতে ভয়, সঙ্কোচ ও ইতস্ততঃ বোধ করলেন না তাঁর অনুমতি না নিয়ে অথবা তাঁর সাথে পরামর্শ না করে পূর্ব বাঙলার সেই প্রধানমন্ত্রী তাঁর ঐ বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এ ধরনের মন্তব্য করা এবং সব কিছুর দায়িত্ব অস্বীকার করা আজিজ আহমদের পক্ষে সম্ভব ছিলো কারণ তৎকালীন আমলারা পর্দার অন্তরালে থেকেই বস্তুতঃপক্ষে সমগ্র প্রশাসনযন্ত্রের ওপর, এমনকি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব জারী রেখেছিলেন।

দাঙ্গার কারণ সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত ফরাসী জমিদার পিয়ের ডিলেনীর বক্তব্য হলো:

তিনি বললেন যে, সমস্ত হাঙ্গামাটাই প্রথমতঃ শুরু হয়েছে নির্বোধ-ভাবে। 'একজন কমিউনিষ্টকে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন পুলিশ খুলনা জেলার একটি হিন্দু গ্রামে গিয়েছিলো। একজন নিহত হয়েছিলো। পুলিশকে মারা সব সময়েই একটা ভুল। পুলিশ ও আনসাররা (মুসলমান ভলান্টিয়ার) গ্রামবাসীদেরকে মারপিট করে এবং গ্রামে লুটতরাজও করে। ঐ গ্রাম থেকে লোকেরা পালিয়ে যায় এবং ভারতের দিকে নিজেদের যাত্রাপথে অন্যান্য গ্রামের লোক-দেরকেও জুটিয়ে নেয়। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে, এক মাসেরও কম সময়ে ৩০,০০০ হিন্দু খুলনা থেকে ভারতে পলায়ন করে। তবু নির্বোধ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এটা বুঝতেই পারলো না যে, কিছু একটা ঘটেছে। সে যদি নির্বোধ না হতো তাহলে সে এলাকাটা একবার সফর করলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যেতো। কিন্তু না। সে তার অফিসে নিজের নিতম্বের ওপর বসে নিজের মোটা মোটা আঙুলগুলো

মোচড়াতে থাকলো। উদ্বাস্তরা ভারতে কতকগুলো ভীতিপ্রদ কাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলো যেগুলি সত্যি না হলেও তারা সেগুলি বিশ্বাস করেছিলো। তারপর ৫ই ফেব্রুয়ারী ভারতে দাঙ্গা ঘটলো ; ৯ তারিখে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার সাথে সাথে পেণ্ডুলাম ঘুরলো।'[৩]

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জাকির হোসেনের সাথে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তায়া জিনকিন তাঁর রিপোর্টে লেখেন:

পুলিশের এই ইন্সপেক্টর জেনারেলের সাথে কথা বলতে বলতে আমি আজিজের জন্যে দুঃখ বোধ করতে শুরু করলাম। এই যদি তাঁর সব থেকে সিনিয়র ও সর্বোৎকৃষ্ট বাঙালী হয় তাহলে তিনি বেশ বেকায়দা অবস্থাতেই আছেন বলতে হবে। হঠাৎ আই. জি. পূর্ব বাঙলায় সব কিছু যারা চালাচ্ছে এবং বাঙালীদেরকে কোন সুযোগ দিচ্ছে না সেই পাঞ্জাবীদেরকে আক্রমণ করতে শুরু করলেন। আমি হঠাৎ উপলব্ধি করলাম কেন হিন্দুরা পলায়ন করছে। যদি পাঞ্জাবী-দের সম্পর্কে এমনকি মুসলমানদের মনোভাব এই হয় তাহলে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বার্থ পরিচালিত একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে ধর্মীয় সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হিন্দুদের কি অবস্থা হতে পারে?[৪]

তায়া জিনকিন ফেব্রুয়ারী মাসেই দ্বিতীয়বার ঢাকা সফরে আসেন। সেবারও তিনি আজিজ আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট:

আমি তার পর আজিজ আহমদের সাথে দেখা করলাম এবং যে যোগ্য-তার সাথে তিনি কলকাতার প্রতিশোধ গ্রহণকে প্রতিরোধ করেছেন তার জন্য অভিনন্দন জানালাম।——প্রথম সাক্ষাতের মতো এবার আজিজ আহমদের ব্যবহার ততখানি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলো না। আমার সফর তাঁর পরিকল্পনা মতো হয় নি। তাছাড়া, ইকনমিষ্টে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যাতে আমি পাকিস্তানকে সীজা-রের স্ত্রীর সাথে তুলনা করে বলেছিলাম যে, ইসলামিক হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াকে তার দেখানো দরকার হচ্ছিলো যে সে হিন্দুদেরকে একটা সম্মানজনক স্থান দিতে পারে। এছাড়া পাঞ্জাবীদের ঔপনিবেশিক মনোভাবের দ্বারা এমন আবহাওয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিলো না যাতে করে হিন্দুরা মনে করতে পারে যে তারা বাঞ্ছিত। বাঙালী মুসল-

মানদের ও পাঞ্জাবী শাসকদের তো তবু একই কোরাণ ছিলো কিন্তু তাদের তাও ছিলো না।

দুইবার পূর্ব বাঙলা সফরের পর তায়া জিনকিন কলকাতায় পশ্চিম বাঙলার মুখ্য মন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকার রিপোর্টের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক:

কিভাবে এ সমস্তটা (অর্থাৎ দাঙ্গা—ব.উ.) শুরু হয়েছে সে বিষয়ে আমার বর্ণনা ডক্টর রায় শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলেও তিনি পূব বাঙলার আবহাওয়ার জন্যে পাঞ্জাবী অফিসারদেরকে দোষারোপ করতে থাকলেন। গতবার যখন পূর্ব বাঙলার মুখ্য মন্ত্রী নূরুল আমীন বাতের চিকিৎসার জন্যে এসেছিলেন তখন তাঁর কাছে তিনি তিক্তভাবে অভি-যোগ করেছিলেন যে, পাঞ্জাবী চীফ সেক্রেটারী—আমার বন্ধু আজিজ আহমদ*—তাঁর সাথে এমন ব্যবহার করেন যেন তিনি একটি আবর্জ্জনা এবং পূর্ব বাঙলার লোকদের সাথে এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন যা বৃটিশরা কোনদিন করে নি। ডক্টর রায়ের মতে বাঙালী মুসল-মানদের এই বিক্ষোভই ব্যাখ্যা করে কি কারণে দাঙ্গা সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিলো। দেশবিভাগ, কাষ্টমসের বিধিনিষেধ এবং দুই দেশের মধ্যেকার প্রায় শেষ হয়ে আসা বাণিজ্য তাদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুব জোর আঘাত হেনেছিলো, বিশেষতঃ এজন্যে যে পাট তাদের থাকলেও পাট কলগুলি ছিলো কলকাতায়।......কেবলমাত্র ভারতীয় আগ্রাসী আক্রমণের ভীতিই পাকিস্তানের দুই অংশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে কাজেই বাঙালী মুসলমানেরা যাতে করে ভারতকে ভয় করে চলে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার উদ্যোগই পাঞ্জাবীরা নিয়েছে।[৬]

তায়া জিনকিনের রিপোর্টের উপরিউদ্ধৃত অংশগুলির থেকে পূর্ব বাঙ-লায় অবাঙালী উচ্চপদস্থ আমলাদের প্রতি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যক্তি ও বাঙালী কর্মচারীদের মনোভাব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। শুধু তাই নয়। অবাঙালী এই সব অফিসারদের প্রতি বাঙালীদের বিক্ষোভ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এত স্বল্প কালের মধ্যেই এমন পর্যায়ে উপনীত হয়ে-ছিলো যাতে করে বাঙালী এবং অবাঙালী দুই পক্ষই বিদেশীদের কাছে

*তায়া জিনকিনের স্বামী মরিস জিনকিন আই.সি.এস. ছিলেন বৃটিশ-ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এই সূত্রেই আজিজ আহমদের সাথে জিনকিনদের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পূর্বেই ছিলো —ব.উ.

এই আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের উল্লেখ এবং পরস্পরের প্রতি অভিযোগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা অথবা সঙ্কোচ বোধ করতেন না। এই পরিস্থিতিতে তারা জিনকিন এবং ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় বাঙালীদের পাঞ্জাবী ভীতিকেই সরকারের প্রতি হিন্দুদের আস্থার অভাব, তাঁদের দেশ ত্যাগ এবং দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণ হিসেবে অনেকখানি সঠিক ভাবেই উল্লেখ করেছেন। ডক্টর রায় কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গতঃ করেন নি। সে বিষয়টি হলো : ভারত ও পশ্চিম বাঙলা সরকারের দাঙ্গা বাধাবার প্রয়োজন হয়েছিলো কেন?

৪

শান্তি আন্দোলন

১০ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় দাঙ্গা বাধার সাথে সাথেই ঢাকা সহ পূর্ব বাঙলার সর্বত্র শান্তি আন্দোলন শুরু হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান করেন। কিছু সংখ্যক ছাত্র সেই সভায় যোগদান করলেও অধিকাংশ ছাত্রের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখা যায় না।[১] পরদিন ১২ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১-৩০ মিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের একটি যৌথ সভা হয় এবং তাতে সভাপতিত্ব করেন কাজী মোতাহার হোসেন। ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর নূরুল হুদা, অধ্যাপক নজমুল করিম ও এ. এন. এম. মাহমুদ এবং কিবরিয়া, আব্দুল আওয়াল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল স্থায়ী হলেও শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এই সভায় গৃহীত হয় না।[২]

এর পর ডক্টর শহীদুল্লাহকে সভাপতি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র, পরিষদ সদস্য, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে 'পূর্ববঙ্গ শান্তি ও পুনর্বসতি কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। 'পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের নিকট আবেদন' শীর্ষক একটি ইস্তাহারে দাঙ্গা ও শান্তি সম্পর্কে এই কমিটির বক্তব্য জনগনের সামনে উপস্থিত করা হয়। শক্তিশালী পাকিস্তান গঠনের জন্যে শান্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, ধর্মের নামে এবং ভারতে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার

নির্যাতনকে দাঙ্গার যুক্তি হিসেবে খাড়া করার বিরুদ্ধে এই ইস্তাহারটিতে নানান যুক্তি দিয়ে সর্বস্তরের জনগণকে দলমত ও ধর্ম নির্বিশেষে সরকারের ও শান্তি কমিটির শান্তি প্রচেষ্টায় সহযোগিতার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

মুসলমানদের প্রতি বিশেষ আবেদন জানিয়ে ইস্তাহারটিতে বলা হয়:

> পাকিস্তানের প্রত্যেক মুসলমানের মনে রাখা উচিৎ যে, কলকাতা বা হিন্দুস্থানের কোন অংশে হিন্দুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কেন অন্যায়ের জন্য এ দেশের হিন্দুদের কিছুতেই দায়ী করা চলে না। মুসলমানদের ন্যায় তারাও স্বাধীন পাকিস্তানের নাগরিক এবং পাকিস্তান সরকার যখন তাহাদের নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তখন জান মালের নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের ন্যায় তাহাদেরও রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণ দাবী আছে। এ কথা প্রত্যেক মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, পাকিস্তানের হিন্দুরা হিন্দুস্থানের মুসলমানদের বিনিময়ে জামানত হিসেবে বাস করিতেছে না। তাহারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকারের বলেই বাস করিতেছে। অতএব এক জন মুসলমানের যে, তারই মত এক জন পাকিস্তানের স্বাধীন নাগরিক এমন এক জন হিন্দুর উপর কোন অবস্থাতেই অন্যায় উৎপীড়ন করার অধিকার নাই। প্রত্যেক শিক্ষিত ও বিবেচক মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, পশ্চিম বঙ্গের দাঙ্গার প্রতিবাদে এখানে নিরাপরাধ হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহাতে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের কোনই উপকার হইবে না। বরং বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশে এখনও যে সব কোটি কোটি মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে সুখে শান্তিতে বাস করিতেছে তাহাদের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িবে। দেশে শান্তি রক্ষার দ্বারা পাকিস্তানের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার দ্বারাই একমাত্র হিন্দুস্থানের মুসলমানদের আপনারা সত্যিকার উপকার করিতে পারেন।

হিন্দুদের প্রতি আবেদন জানিয়ে ইস্তাহারটিতে বলা হয়:

> হিন্দু ভাইগণকে আমরা বলিব, আপনারা "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী," সেই জন্মভূমিকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সহসা পরিত্যাগ করিবেন না। আপনারা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণে হিন্দু মুসলমানের মিলনমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করুন এবং সাহস

সহকারে বিপদ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করুন। আপনারা নিশ্চয় জানিবেন রাষ্ট্রের সর্বাধিক সাহায্য ও সহানুভূতি সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল সময়ে আপনারা পাইবেন। পাকিস্তানের দৃঢ় অথচ সদয়বাহু সর্ব্বদা আপনাদিগকে সাহায্য ও রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে এবং রাষ্ট্রের সমস্ত হিতকামী নাগরিক ও ধর্মনিষ্ঠ মুমিন মুসলমান আপনাদের সহিত আছেন। ইহার প্রমাণ আপনারা বর্ত্তমানে পাইয়াছেন ও ভবিষ্যতে পাইবেন। আপনারা লক্ষ্য রাখিবেন; আপনাদের মধ্য হইতে আত্মীয় স্বজন ফেলিয়া যাঁহারা পশ্চিম বঙ্গ, আসাম প্রভৃতি ভারতীয় রাজ্যে চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহারা যেন সেখানে যাইয়া অতিরঞ্জিত কোন কথা না বলেন বা উত্তেজনামূলক কোন গুজব না রটান, অথবা এখান হইতে কেহ কোন মিথ্যা সংবাদ সংবাদপত্রে বা চিঠিপত্রের মারফতে কাহারও নিকট না পাঠান। কারণ তাহাতে সেখানে উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে এখানেও হইতে পারে এবং তার ফলে উভয় রাজ্যেই অশেষ অঘটন ঘটিতে পারে। যদি কেহ তাহা করেন, তবে নিজের আত্মীয় গোষ্ঠিরই অনিষ্ট করিবেন। সকলের মঙ্গলের জন্য শান্তির পথই একমাত্র পথ।

ইস্তাহারটিতে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এতে দাঙ্গার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই, দাঙ্গাকারীদেরকে প্রত্যক্ষভাবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য নেই এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পূর্ব বাঙলা সরকার যে হিন্দুদের পরম বন্ধু একথা জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র ও প্রাদেশিক সরকার সম্পর্কে এই ধরনের বক্তব্য যে তৎকালীন পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের মধ্যে নিরাপত্তার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে না তা বলাই বাহুল্য।

'পূর্ববঙ্গ শান্তি ও পুনর্বসতি কমিটির' এই ইস্তাহারটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা স্বাক্ষর দেন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডক্টর এস. এন. রায়; পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদ সদস্য হামিদুল হক চৌধুরী, আলি আহমদ খান, বসন্ত কুমার দাস, ফরিদ আহমদ চৌধুরী, আনোয়ারা খাতুন, আব্দুল খালেক, খয়রাত হোসেন, আব্দুল হাকিম ও শামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী; পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য এব্রাহিম খান ও ভবেশ চন্দ্র নন্দী; এডভোকেট আতাউর রহমান, মহম্মদ নূরুল হুদা, কফিলউদ্দীন চৌধুরী, আলী আমজাদ খান; ব্যবসায়ী খান বাহাদুর আরফান খান

ও রায়বাহাদুর আর, পি, সাহা ; শিল্পপতি সূর্য্য কুমার বসু ; মীর্জ্জা আব্দুল কাদের, আলমাস আলী, এম. এ. আউয়াল, এম. এ. ওয়াদুদ, কে. জি. মহবুব, তফজ্জল হোসেন, খালেক নেওয়াজ খান, এম. এ. আজিজ ও আজিজুল হাকিম ; সংবাদপত্র প্রতিনিধি উষা রায় (আনন্দ বাজার), আব্দুল ওয়াহাব (ষ্টেটসম্যান) ও এস. কে. চ্যাটার্জ্জি (অমৃত বাজার) ; এন. সি. সাহা, পি. কে. ব্যানার্জ্জি, জাফর করিম, ক্ষেত্র মোহন বণিক, রাধাবল্লভ ও সামসুল হক।

'পূর্ব্ববঙ্গ শান্তি ও পুনর্বসতি কমিটি' ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্রদের সমন্বয়ে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি কমিটি' নামে অন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়। এই কমিটি ২রা মার্চ, ১৯৫০, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি সভা আহ্বান করেন এবং সেই উপলক্ষে '২রা মার্চ শান্তি দিবস পালন করুন' নামে একটি ইস্তাহার তাদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়ঃ

> দেশ বিভাগের পর ঢাকার তথা পূর্ব বঙ্গের ছাত্র সমাজ রাষ্ট্র ভাষার দাবীতে, দমননীতি বিরোধী দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে, আরবী হরফ প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে আরও নানা প্রগতিশীল আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন চিন্তাধারা ও বলিষ্ঠ সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় দিয়াছে এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্ত বারবার বানচাল করিয়া দিয়াছে। এই সকল আন্দোলন শুধু ছাত্র আন্দোলন হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকে নাই ; প্রদেশব্যাপী গণ-আন্দোলনে পর্যবসিত হইয়াছে।
>
> গণ-আন্দোলনে ভীত কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সম্প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অতি পুরাতন অস্ত্র হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাকে আবার চাঙ্গা করিয়া তুলিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করিবার চাল চালিয়াছিল। কিন্তু সচেতন ছাত্র সমাজ ও শান্তিকামী জনসাধারণ সক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা এই নয়া চক্রান্তকে রুখিয়া দাঁড়ায় এবং শান্তি ও সৌহার্দ ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হয়।
>
> কিন্তু পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি? এখনো ১৪৪ ধারা, সান্ধ্য আইন মিলিটারীরাজ যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে কারো মনে পূর্ণ আস্থা ফিরিয়া আসিতে পারে না এবং কোন

গণআন্দোলনই দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে না। অধিকাংশ শিক্ষায়তনের দুয়ার এখনো বন্ধ, শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাযন্ত্র অচল। এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান ঘটাইয়া পূর্ণ শান্তি ও আস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আরো জোরদার সংগ্রাম প্রয়োজন। এই শান্তির লড়াইয়ে আমাদের হাতিয়ার—সুসংহত ছাত্র ও গণশক্তি। আমাদের এমন অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যেখানে মেহনতী জনতার ভাত কাপড়ের লড়াই চলিবে, প্রগতিবাদী আন্দোলন চলিবে, এবং ছাত্রদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি রুদ্ধ হইবে না। তাই জনসাধারণের মধ্যে যে কোন আকারের (তা ধর্মীয় ভিত্তিতেই হোক বা প্রাদেশিক ভিত্তিতেই হোক) সাম্প্রদায়িক সংঘাত বা তার উস্কানি আমাদের রুখিতে হইবে।

এই দ্বিতীয় ইস্তাহারটি প্রথমটির থেকে স্পষ্টতঃই তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। এখানে দাঙ্গার কারণ ও দাঙ্গা কারীদের সম্পর্কে বক্তব্যের চরিত্র এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বানের ক্ষেত্রে অনেক প্রভেদ। এই স্বাতন্ত্র ও প্রভেদের কারণ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি কমিটি' নামে এই কমিটি ছিলো মূলতঃ কমিউনিষ্ট প্রভাবাধীন ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রদের উদ্যোগে গঠিত এবং এই ইস্তাহারটি ছিলো খুব সম্ভবতঃ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা রচিত।

২রা মার্চ, ১৯৫০, দুপুর দুটোর সময় 'বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি কমিটির, উদ্যোগে আয়োজিত সভাটি মহম্মদ তোয়াহার সভাপতিত্বে শুরু হয়। কিন্তু শুরু হওয়ার সাথে সাথেই শান্তি কমিটির বৈধতা ইত্যাদি নিয়ে সভাস্থলে দারুণ গণ্ডগোল ও ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। এই গণ্ডগোল বাধানোর ক্ষেত্রে আওয়ামী মুসলিম লীগের ছাত্র ফ্রন্ট মুসলিম ছাত্র লীগের এম. এ. ওয়াদুদ, কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নওয়াজ খান প্রভৃতি নেতৃত্ব দেন এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ছাত্র ফ্রন্ট নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের দলিল, আহসান উল্লাহ প্রভৃতির সাথে হাত মেলান।* শেষোক্ত এই দুই ছাত্র প্রতিষ্ঠানের উপরোক্ত নেতারা ২রা মার্চের সেই বিশ্ববিদ্যালয়

*এই 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের' নেতারাই ১৯৪৯ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হাজং কৃষকদের ওপর সরকারী পুলিশ নির্যাতনের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র ফেডারেশন কর্তৃক আহূত সভায় আহ্বায়কদেরকে মারপিট করে ও গুণ্ডামীর মাধ্যমে সভা পণ্ড করে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ছাত্র সভায় দারুণ হট্টগোল ও মারপিটের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে একটি পাল্টা শান্তি কমিটি গঠন করেন।[৩]

এই সময় 'Save Bengals From the Clutches of Riot Mongers' নামে ইংরেজীতে লিখিত একটি দাঙ্গা বিরোধী ইস্তাহার সরাসরি 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের' নামে প্রচারিত হয়। সাত পৃষ্ঠার এই নিম্নলিখিত দীর্ঘ ইস্তাহারটিতে তৎকালীন পরিস্থিতিতে দাঙ্গার কারণ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে তার বিরুদ্ধে সামগ্রিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জনগণের কাছে আহ্বান জানানো হয়:

> দুই বাঙলাই সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার কবলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রথম দফা দাঙ্গা ইতিপূর্বেই সংঘটিত হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। আরও অধিক সংখ্যক হয়েছে গৃহহীন। যারা মৃত্যুকে এড়াতে পেরেছে তারা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পলায়ন করছে। দ্বিতীয়টির প্রস্তুতি এখন চলছে উন্মত্ত গতিতে। 'আন্তর্ডোমিনিয়ন যুদ্ধ', 'পিতৃভূমি রক্ষা', 'অন্যদেশে সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক এলাকা', 'লোক বিনিময়'—দ্বিতীয় দফা দাঙ্গার প্রস্তুতি হিসাবে এগুলি এবং অন্যান্য ধ্বনি ওঠানো হচ্ছে। পাকিস্তানের লীগ নেতারা বলছেন যে, ভারতীয় ইউনিয়নেই সমস্ত রকম নৃশংসতা করা হচ্ছে এবং পূর্ব বাঙলায় যে সামান্য কয়েকটি ছোটখাট ঘটনা ঘটেছে সেগুলি সবই ভারতে মুসলিম নিধনের 'অপরিহার্য্য প্রতিক্রিয়া'। ভারতের কংগ্রেস নেতারা বলছেন যে হাঙ্গামা পাকিস্তানেই শুরু হয়েছে ও সেখানে হাজার হাজার হিন্দুকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং পশ্চিম বাঙলায় যা ঘটেছে সেটা তারই প্রতিক্রিয়া। কংগ্রেস এবং লীগ উভয় সরকারই বলছে যে পরিস্থিতিকে তারা দৃঢ় হস্তে নিয়ন্ত্রিত করছে। উভয়েই জনগণকে বলছে শান্তি বজায় রাখতে এবং সীমান্তের অপর পারে যা ঘটছে তার দ্বারা উত্তেজিত না হতে। কংগ্রেস ও লীগ সংবাদপত্র-মহল এই একই লাইন অনুসরণ করছে। অন্য ডমিনিয়নের নৃশংসতার সংবাদ এক তরফাভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এবং তার পর জনগণকে বলা হচ্ছে উত্তেজিত না হতে।
>
> একথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, কংগ্রেস লীগ উভয় সরকারই যদি তাদের নিজেদের ডমিনিয়নে শান্তি অক্ষুন্ন রাখতে বদ্ধপরিকর হয়, উভয়েই যদি দুষ্কৃতিকারীদেরকে দৃঢ় হস্তে দমন করে তাহলে দাঙ্গা

অব্যাহত থাকছে কেন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদেরকে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও উত্তেজনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? এর কারণ কি এই যে, পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলা উভয় সরকারেরই রাষ্ট্রীয় যন্ত্র খুব দুর্বল? এর কারণ কি এই যে, পুলিশ ও সামরিক বাহিনী অযোগ্য? কিন্তু পুলিশ ও সামরিক বাহিনী তো যথেষ্ট যোগ্য।

বন্যার পানি থেকে নিজেদের ঘরকে রক্ষা করার জন্য যখন তারা একজন জমিদারের জমিতে "অনধিকার প্রবেশ" করেছিলো তখন এই একই পুলিশ ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রাম জেলার মাদ্রাসায় ৪০ জন কৃষককে হত্যা করেছিলো।* এই একই বৎসরে ঢাকাতে যখন কনষ্টেবলরা ধর্মঘট করেছিলো তখন এই একই সামরিক বাহিনী তাদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যককে হত্যা করেছিলো। ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গায় লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, ও বুলেট দিয়ে ছাত্র ও জনতার মিছিল ভেঙে দেওয়ার জন্য এই একই পুলিশকে বহু ক্ষেত্রে খুব যোগ্যতার সাথেই ব্যবহার করা হয়েছে। শত শত ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষককে এই একই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনব্যবস্থা বিনা বিচারে আটক রেখেছে। বেয়ারা-দের প্রতি সমবেদনা দেখাতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন ধর্মঘট করেছিলো তখন "নিদারুণ শৃঙ্খলাভঙ্গের" অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদেরকে বহিস্কার করার জন্য এই একই প্রশাসনব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হয়েছিলো। আবার ইনি হচ্ছেন সেই একই বি. সি. রায় যাঁর পুলিশ একই দিনে কলকাতায় পাঁচ জন মহিলাকে গুলি করে হত্যা করেছে, যাঁর রাজত্বে প্রতিদিনই ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকদের ওপর লাঠি চালনা, কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ ও গুলি চালনা করা হচ্ছে। পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় কি সমগ্র প্রশাসনযন্ত্র ভেঙে পড়ে গেছে? দুই সর-কারই কি রাতারাতি রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের (যাকে মেহনতী মানুষের বিরুদ্ধে খুব তৎপর দেখা গেছে) ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে? যে সমস্ত সভা ও মিছিলের মাধ্যমে দাঙ্গাকারীরা জনগণকে উত্তেজিত করে দাঙ্গা শুরু করেছিলো সেগুলি ভেঙে দেওয়ার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় কি কোন পুলিশ ছিলো না? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের এজেন্ট টাটা, বিড়লা, ইস্পাহানী ও হারুণরা ভারতীয় ও পাকিস্তানী জনগণের ওপর যে নির্লজ্জ শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে তার চরিত্র উন্মোচন

* এই সংখ্যা আসলে ছিলো দশ, চল্লিশ নয়।—ব,উ,

করা ও জনগণকে সত্য কথা বলা হচ্ছিলো সে সাহিত্যের মাধ্যমে সেই মার্কসবাদী ও কমিউনিষ্ট সাহিত্যের বিক্রেতা ন্যাশনাল বুক এজেন্সীকে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সরকার খুবই ক্ষিপ্রতার সাথে বন্ধ করে দিয়েছিলো। শ্রমিক, ছাত্র, কৃষক, কেরাণী, শিক্ষক ও অপরাপর মেহনতী মানুষের স্বার্থের জন্যে যে সমস্ত প্রগতিশীল সাময়িকী ও পত্রপত্রিকা সংগ্রাম করছিলো প্রচুর সংখ্যক সেই সব পত্রিকা দুই সরকারই বেআইনী ঘোষণা করেছে। কিন্তু পূর্ব বাঙলায় আজাদ ও মর্নিং নিউজ এবং পশ্চিম বাঙলায় হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃতবাজার পত্রিকা ইত্যাদি তাদের বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। এগুলো বন্ধ করার ক্ষমতা কি সরকার দুটির নেই? শুধু এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করলেই দুই বাঙলায় লীগ ও কংগ্রেস শাসকদের ভণ্ডামীর মুখোশ খসে পড়বে।

কিন্তু এবারই এই প্রথমবার আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত দখল করার পর থেকেই তাদের সুপরিকল্পিত নীতি ছিলো হিন্দু মুসলমানদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া। এই নোংরা খেলায় সামন্ত প্রভুরা, দেশীয় রাজারা এবং বড়ো পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করেছিলো। এই নীতির পরিণতি ঘটেছিলো মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদের মধ্যে যা আমাদের জনগণকে দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ রাষ্ট্রে বিভক্ত করে নেহরু ও লিয়াকাত আলীকে প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসিয়েছিলো যাতে করে জনগণকে বিশ্বাস করানো চলে যে, প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে এবং সেই সাথে ভারত ও পাকিস্তানে বৃটিশ স্বার্থকে 'পবিত্র এবং অক্ষুন্ন' রাখাও চলে।

১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মাসের পর কোটি কোটি শোষিত মানুষের ক্রোধের হাত থেকে বৃটিশ পুঁজি, শিল্প, খামার, ব্যাঙ্কগুলিকে এবং প্রতিক্রিয়ার জয়গানকারী ও বৃটিশের বহু পুরাতন হুকুমবরদার পাতিয়ালা ও কাশ্মীরের মহারাজা, হায়দারাবাদের নিজাম, জুনাগড় ও পতৌদির নবাব, কালাতের খান ও চিত্রলের মীরদের সামন্তবাদী স্বার্থকে রক্ষার দায়িত্ব বর্তেছে নেহরু ও লিয়াকাত আলীর ওপর। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণা এই পর্যায়ে এমন ছিলো যে ভারতীয় শ্রমিক, কৃষক ও অপরাপর মেহনতী মানুষকে বৃটিশ কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ নির্দেশে গুলি করে হত্যা করা সম্ভব হচ্ছিলো না।

এ কারণেই বিড়লা ও ইস্পাহানীর প্রতিনিধি নেহরু ও লিয়াকাত আলীকে এই নির্লজ্জ কাজের জন্যে ঘুষ দেওয়া হয়েছিলো। এই হচ্ছে 'স্বাধীনতা' বলে যাকে দেখানো হচ্ছে সেই মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদের স্বরূপ। এ কারণেই সাম্প্রদায়িক সমস্যাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে লীগ ও কংগ্রেস নেতারা সেই একই নীতি অনুসরণ করে ,চলেছেন যে নীতি এ পর্যন্ত বৃটিশ ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেলদের দ্বারা অনুসৃত হতো।

জীবনের কোন একটি সমস্যারও সমাধান করতে না পেরে, জনগণকে বুলেট, লাঠি এবং নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স ব্যতীত অন্য কিছু দিতে অক্ষম হয়ে কংগ্রেস ও লীগ নেতারা জনগণের ঘৃণার পাত্র হয়েছেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক, ছাত্র এবং অপরাপর মেহনতী মানুষের ক্রোধ ফেটে পড়ছে। গত আড়াই বছরের ইতিহাস হচ্ছে কংগ্রেস ও লীগের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের ইতিহাস। ঢাকা ও কলকাতার রাজপথে এখনো পর্যন্ত 'নূরুল আমীন মন্ত্রীত্ব ধ্বংস হোক', 'রায় মন্ত্রীত্ব ধ্বংস হোক' এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার অপরাপর স্থানের কৃষকরা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে মুক্তির জন্য এক বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করেছেন। জনগণের আন্দোলনের হাতুড়ী আঘাতে শোষক ও বিশ্বাসঘাতকদের শাসনের পরিপূর্ণ পতন 'ঘটতে চলেছে।

এবং এই ধ্বংসন্মুখ ঔপনিবেশিক শাসনকে রক্ষা করার জন্যই কংগ্রেস ও লীগ নেতারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এই রক্তাক্ত খেলা শুরু করেছে। যে জনগণকে তারা নির্লজ্জভাবে শোষণ করছে উদ্বাস্তুদের নাম করে তাদেরই সহানুভূতি 'তারা পুনরায় অর্জন করতে চাইছে।

কিন্তু যে পদ্ধতিতে লীগ সরকার উদ্বাস্তু সমস্যার মোকাবেলা করছে তার থেকেই জনগণের এই শত্রুদের প্রকৃত চরিত্র উদঘাটিত হচ্ছে। যে সময়ে সীমান্তের অপর পারে নিজেদের সমস্ত কিছু খুইয়ে হাজারে হাজারে উদ্বাস্তুরা পূর্ব বাঙলায় প্রবেশ করছে সেই সময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে লীগ নেতারা ইরানের শাহকে নিয়ে রাজকীয় সম্বর্দ্ধনা

করা ও জনগণকে সত্য কথা বলা হচ্ছিলো সে সাহিত্যের মাধ্যমে সেই মার্কসবাদী ও কমিউনিষ্ট সাহিত্যের বিক্রেতা ন্যাশনাল বুক এজেন্সীকে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সরকার খুবই ক্ষিপ্রতার সাথে বন্ধ করে দিয়েছিলো। শ্রমিক, ছাত্র, কৃষক, কেরাণী, শিক্ষক ও অপরাপর মেহনতী মানুষের স্বার্থের জন্যে যে সমস্ত প্রগতিশীল সাময়িকী ও পত্রপত্রিকা সংগ্রাম করছিলো প্রচুর সংখ্যক সেই সব পত্রিকা দুই সরকারই বেআইনী ঘোষণা করেছে। কিন্তু পূর্ব বাঙলায় আজাদ ও মর্নিং নিউজ এবং পশ্চিম বাঙলায় হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃতবাজার পত্রিকা ইত্যাদি তাদের বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। এগুলো বন্ধ করার ক্ষমতা কি সরকার দুটির নেই? শুধু এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করলেই দুই বাঙলায় লীগ ও কংগ্রেস শাসকদের ভণ্ডামীর মুখোশ খসে পড়বে।

কিন্তু এবারই এই প্রথমবার আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত দখল করার পর থেকেই তাদের সুপরিকল্পিত নীতি ছিলো হিন্দু মুসলমানদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া। এই নোংরা খেলায় সামন্ত প্রভুরা, দেশীয় রাজারা এবং বড়ো পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করেছিলো। এই নীতির পরিণতি ঘটেছিলো মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদের মধ্যে যা আমাদের জনগণকে দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ রাষ্ট্রে বিভক্ত করে নেহরু ও লিয়াকাত আলীকে প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসিয়েছিলো যাতে করে জনগণকে বিশ্বাস করানো চলে যে, প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে এবং সেই সাথে ভারত ও পাকিস্তানে বৃটিশ স্বার্থকে 'পবিত্র এবং অক্ষুন্ন' রাখাও চলে।

১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মাসের পর কোটি কোটি শোষিত মানুষের ক্রোধের হাত থেকে বৃটিশ পুঁজি, শিল্প, খামার, ব্যাঙ্কগুলিকে এবং প্রতিক্রিয়ার জয়গানকারী ও বৃটিশের বহু পুরাতন হুকুমবরদার পাতিয়ালা ও কাশ্মীরের মহারাজা, হায়দারাবাদের নিজাম, জুনাগড় ও পতৌদির নবাব, কালাতের খান ও চিত্রলের মীরদের সামন্তবাদী স্বার্থকে রক্ষার দায়িত্ব বর্তেছে নেহরু ও লিয়াকাত আলীর ওপর। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণা এই পর্যায়ে এমন ছিলো যে ভারতীয় শ্রমিক, কৃষক ও অপরাপর মেহনতী মানুষকে বৃটিশ কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ নির্দেশে গুলি করে হত্যা করা সম্ভব হচ্ছিলো না।

এ কারণেই বিড়লা ও ইস্পাহানীর প্রতিনিধি নেহরু ও লিয়াকাত আলীকে এই নির্লজ্জ কাজের জন্যে ঘুষ দেওয়া হয়েছিলো। এই হচ্ছে 'স্বাধীনতা' বলে যাকে দেখানো হচ্ছে সেই মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদের স্বরূপ। এ কারণেই সাম্প্রদায়িক সমস্যাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে লীগ ও কংগ্রেস নেতারা সেই একই নীতি অনুসরণ করে ,চলেছেন যে নীতি এ পর্যন্ত বৃটিশ ভাইসরয় ও গভর্নর জেনা-রেলদের দ্বারা অনুসৃত হতো।

জীবনের কোন একটি সমস্যারও সমাধান করতে না পেরে, জন-গণকে বুলেট, লাঠি এবং নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স ব্যতীত অন্য কিছু দিতে অক্ষম হয়ে কংগ্রেস ও লীগ নেতারা জনগণের ঘৃণার পাত্র হয়েছেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক, ছাত্র এবং অপরাপর মেহনতী মানুষের ক্রোধ ফেটে পড়ছে। গত আড়াই বছরের ইতিহাস হচ্ছে কংগ্রেস ও লীগের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের ইতিহাস। ঢাকা ও কলকাতার রাজপথে এখনো পর্যন্ত 'নূরুল আমীন মন্ত্রীত্ব ধ্বংস হোক', 'রায় মন্ত্রীত্ব ধ্বংস হোক' এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার অপরাপর স্থানের কৃষকরা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে মুক্তির জন্য এক বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করেছেন। জনগণের আন্দো-লনের হাতুড়ী আঘাতে শোষক ও বিশ্বাসঘাতকদের শাসনের পরিপূর্ণ পতন ঘটতে চলেছে।

এবং এই ধ্বংসন্মুখ ঔপনিবেশিক শাসনকে রক্ষা করার জন্যই কংগ্রেস ও লীগ নেতারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এই রক্তাক্ত খেলা শুরু করেছে। যে জনগণকে তারা নির্লজ্জভাবে শোষণ করছে উদ্বাস্তুদের নাম করে তাদেরই সহানুভূতি তারা পুনরায় অর্জন করতে চাইছে।

কিন্তু যে পদ্ধতিতে লীগ সরকার উদ্বাস্তু সমস্যার মোকাবেলা করছে তার থেকেই জনগণের এই শত্রুদের প্রকৃত চরিত্র উদঘাটিত হচ্ছে। যে সময়ে সীমান্তের অপর পারে নিজেদের সমস্ত কিছু খুইয়ে হাজারে হাজারে উদ্বাস্তুরা পূর্ব বাঙলায় প্রবেশ করছে সেই সময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে লীগ নেতারা ইরানের শাহকে নিয়ে রাজকীয় সম্বর্দ্ধনা

মদ্যপানের আসর, খানাপিনা ও শিকারে ব্যস্ত ছিলেন।* পশ্চিম বাঙলায় শত শত লোককে তাদের চাকরী খোয়াতে হয়েছে কিন্তু তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে লীগ সরকার তৎকালীন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বিভাগকেই উঠিয়ে দিয়েছেন। রাষ্ট্র খুব দরিদ্র, উদ্বাস্তুদের খাদ্য এবং কর্মহীনদের কর্মসংস্থানের জন্য পাকিস্তানের কোষাগারে কোন অর্থ নেই, এই অজুহাত দেখিয়ে এই সব করা হচ্ছে। কিন্তু এই একই 'দরিদ্র রাষ্ট্র' বর্মী জনগণের মুক্তি সংগ্রাম দমনের উদ্দেশ্যে বর্মা সরকারকে ৫০,০০০০ পাউণ্ড (প্রায় এক কোটি টাকা) দিয়েছে। হ্যাঁ বর্মী জনগণের হাত থেকে বর্মার বৃটিশ তেল কোম্পানীগুলিকে রক্ষার জন্য আমাদের জনগণকে উলঙ্গ এবং শিশুদেরকে উপোস থাকতে হবে—মুসলিম লীগ নেতাদের নীতিই হচ্ছে তাই। যে পর্যন্ত নেহরু ও লিয়াকাত আলী ক্ষমতায় থাকবে, যে পর্যন্ত কমনওয়েলথ মার্কা 'স্বাধীনতা' থাকবে সে পর্যন্ত উপোস, দারিদ্র ও বেকারত্ব, লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, বুলেট ও জেল; সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, লুটতরাজ, খুন ও ধর্ষণ——আমাদের জনগণের ভাগ্যে এইই জুটবে। একমাত্র হিন্দু মুসলমান জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই আমাদের দেশকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের আজ্ঞাবাহী এজেণ্টদের থেকে মুক্ত করতে পারে এবং আমাদের জনগণকে রক্ষা করতে পারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকা থেকে। জনগণ এই সত্য উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। তাঁরা ১৯৪৬-৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে, দাঙ্গা তাঁদের কোন ভাল করতে পারে না। তা কেবল তাঁদের দুর্দ্দশাকে বাড়িয়েই তোলে। এজন্যেই প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবর্গ এবং তাদের সংবাদপত্রসমূহের সব রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পূর্ব অথবা পশ্চিম বাঙলার কোথায়ও ব্যাপক জনগণ দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ করেন নি। মুসলমানরা যেখানে হিন্দুদের

ইরাণের শাহ রেজা শাহ পহলবী ৫ই মার্চ, ১৯৫০, তারিখে ঢাকা পৌঁছানোর পর ৬ই মার্চ শিকারের উদ্দেশ্যে গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে সিলেটের পৃথীমপাশায় গিয়ে জমিদার আলী হায়দার খানের অতিথি হিসেবে অবস্থান করেন এবং তাঁর জমিদারী অঞ্চলেই বাঘ শিকার করতে যান (নেওবেলাল: ৯.৩.৫০)। ইস্তাহারটিতে তারিখের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু ইরাণের শাহের বাঘ শিকারের এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে এটি তার পরবর্তী সময়ে প্রচারিত হয়।—ব.উ.

জীবন রক্ষা করেছেন এবং হিন্দুরা মুসলমানদের জীবন রক্ষা করেছেন সে রকম উদাহরণ অসংখ্য—যদিও প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রসমূহ এই দিকটির ব্যাপারে নিশ্চুপ, বিশেষতঃ অন্য ডমিনিয়নে এই ধরনের উদাহরণের ক্ষেত্রে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সাময়িকভাবে প্রতিক্রিয়াশীলরা সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বহুলাংশে সফল হয়েছে। এবং প্রথম দফায় যদিও তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জনগণকে টেনে আনতে ব্যর্থ হয়েছে তবু তারা নিজেদের হাতিয়ারকে কোনমতেই বর্জন করেনি। সাম্প্রদায়িক হলাহল ক্রমাগত ছড়ানো হচ্ছে এবং তোলা হচ্ছে যুদ্ধের ধ্বনি। ভারতীয় ইউনিয়নে পূর্ব বাঙলা আক্রমণের কথা হচ্ছে এবং করাচীতে জমিয়াত উল উলেমা কাশ্মীরে জেহাদের আহ্বান জানাচ্ছে (অবশ্য তা বৃটিশ কমাণ্ডার ইন-চীফের পরিচালনায়)। এবং এই সবের দ্বারা সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলা হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে কারো উদাসীন থাকা উচিৎ নয়। আমাদের হিন্দু মুসলমান মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে কংগ্রেস লীগ নেতারা খেলা করতে চায়। আসলে এর দ্বারা আমাদের মুক্তি সংগ্রামকেই আক্রমণ করা হচ্ছে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, কেরাণী, শিক্ষক এবং অপরাপর মেহনতী মানুষের—সাধারণ জনগণের স্বার্থই আজ বিপন্ন।

কমরেড, ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা পরিস্থিতির মোকাবেলা করি। সাংগঠনিক আনুগত্যের প্রশ্ন বাদ দিয়ে সকল সৎ ও দেশপ্রেমিক ছাত্রকেই সাম্প্রদায়িক শান্তি রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের মধ্যে থেকে লীগ সরকারের এজেণ্ট ও জনগণের শত্রু দাঙ্গাকারীদের তাড়িয়ে দিই। উদ্বাস্তু ছাত্রদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসুন আমরা তাদের অল্প খরচে শিক্ষা, পরীক্ষা দানের অধিকার এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য সংগ্রাম করি। আসুন আমরা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে সর্বস্তরের শান্তিপ্রিয় ও সৎ ছাত্রদের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তি কমিটি গঠন করি। আসুন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের এবং তাদের এজেণ্ট ও প্রতিপালিত সংবাদপত্রমহলের বিরুদ্ধে সমগ্র ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করি।

হিন্দু মুসলিম জনগণের ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক। ছাত্র ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ধ্বংস হোক। লীগ সরকার ধ্বংস হোক। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

পূর্ব প্যাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন

এই ইস্তাহারটি ছাত্র ফেডারেশনের নামে প্রচারিত হলেও এটি যে তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টিরই বেনামী প্রচারপত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এর মাধ্যমে জনগণের সামনে দাঙ্গাসহ দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে সেটা ছিলো তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টিরই বক্তব্য। সেই হিসেবে বলা চলে যে 'ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় শান্তি কমিটির' নামে যে ইস্তাহারটি প্রচার করা হয়েছিলো এই ইস্তাহারটি তারই একটি পরিবর্দ্ধিত এবং অধিকতর পূর্ণ সংস্করণ। এতে দাঙ্গার মূল কারণকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে সঠিকভাবেই ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে, পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলা সরকারকে দাঙ্গার জন্য একই-ভাবে দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু বক্তব্য সঠিক হলেও তৎকালীন পরি-স্থিতিতে এই বক্তব্যের ভিত্তিতে দাঙ্গা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার মতো শক্তি কমিউনিষ্ট পার্টির ছিলো না। তাঁদের পক্ষে সাধারণ জন সমর্থনও ছিলো খুবই সামান্য। যে ছাত্র ফ্রণ্টের মাধ্যমে তখনো পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের বক্তব্য জনগণের সামনে তুলে ধরছিলেন তারও বিশেষ কোন শক্তি তখন ছিলো না। উপরন্তু ঢাকা এবং অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্র সাধারণ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পক্ষপাতী না হলেও তারা তখনো পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ (আওয়ামী মুসলিম লীগ সমর্থক) এবং নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ (মুসলিম লীগ ও সরকার সমর্থক) এই দুই সাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠনের প্রভাবাধীন ছিলো। এজন্যেই ছাত্র ফেডারেশনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কিত বক্তব্যের বিরোধিতা করে উপরোক্ত ছাত্র সংগঠন দুটি ২রা মার্চের বিশ্ববিদ্যালয় সভায় যৌথভাবে পাল্টা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি কমিটি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলো।

শুধু ঢাকাতেই নয়, দাঙ্গা প্রতিরোধ ও শান্তি আন্দোলন পূর্ব বাঙলার অপরাপর অঞ্চলেও এই সময় হয়েছিলো। এই আন্দোলনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ সম্পর্কে সকলে ঐক্যমত না হলেও দাঙ্গার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণ যে এগিয়ে এসেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

নেই। জেলা ও মহকুমা শহর তো বটেই, এমনকি ছোটখাট শহর, গঞ্জ ও হাটবাজারে পর্যন্ত এই সময় শান্তি মিছিল ও দাঙ্গা প্রতিরোধ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিস্থিতির চাপে পড়ে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০, পূর্ব বাঙলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ হইতে আকরাম খানের সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি শান্তি কমিটি স্থাপন করে।[৪]

সিলেটের সাংবাদিকরা এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের সাংবাদিকদের কাছে যুক্তফ্রণ্ট স্থাপন করে দাঙ্গা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জ্ঞাপন করেন।[৫] সাপ্তাহিক নওবেলাল অফিসে সিলেট শান্তি কমিটির অফিস স্থাপিত হয় এবং মুসলিম লীগের সাধারণ কর্মীরা অন্যান্যদের সাথে একত্রে সিলেটে ব্যাপকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয় হন। এই শান্তি আন্দোলনের সময় সিলেটে সরকারী আমলাদের সাথে স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা ও কর্মীদের ভয়ানক বিরোধ বাধে। সিলেটে শান্তি আন্দোলন যে ব্যাপক আকার নিয়েছিলো তা স্থানীয় আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের মনঃপুত না হওয়ায় তারা এই আন্দোলনকে আঘাত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৪ই মার্চ বিনা পরোয়ানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের বলে নওবেলাল অফিসে অবস্থিত শান্তি কমিটি অফিস খানাতল্লাসী করে অফিস তালাবদ্ধ করে। তার পরদিনই তারা শান্তি কমিটির বিশিষ্ট সদস্য নওবেলালের সম্পাদক ও স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা মাহমুদ আলীকে গ্রেফতার করে।[৬]

শান্তি কমিটির অফিস আক্রমণ ও মাহমুদ আলীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৬ই মার্চ সিলেট শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয় এবং সারা শহরে সরকারী দমননীতি বিরোধী পোষ্টার পড়ে। সিলেট মুরারীচাঁদ কলেজের ছাত্রেরা ধর্মঘটের পর মিছিল বের করেন এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও তাদের সাথে যোগদান করে। বিরাট সংখ্যক অছাত্র জনগণও সেই মিছিলে শরীক হয়ে সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন এবং গোবিন্দ পার্কে সমবেত হয়ে প্রতিবাদ সভা করেন। এই জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য মতসির আলী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, কিভাবে আমলাতন্ত্র গণআন্দোলনের গলা টিপে মারার উদ্দেশ্যে জনপ্রিয় নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করছে এবং শিক্ষা ও বাঁচার দাবীর কণ্ঠরোধ করার চক্রান্ত করছে। এই জুলুমবাজী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে তিনি ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতি

আহ্বান জানান। ঐ দিনই জন সভার পর মতসির আলীকে গ্রেফতার এবং সিলেটে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। এইভাবে ১৪৪ ধারা জারীর পর ছাত্র জনসাধারণের একাংশ শহরের একটি মসজিদে সভার আয়োজন করেন এবং আমলাতান্ত্রিক দমন নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আওয়াজ তুলে অবিলম্বে মাহমুদ আলী ও মতসির আলী সহ অন্যান্য জনপ্রিয় নেতাদের মুক্তি দাবী করেন। সভায় ডেপুটি কমিশনার নোমানীর স্বেচ্ছাচারিতামূলক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং তাঁকে অপসারণ করে তাঁর বিরুদ্ধে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। নওবেলাল অফিস তালাবদ্ধ থাকার জন্যে পত্রিকাটির প্রকাশনা ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকে।[৭]

সিলেটে স্থানীয় লীগ ও স্থানীয় আমলাতন্ত্রের সংঘর্ষ কত তীব্র আকার এই সময় ধারণ করেছিলো তা মুসলিম লীগ সমর্থক ও মুসলিম লীগ নেতা মাহমুদ আলী পরিচালিত সাপ্তাহিক নওবেলাল পত্রিকার সম্পাদকীয়টির নিম্নোদ্ধৃত অংশটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে:

> কিন্তু সিলেটের জেলা কর্তৃপক্ষ কিভাবে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাষ্ট্র প্রতিশ্রুত মৌলিক অধিকার হরণ করে নাগরিক নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলেছেন মাত্র অল্প কয়েকদিনের ভিতরে পর পর সংঘটিত ঘটনাবলীই তার চরম সাক্ষ্য। একনিষ্ঠ লীগ কর্মী কাজী মহিবুর রহমানের বিশেষ ক্ষমতা আইনের বলে গ্রেফতার ও প্রায় সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বন্দী অবস্থায় শোচনীয় মৃত্যু, শান্তি মিশনের উপর পুলিশী হামলা, চেয়ারম্যানের গ্রেফতারের প্রতিবাদ শোভাযাত্রা হ'তে জনাব মতসির আলীর গ্রেফতার, শহর ও শহরতলীতে ১৪৪ ধারা জারী করে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার ক্ষমতা অপহরণ প্রতিটি ব্যাপারই পাক-নাগরিকের মৌলিক অধিকারের উপর হেনেছে কঠোর আঘাত—তার অধিকারকে করেছে পদদলিত।
>
> যে সমস্ত আমলা বিনা কারণে ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা পাক-নাগরিককে অযথা আটক ইত্যাদি দ্বারা জন নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলছে তদন্তক্রমে তাদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাগরিক নিরাপত্তা রক্ষায় পাক সরকারের নিকট আমরা দাবী জানাই। দমন নীতির পথে নয়—গণতন্ত্রের পথেই রয়েছে পাক রাষ্ট্রের উজ্জ্বল-গরিমাময় ভবিষ্যৎ।[৮]

মুসলিম লীগ কর্মী এবং প্রাদেশিক ও নিম্নস্তরের নেতাদের সাথে আমলাতন্ত্রের এই বিরোধই এই পর্যায়ে মুসলিম লীগের মধ্যেকার ভাঙনকে ত্বরান্বিত করেছিলো। মুসলিম লীগের এই ভাঙনের ফলে ছাত্র যুবকেরা বিরাট সংখ্যায় মুসলিম লীগের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ছিলেন এবং গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্যে ধীরে ধীরে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্ভব ছিলো একমাত্র মুসলিম লীগের বিরোধিতার মাধ্যমে। আমলাতন্ত্রের সাথে মুসলিম লীগের সাধারণ কর্মী ও নিম্নস্তরের নেতাদের এই ধরনের সংঘর্ষের মাধ্যমেই মুসলিম লীগ সংগঠনের উচচ পর্যায়ের নেতাদের থেকে কর্মীরা এবং নিম্নস্তরের নেতারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন। আমলাতন্ত্রের উৎপীড়ন প্রাদেশিক নেতারাও নানাভাবে ভোগ করলেও এবং এই সমস্ত নেতারা আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজেদের বিক্ষোভ কখনো কখনো ব্যক্ত করলেও আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ অথবা তার সক্রিয় বিরোধিতার ক্ষমতা তাদের ছিলো না। কারণ বস্তুতঃ পক্ষে পূর্ব বাঙলায় প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রই ছিলো কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় মুস-লিম লীগের প্রকৃত প্রাদেশিক এজেণ্ট, প্রাদেশিক সরকার অথবা মুসলিম লীগ নয়। এজন্যেই প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ও প্রাদেশিক সরকারের প্রধান-দেরকে মান্য করা অথবা তাদের কোন কথা গ্রাহ্য করার প্রয়োজন তাদের ছিলো না। নীতি নির্ণয় ও তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে তারা ছিলো মোটা-মুটিভাবে স্বাধীন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার তাই প্রকৃতপক্ষে ছিলো কেন্দ্রীয় সরকারের এজেণ্ট প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রের আজ্ঞাবাহী। মুসলিম লীগের সাথে আমলাতন্ত্রের এই সম্পর্কের ফলেই মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙন খুব দ্রুতগতি হয় এবং অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই বিপুল সংখ্যায় মুসলিম লীগ কর্মী ও নিম্নস্তরের মুসলিম লীগ নেতারা পূর্ব বাঙলার সর্বত্র মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করে অন্যান্য রাজনৈতিক দলে যোগ দেন অথবা রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

৫

দাঙ্গার পরবর্তী পর্যায়

১৯৫০ সালে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রয়োজন ভারত ও পাকি-স্তান দুই দেশের শোষক ও শাসক শ্রেণীরই ছিলো এবং সেই প্রয়োজন

অনুযায়ী দুই দেশের সরকারই নিজ নিজ দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবেই জারী করে। খুলনা জেলার কালশিরা গ্রামে কমিউনিষ্ট বিরোধী পুলিশী অভিযানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কিছু না থাকলেও এবং গ্রামবাসীদের ওপর নির্যাতন গ্রামবাসীদের দ্বারা সংঘটিত না হয়ে পুলিশের দ্বারা হলেও ভারত ও পাকিস্তান উভয় সরকারই এই ঘটনাকে সুবিধামতো ব্যবহার করে শুধু পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলাতেই নয়, বিহার এবং আসামেও ব্যাপক দাঙ্গার সৃষ্টি করে। ১৯৫০ সালের এই দাঙ্গা যে প্রক্রিয়া অনুসারে সংঘটিত হয়েছিলো তা কোন অংশেই ব্যতিক্রম ছিলো না। দাঙ্গা সর্বক্ষেত্রেই যেভাবে সৃষ্টি হয় ও ব্যাপকতা লাভ করে এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেভাবেই তা সৃষ্টি হয়েছিলো এবং ব্যাপকতা লাভ করেছিলো।*

১৯৪৭-৫০ সালের আড়াই বৎসরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সরকার ভারত ও পাকিস্তানে বিশেষতঃ এই দুই দেশের পূর্বাঞ্চলে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলো এবং যেভাবে তাদের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ সক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছিলো তাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই ছিলো দুই দেশের শাসক শোষক শ্রেণী ও তাদের প্রতিনিধি কংগ্রেস ও লীগ সরকারের আত্মরক্ষার সর্বপ্রধান হাতিয়ার। নিজেদের অবাধ শোষণ ও স্বৈরাচারী শাসনকে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাত থেকে রক্ষার জন্যে তারা এই হাতিয়ারকে খুবই পরিকল্পিতভাবে ও যোগ্যতার সাথে ব্যবহার করেছিলো।

পূর্ব বাঙলায় মুসলিম লীগ সরকার এই সময়ে সিলেট, ময়মনসিংহ, খুলনা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে শুধু কৃষক প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছিলো তাই নয়। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শহুরে মধ্যবিত্ত এবং সর্বস্তরের মেহনতী জনগণের মধ্যে দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করছিলো। এই আন্দোলনের এবং আরও ব্যাপকভাবে তা সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনার বিরুদ্ধেই তারা জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সৃষ্টি করে ও দাঙ্গা বাধিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত, বিভক্ত ও বিপথগামী করার চক্রান্ত করেছিলো এবং তাদের এই চক্রান্ত সাময়িকভাবে সফলও হয়েছিলো।

১৯৫০ সালের মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে বিহার, পশ্চিম বাঙলা এবং আসাম থেকে লক্ষ লক্ষ মোহাজের পূর্ব বাঙলায় উপস্থিত হয়ে পুনর্বাসনের

* সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রক্রিয়া সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: বদরুদ্দীন উমরের 'সাম্প্রদায়িকতা' নামক বইয়ের 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' শীর্ষক প্রবন্ধ।

জন্যে পূর্ব বাঙলা সরকারের দারস্থ হলো। এই পরিস্থিতি সরকারকে একটা আর্থিক সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করলেও তার থেকে রাজনৈতিক ফায়দা অর্জ্জনের সুযোগ তারা পুরোপুরি গ্রহণ করলো। এই উদ্দেশ্যে বিহার ও আসাম থেকে আগত বিপুল সংখ্যক মোহাজেরদেরকে তারা সংগ্রামী পাহাড় সীমান্ত এলাকাতে সমাবেশ করলো এবং আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কৃষকদেরকে উচ্ছেদ করে তাদের স্থানে মোহাজের পুনর্বাসনের এক চক্রান্তমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা আদিবাসী কৃষকদেরকে তাদের ভিটাবাড়ী ও জমিজমা থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করতে শুরু করলো। সীমান্তের প্রায় একশো মাইল দৈর্ঘ ও চার পাঁচ মাইল প্রস্থ এলাকাব্যাপী তাদের এই কৃষক উচ্ছেদ কার্যকর করার জন্যে তারা সমগ্র এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও সামরিক বাহিনী মোতায়েন করলো। প্রথমে তারা সুসং দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা থানার উত্তর সীমান্তের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে স্থানীয় আদিবাসী কৃষকদেরকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে সেখানে বিহারী মোহাজেরদেরকে বসিয়ে দিলো। এর পর হালুয়াঘাট, নলিতাবাড়ী ও শ্রীবর্দি থানার গ্রামে গ্রামে ঐ একইভাবে স্থানীয় কৃষকদের ঘরবাড়ী ও জমিজমা পুলিশ মিলিটারীর সাহায্যে দখল করে সরকার আসামী মোহাজেরদের 'পুনর্বাসন' করলো। এই এলাকায় কৃষক উচ্ছেদের জন্যে তারা বন্দুক ও রাইফেল সজ্জিত অসংখ্য পুলিশ ও মিলিটারী এবং জীপ, ঘোড়া ও আট দশটি হাতী পর্যন্ত নামিয়ে ছিলো। এই ভাবে পূর্বে পাঁচগাও, খারটন, চৈতন্য নগর ও লেঙ্গুরা থেকে পশ্চিমে রামরামপুর কর্ণঝোরার মধ্যে জিগাতলা, ভেদীকুড়া, মাইজপাড়া, ঘোষগাঁও, গাজীর ভিটা, হালুয়াঘাট, ভুবনকুড়া, যুগলী, কাকড়কান্দি, মণ্ডলীয়াপাড়া, মালপাড়া, বনকুড়া, ঝিনাইগাতী, নল্লি প্রভৃতি ইউনিয়নের প্রায় দেড়শো গ্রাম থেকে আদিবাসী কৃষকদেরকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা হলো।[১] এইভাবে বিহার ও আসামের মুসলমান উদ্বাস্তুদের "পুনর্বাসনের" নাম করে পূর্ব বাঙলার মুসলিম লীগ সরকার ময়মনসিংহের আদিবাসী অঞ্চলের অগণিত কৃষককে উচ্ছেদ করে, তাদেরকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করে, আসামে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলো। এই হলো মুসলিম লীগ সরকারের এবং তাদের মোহাজের পুনর্বাসনের স্বরূপ।

নারীপুরুষ শিশু নির্বিশেষে আদিবাসীদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে জোরপূর্বক টেনে বের করে পুলিশ তাদেরকে পথে ভাসিয়ে দিলো।

এইভাবে কৃষক উচ্ছেদ করতে গিয়ে এই সমস্ত অঞ্চলের শত শত যুবক ও মোড়লদেরকে বেপরোয়াভাবে মারপিট করে নির্বিচারে জেলে নিক্ষেপ করা হলো। হাজতে ও ময়মনসিংহ জেলে অমানুষিক নির্যাতন এবং খাদ্যকষ্টে পঁচিশ জন আদিবাসীর মৃত্যু ঘটলো এবং প্রায় শতাধিক সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা নানা ধরনের কঠিন ও দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হলেন। এইভাবে সমগ্র অঞ্চলে এমন সন্ত্রাস সৃষ্টি হলো যে, পুলিশ সরাসরি যাদেরকে উচ্ছেদ করলো না তারাও প্রাণভয়ে ভীত হয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলো।[২]

সরকার এইভাবে আদিবাসী ও হিন্দু কৃষক উচ্ছেদ শুরু করার পর স্থানীয় সংগ্রামী কৃষকরা তার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। তাঁরা পাহাড় অঞ্চলের জমিদারী ও টংক বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস মোহাজেরদের কাছে বর্ণনা করেন এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের মধ্যে সভা সমিতি ও ইস্তাহার বিলি করেন। স্থানীয় কৃষকদের জমি, ঘরবাড়ী এবং অস্থাবর সম্পত্তি জবর দখল না করে জমিদারী খাস পতিত দখল ও খামার জমিতে বসার জন্যে তাঁরা মোহাজেরদের কাছে আবেদন জানান। এ ব্যাপারে তখন বিহারী মোহাজেরদের মধ্যে সাড়া পাওয়া না গেলেও অসমীয়া মোহাজেরদের থেকে কিছু কিছু সাড়া তাঁরা পান। এর ফলে হালুয়াঘাট ও নলিতাবাড়ী থানার কোন কোন এলাকায় জমিদারদের জমি ও খামার জমি তাঁরা দখল করেন। এই পরিস্থিতি সরকারের নজরে পড়ে এবং তারা তখন কিছু সংখ্যক মোহাজেরকে গ্রেফতার করে এবং কিছু সংখ্যককে সেখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র চালান দেয়। এইভাবে মোহাজেরদের মধ্যে যে আন্দোলনের ক্ষীণতম সূত্রপাত হয়েছিলো তাকে পূর্ব বাঙলা সরকার প্রাথমিক স্তরেই দমন করে এবং অনগ্রসর, অচেতন ও নিরাপত্তাপ্রার্থী কৃষকদেরকে সংগ্রামী কৃষকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে সমগ্র এলাকায় নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করে। অনেক সময় অনিচ্ছুক মোহাজেরদের ওপর জোর জুলুম করে তারা স্থানীয় কৃষকদের ঘরবাড়ী লুণ্ঠন ও জমি দখল করতে বাধ্য করে।[৩] এইভাবে পূর্ব বাঙলার সীমান্তবর্তী পাহাড় অঞ্চলে প্রধানতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাতে বহু বছর ধরে স্থানীয় কৃষকদেরকে কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার বহু প্রচেষ্টা বৃটিশ আমল থেকে বিফল হলেও উদ্বাস্তু কৃষকদের সাহায্যে ও মোহাজের পুনর্বাসন ইত্যাদির ভাঁওতা দিয়ে মুসলিম লীগ সরকার সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গার পর এই সংগ্রামী কৃষক জনগণকে পূর্ব বাঙলার মাটি থেকে সম্পূর্ণ-ভাবে উচ্ছেদ করতে শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হলো।

শুধু ময়মনসিংহের পাহাড় অঞ্চলেই নয়। নাচোলের সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলেও পূর্ব বাঙলা সরকার ঐ একই নীতি গ্রহণ করলো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে যে অগণিত উদ্বাস্তু পূর্ব বাঙলার উত্তরাঞ্চলে প্রবেশ করে তাদের পুনর্বাসনের অজুহাতে সরকার সাঁওতাল কৃষকদের জমিজমা ও বাড়ীঘর দখল করে তাদেরকে উচ্ছেদ করলো। সাঁওতালরাও ময়মনসিংহের পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসীদের মতো পূর্ব পুরুষদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে উদ্বাস্তু হিসেবে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু কৃষক আন্দোলনের এলাকাগুলি প্রধানতঃ আদিবাসী, সাঁওতাল, নমশূদ্র প্রভৃতি ধর্মীয় সংখ্যালঘু এলাকা হওয়ার ফলে সরকারের যে সুবিধা হয়েছিলো পূর্ব বাঙলার অপরাপর অঞ্চলে সে সুবিধা তাদের হয় নি। মধ্য শ্রেণীর রাজনীতির ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ সরকারের সর্বমুখী নির্যাতন সারা পূর্ব বাঙলার জনগণকে দেশভাগের মাত্র আড়াই বৎসরের মধ্যেই গ্রাস করেছিলো এবং জনগণ খুব সংগঠিত প্রতি-রোধে সমর্থ না হলেও সরকারের বিরুদ্ধে তাঁরা ব্যাপকভাবে আস্থা হারাতে শুরু করেছিলেন। সরকারও তাদের জুলুমের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিরোধকেও নির্বিচারে সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রদান করে আন্দোলনকারীদের ইসলাম ও পাকিস্তান বিরোধী বলে অহরহ আখ্যায়িত করছিলো। এজন্যে রাজ-নীতির সাম্প্রদায়িকতা মুক্তি সে সময়ে মধ্য শ্রেণীর মধ্যে বেশ কিছুটা অর্জিত হয়েছিলো এবং সরকারের অহর্নিশি সাম্প্রদায়িক প্রচারণার সঠিক চরিত্র উপলব্ধি করতে তাঁরা অনেকাংশে সক্ষম হচ্ছিলেন। এর ফলে দেখা যায় যে, ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর কৃষক আন্দোলন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে বস্তুতঃপক্ষে এক যুগ ধরে স্তিমিত অবস্থায় থাকলেও সেই পর্যায়ে মধ্যশ্রেণীর নানান আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করে মুসলিম লীগ সরকারকে উচ্ছেদের পথে দ্রুত অগ্রগতি সাধন করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জুলুম ও প্রতিরোধ

১

সংবাদপত্র ও সরকার বিরোধী প্রচারপত্রের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও হামলা

১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মাসে দেশবিভাগের সময় ঢাকায় কোন উল্লেখযোগ্য দৈনিক সংবাদপত্র ছিলো না। কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদ, মর্নিং নিউজ ও ইত্তেহাদ এই তিনটি পত্রিকার মধ্যে তৃতীয়টি ছিলো শহীদ সুহরাওয়ার্দীর পত্রিকা। শহীদ সুহরাওয়ার্দী দেশ বিভাগের পর কিছুদিন কলকাতাতেই থাকেন কাজেই তাঁর পত্রিকা ঢাকাতে স্থানান্তরিত হয় নি। কলকাতায় কিছুদিন পর্যন্ত তার প্রকাশনা চলার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। দৈনিক আজাদ ও মর্নিং নিউজ ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এ দুটি পত্রিকাই ছিলো সরকার সমর্থক।

সরকার বিরোধী কোন দৈনিক পত্রিকা ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভার' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে না থাকায় ১৯৪৮ সালের গোড়াতেই ঢাকা থেকে প্রকাশিত তমদ্দুন মজলিশের মুখপত্র সাপ্তাহিক সৈনিকই (সম্পাদক শাহেদ আলী) ১৯৪৮ সালে ছিলো পূর্ব বাঙলার সব থেকে বহুল প্রচারিত এবং উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। এই পত্রিকাটিতে সরকারের অনেক সমালোচনা থাকলেও পত্রিকাটি ছিলো ইসলামী সমাজতন্ত্রের প্রচারক ও কমিউনিষ্ট বিরোধী। সেই হিসেবে তাতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের কোন সংবাদ স্থান লাভ করতো না।

১৯৪৮ সাল থেকে সিলেটে মাহমুদ আলীর পরিচালনায় সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি মুসলিম লীগ সমর্থক হিসেবে প্রকাশিত হলেও মুসলিম লীগের মধ্যে যে ভাঙন গোড়া থেকেই শুরু হয় তার প্রতিফলন পত্রিকাটিতে ভালভাবেই পাওয়া যায়। পত্রিকাটি কমিউনিষ্ট বিরোধী হওয়ার ফলে তাতেও কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিশেষ

কোন সংবাদ প্রকৃতপক্ষে প্রকাশিত হতো না। কমিউনিষ্টদের ওপর নির্যাতনের কোন প্রতিবাদও তাতে হতো না। কিন্তু কমিউনিষ্টদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও পত্রিকাটিতে তৎকালীন পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন গণআন্দোলনের যে সব প্রতিবেদন পাওয়া যায় তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান। এদিক দিয়ে বিচার করলে সিলেট থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকা-টিকে তৎকালীন পূর্ব বাঙলার একটি 'জাতীয়' সাপ্তাহিক হিসেবেও আখ্যা-য়িত করা যেতে পারে।

পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি অন্যান্য যে পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হতো সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: চট্টগ্রামের দৈনিক 'পূর্ব পাকিস্তান (সম্পাদক, আবদুস সালাম), ঢাকার অর্দ্ধ সাপ্তাহিক 'পাকিস্তান' (সম্পাদক, মোহাম্মদ মোদাব্বের), ঢাকার 'যুগের দাবী' (সম্পাদক, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস), ঢাকার 'জিন্দেগী' (সম্পাদক, বজলুল হক), চট্টগ্রামের 'পাঞ্চজন্য' (সম্পাদক, অম্বিকা চরণ দাস) ও 'আজান', সিলেটের 'যুগভেরী' এবং সোনার বাংলা (ঢাকা), সংগ্রাম (নারায়ণগঞ্জ), নকীব (বরিশাল), তালিম (ফেনী), কাফেলা (ঢাকা), New Age (সিলেট), নয়া জামানা (রাজশাহী), খিলাফত (বরিশাল), আনসার (বগুড়া), পাসবান (উর্দু পত্রিকা, ঢাকা), নওবাহার (ঢাকা), ইমরোজ (ঢাকা), Pakistan Today (ঢাকা), ইষ্টার্ণ হেরাল্ড (সিলেট) ও দৈনিক 'এলান' (চট্টগ্রাম)।[১]

১৯৪৮ সালের ৯ই জুন পূর্ব বাঙলা সরকার 'বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স' নামে একটি নোতুন অর্ডিন্যান্স জারী করেন। ১৯৪৮ সালের ১৬ই মার্চ থেকে এটি বলবৎ হবে বলে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। এই অর্ডিন্যান্সটির সাথে একটি ধারা সংযোজিত করে সম্পূর্ণভাবে অথবা বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সময়ের জন্যে পূর্ব বাঙলায় সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা, পুস্তিকা ও অন্য যে কোন প্রকার মুদ্রিত কাগজপত্রাদির আমদানী নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। অর্ডিন্যান্সটির আদেশ কেউ অমান্য করলে তার পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডের ব্যবস্থাও অর্ডিন্যান্সটিতে রাখা হয়।[২]

ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্যেই যে উপরোক্ত অর্ডিন্যান্সটি পূর্ব বাঙলা সরকার কর্তৃক জারী করা হয় এবং তার মাধ্যমে সরকারের স্বৈরাচারী রূপই যে সুস্পষ্টভাবে উদঘাটিত হয়

সে বিষয়ে 'স্বৈরাচারের নূতন রূপ' নামক একটি সম্পাদকীয়তে সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হয়:

পূর্ব বঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠার পর হইতেই নাজিম মন্ত্রীমণ্ডলী যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন—তাহাতে জনসাধারণের মনে ক্রমশঃ এই ধারণাই বদ্ধমূল হইতেছে যে পাকিস্তানে ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন সুযোগ থাকিবে না। .. .. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব্ব বঙ্গের প্রাদেশিক সরকার যে ভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে স্বভাবতঃই পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধেও সাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। .. .. .. সংবাদপত্রের মারফতে অথবা পুস্তিকার আকারে সরকারকে সমালোচনা করা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট নহেন এমন লোকের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে—কিন্তু তার পথও বন্ধ করিবার জন্য নাজিম সরকারের চেষ্টার ত্রুটি নাই। ঢাকার একখানা পত্রিকা এই সরকারের নানাবিধ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত কোন জায়গায়ই স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র পরিচালনা করার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। পূর্ব্ব বঙ্গ সরকারকে সমালোচনা করার সকল সম্ভাবনা উপরোক্ত সরকার সেইদিন (অর্থাৎ ৯ই জুন, ১৯৪৮—ব.উ.) একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। .... সোজা কথায় সরকার তাহাদের মতের বিরুদ্ধে কোন মুদ্রিত কাগজই পূর্ব্ব বঙ্গে প্রকাশ করিতে দিবেন না। আরও সোজা কথায় বলিতে হইবে সরকার কোন প্রকার সমালোচনাই বরদাসত করিবেন না। .... বর্ত্তমানে পূর্ব্ব বঙ্গ সরকার যে রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, তাহাতে তাহাকে ফ্যাসিষ্ট বলা কোন অবস্থাতেই অন্যায় নহে।"[৩]

১৯৪৯ সালের মে মাসে ঢাকার এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিলেটের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটি সার্কুলার পাঠিয়ে তাতে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার উল্লেখ করে কাগজের সংকট লাঘবের জন্যে 'নওবেলাল' এর প্রকাশনা বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন।[৪] কিন্তু তা সত্ত্বেও 'নওবেলাল' অগাষ্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এর পর ১৮ই অগাষ্ট সিলেটের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ ডি. আই. জির আদেশ অনুযায়ী ১৯৪৫ সালের পেপার কনট্রোল অর্ডারের ৯ক ধারা অমান্য

করার অপরাধে পত্রিকাটি বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় চার মাস পরে নিষেধাজ্ঞা সরকার কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয় এবং নওবেলাল পুনঃপ্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর।[৫]

১৯৪৯ সালের মে মাসে পূর্ব বাঙলা সরকার একটি আদেশ জারী করে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'ইত্তেহাদ' ও 'দি নেশন' এই চারটি ভারতীয় পত্রিকার পূর্ব বাঙলা প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৬] এই নিষেধাজ্ঞা কয়েকমাস বলবৎ থাকার পর এর প্রতিবাদে পাকিস্তান ছাত্র র‍্যালীর উদ্যোগে ১২ই অগাষ্ট ফজলুল হকের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।* ঐ একই মাসে পূর্ব বাঙলা সরকার চট্টগ্রামের দৈনিক 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের' নিকট হতে তিন হাজার টাকা জামানত তলব করেন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পাদকীয় ও সংবাদসমূহের ওপর প্রিসেন্সরশীপের নির্দেশ দেন।[৭] ঢাকার ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ইষ্টার্ণ ষ্টার' এর ওপর প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৬ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বলে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশের পূর্বে সরকারের অনুমোদন লাভের আদেশ জারী করেন।[৮]

চট্টগ্রামের দৈনিক 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের' নিকট জামানত তলব করে ও তার ওপর প্রিসেন্সরশীপের ব্যবস্থা করে সরকার যে দমন নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন তার প্রতিবাদে পত্রিকাটির সম্পাদক আব্দুস সালাম ১লা জুন থেকে আমৃত্যু অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।[৯] দৈনিক 'পূর্ব্ব পাকিস্তান' ও 'ইষ্টার্ণ ষ্টার' এর ওপর সরকারী নির্দেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এই সময় সাপ্তাহিক নওবেলাল বলেন:

> সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সকল স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানই প্রতিবাদ জানাইয়া অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকার তাঁহাদের আদেশ বলবৎ রাখিয়াছেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানে সংবাদপত্রের সংখ্যা পাকিস্তানের অন্য প্রদেশের তুলনায় খুবই অল্প। এই প্রদেশে শক্তিশালী সংবাদপত্র যাহাতে ত্বরিত গড়িয়া উঠে সরকারের উচিত ছিল সে ব্যবস্থা করা। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সরকার তার বিপরীত পন্থাই অবলম্বন করিতেছেন। দেশের জাগ্রত জনমত তাহা

---

* জনসভাটি আহ্বান করে ছাত্র র‍্যালী প্রকাশিত একটি ইস্তাহারে এই সভার সংবাদ পাওয়া যায়।

> কোনমতেই অনুমোদন করিতে পারে না এবং করেও নাই। জনমতের প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা সরকারকে আরও একবার অনুরোধ করিব—আপনাদের আদেশ প্রত্যাহার করুন।[১০]

১৯৪৯ সালের ১০ই জুন ফরিদপুর জেলার পাংশা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'খাতক' পত্রিকায় 'আমাদের ফরিয়াদ' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় এবং তাতে সরকারের কিছু সমালোচনা থাকে। এই সম্পাদকীয়টি প্রকাশের জন্যে ৭ই অগাষ্ট তারিখে 'খাতকের' সাতাত্তর বৎসর বয়স্ক সম্পাদক খোন্দকার নাজিরউদ্দীন আহমদকে পাংশা ষ্টেশনে ১৯৪৯ সালের পূর্ব বঙ্গ স্পেশাল অর্ডন্যান্সের ৭ ধারা মতে গ্রেফতার করা হয়। ৮ই অগাষ্ট গোয়ালন্দ এস্. ডি. ওর কোর্টে হাজির করার পর তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। 'খাতক' সম্পাদকের এই গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে ফরিদপুরের গ্রামাঞ্চলে কিছুটা বিক্ষোভের সঞ্চার হয়।[১১] এই বিক্ষোভের অন্যতম কারণ পত্রিকাটি মুসলিম লীগ, জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলাম ও তবলীগ জমায়াতের সংবাদ পরিবেশক হিসেবে প্রায় দশ বৎসর ধরে ফরিদপুর জেলার পাংশা থেকে প্রকাশিত হচ্ছিলো এবং গ্রামাঞ্চলের ধার্মিক মুসলমানদের মধ্যে পত্রিকাটির বেশ কিছু প্রভাব ছিলো। খাতক সম্পাদকের গ্রেফতারের জন্যে জেলা কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে 'নওবেলালের' একটি উপসম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> সাতাত্তর বৎসর বয়স্ক সাংবাদিক পাংশার (ফরিদপুর) 'খাতক' পত্রিকার সম্পাদক জনাব নাজিরউদ্দিন আহমদের গ্রেফতারে পূর্ব্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক মহলে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হইবে, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয় এই অপকার্যের জন্য তথাকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষই দায়ী। পূর্ব্ব বঙ্গ সরকার এত কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়িবেন আমরা এ বিশ্বাস করি না। ফরিদপুর জেলা কর্তৃপক্ষের এই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কার্য্যের আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাইতেছি।[১২]

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির ঢাকা জেলা কমিটি 'বর্ম্মার জনতার স্বাধীনতার লড়াই—ব্রহ্মদেশে হস্তক্ষেপ চলিবে না—সাম্রাজ্যবাদের দালালী রোধ করো' শীর্ষক একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন। এই ইস্তাহারটি ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাঙলা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন।[১৩] পার্শ্ববর্তী দেশ বর্মায় কমিউনিষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে তৎকালে পূর্ব বাঙলা

ও পাকিস্তান সরকারের আতঙ্কের যে শেষ ছিলো না তার অন্যান্য অনেক প্রমাণ পূব বাঙলা সরকারের কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচারণার মধ্যে পাওয়া যায়। এজন্যে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বাধীন বর্মার মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে পূর্ব বাঙলার জনগণ যাতে অবহিত হতে না পারেন এবং সেই সংগ্রামের প্রতি তাঁদের কোন সহানুভূতি ও সমর্থন না থাকে তার জন্যে সরকারের উদ্বেগ ও প্রচারণার অভাব ছিলো না।*

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে পুলিশ ঢাকার ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকার কার্যালয় ও আল-হেলাল প্রেসে দুই ঘণ্টা ব্যাপী খানা তল্লাসী চালায় এবং কিছু কাগজপত্র নিয়ে যায়।[১৪] সিলেটের মৌলবী-বাজার থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'অভিযান' এর সম্পাদককে পুলিশ নভেম্বর মাসে গ্রেফতার করে।[১৫]

১৮ই নভেম্বর সিলেটের গোবিন্দ পার্কে মুসলিম লীগ ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনর্বহালের দাবীতে একটি জনসভা আহ্বান করে। সেই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক 'আজান' পত্রিকার সম্পাদক এম. এ. বারী সিলেটের ডেপুটি কমিশনার হামিদ হাসান নোমানীর কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, দেশে যখন দারুণ খাদ্যাভাব বিরাজ করছে তখন তিনি প্রস্তাবিত উর্দু স্কুলের জন্যে চাঁদা আদায়ে ব্যস্ত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, তাঁর এই সমালোচনার জন্যে পরের দিন তাঁকে গ্রেফতার করলেও তিনি আশ্চর্য হবেন না।[১৬] আজান সম্পাদকের এই আশঙ্কাই আংশিকভাবে সত্য প্রমাণিত হয়। পরদিনই অর্থাৎ ১৯শে নভেম্বর তাঁর বাড়ী, পত্রিকার অফিস এবং ছাপাখানা আনন্দ প্রেসে পুলিশ খানা তল্লাশী চালায়। প্রেস থেকে কমপোজড ম্যাটার হস্তগত করে তারা আনন্দ প্রেস তালাবন্ধ করে চলে যায়।[১৭]

সিলেট জেলা সাংবাদিক সমিতি একটি জরুরী সভা আহ্বান করে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের এই আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।[১৮] সাংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে উত্তর

---

* বর্মার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এই সময় পূর্ব বাঙলা সরকার বর্মা সরকারকে ৫০,০০০ ষ্টার্লিং বা প্রায় এক কোটি টাকা সাহায্য দান করে (দ্রষ্টব্য: ছাত্র ফেডারেশনের ইস্তাহার Save Bengals from the clutches of Riot Mongers চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচারণার ক্ষেত্রে বর্মার সংগ্রামের প্রসঙ্গের জন্যে দ্রষ্টব্য: পূর্ব বাঙলা সরকারের কমিউনিষ্ট বিরোধী ইস্তাহার 'কমিউনিজমের স্বরূপ' তৃতীয় পরিচ্ছেদ)।

সিলেট জেলা মুসলিম লীগ ও সিলেট জেলা সাংবাদিক সমিতি যৌথভাবে ২২শে নভেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে একটি জনসভা আহ্বান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য মাহমুদ আলী। সিলেটের ডেপুটি কমিশনার নোমানী কর্তৃক সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ ও তাঁর নানান স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ ও সরকারী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্তের দাবী জানিয়ে একটি প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হয়।[১৯]

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ ও হামলা জারী থাকলেও পূর্ব বাঙলায় এ পর্যন্ত সাংবাদিকদের কোন নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ছিলো না। এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে ২১শে জানুয়ারী, ১৯৫০, তারিখে ঢাকাতে পূর্ব বাঙলার কিছু সংখ্যক সাংবাদিক এক সভায় মিলিত হন। এই সভায় আবুল কালাম শামসুদ্দীন (সম্পাদক, আজাদ), বজলুল হক (সম্পাদক, জিন্দেগী), মাহমুদ আলী (সম্পাদক, নওবেলাল), আব্দুল ওয়াহাব (প্রতিনিধি, ষ্টেটসম্যান), মহম্মদ হোসেন, জহুর হোসেন চৌধুরী (পাকিস্তান অবজার্ভার), এম. এ. আজম (এ. পি. পি.) এবং আজাদ, নওবেলাল ও পাকিস্তান অবজার্ভারের আরও কয়েকজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব বাঙলায় একটি সাংবাদিক সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২০]

১৫ই মে, ১৯৫০, তারিখে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাঙলার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা সম্পাদকদের এক সম্মেলনে 'পূর্ব পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। 'আজাদ' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ঢাকার এবং প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত পত্রিকা সম্পাদকরা ৬৯টি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদককে এই 'সম্পাদক সম্মেলন' এর সদস্য তালিকাভুক্ত করেন। ১৫ই মে'র সম্পাদক সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়: সভাপতি, 'আজাদ' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। সহ-সভাপতি, 'পাকিস্তান অবজার্ভারের' ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আব্দুস সালাম, 'জিন্দেগী' সম্পাদক বজলুল হক, 'পাঞ্চজন্য' সম্পাদক অম্বিকা চরণ দাস ও 'আজান' (চট্টগ্রাম) পত্রিকার সম্পাদক। সেক্রেটারী, 'মর্নিং নিউজ' সম্পাদক সৈয়দ মোহসিন আলী। জয়েণ্ট-সেক্রেটারী, অর্দ্ধ সাপ্তাহিক 'পাকিস্তান' সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বের।

সহকারী সম্পাদক, 'যুগের দাবী' সম্পাদক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। কোষাধ্যক্ষ ঢাকাস্থ এ. পি.-পি. র প্রতিনিধি এম. এ. আজম। এছাড়া আরও পনের জন পত্রিকা সম্পাদক কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। সম্মেলনে সৈয়দ মহসিন আলীকে আহ্বায়ক এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আব্দুস সালাম ও বজলুল হককে সদস্য করে একটি গঠনতন্ত্র সাবকমিটি গঠিত হয়।[২১] ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্মেলন'এর সভাপতি আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও 'পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্মেলন'এর সভাপতি পীর আলী মহম্মদ রাশেদীর মধ্যে এক আলোচনার ফলে স্থির হয় যে, পূর্ব বাঙলার সংগঠনটি পাকিস্তানের সংগঠনের একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করবে এবং পূর্ব বাঙলার যাবতীয় ব্যাপারে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।[২২]

শুধু পূর্ব বাঙলা সরকারই যে এই সময় সংবাদপত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর নানাভাবে হামলা চালাচ্ছিলো তাই নয়। পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশেও ঐ একইভাবে সরকারী নির্যাতন জারী ছিলো। পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের অসংখ্য পত্রিকা এই সময় বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিলো, পত্রিকার নিকট থেকে হাজার হাজার টাকা জামানত তলব করা হচ্ছিলো, পত্রিকার ছাপাখানা সমূহ তালাবন্ধ ও পত্রিকা সম্পাদক-দেরকে বেআইনীভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছিলো। এই সবের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিকরা প্রতিবাদ করছিলেন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্যে সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৫০ সালের ৭ই এপ্রিল করাচীতে 'পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন' এর একটি সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তখন পর্যন্ত 'পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সম্মেলন' প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে পূর্ব বাঙলার কোন প্রতিনিধি তাতে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁদের এই অনুপস্থিতি সম্পর্কে অধিবেশনে আলোচনা হয় এবং তাঁরা ভবিষ্যতে যাতে উপস্থিত হতে পারেন তার জন্যে গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধনের সিদ্ধান্তও তাঁরা গ্রহণ করেন।[২৩]

পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদকদের এই সম্মেলনে পাকিস্তান সরকারের 'জননিরাপত্তা' আইন সম্পর্কে তুমুল বিতর্ক হয়। সংবাদপত্রের ওপর এই আইনের প্রয়োগ যাতে না হয় এবং সম্পাদকদেরকে যাতে এই আইনের

আওতাভুক্ত করা না হয় তার জন্যে কয়েকজন সম্পাদক সম্মেলনে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রদেশের সাত জন সম্পাদক অধিবেশন গৃহ পরিত্যাগ করেন।[২৪] সম্মেলনের পর লাহোরের এগারোটি সংবাদপত্র ও সাময়িকীর প্রতিনিধি-বৃন্দ এ সম্পর্কে এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করে তাতে বলেন যে, পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন জাতীয় সংবাদপত্রের অধিকার অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁরা আরও বলেন যে, বহু সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান তখনই সমর্থন যোগ্য হয় যখন তা সকল মতাবলম্বী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিত্ব করে এবং মতামতের স্বাধীনতা স্বীকার করে। 'পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্মেলন' এর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ জ্ঞাপন করে তাঁরা বলেন যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং অধিকার রক্ষাই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত হলেও প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্ব সে দায়িত্ব প্রতিপালনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।[২৫]

করাচীতে অনুষ্ঠিত উপরোক্ত সম্মেলনের 'জন নিরাপত্তা আইন' সম্পর্কিত বিতর্কের ওপর পূর্ব বাঙলার সংবাদপত্রগুলিতেও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। জন নিরাপত্তা আইনের কোন অপপ্রয়োগ করা হবে না, এই মর্মে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন তার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে 'পাকিস্তান অবজার্ভার' বলেন,

> এই ধরনের প্রতিশ্রুতির কোন অর্থই হয় না। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কাইয়ুম মন্ত্রীসভা, মন্ত্রীসভার রদবদল সম্পর্কে এক সংবাদ প্রকাশ করার জন্য 'সরহদ' পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানেও এইরূপ বা ইহার চেয়েও নগণ্য কারণে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সমগ্র পাকিস্তান জুড়িয়া এবং বিশেষ করিয়া উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পূর্ব্ব পাকিস্তানে বিশিষ্ট মুসলিম লীগ পর্য্যন্ত এই আইনের আওতায় ফেলিয়া বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছে এবং হইতেছে।[২৬]

১৮ই এপ্রিল, ১৯৫০, তারিখে মর্নিং নিউজ পূর্ব বাঙলার পরিস্থিতি সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেন,

এখানে কর্ত্তৃপক্ষ জনকল্যাণমূলক সমালোচনা সহ্য করিতেও প্রস্তুত নহেন। প্রাদেশিক প্রেস কনসালটেটিভ কমিটির ২১ জন সদস্যের মধ্যে চারিজনই সরকারী কর্মচারী। এই কমিটিকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই সম্পাদকদের গ্রেফতার করা হইতেছে, জামানত তলব করা হইতেছে এবং সংবাদপত্র বন্ধ করা হইতেছে।

২৭শে এপ্রিল তারিখে 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে 'নওবেলাল' বলেন,

সম্প্রতি করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের অধিবেশন হইতে লাহোরের কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক সম্মেলনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। পাকিস্তান সরকারের জন নিরাপত্তা আইনের কবল হইতে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদিগকে অব্যাহতি দিবার জন্য যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা সম্মেলনে অগ্রাহ্য হইয়া যাওয়ায়ই তাঁহারা এই পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই আইন অনুযায়ী সরকার কোন কারণ না দর্শাইয়াই যে কোন সময় যে কোন সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দিতে বা যে কোন সংবাদপত্র সম্পাদককে কারা প্রাচীরের অন্তরালে নিক্ষেপ করিতে পারেন। দেশে জরুরী অবস্থাধীনে এই ধরনের আইনের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এইরূপ বিশেষ ক্ষমতার ব্যবস্থাকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের নামান্তর ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। পাকিস্তান সরকারের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী খাঁওয়াজা শাহাবুদ্দীন এই আইনের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন সত্য কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

'পাকিস্তান অবজার্ভার' ও 'মর্নিং নিউজ' এর উপরোক্ত মন্তব্যের উল্লেখ করে সম্পাদকীয়টিতে বলা হয়:

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য উপরোক্ত দুইটি বিশিষ্ট দৈনিক যে সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহার সহিত আমরাও আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠ সংযোগ করিতেছি। স্বাধীন রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এক মৌলিক অধিকার। সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অর্থ সমগ্রভাবে দেশের স্বাধীনতার উপরই হস্তক্ষেপের নামান্তর। এই স্বাধীনতা যাহাতে কোন প্রকার খর্ব্ব না হয় সে দিকে নজর

রাখা স্বাধীনতা প্রিয় সকল নাগরিকের অন্যতম কর্ত্তব্য। এই অধিকার রক্ষায় আমাদের তৎপরতা যতই হ্রাস পাইবে ততই অধিকার হরণ-কারীর দল অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিবে এবং অচিরেই গণ আজাদীর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে না।

পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র ও প্রচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন 'কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র পরামর্শ কমিটির' পূর্ব বাঙলা প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সর-কারের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে ১০ই মে, ১৯৫০ তারিখে 'পাকিস্তান অবজার্ভার' এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আবদুস সালামের সভাপতিত্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতির' কার্যকরী কমিটির একটি সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র পরামর্শ কমিটির প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যাপারে পূর্ব্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্র সমূহের সঙ্গে আলোচনা না করিয়াই পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র ও প্রচার সচিব যে খামখেয়ালী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এই সভা তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছেন। এই সভা মনে করেন যে কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র পরামর্শ কমিটিতে পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয় নাই। স্বরাষ্ট্র ও প্রচার বিভাগের এহেন মনোভাব পূর্ব্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রের প্রতি অপমানজনক বলিয়া সমিতি মনে করে।[২৭]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব বাঙলা প্রাদেশিক সংবাদপত্র পরামর্শ কমিটির এগারো জন সদস্যের মধ্যে চার জনই যে সরকারী কর্মচারী এ বিষয়ে 'মর্নিং নিউজের' ১৮ই এপ্রিলের উপরোক্ত সম্পাদকীয়তে অভি-যোগ করা হয়।

করাচীতে একটি উর্দু সংবাদপত্রের মালিককে সংবাদপত্র ভবন খালি করে দেওয়ার জন্যে কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সেই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু পরে তিনি মুক্তি লাভ করেন। তাঁর মুক্তি লাভের অব্যবহিত পরেই 'দি সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট', 'আনজাম', 'জঙ্গ', 'ইমরোজ' ও 'মিল্লাত' নামক করাচীর পাঁচটি বিশিষ্ট পত্রিকা একই দিনে যুগপৎ একই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে, 'গোপনে অসাধু উপায় অবলম্বন, প্রত্যক্ষ চাপ এবং প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রগুলিকে ভীতি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছে।'

সাধারণ নাগরিকদের আশা-আকাঙ্খা প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে উক্ত সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, পাকিস্তানে এমন একদল লোক আছে যারা অবাধে নির্ভীক মতামত প্রকাশের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করতে চেষ্টা করছে এবং সাংবাদিকতাকে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নক রূপে ব্যবহারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে তাঁরা ফ্যাসিষ্ট মনোভাবাপন্ন বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে, দমন নীতি দ্বারা পাকিস্তানের সাংবাদিকদেরকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। কর্ত্তৃপক্ষকে এই সাথে সতর্ক করে দিয়ে তাঁরা বলেন যে, মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হলে পাকিস্তানের সাংবাদিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিরোধ করবেন।[২৮]

১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে ফেণী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সংগ্রাম' পত্রিকার সম্পাদক ফায়েজ আহমদকে 'জন নিরাপত্তা আইনে' গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে ২রা নভেম্বর নওবেলাল 'দুর্ভাগা সাংবাদিক' নামে এক দীর্ঘ ও কঠোর সমালোচনামূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> সরকারের হাতে 'আইন'—সাংবাদিকের হাতে 'জনমত' এই দুইটির পরস্পর বিরোধী শক্তি পরীক্ষা চলিয়াছে—সত্যিকারের জনমতকে ব্যক্ত করিবার অধিকার সাংবাদিকের নাই। প্রাক পাকিস্তান যুগের শতকরা ১৩ জনের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা এই সকল স্বেচ্ছাচারী আইন প্রস্তুত হইয়াছে। তাই জনগণের মুক্তির দাবী, জনগণের মনোমানসের অভিব্যক্তিকে কায়েমী স্বার্থশীলেরা জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। এমনি পরিহাস চলিয়াছে। দুর্ভাগা সাংবাদিকেরা অতীতের আজাদী আন্দোলনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকলে নানা অত্যাচার নির্য্যাতন সহ্য করিয়া দুর্গম কণ্টকিত যাত্রাপথ অতিক্রম করিয়া যখন স্বাধীনতার নূতন প্রভাতকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল,—সেই আজাদীর প্রথম পর্য্যায়েই দেশী একচ্ছত্রপতিদের অমানবীয় মনোবৃত্তি সাংবাদিকদের স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশের সাংবাদিকদের চারিদিকে গড়িয়া উঠিয়াছে দুর্লঙ্ঘ বেড়াজাল। সাধু সাংবাদিকতা রক্ষা করিবার উপায় চারিদিক হইতে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। .. .. বহু কষ্টে দারিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিয়া জনগণের বেদনার কথা জানা-

ইতে গেলেই একদিকে সরকারের কোপদৃষ্টি, অপরদিকে স্বার্থবাদী চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র সাংবাদিকের জীবনকে অবর্ণণীয় লাঞ্ছনার দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। এই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আমরা সাংবাদিকগণ দাঁড়াইয়া আছি। ডানে আমাদের শত্রু—বামে আমাদের শত্রু—তারই মধ্যে সংগ্রাম সম্পাদক একটি মাত্র বলি। আমরা জানি এমনি আঘাতের পর আঘাত আমাদের আসিবে। তাহাকে মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে। তবে এই কথা আমরা কায়েমী স্বার্থশীল ব্যক্তি সমূহকে স্পষ্টভাষায় জানাইয়া দিতে চাই—তাহাদের দিন গণনার সময় সমাগত। লাঞ্ছিত মানবের আর্ত্তনাদ একদিন আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করিয়া নব-সমাজের পত্তন করিবে।

১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সরকারী নির্যাতন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়:

সংবাদ পরীক্ষার নির্দেশ দান করিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংবাদপত্রের উপর নির্য্যাতন করিয়া জামানত ইত্যাদির দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার যে প্রবণতা সরকারী মহলে দেখা যাইতেছে সম্মেলন তাহা গভীর আশঙ্কার সহিত পর্য্যালোচনা এবং এইভাবে জনমত দাবাইয়া রাখার চেষ্টার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সরকারকে সাবধান করিয়া দিতেছে।

২

ছাত্র নির্যাতন ও প্রতিরোধ

১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাষ্টের পর থেকেই প্রগতিশীল এবং এমনকি সরকারের সাথে সব বিষয়ে একমত নয় সেই ধরনের ছাত্রদের ওপরও পূর্ব বাঙলা সরকারের নির্যাতন শুরু হয়। এই নির্যাতনের ক্ষেত্রে সরকার ও সরকারী দল মুসলিম লীগ শুধু যে পুলিশের ওপরই নির্ভর করে তাই নয়, তারা ছাত্রদের মধ্যে এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল ও গুণ্ডাস্থানীয় ছাত্র-

দেরকেও বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করে।* ১৯৪৮ সালের মধ্যেই এই সরকারী নির্যাতন ও দমননীতির চেহারা ছাত্রদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে কারণ দেশভাগের এক বৎসরের মধ্যেই পূর্ব বাঙলা সরকার ঢাকা এবং প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে শত শত ছাত্রকে জেলে নিক্ষেপ করে, জরিমানা করে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নিজ নিজ এলাকা থেকে বহিস্কার করে তাদের শোষুণ ও কুশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন ও বিক্ষোভকে দমন করতে বদ্ধপরিকর হয়।

এই পটভূমিকায় 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' ১৯৪৯ সালের ৮ই জানুয়ারী সমস্ত পূর্ব বাঙলা ব্যাপী 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্যে ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানায়। 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস কেন?' নামক একটি ইস্তাহারে খুলনা, বরিশাল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে গ্রেফতার, পরোয়ানা ও বহিস্কার আদেশ জারী ইত্যাদির মাধ্যমে কত জন ছাত্রের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে তার একটা তালিকা প্রদান করা হয়। তারপর ইস্তাহারটিতে বলা হয়:

> এরা প্রত্যেকেই লীগের সুপরিচিত ছাত্র কর্ম্মী ও পাকিস্তান সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল। এদের উপর দমন নীতি চালাবার কারণ এরা শিক্ষা সংস্কার চায়, দুর্নীতি এবং স্বজন প্রীতির অবসান চায়। পাকিস্তান হোতে হিন্দুস্থানে বে-আইনী খাদ্য শস্য পাঠাতে বাধা দেয়। লক্ষ্য করিয়াছেন কি উপরোক্ত জেলাগুলো সীমান্তে অবস্থিত এবং এগুলো থেকে খাদ্য শস্য বে-আইনীভাবে হিন্দুস্থানে চলে যাচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের জুলুম প্রতিরোধ দিবস সাব-কমিটি ৮ই জানুয়ারী শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল, মিছিল ও সভা সমিতির মাধ্যমে জুলুম প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে 'ছাত্র সমাজের উপর দমননীতির ষ্টীম রোলার' শীর্ষক একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন। এই ইস্তাহারটিতে শিক্ষা, ছাত্র আন্দোলন ও দেশের সাধারণ পরিস্থিতির একটা বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়:

> দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা আজ ভাঙ্গনের মুখে; ছাত্র আছে ছাত্রাবাস নেই, স্কুল কলেজ আছে শিক্ষক নেই, যে কয়জন শিক্ষক আছেন তাঁদের পেটে ভাত পরনে কাপড় নেই। শিক্ষা দপ্তর আছে শিক্ষা

* ছাত্র নির্যাতনের পূর্ণতর বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: প্রথম খণ্ডের ছাত্র আন্দোলন শীর্ষক পরিচ্ছেদ।

প্রসারের চেষ্টা নেই, দপ্তর আছে কিন্তু দপ্তরখানায় "বাংলা ভাষা কমিটির ও ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের ফাইল নেই," উধাও হয়ে যায়। শিক্ষা সঙ্কোচের উৎসাহে সরকারী মহল উন্মত্ত। ছাত্রেরা যখনই বলেন শিক্ষা সঙ্কোচ চলবে না, শিক্ষকদের উপযুক্ত মাইনা দিতে হবে, শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার চাই, ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করতে হবে, তখনি ফতুয়া দেওয়া হয় "সব ঠিক হায়, ছাত্রলোগ গোলমাল করতা হায়।" পূর্ব্ব পাকিস্তানের অগণিত জনসাধারণ যখন অন্নাভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় তখন সরকারী কর্ম্মচারী ও দালালদের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের ধান চাল বেআইনীভাবে হিন্দুস্থানে হু হু করে চলে যায়। কেও কি কসম করে বলতে পারেন যে বরিশাল, উত্তর বঙ্গ ও অন্যান্য উদ্বৃত্ত জেলার চাল রেশন এলাকায় এক সন্ধ্যাও খেয়েছেন? তবে চাল ধান যায় কোথায়? ছাত্রেরা যখনই এ ব্যাপারে মুখ খুলেন তখনই তাঁরা পান "রাষ্ট্রের দুশমন" খেতাব। আজ নিজেদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা মনে করেন, ফ্রাঞ্চের চতুর্দ্দশ লুই। কাজেই যারা পাক ভূমিকে অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, ঘুষখোর ও চোরাকারবারী মুক্ত করে সত্যিকারের পাকিস্তানে পরিণত করতে চান তাদের উপর চলে ঘুষখোর ও পাকিস্তানের ধ্বংসকারীদের অবিরাম অত্যাচার।

এরই জন্য চলছে আজ রাজশাহী, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল ও ফরিদপুরের ছাত্রদের উপর অসহনীয় নির্যাতন। ছাত্রাবাসের দাবী করার জন্য কুষ্টিয়ার প্রায় দেড় ডজন ছাত্রের উপর এই সেই দিনও জুলুম চালানো হোল। রাজশাহী কলেজের চারজন ছাত্রকে কলেজ ও জেলা হোতে বহিস্কার করা হয়েছে, ২৫ জন ছাত্রকে হোষ্টেল ও সহর ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। আরও ৬০ জনকে বের করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। যে দুর্ব্বৃত্তেরা মিছিল আক্রমণ করল তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নি, হয়েছে ছাত্রদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা। যে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করল তাদের শাস্তির কি ব্যবস্থা করা হয়েছে? সরকারী কলেজ হোষ্টেলকে সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে দু'দুবার ঘিরে ফেলা, হোষ্টেলের কামরায় কামরায় খানাতল্লাসী চালান, বিনা ওয়ারেণ্টে হোষ্টেল হতে ছাত্র গ্রেপ্তার করা, ২৭ ঘণ্টা অনশনকারীদের পুলিশ দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া মত

সাহস সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ আমলেও কোন জেলা কর্তৃপক্ষ করে নি। অথচ আজ এ সাহস কেন? শিক্ষামন্ত্রী ঠিকই বলেছেন "জেলা কর্তৃপক্ষ এমন একজন উচচ পদস্থ কর্ম্মচারীর আত্মীয় যাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করবার আগে ভেবে দেখতে হবে।" সরকারী কর্ম্মচারীরা কি তবে মন্ত্রী সাহেবানদের সিংহাসন টলটলায়মান করতে পারেন? ছাত্রদের আমরা জিজ্ঞাসা করি আপনারা কাওকে দেখে ভয় করেন? নিশ্চয়ই না। তবে আমাদের প্রতিনিধিরা ভয় করেন কেন? বেসরকারী তদন্তের দাবীতে রাজী হতে মন্ত্রী সাহেবানরা সাহস করেন না কেন? অন্যান্য উপরোক্ত জেলাগুলোতে ঠিক একই ভাবে তাদের জুলুম চলছে। কাজেই জুলুম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।*

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের 'জুলুম বিরোধী দিবস' পালনের এই আহ্বান ছাত্র ফেডারেশনও সমর্থন করে। ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ও সম্পাদক একটি বিবৃতির মাধ্যমে ৮ই জানুয়ারী প্রদেশব্যাপী জুলুম বিরোধী দিবস পালনের আহ্বান জানান। বিবৃতিটি পূর্ব বাঙলা থেকে প্রকাশিত কোন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত না হলেও কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'ইত্তেফাক' এ ৩রা জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত হয়।

অপরদিকে সরকারী দলের সমর্থক নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ খুব সক্রিয়ভাবে এই দিবস পালনের বিরোধিতা করে। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত 'রাজশাহী কলেজে দলাদলি' শীর্ষক তাদের একটি বেনামী ইস্তাহারে তারা ৮ই জানুয়ারীর জুলুম বিরোধী দিবস বানচালের জন্যে ছাত্র সাধারণের প্রতি আহ্বান জানায়। ছাত্র ফেডারেশন ও কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিষোদগারণ করতে গিয়ে তাতে বলা হয়:

> তাহাদের উদ্দেশ্য আমরা জানি। অত্যন্ত লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হয় কতিপয় মুসলিম ছাত্র অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করিয়া দায়িত্বহীনের মত উক্ত (অর্থাৎ ছাত্র ফেডারেশনের—ব. উ.) কম্যুনিষ্ট পন্থীদের সহযোগিতায় 'দমন নীতি বিরোধী দিবস' আহ্বান করিয়াছে।

* এই ইস্তাহারটিতে আমলাতন্ত্রের, বিশেষতঃ অবাঙালী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ খুব স্পষ্ট এবং তীব্র। মুসলিম লীগ নেতৃত্বের থেকে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধেই এক্ষেত্রে সমালোচনা তাই মূলতঃ কেন্দ্রীভূত। মুসলিম লীগের মন্ত্রীদের সাথে অবাঙালী উচচ পর্যায়ের আমলাদের সম্পর্ক সম্পর্কিত বক্তব্যও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

> আমরা বুঝিতে পারিলাম না ইহা কার বিরুদ্ধে 'দমন নীতি বিরোধী দিবস' এবং কিসের জন্য দমন নীতি বিরোধী দিবস। রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপের জন্য জেল খানায় যাহারা আশ্রয় লাভ করিয়াছে—তাহাদেরকেও এই সুযোগে জেলখানা হইতে উদ্ধার করিয়া এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার জন্য ছাত্র ফেডারেশন ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে।

জুলুম বিরোধী দিবসকে রাজশাহীতে কিছুতেই সফল হতে তারা দেবে না এই মর্মে তারা ইস্তাহারটিতে একটি 'চ্যালেঞ্জ' প্রদান করে। কিন্তু শুধু রাজশাহীতেই নয়। পূর্ব বাঙলার সর্বত্র তারা এই একইভাবে দিবসটি উদযাপনের বিরোধিতা করে এবং ৮ই জানুয়ারীর ছাত্র সভায় সংগঠিত হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে তারা অনেক ক্ষেত্রেই সমর্থ হয়।

> ৮ই জানুয়ারী ঢাকা এবং পূর্ব বাঙলার অন্যান্য শহর ও বিভিন্ন অঞ্চলে 'জুলুম বিরোধী দিবস' পালিত হয়।
>
> ঢাকায় কেবলমাত্র ঢাকা কলেজ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'জুলুম বিরোধী দিবস' এর ধর্মঘট সফল হয়। দুপুর ২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে নঈমুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে 'জুলুম বিরোধী দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত সভাটি অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে অন্যান্যদের মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান ও দবিরুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। সভায় একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে ছাত্রদের দাবী সমূহ মেনে নেওয়ার জন্যে সরকারকে এক মাস সময় দেওয়া হয়।[১]

তাজউদ্দীন আহমদের এই বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, বিপুলভাবে সাফল্য মণ্ডিত না হলেও 'জুলুম বিরোধী দিবস' ঢাকায় আংশিকভাবে সফল হয়। পূর্ব বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলে কিন্তু পরিস্থিতি অন্য রকম দাঁড়ায়। 'নওবেলালে'র ঢাকাস্থ নিজস্ব প্রতিনিধি এই সাধারণ পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

> ৮ই জানুয়ারী 'জুলুম প্রতিরোধ দিবসে'র ব্যর্থতার পর সাধারণ ছাত্র সমাজের মধ্যে যে নিরাশা ও আন্দোলনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে তীব্র অসন্তোষ দেখা গিয়াছে, গত সপ্তাহে ইহাই আরো পরিস্কার করিয়া লক্ষ্য করা গিয়াছে।
>
> রাজশাহী, খুলনা, ও অন্যান্য জেলায় যে সব ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদের এখনো মুক্তি দেওয়া হয় নাই। যে সব ছাত্রকে রাজশাহী শহর হইতে বহিস্কৃত করা হইয়াছিল, তাহারা আজও শহরে

প্রবেশ করিবার অধিকার পান নাই। শিক্ষা সঙ্কোচের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ ও ছাত্র ফেডারেশন যে দাবী তুলিয়াছিল, সে দাবীর প্রতি সরকার কর্ণপাতও করেন নাই। একদিকে সরকারের অনমণীয় মনোভাব, অন্য দিকে ছাত্র সমাজের (বিশেষ করে মুসলিম ছাত্র লীগের) নেতাদের 'আপোষ'—ইহাই হইতেছে ছাত্র সমাজের অসন্তোষের প্রধান কারণ। একদিকে সংগ্রামশীল ছাত্র সাধারণ, অন্যদিকে দুর্বল নেতৃত্ব, ইহাই আজ তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে।

যে সব ছাত্র নেতা ৮ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ দিবসের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ঢাকার বাহিরে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইতিমধ্যে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বগুড়ার জনৈক ছাত্র আমাকে বলেন—"সংগ্রামী ছাত্র সমাজকে নেতৃত্ব দিতে গিয়া ঢাকা ব্যর্থ হইয়াছে। আগামী আন্দোলনগুলোকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে রাজশাহী, খুলনা, সিলেটের ছাত্র সাধারণকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। যে সব জায়গায় ছাত্র দমন চলিতেছে, সেই সব জায়গায়ই আন্দোলনের কেন্দ্র স্থল হইয়া উঠুক।"[২]

ওপরের এই রিপোর্টটিতে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস'কে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ বলে বর্ণনা করলেও বাস্তবতঃ তা ততখানি ব্যর্থ হয় নি। ঢাকা সহ পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ সম্পর্কে কিছু প্রচার হয়েছিলো এবং সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সাফল্য বলতে উপরোক্ত রিপোর্টটিতে লেখক পূর্ব বাঙলার জেলাগুলি থেকে ৮ই জানুয়ারীর পর ছাত্রবন্দীদের মুক্তি, তাদের বিরুদ্ধে সব রকম বিধি নিষেধ প্রত্যাহার ইত্যাদি বোঝাতে চেয়েছেন। কোন "দিবস" পালনের সাফল্য অথবা ব্যর্থতাকে যেমন শুধু এই মাপকাঠিতেই বিচার করা চলে না, তেমনি ছাত্রদের একটি প্রতিবাদ দিবস উদযাপনের ধাক্কায় সরকার যে অবনত মস্তকে ছাত্রদের দাবীসমূহ স্বীকার করে নেবে তেমন পরিস্থিতিও তৎকালীন পূর্ব বাঙলায় ছিলো না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে মুসলিম ছাত্র লীগ নেতৃত্বের একটি শক্তিশালী অংশ সরকার ও তাদের ছাত্র সংগঠন নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সাথে আপোষপন্থী হওয়ার ফলে প্রতিরোধ দিবস যতখানি সফল হওয়ার

সম্ভাবনা ছিলো ততখানি হয় নি। এই দুই ছাত্র লীগের আপোষ, সুবিধাবাদিতা এবং ছাত্র ফেডারেশন বিরোধিতা একটা নগ্নরূপ পরিগ্রহ করেছিলো ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলনের সময়।*

সরকার যে ছাত্রদের আন্দোলন, সে যে দাবীর জন্যেই হোক, সর্বপ্রকারে দমন করতে বদ্ধপরিকর ছিলো তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ১২ই মার্চ, ১৯৪৯, এর ছাত্র গ্রেফতার। ঐ দিন ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ও পরিচালনায় পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের সামনে কিছু সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী দলবদ্ধ হয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'আরবী হরফ চাই না' ইত্যাদি ধ্বনি সহকারে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে তাঁদের মধ্যে থেকে সৈয়দ আফজাল হোসেন, মৃণাল কান্তি বাড়রী, বাহাউদ্দীন চৌধুরী, ইকবাল আনসারী, আব্দুস সালাম এবং এ. কে. এম. মনিরুজ্জমান চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়।[৩] ১৪ই মার্চ তারিখে সিলেট জেলা ছাত্র ফেডারেশনের অফিসের ওপর পুলিশ হামলা করে।[৪]

পূর্ব বাঙলার সর্বত্র, বিশেষতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নির্যাতন এবং ছাত্রদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ কি পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো তার একটি উল্লেখযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত এবং জনৈক শামসুল হক লিখিত 'স্কুল কলেজের চার দেয়ালের মধ্যে মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আদায় করুন' শীর্ষক নিম্নলিখিত প্রবন্ধে:

> পূর্ব্ব পাকিস্তানের একমাত্র ও পাকিস্তানের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণে প্রবেশ করার পরে ডাইনে চোখ ফেরালেই কালো কালির উপর সাদা বড় বড় হরফে লেখা কর্ত্তৃপক্ষের যে বিরাট নোটিশটি নজরে পড়ে তাতে ভাষার মারপ্যাঁচ যতই থাক না কেন, বক্তব্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—"ছাত্র সাধারণকে জানান যাইতেছে যে কর্ত্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কোনো সভা হইতে পারিবে না।" সরকারের তাবেদার বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ জানেন, আমরাও জানি কোনো রাজনৈতিক সভা আহ্বান করার অনুমতি কর্ত্তৃপক্ষের কাছে চাইলেও পাওয়া যায় না, যেতে পারে না।

*চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-১৯৫০' দ্রষ্টব্য।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের মধ্যে মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতি এর চেয়ে নির্লজ্জ বিদ্রূপ আর কিছু কল্পনা করা অসম্ভব। বস্তুত এই মনোভাবকে গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহের প্রতি সরকারের নীতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা অসম্ভব কারণ এই একই নীতি প্রদেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অনুসরণ করা হচ্ছে, ঠিক একইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের আড়ালে পুলিশি আইন কানুন চালু করা হয়েছে। সভা সমিতি করতে গিয়ে গত দু বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বহিষ্কার এবং 'ডিসিপ্লিনারী এ্যাকসনের' হুমকির মারফত যে সব বাধা হরদম আমরা পেয়ে আসছি, ঠিক একই ধরনের বাধা পেয়েছি সিলেটের এম. সি. কলেজ হোষ্টেলের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে, শিক্ষা সম্মেলনের উপর সভা করতে গিয়ে। অর্থ সাহায্য ও অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে সরকারের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিমানের শেষ নেই কিন্তু ছাত্র সংহতি ও আন্দোলনের উপর এই ধরনের সরকারী কালা কানুন আজ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন, এমন কি মাঝে মাঝে তাদের জুলুম সকল প্রকার সীমা ছাড়িয়ে চরম নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল ও নোটিশ বোর্ড থেকে নিজের হাতে পোষ্টার, সভার বিজ্ঞপ্তি বা দেয়াল পত্রিকা ছিঁড়ে ফেলে দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আদৌ লজ্জাবোধ করেন না, এমনকি বিভিন্ন কমিটি ও ঘরোয়া বৈঠকে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে সাধারণ পুলিশ অফিসারের মতো বক্তৃতার নোট নেয়াকেও দৈনন্দিন কাজের অংশ বলে ধরে নিয়েছেন। এই ধরনের পুলিশি কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন বলেই ১৮ই অগাষ্ট নিখিল পূর্ব্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির বৈঠকে উপস্থিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ অধ্যাপক অত্যন্ত সহজ ভাবেই বলেছিলেন—"আমি তাদের বলে দিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তাদের ভাবতে হবে না। আমিই সব করবো।" এই নির্লজ্জ উক্তির উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভাসমিতি নিষিদ্ধ করে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর সরাসরি আঘাত হেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত হচ্ছে না। আজ তারা স্বাধীন ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা

প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করবার জন্য সব সময়েই নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করে চলেছেন। সরকারী ও বেসরকারী কলেজ ও হোষ্টেল ইউনিয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র ও কার্য্য-পদ্ধতির দিকে নজর দিলেই কর্ত্তৃপক্ষের এই বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব বিভিন্ন হল ইউনিয়ন, যা অতি সহজেই স্বাধীন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার প্রচারক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারত, আজ তাদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের 'রেজিমেণ্টেশন' ও সুপরিকল্পিত গণতন্ত্র-বিরোধী নীতির আস্ফালন চরমে উঠেছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রাবাস ও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নগুলোতে অর্থহীন পার্লামেণ্টারিয়ানইজম এর কচকচানির আড়ালে বিরাট ধাপ্পাবাজী চলেছে, ছিনিমিনি খেলা চলেছে ছাত্র সাধারণের মত প্রকাশের গণ-তান্ত্রিক অধিকার নিয়ে।

আমাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর হামলা চালিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্র সংহতি ও আমাদের আন্দোলনকে বানচাল করে দেবার জন্য যে আঘাত হানছেন, তার বিরুদ্ধে আমাদের সকল শক্তি নিয়ে আওয়াজ তুলতে হবে, শিক্ষা সম্মেলনের ভেতর দিয়ে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালা কানুনের অবসান ঘটিয়ে মত প্রকাশের পূর্ণতম স্বাধীনতা আদায় করবার জন্য কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করবো।

বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস ইউনিয়নগুলোকে পার্লা-মেণ্টারিয়ানইজম এর আওতা থেকে মুক্তি দিয়ে সত্যিকারের স্বাধীন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারা বিকাশের পথ খুলে দেব এবং সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ সভা সমিতি করার অভিযোগে যাদের উপর 'ডিসিপ্লিনারী এ্যাকসনের' হুমকি ঝুলছে তাদের পেছনে এসে দাঁড়াব—এই ধরনের হুমকি সরিয়ে নেয়ার আপোষহীন দাবী জানাব।[৫]

৩

জননিরাপত্তা আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি

১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে 'জন-নিরাপত্তা আইনের' মেয়াদ বৃদ্ধির জন্যে একটি অর্ডিন্যান্স পেশ করা হয়।

ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর আক্রমণকে জারী রাখার উদ্দেশ্যে এই সরকারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে ৪ঠা নভেম্বর 'পাকিস্তান অবজার্ভার' অফিসে 'ব্যক্তি স্বাধীনতা লীগের' একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।[১] 'পাকিস্তান অবজার্ভারের' সম্পাদক আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, আব্দুস সালাম, আতাউর রহমান খান, কফিলউদ্দীন আহমদ চৌধুরী, কমরুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, মীর্জা গোলাম হাফেজ, টি. হোসেন, আব্দুল বারী, আব্দুল আওয়াল, আব্দুল ওদুদ, শামসুল হক চৌধুরী এবং মীর্জা গোলাম কাদেরকে নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল 'ব্যক্তি স্বাধীনতা লীগের' পক্ষ থেকে পূর্ব বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে অর্ডিন্যান্সটি সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এই সভায় আরও একটি সিদ্ধান্ত হয় যে, তাঁদের আরও কয়েকজন প্রতিনিধি মুসলিম লীগ পরিষদ সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করে অর্ডিন্যান্সটি যাতে তাঁরা পাশ না করেন তার জন্যে আবেদন জানাবেন।

ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অর্ডিন্যান্সটির প্রতিবাদে একটি সভা করেন এবং তাঁরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গঠনের উদ্দেশ্যে ছাত্র সমাজের কাছে আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন যে, সরকার নিজেদের দুর্নীতি এবং অকর্ম্মণ্যতাকে ঢেকে রেখে গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের কণ্ঠরোধ ও নিজেদের গদী রক্ষার জন্যেই অর্ডিন্যান্সটির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।[২]

২রা নভেম্বর, ১৯৫১, তারিখে কফিলউদ্দীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে অর্ডিন্যান্সটির বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটিতে আব্দুল জব্বার খদ্দর, আতাউর রহমান খান, কমরুদ্দীন আহমদ এবং আরও কয়েকজন বক্তৃতা করেন।[৩] বক্তারা অর্ডিন্যান্সটিকে 'মন্ত্রী নিরাপত্তা আইন', 'অফিসার নিরাপত্তা আইন', 'শাসকদল নিরাপত্তা আইন' হিসেবে অভিহিত করে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।[৪]

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ৫ই নভেম্বর পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে অর্ডিন্যান্সটি গৃহীত হয় এবং তার মেয়াদ ১৯৫৩ সালের ১লা অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।[৫]

অর্ডিন্যান্সটির ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে 'জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে নওবেলাল বলেন:

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন সাহেব দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, 'নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স' কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বার্থে ব্যবহৃত হইবে। ইহা ছাড়াও পাক সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য সমাবেশের ফলে যে যুদ্ধাশঙ্কা দেখা দিয়াছে ইহাতে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। .... জনাব প্রধানমন্ত্রীর 'সাধু সঙ্কল্প' সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই—কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা হইতে বলিবার আমাদের অনেক কিছুই আছে। জনাব মন্ত্রী সাহেব জনসাধারণকে জানাইবেন কি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ চার বৎসরের মধ্যে কয়জন মুনাফাখোর ও কালোবাজারী এই অর্ডিন্যান্সের আওতায় আসিয়াছে? .... প্রধানমন্ত্রী সাহেব আরও জানাইবেন কি কয়জন নিঃস্বার্থ কর্মী, সমাজ সেবক, রাজনৈতিক কর্মী অর্ডিন্যান্সী হামলার কবলে পড়িয়াছে এবং এখনও জেলে পচিতেছে ও দেশ হইতে বহিস্কৃত হইয়াছে? ইহাদের কয়জন পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বার্থে কাজ করিয়াছে?

গণতন্ত্রের যুগে আমাদের বাস, সরকারের সমালোচনার স্বাধীনতা বাক স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। অর্ডিন্যান্স পাশ করিয়া এই স্বাধীনতার উপর হামলাকে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক জনসাধারণ কোন দিনই সহ্য করিবে না।

১৯৪৫ সাল থেকে বিনা রশিদে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মোফাজ্জল হক কর্তৃক লেডিজ পার্কের জন্যে একটি ফাণ্ডে রিক্সা চালকদের নিকট নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায় বন্ধ করা এবং রিক্সা ষ্ট্যাণ্ড প্রবর্তনের দাবীতে বরিশালের দেড় হাজার রিক্সা চালক তাঁদের ইউনিয়নের মাধ্যমে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের কাছে একটি স্মারক লিপি প্রদান করেন। এই দাবী সমূহ বিবেচনা সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদানের মেয়াদ ১৫ই থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর অনুরোধও তাঁরা জানান। কিন্তু চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যালিটির কোন সভা আহ্বান না করেই পূর্ব নির্দ্ধারিত মেয়াদ বহাল রাখেন। এর ফলে ১৬ই তারিখে বরিশাল শহরে রিক্সা চলাচল লাইসেন্স অভাবে প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ঐ দিনই রিক্সা চালকগণ শান্তভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তাঁদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার এবং মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানের পদত্যাগ দাবী করেন। পরদিন কমিশনার-

-দের এক জরুরী সভায় লাইসেন্সের মেয়াদ ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়।[৭]

রিক্সা ইউনিয়নের আংশিক দাবী এই ভাবে আদায় হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডি. কে. পাওয়ার জন নিরাপত্তা আইনের বিশেষ ক্ষমতা বলে বরিশালের সাংবাদিক মোহাম্মদ আলী আশরাফ, মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার জাহেদ হোসেন, বি. এম. স্কুলের সহকারী শিক্ষক ও রিক্সা ইউনিয়নের সেক্রেটারী তফাজ্জল হোসেন, রিক্সা ইউনিয়নের সভাপতি এলেমদ্দিন, রিক্সা মহাজন সমিতির সেক্রেটারী সুশীল কুমার বসু এবং অপর দুইজন রিক্সা মহাজন ও রিক্সা চালককে বরিশাল মিউনিসিপ্যাল এলাকা থেকে বহিস্কারের জন্যে আদেশ প্রদান করেন।[৮]

পূর্ব পাকিস্তান ব্যক্তি স্বাধীনতা লীগ, পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইকবাল হলের ছাত্র ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্পাদক প্রভৃতি তীব্র ভাষায় এই বহিস্কার আদেশের নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবী জানান। এছাড়া আলী আহমদ খান, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন, চৌধুরী মোহাম্মদ আরীফ ও চৌধুরী শামসুদ্দীন ব্যবস্থা পরিষদের এই পাঁচজন সদস্য এর বিরুদ্ধে এক বিবৃতি প্রদান করে জননিরাপত্তার নামে যে প্রহসন চলছে তার প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সরকারের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গঠনের জন্যে দাবী জানান।[৯]

বরিশাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এই বহিস্কারাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'জন-নিরাপত্তা' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে নওবেলাল বলেন:

> এই অপরিনামদর্শী আদেশের ফলে নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনতা প্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই আহত হইয়াছেন।
>
> পরিষদ কর্তৃক জন-নিরাপত্তা আইন গৃহীত হওয়ার পক্ষকাল যাইতে না যাইতেই ইহার এক নিদারুণ অপব্যবহারে দেশব্যাপী ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে এবং জনসাধারণ সন্দেহ করিতে শুরু করিয়াছে যে বর্ত্তমান সরকার এই ধরনের বিশেষ ক্ষমতার অধিকার পাওয়ার উপযুক্ত কিনা .... তাহারা আরও ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে যে জন-নিরাপত্তার নামে যে আইন প্রচলিত হইল তাহা যেন জন-অনিরাপত্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। বরিশালের আদেশ এবং ইতিপূর্বে অভি-

ন্যান্স রূপে এই একই আইনের আমলদারীতে আরও বহু ঘটনা দমনে এই আশঙ্কা অতি স্বাভাবিকভাবেই জাগরিত করিয়াছে। .... দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য স্থানীয় বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রভাবান্বিত করিয়া জননিরাপত্তা আইন যদি প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে কার্যক্ষেত্রে এই আইন জননিরাপত্তার বদলে 'জন-অনিরাপত্তা' সৃষ্টি করিতে বাধ্য।[১০]

পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে ২রা ডিসেম্বর ঢাকার ২ হাজার রিক্সা চালক ধর্মঘট পালন করেন এবং ঐ দিনই বিকেলে ভিক্টোরিয়া পার্কে রিক্সা চালকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।[১১]

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫১, তারিখে পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের কার্যকরী সংসদ বিনা সর্তে সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[১২] ২০শে ডিসেম্বর মেডিকেল স্কুলের এক ছাত্র সমাবেশে শেখ মুজিবর রহমান ও মহীউদ্দীন আহমদের মুক্তি দাবী করা হয়। এই সভায় পাঁচজন মেডিকেল ছাত্রের বিরুদ্ধে বহিস্কার আদেশ বাতিল করার দাবী জানান হয়। ছাত্র, শ্রমিক এবং সাধারণভাবে জনগণের ওপর সরকারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এই সভা তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে।[১৩]

৪

নির্যাতনের ব্যাপকতা

সরকারের নির্যাতন যে কেবলমাত্র কমিউনিষ্ট এবং ছাত্রদের ওপরই জারী ছিলো তাই নয়। প্রগতিশীল জনগণের সমগ্র অংশ, এমনকি মুসলিম লীগের মধ্যেকার সরকার বিরোধী অংশও এই নির্যাতনের দ্বারা ব্যাপকভাবে নিপীড়িত হচ্ছিলো। প্রথম থেকেই পূর্ব বাঙলা সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্দ্ধারণ ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের থেকে আমলাতন্ত্রের প্রভাব তুলনায় অনেক বেশী ছিলো। শুধু তাই নয়, আমলাতন্ত্রের এই প্রভাব সমগ্র প্রশাসন ও সরকারী নীতির ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভই করছিলো। এজন্যে মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্ত হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী এবং জেলা, মহকুমা অথবা তারও নিম্নস্তরের নেতাদের

কোন সমালোচনাই তৎকালীন পূর্ব বাঙলা সরকারের নীতি অথবা কার্যা-বলীর মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হচ্ছিলো না। এর ফলে মুসলিম লীগের মধ্যেই সরকার বিরোধিতা ক্রমশঃ একটা ব্যাপক আকার পরিগ্রহ করেছিলো এবং সেই অনুযায়ী এই ধরনের বিরোধী মতা-বলম্বীরা ক্রমশঃ মুসলিম লীগের থেকে সাংগঠনিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন।

মুসলিম লীগ কর্মীদের ক্ষেত্রে যা ঘটছিলো সাধারণভাবে মুসলিম লীগ সমর্থক পত্র পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রেও ঘটছিলো ঠিক তাই। সামান্য বিরোধিতা কোন জায়গায় দেখা দিলেই তাকে কমিউনিষ্ট আখ্যায় ভূষিত করে সেই বিরোধিতাকে নির্যাতনের মাধ্যমে স্তব্ধ এবং বিলুপ্ত করতে সরকারের কোন ক্লান্তি ছিলো না।

এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খুব বিরাট ব্যাপক আকারে না হলেও তা বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিলো। অসংগঠিত বিক্ষোভ এবং প্রতিরোধের সংকল্প ধীরে ধীরে সংগঠিত ও দৃঢ় প্রতিরোধের রূপ পরিগ্রহ করছিলো। এবং শুধু কমিউনিষ্টরাই নয় জন-গণের ব্যাপকতম অংশ নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেই প্রতিরোধে উত্তরোত্তরভাবে অংশ গ্রহণ করছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি প্রস্তাব বিরোধী আন্দোলন

১

পাকিস্তান সংবিধান সভায় মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সুপারিশ

১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ পাকিস্তান সংবিধান সভার একটি প্রস্তাব অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটি গঠিত হয়েছিলো। এই কমিটি ১৯৫০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর সংবিধান সভায় তাঁদের অন্তবর্ত্তী-কালীন রিপোর্ট পেশ করেন।[১] এই রিপোর্টে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে তাঁরা যে সুপারিশ করেন তা হলো নিম্নরূপ।

কেন্দ্রীয় আইনসভা: কেন্দ্রীয় আইন সভায় হাউস অব ইউনিট্স্ এবং হাউস অব পিপল্স্ নামে দুটি পৃথক পরিষদ থাকবে। উচ্চ পরিষদ, হাউস অব ইউনিটস, প্রত্যেকটি প্রদেশের সমান সংখ্যক প্রতি-নিধিদের দ্বারা গঠিত হবে। নিম্নপরিষদ হাউস অব পিপল্স্ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে। "দুই পরিষদের পারস্পরিক ক্ষমতা ও কেন্দ্রীয় শাসনভার এর বিষয়ে উভয় পরিষদ সমান ক্ষমতার অধিকারী হইবে। কোন বিষয়ে মতবিরোধ উপস্থিত হইলে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহূত হইবে। বাজেট ও অর্থ সংক্রান্ত বিল উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে আলোচিত হইবে।"* যুক্ত অধিবেশন আহ্বানের ক্ষমতা থাকবে প্রেসিডেণ্টের হাতে। দুই কেন্দ্রীয় পরিষদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসার জন্যে উভয় পরিষদের যুক্ত অধি-বেশন আহ্বান করা হবে। এছাড়া রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন ও অপসারণ এবং মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনীত আনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনার জন্যেও যুক্ত অধিবেশন আহূত হবে।[২]

প্রেসিডেণ্ট: ফেডারেশনের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রেসিডেণ্টের ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে

* এই উদ্ধৃত অংশগুলি মূল রিপোর্টের থেকে উদ্ধৃত—ব. উ.

নির্বাচিত হবেন। তাঁর কার্যকাল হবে পাঁচ বৎসর। সশস্ত্র বাহিনীর ওপর প্রেসিডেন্টের সর্বময় কর্তৃত্ব থাকবে। তাছাড়া নির্বাচন পরিচালনা এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার সর্বপ্রকার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত থাকবে। উভয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্য দাবী করলে উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে মোট সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ভোটে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করা যেতে পারবে।[৩]

প্রেসিডেন্ট বা "রাষ্ট্রনায়ক কর্তৃক প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবেন।" "জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রে রাষ্ট্রনায়কের যে ক্ষমতা থাকিবে প্রদেশে প্রাদেশিক শাসন কর্তারও সেই ক্ষমতা থাকিবে, তবে এই সকল ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপকতায় তিনি রাষ্ট্রনায়কের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশাধীন থাকিবেন।" "প্রদেশের মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্তের ব্যাপারে প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে রাষ্ট্রনায়কের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করিতে হইবে।"[৪]

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার পারস্পরিক সম্পর্ক : "প্রাদেশিক ও সম্মিলিত বিষয়ের তালিকা সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয়-সাধনের ক্ষমতা কেন্দ্রের থাকিবে। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইন সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

"কেন্দ্রীয় আইনসভা কোন আইন প্রণয়ন করিলে পরিচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে আইন প্রণয়ন করিয়া কেন্দ্রীয় আইনসভা ইহা সংশোধিত অথবা বাতিল করিতে পারিবে, কিন্তু যে প্রদেশের উপর এই আইন প্রয়োগ হইবে সেই প্রদেশের আইনসভায় আইন পাশ করিয়া সংশোধন ও বাতিল করা চলিবে না।"

"কেন্দ্রীয় আইনসভা ও প্রাদেশিক আইনসভায় প্রণীত আইনের অসামঞ্জস্য বা কোন বৈসাদৃশ্য দেখা দিলে কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রাদেশিক আইন সভার উপর প্রাধান্য লাভ করিবে।"

"জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে কেন্দ্র প্রাদেশিক তালিকায় উল্লিখিত যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন।"

"প্রদেশের শাসন ক্ষমতা এমনভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন এবং প্রদেশের প্রচলিত আইনের সহিত উহার সামঞ্জস্য থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলে ফেডারেশনের শাসন ক্ষমতা অনুসারে সেই নির্দেশ দান করিবেন।

"প্রত্যেক প্রদেশের শাসনক্ষমতা এমনভাবে পরিচালনা হইবে যাহাতে ফেডারেশনের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় তাহা বাধাস্বরূপ না হইয়া দাঁড়াইতে পারে।"[৫]

জরুরী অবস্থা: কোন বিশেষ অবস্থাকে জরুরী বিবেচনা করলে প্রেসিডেণ্ট সাময়িকভাবে শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখতে পারবেন।[৬]

ক্ষমতা বণ্টন: কেন্দ্র ও প্রদেশ সমূহের ক্ষমতা তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন বিভাগ, প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্বাধীন বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন বিভাগ।. তালিকাভুক্ত ক্ষমতা ব্যতীত সমস্ত অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকবে।[৭]

প্রধানমন্ত্রী: প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। প্রেসিডেণ্ট এমন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করবেন যিনি তাঁর মতো কেন্দ্রীয় আইন সভার উভয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থা-ভাজন। প্রেসিডেণ্ট প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী মন্ত্রীসভার অপরাপর সদস্য নিযুক্ত করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় সরকারের উভয় পরিষদের কাছে সমানভাবে দায়ী থাকবেন।[৮]

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা: প্রাদেশিক পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করবেন। প্রাদেশিক মন্ত্রীরা প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে প্রাদেশিক শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা কর্তৃক কোন মন্ত্রীর নিয়োগ অথবা বরখাস্তের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা চলবে না।[৯]

অর্ডিন্যান্স: প্রেসিডেণ্ট যে সমস্ত অর্ডিন্যান্স জারী করবেন সেগুলি কেন্দ্রীয় আইনসভার পরবর্তী অধিবেশনে উত্থাপন করতে হবে। আইন সভা অর্ডিন্যান্সের জন্যে নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ নির্দ্ধারণ করবেন।[১০]

রাষ্ট্রভাষা: পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।[১১]

২

মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পূর্ব বাঙলায় বিক্ষোভ

মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির উপরোক্ত সুপারিশসমূহ এতো নগ্নভাবে অগণতান্ত্রিক এবং পূর্ব বাঙলার প্রতি বৈষম্যমূলক যে মুসলিম লীগ সমর্থক ব্যক্তি ও পত্রপত্রিকাসমূহ, এমনকি মুসলিম লীগের সদস্য পর্যায়ের ব্যক্তিরাও এই সব সুপারিশের বিরুদ্ধে সমালোচনায় অন্যান্যদের মতোই অংশ গ্রহণ করেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আকরাম খান মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সদস্য এবং ক্ষমতাসীন দলের একজন পাণ্ডা ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পত্রিকা 'দৈনিক আজাদ' এই সমস্ত সুপারিশের বিরুদ্ধে পর পর কয়েকটি সমালোচনামূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এমনি একটি সম্পাদকীয়তে উচ্চ পরিষদে প্রত্যেক প্রদেশের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকা সম্পর্কে বলা হয়:

> প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, উচ্চ পরিষদে সব প্রদেশেরই সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে। অর্থাৎ কয়েক লক্ষ অধিবাসীর প্রদেশ বেলুচিস্তানে যতজন প্রতিনিধি উচ্চ পরিষদে থাকিবে চারি কোটি অধিবাসী অধ্যুসিত পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি সংখ্যা সেখানে মাত্র ততজনই থাকিবে। এর চাইতে অন্যায় ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে আমরা জানি না। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে উচ্চ পরিষদে চিরদিনের জন্য সংখ্যাগুরু পূর্ব্ব পাকিস্তানকে মাত্র এক পঞ্চমাংশ প্রতিনিধির অধিকার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এর ফলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের স্বার্থমূলক কোন প্রস্তাব কস্মিনকালেও গৃহীত হইবে না।

ঐ একই বিষয়ে ২রা অক্টোবর 'দৈনিক আজাদ' অন্য একটি সম্পাদকীয়তে বলেন:

> প্রস্তাবিত দুইটি সভা সম্পূর্ণ গণতন্ত্র বিরোধী ও একান্তভাবে পূর্ব্ব পাকিস্তানের স্বার্থের পক্ষে হানিকর। প্রথমতঃ—এই প্রস্তাব করিয়া যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করা হইয়াছে। এই যুগে একটি উচ্চতর আইনসভা গঠনের বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক দেশেই প্রবণতা দেখা দিয়াছে। কারণ উহা অহেতুক, অবান্তর এবং অপ্রয়োজনীয় একটা শাসনতান্ত্রিক বিলাস-ভূষণ ছাড়া কিছুই নয়। শ্বেতহস্তী পোষণের

এই বিরাট ব্যয় বহনের দায়িত্ব জনসাধারণ আজ কোন দেশেই বহন করিতে চায় না। সব চাইতে মারাত্মক কথা হইল—উচচতর সভাও সমান ক্ষমতার অধিকার পাইবে। এখানেই পূর্ব্ব পাকিস্তান আজ সমূহ বিপদের আশঙ্কা করিতেছে। জনসংখ্যার ও গণতান্ত্রিকতার স্বাভাবিক অধিকারে পূর্ব্ব পাকিস্তান একক নিম্ন পরিষদে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রভৃতি দেশের সম্মিলিত আসন সংখ্যার চাইতে বেশী আসন লাভ করিবে। উচচ পরিষদে প্রতি প্রদেশের সমান আসন লইয়া সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলে নিম্ন পরিষদের ক্ষমতাকে ইহা অনায়াসেই অর্থহীন ও ব্যর্থ করিয়া ফেলিবে। এই খানেই পূর্ব্ব পাকিস্তানকে জবেহ করিবার সব চাইতে বড় ভয় রহিয়াছে।

এরপর ৪ঠা অক্টোবর 'দৈনিক আজাদ' উচচ পরিষদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অপর একটি কঠোরতর সম্পাদকীয়তে বলেন:

উচচ পরিষদের পরিকল্পনা গৃহীত হইলে পূর্ব্ব পাকিস্তান একটা কলোণীতে পরিণত হইবে এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানীরা নিজ দেশে পরবাসীর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে। মনে হয়, উহা (খসড়াতন্ত্র) রচনা করার সময় তাদের চোখে ভাসিতেছিল কোন নগরের মিউনিসিপ্যাল স্বায়ত্ত্ব শাসনের স্বরূপ। তারা প্রদেশকে একটি মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া অধিক ক্ষমতা দিতে রাজী হইতে পারেন নাই। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার নামে এত বড় পুকুর চুরির ব্যাপার আর কখনও কোথায় হইয়াছে কিনা আমাদের জানা নাই। কেন্দ্রের হাতে যে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করার প্রস্তাব এই খসড়ায় কথা হইয়াছে তাহা গৃহীত হইলে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের ক্ষমতা সেরূপ খর্ব্ব হইয়া থাকুক বা না থাকুক পূর্ব্ব পাকিস্তান একেবারে ঠুটো জগন্নাথে পরিণত হইবে। পূর্ব্ব পাকিস্তানবাসীরা তা মানিয়া লইয়া আত্মহত্যা বরণ করিতে পারে না।

কেন্দ্র ও প্রদেশের পারস্পরিক সম্পর্ক মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটি যেভাবে নির্দ্ধারণের সুপারিশ করেন সে বিষয়ে ৬ই অক্টোবর অপর একটি সম্পাদকীয়তে 'দৈনিক আজাদ' বলেন:

বস্তুতঃ পাকিস্তানের রাষ্ট্র কর্ত্তা ও প্রধানমন্ত্রী মিলিয়া এই শাসনব্যবস্থায় নিরুদ্বেগে যথেচ্ছাচারী শাসন কায়েম করিতে পারিবেন। পাকিস্তান যে আজাদীর স্বপ্ন দেখিয়াছিল এবং গণতন্ত্রের যে আদর্শ গ্রহণ করিয়া-

ছিল তাহার কোন ছাপ প্রস্তাবিত শাসন ব্যবস্থায় নাই। উক্ত ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ধ্বংসস্তুপের উপর একটি ফ্যাসিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন চলিয়াছে।

মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সুপারিশগুলি পূর্ব বাঙলায় কতখানি তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিলো মুসলিম লীগের চির-সমর্থক ও মুসলিম লীগের একজন উচ্চতম নেতার মালিকানাধীন পত্রিকা 'দৈনিক আজাদ' এর উপরোক্ত মন্তব্য সমূহকে তার একটা মাপকাঠি হিসেবে ধরা যায়। শুধু পূর্ব বাঙলাতেই নয়। পশ্চিম পাকিস্তানেও এই সব সুপারিশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাপক সমালোচনা ও বিক্ষোভ শুরু হয়। ২রা অক্টোবর লাহোর থেকে প্রকাশিত 'জমিদার' এই সুপারিশগুলি সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন:

> বৃটিশ ও আমেরিকার শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্রের যে আঁচ পাওয়া যায় এই প্রস্তাবে তাহাও রক্ষিত হয় নাই। এই সকল প্রস্তাব ১৯৩৫ সালে রচিত ভারত শাসন আইনের চেয়েও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া আমাদের অভিমত।

মুসলিম লীগকে সীমিতভাবে সমর্থন দানকারী সিলেট থেকে প্রকাশিত তৎকালীন পূর্ব বাঙলার সব থেকে উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' ৫ই অক্টোবর উপরোক্ত সুপারিশসমূহ সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন:

> তিন বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ কোশেষ করার পর পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে মূলনীতি নির্দ্ধারণ কমিটি বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর পাক-গণপরিষদে তাহাদের অসম্পূর্ণ রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এই রিপোর্ট পাঠক মাত্রকেই পর্ব্বতের মুষীক প্রসবের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে এবং গণতন্ত্রের অভূতপূর্ব্ব রূপ দর্শনে অপার বিস্ময়ে বিমূঢ় চিত্তে তাহারা প্রশ্ন করিবে "ইহাই কি বহু বিঘোষিত ইসলামী গণতন্ত্রের নমুনা।"
>
> খসড়া রিপোর্টে রাষ্ট্রের কর্ণধার নির্বাচন কেন্দ্রের উভয় পরিষদের সদস্যদের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার উপর অনাস্থা প্রস্তাব উভয় পরিষদের মিলিত সভা ব্যতিরেকে বেআইনী করার, উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ হাউস অব ইউনিটসের প্রতিনিধি সংখ্যা জনসংখ্যার সহিত সম্পর্কহীনভাবে সকল প্রদেশের জন্য সমান করার

এবং উচচ ও নিম্ন পরিষদকে সমান ক্ষমতা সম্পন্ন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রের কর্ণধারকে বিধিবদ্ধভাবে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী করার প্রস্তাব করা হইয়াছে কিন্তু সেই ক্ষমতার অপব্যবহার হইতে তাহাকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা জনগণের প্রতিনিধিদের নানা কৌশলে বঞ্চিত করার আয়োজন করা হইয়াছে। ..

খসড়া রিপোর্টের বিরুদ্ধে সারা পাকিস্তানব্যাপী যে তুমুল প্রতিবাদ উঠিয়াছে আমরাও সেই সঙ্গে সুর মিলাইতেছি। পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রতি যে সাম্রাজ্যবাদী সুলভ বিধানের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব পাকিস্তানবাসীরা কিছুতেই মানিয়া লইবে না একথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি সংবাদপত্র ও প্রতিষ্ঠান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাইয়াছে। যে জনগণ পাকিস্তান অর্জন করিতে পারিয়াছে, তাহারা তাহাদের অধিকার রক্ষা করিতে পিছাইয়া যাইবে না এ সত্য নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করিলে মঙ্গলের পথেই আগাইয়া যাইবেন। এখনও সময় সম্পূর্ণ অতিবাহিত হইয়া যায় নাই। মঙ্গলের পথে আগাইয়া আসুন, এই আহ্বানই আমরা জানাইতেছি।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সুপারিশ ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে গণপরিষদের বাঙালী সদস্যেরা আরও সময় চাওয়ায় কমিটির রিপোর্টটি পরিষদে উত্থাপন স্থগিত রাখা হয় কিন্তু মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত রিপোর্টটি পরিষদে গৃহীত হয়।[১] "কেবলমাত্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ হুমকী অথবা গুরুতর জরুরী অবস্থা ব্যতীত হাই কোর্টে কোন নাগরিক কর্ত্তৃক হেবিয়াস কর্পাসের আবেদনের অধিকার স্থগিত রাখা হবে না"—এই ধারা সম্পর্কে পাঞ্জাবের মিঞা ইফতেখারউদ্দীন ও শওকত হায়াত খান একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। তাঁদের প্রস্তাবটিতে কোন নাগরিককে বিনা বিচারে আটক রাখার ব্যবস্থার বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ভোটে তাঁদের এই সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।[২]

'মৌলিক অধিকার' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে 'নওবেলাল' এ সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন:

বিনা বিচারে কোন নাগরিককেই আটক রাখা যাইবে না, ইহা তাহার সর্ব্ববাদী স্বীকৃত অধিকার। তাহাকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত

করিতে হইলে যথেষ্ট সংগত কারণ থাকা প্রয়োজন। ....
কিন্তু জাতীয় জরুরী অবস্থার ভাওতা দেখাইয়া এই মৌলিক অধিকার খর্ব করার ক্ষমতা কোন আজাদী প্রিয় জাতিই কাহারও হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে তাহার স্বাধীন স্বত্বার ভিত্তি-মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে।[৩]

মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটিব রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিলো। তা সত্ত্বেও ৫ই অক্টোবর ফজলুল হক হলের মিলনায়তনে আব্দুল জব্বারের সভাপতিত্বে শাসনতন্ত্রের সুপারিশ আলোচনার জন্যে একটি ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বক্তাবা এই সুপারিশের তীব্র সমালোচনা করেন। কমিটি রিপোর্টের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রতিবাদ-মূলক প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হয়।[৪]

'গণতান্ত্রিক কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠা কর্মপরিষদ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান এই সময় গঠিত হয় এবং তাঁদের আহ্বানে ১৩ই অক্টোবর বৈকালে আর্মানী-টোলা ময়দানে মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটিব সুপারিশের প্রতিবাদে একটি জনসভা আহ্বান করা হয়। এই উপলক্ষে উপরোক্ত কর্মপবিষদ একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন। তাতে লোক পরিষদ ও উচচ পবিষদের প্রতি-নিধিত্ব ও ক্ষমতা, প্রেসিডেণ্ট ও মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতা, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে কমিটির সুপারিশসমূহের কঠোর সমালোচনা করা হয়। ইস্তাহারটিতে মুসলিম লীগের চক্রান্ত সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয়:

বিগত তিন বৎসরে পাকিস্তান পার্লামেণ্ট ও গণপবিষদে কে আসি-তেছেন, কে ববখাস্ত হইতেছেন, আর কে কে চলিয়া যাইতেছেন এ সব ব্যাপার দেশের জনসাধারণের অজ্ঞাত। এ সব ব্যাপারে জনসাধারণকে সম্পূর্ণ দূরে রাখিয়া এবং তাহাদেব রায়ের অপেক্ষা না করিয়া জোটবদ্ধ কতিপয় কোটারীর পরোক্ষ নির্বাচনে যাহারা নির্বাচিত হইয়াছে, তাহারাই ভবিষ্যতের জন্য জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অপহরণের এই চেষ্টা করিতেছে। এই রিপোর্ট কার্য্যকরী হইলে বিপুল সংখ্যাগুরুদ পূর্ব্ববঙ্গ শাসক গোষ্ঠির উপনিবেশে পরিণত করিবে। হয়তবা এমন একদিন আসিবে, যে দিন বিপুল ক্ষমতা-সম্পন্ন রাষ্ট্রপতি সময় বুঝিয়া দুই একজন প্রধানকে হাত করিয়া মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলির ন্যায় বিদেশীর সাহায্যে পাকিস্তানকে

রাজতন্ত্রের কুখ্যাত জুয়ালে জুড়িয়া দিবে। .. ..
উপরোক্ত কোনঠাসা পরিবেশের মধ্যে পূর্ব্ব পাকিস্তানকে ও অন্যান্য প্রদেশকে মিউনিসিপ্যালিটিতে পরিণত করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। জমিদারী, জায়গীরদারী প্রথা, শিল্প ও বিদেশী পুঁজির প্রতিষ্ঠান বিনা খেসারতে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি পরিণত করা যাইবে না, শোষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণ কোন প্রতিবাদের আওযাজ তুলিতে পারিবে না, কমিটির সুপারিশে তাহাবও ব্যবস্থা করা হইযাছে।

মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির ভাষা বিষয়ক সুপাবিশের উল্লেখ করে ইস্তাহারটিতে আন্দোলনেব আহ্বান জানিযে বলা হয়:

আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে, পাকিস্তানেব শতকরা ৬২ জন অধিবাসীর সমৃদ্ধিশালী ও বলিষ্ঠ বাংলা ভাষা-যাহা পৃথিবীব ভাষা ও সাহিত্যের আসরে ৭ম স্থান অধিকার কবিযাছে, এমন ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা না কবিয়া যাহা পাকিস্তানেব কোন প্রদেশেবই ভাষা নহে, এমন একটি বিদেশী ভাষা উর্দুকেই বাষ্ট্রীয ভাষা কবাব সিদ্ধান্ত করা হইযাছে। উপবোক্ত মূলনীতিব সন্দেশ দেখাইযাই পূর্ব্ববঙ্গকে সাম্রাজ্যবাদীদেব শোষণের ক্ষেত্র করার যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে তাব বিরুদ্ধেই আজ দেশের গণতান্ত্রিক জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সমাজ, ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সময় আসিযাছে। পাকিস্তান অর্জ্জনেব জন্য দেশময যে আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল— বর্ত্তমান পবিস্থিতিতে তাহার চাইতেও শতগুণ বেশী জোরদার আন্দোলন প্রয়োজন। আজ প্রশ্ন, স্বদেশে আমরা স্বাধীন থাকিব না গোলামে পরিণত হইব। সেই প্রশ্নেব মীমাংসার জন্যই আগামী ১৩ই অক্টোবর শুক্রবার বিকাল ৪টায় স্থানীয় আর্মানীটোলা ময়দানে এক বিরাট জনসমাবেশের আয়োজন করা হইয়াছে। দেশের ভ্রাতা-ভগ্নিগণকে এই সভায় যোগদান করিয়া সমস্বরে আওয়াজ তুলিতে হইবে—

'পাকিস্তানে ফ্যাসিষ্ট শাসনতন্ত্র চাই না' 'এক নায়কত্ব ধ্বংস হউক' 'মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সুপারিশ বাতিল চাই' 'কনফেডারেশন চাই' 'পূর্ব্ববঙ্গের গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হইবে'।

১৩ই অক্টোবর বৈকালে আর্মানীটোলা ময়দানে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে বক্তৃতা করেন হাফিজুর

রহমান, শামসুদ্দীন আহমদ (কুষ্টিয়া), খয়রাত হোসেন, রফিক, আবদুল ওদুদ ও শামসুল হুদা। কতকগুলি প্রতিবাদমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেগুলি উত্থাপন করেন কমরুদ্দীন আহমদ। সভায় ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশের সমাবেশ ঘটে।[৫]

শুধু ঢাকাতেই নয় পূর্ব বাঙলার সর্বত্র মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপিত হয় এবং জনমত দ্রুতগতিতে সংগঠিত হতে থাকে। ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী এমনকি মুসলিম লীগ পন্থী, জমিয়ত উল ওলামাযে ইসলাম সমর্থক প্রভৃতিরা পর্যন্ত ব্যাপক-ভাবে এই সুপারিশ সমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবোধ সংগঠিত করার জন্যে এগিয়ে আসেন।[৬]

এই অবস্থায় করাচী থেকে ঢাকা ফিরে এসে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আকরাম খান মূলনীতি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে পূর্ব বাঙলার প্রতিবাদকে "মতলববাজদেব কারসাজী" হিসেবে আখ্যায়িত করে একটি সংবাদপত্র বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁর এই উষ্মার অতিরিক্ত কারণ এই ছিলো যে, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান ২৭শে অক্টোবর কমিটি রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রদেশব্যাপী একটি 'প্রতিবাদ দিবস' পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মৌলানা আকরাম খান একটি পৃথক বিবৃতিতে প্রাদেশিক সম্পাদকের 'প্রতিবাদ দিবস' এর এই আহ্বানকে বেআইনী ঘোষণা করে জনসাধারণকে তাতে অংশ গ্রহণ না করার পরামর্শ দেন। এর পর শাহ আজিজুর রহমান তাঁর দিবস পালনের আহ্বান প্রত্যাহার করে একটি বিবৃতি প্রদান করেন এবং তাতে বলেন যে, একটি জরুরী সভা আহ্বান করার জন্যে তিনি প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের প্রায় সকল সদস্যের নিকট থেকে অনুরোধ পত্র পেয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী মৌলানা আকরাম খানের উচিত শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত দানের মৌলিক অধিকার থেকে মুসলিম লীগ কাউন্সিল সদস্যদেরকে বঞ্চিত না করা। সভাপতি আকরাম খান সম্পাদকের এই বিবৃতির জবাবে কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান না করে ২৯শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের বাস ভবনে প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা আহ্বান করেন।[৭]

২৭শে অক্টোবর বৈকালে সরকার সমর্থক 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের' উদ্যোগে ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে মূলনীতি কমিটির

রিপোর্টের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটিতে ঢাকার বুদ্ধিজীবীরা যথেষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত থাকেন। আওয়ামী লীগ সম্পাদক শামসুল হক, আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ, মানিক মিয়া, মুস্তাক আহমদ প্রভৃতিও শ্রোতা হিসাবে সেখানে উপস্থিত থাকেন।[৮]

মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সুপারিশ সমূহ তৎকালে পূর্ব বাঙলার সর্বস্তরের জনগণকে কিভাবে আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ করেছিলো নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের মতো একটি প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র প্রতিষ্ঠানের এই প্রতিবাদ সভা এবং সেই সভায় সরকার বিরোধী পক্ষের এই সমস্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতি থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

মূলনীতি কমিটির সুপারিশ উদ্ভূত শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নাবলী বিবেচনার জন্যে পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের বহুসংখ্যক মুসলিম লীগ সদস্য মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা নূরুল আমীনের কাছে পরিষদের একটি জরুরী অধিবেশন আহ্বান করার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।[৯]

অবকাশের পর ৩১শে অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয় এবং ঐদিনই বেলা ১-৫০ মিনিট থেকে ৩টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মহম্মদ নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে ছাত্রদের একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দ মহম্মদ আলী, আব্দুল ওদুদ, মৌলানা নূরুল ইসলাম সহ কয়েকজন বক্তৃতা করেন এবং প্রস্তাব উত্থাপন করেন মাহবুব জামাল জাহেদী। সভায় মূলনীতি সংক্রান্ত সুপারিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠনের উদ্দেশ্যে একটি ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।[১০]

৩

জাতীয় মহা সম্মেলন

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০, মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং কর্মতৎপরতা দেখা দেয়। সারা পাকিস্তান, বিশেষতঃ পূর্ব বাঙলার ওপর একটি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে

সারা প্রদেশব্যাপী যে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুরু হয় তাকে একটা সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ রূপ দানের জন্যে ঢাকার সকল স্তরের প্রতিনিধিত্বমূলক নাগরিকদের সমন্বয়ে একটি সংগ্রাম কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে 'পাকিস্তান অবজার্ভার' অফিসে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে একটি সভা হয়। এই সভায় "ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের সংগ্রাম কমিটি"* নামে একটি সংগঠন গঠিত হয় এবং এই সংগঠনটিই মূলনীতি সুপারিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে সংগ্রাম কমিটির ভূমিকা পালন করে।[১] ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। এ ছাড়া মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সুপারিশের একটি বিকল্প শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরীর উদ্দেশ্যে 'সংবিধান কমিটি' নামে তাঁরা আরও একটি পৃথক কমিটি গঠন করেন।

১২ই অক্টোবর বেলা ১১টায় পাকিস্তান অবজার্ভার অফিসে সংগ্রাম কমিটির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে কমরুদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান খান, মহম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দীন আহমদ, রফিক, আব্দুস সালাম (পাকিস্তান অবজার্ভারের সম্পাদক), মানিক মিয়া প্রভৃতি উপস্থিত থাকেন। এই বৈঠকে তাঁরা পর দিনের অর্থাৎ ১৩ই অক্টোবর তারিখে আর্মানীটোলা ময়দানে তাঁদের দ্বারা আহূত জনসভা সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ করেন। এছাড়া ঐক্যফ্রণ্ট গঠনের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের সাথে আলোচনার সিদ্ধান্তও তাঁরা এই বৈঠকে গ্রহণ করেন।[২]

৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর তারিখে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন বিবেচনার জন্যে ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন একটি জাতীয় মহা সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেন। এই সম্মেলনে মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির পাল্টা একটি শাসনতন্ত্র পেশ করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী ১৭ই অক্টোবর থেকে ২৮শে অক্টোবর প্রতিদিনই সাখাওয়াৎ হোসেনের বাসভবনে শাসনতান্ত্রিক কমিটির বৈঠক চলতে থাকে। এই সমস্ত বৈঠকে কমরুদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান খান, তাজউদ্দীন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আব্দুস সালাম, সাখাওয়াৎ হোসেন নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। মাঝে মাঝে যাঁরা উপস্থিত থাকেন তাঁদের মধ্যে কফিলউদ্দীন চৌধুরী, জহিরুল হক, শামসুর রহমান (জনসন), আবুল কাসেম (তমদ্দুন মজলিস), মানিক

* *Committee of Action For Democratic Federation.* সংক্ষেপে *Democratic Federation.*

মিয়া, রফিক, ঠাণ্ডা মিয়া, ইদরিস, হাবিবুর রহমান, ওদুদ, মহীউদ্দীন, মীর্জা গোলাম হাফেজ, আজিজ আহমদ, শামসুজ্জোহা, এম. এ. রহিম ও এন. ইসলামের নাম উল্লেখযোগ্য।[৩]

সাখাওয়াৎ হোসেনের বাসভবনে ১লা নভেম্বর সন্ধ্যাবেলায় সংগ্রাম কমিটির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সংগ্রাম কমিটির সদস্য উপস্থিত থাকেন এবং ৪-৫ নভেম্বরের জাতীয় মহা সম্মেলনের বিভিন্ন সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। সম্মেলনের প্রিসিডিয়াম সম্পর্কে গরিষ্ঠ ভোটে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো আতাউর রহমান খান তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করায় এই বৈঠকে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত আতাউর রহমান খানের অনমনীয় মনোভাবের জন্যে প্রিসিডিয়াম সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। সিদ্ধান্ত এইভাবে বাতিল করায় বিক্ষুব্ধ হয়ে অলি আহাদ উত্তেজিত-ভাষায় প্রতিবাদ করেন এবং সংগ্রাম কমিটি থেকে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করেন।[৪]

ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন কর্তৃক প্রকাশিত শাসনতন্ত্রের মূল খসড়াটি সাধারণভাবে সংগ্রাম কমিটিতে গৃহীত হলেও তার কতকগুলি সংশোধনী মহাসম্মেলনে বিবেচনার জন্যে কমিটির কাছে দেওয়া হয় এবং ৪ঠা নভেম্বর সকালে কমরুদ্দীন আহমদ সেগুলির চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করেন।[৫]

'জনাব লিয়াকাত আলী খান নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জবাব দেবেন কি?' —এই শীর্ষক একটি ইস্তাহার জাতীয় মহাসম্মেলন উপলক্ষ্যে ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রচারিত হয়।* এবং তাতে শাসন-তান্ত্রিক প্রশ্নাবলী সহ পূর্ব বাঙলার সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে খোলাখুলিভাবে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হয়:

১। পাকিস্তানের ভিত্তি হচ্ছে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব যার মধ্যে বিভিন্ন এলাকার জন্যে স্বায়ত্বশাসিত ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের কথা আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও মূলনীতি কমিটির সুপারিশসমূহে সেই সমস্ত নীতিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে কেন?

২। আপনি কি স্বীকার করেন না যে, পূর্ব পাকিস্তান অন্য অংশটি থেকে দুই হাজার মাইল বৈদেশিক ভূখণ্ডের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার

---

* প্রচারিত মূল ইস্তাহারটি ইংরেজীতে রচিত—'*Will Janab Liaquat Ali Khan Answer The Following Questions?*'

কারণে তার স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির জন্যে সর্বক্ষেত্রে তার পরিপূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন থাকা দরকার?

৩। আদর্শ প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, জনগণই সার্বভৌমত্বের মালিক। রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক সংবিধান স্থগিত রাখার ব্যবস্থা কি আদর্শ প্রস্তাবের মূল ভিত্তিকেই নাকচ করে জনগণকে রাষ্ট্রপ্রধানের খামখেয়ালীর অধীনস্থ করে দেয় নি?

৪। সংবিধান স্থগিত রাখার ক্ষমতা যেহেতু রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের মধ্যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রবণতা সৃষ্টিরই একটি ব্যবস্থা সেজন্যে আপনি কি স্বীকার করেন না যে, তার দ্বারা জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা ভয়ঙ্করভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে?

৫। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার নিদর্শন একটি উচ্চ পরিষদ সৃষ্টি এবং আইন সভার দুই পরিষদকেই সমান ক্ষমতা প্রদানের অর্থ কি? সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করা এবং সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আইন প্রণয়নকে বাধা দেওয়াই কি তার উদ্দেশ্য নয়?

৬। বাংলা ভাষার দাবীকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে উর্দুকে এক-মাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ কি জনসংখ্যার শতকরা বাষট্টি ভাগের দাবীকে স্বেচ্ছাচারী ও বেপরোয়া ভাবে লঙ্ঘন করা নয়?

৭। প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাকে প্রাদেশিক পরিষদের কাছে দায়ী না করে তাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের কাছে দায়ী করার ব্যবস্থা কি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক নয়?

৮। আপনি কি স্বীকার করেন না যে, বিনা বিচারে আটক ব্যক্তি-দের হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার স্থগিত রাখার ব্যবস্থা গণতন্ত্রের যে কোন ধারণার সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যহীন?

৯। আপনি কি স্বীকার করেন না যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র কর্তৃক দখল জনগণের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে, অপরাপর ক্ষেত্র ছাড়াও, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মারাত্মক ফলাফল সৃষ্টি করেছে? (১) (ক) পাটের আয় অস্বাভাবিকভাবে কমে গেছে—১৯৪৮ সালে ১১৪ কোটি, ১৯৪৯ সালে ৭৫ কোটি এবং ১৯৫০ সালে মাত্র ৩৫ কোটি?

(খ) উৎপাদকদের প্রাপ্য পাটের মূল্য কমে গেছে, নির্দিষ্ট নিম্নতম মূল্য থেকে অনেক কম—পূর্ব বাঙলায় মনপ্রতি যেখানে ১২ টাকা সেখানে সীমান্তের অপর পারে তা বিক্রী হচ্ছে মনপ্রতি ৫৫ টাকায়।

(গ) জুট বোর্ড কি উৎপাদকদের পরিবর্ত্তে ইস্পাহানী ও হারুণদের স্বার্থই রক্ষণাবেক্ষণ করে না?

(২) সুপারীর মূল্য মনপ্রতি ৭৫ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১০ টাকায় দাঁড়িয়েছে যেখানে ভারতীয় ইউনিয়নে তা বিক্রী হচ্ছে ৯০ টাকা দরে।

(৩) কেন্দ্র কর্ত্তৃক সর্বপ্রকার রাজস্ব নিজের হাতে নিয়ে নেওয়ার ফলে প্রাদেশিক সরকার ব্যয় বহনে অক্ষম হওয়ায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে ধ্বসে পড়েছে।

(৪) সরকারের ভ্রান্ত আমদানী রপ্তানী নীতির ফলে গেঞ্জী, চিরুণী, শাঁখা ও বোতাম তৈরীর এবং পেতল ও কাঁসার একদা-বর্ধিষ্ণু কুটীর শিল্পসমূহের উন্নতি হচ্ছে না।

(৫) চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নকে অবহেলা করে পূর্ব বাঙলাকে ভারতীয় ইউনিয়নের উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছে এবং তার ফলে জনগণের শিল্প ও বাণিজ্যিক জীবন গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি
ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন

৪ঠা নভেম্বর বিকেল ৫টায় ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে জাতীয় মহাসম্মেলন শুরু হয়। প্রায় চারশত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন।[৬] বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান করলেও তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ঢাকায় বসবাসকারী।[৭] রাত্রি ৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত অধিবেশন চলে এবং মূলনীতির খসড়ার দ্বিতীয় পর্ব্ব এই অধিবেশনেই শুরু হয়।[৮]

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি আতাউর রহমান খান এক দীর্ঘ লিখিত ভাষণ প্রদান করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটিতে তিনি পূর্ব বাঙলার তৎকালীন পরিস্থিতিতে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নসমূহের ওপর সম্মেলনের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন:

সংবিধান পরিষদের মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সাব-কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার এবং পরিষদ কর্ত্তৃক মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সুপারিশ গৃহীত হওয়ার পর সারা দেশব্যাপী তা যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও সার্বজনীন বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে আপনারা অবগত।

আছেন। অগণতান্ত্রিক ও অনৈসলামিক এবং শাসকচক্র কর্তৃক স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করে জনগণকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করার সহায়ক হিসেবে সর্বস্তরের জনগণ একবাক্যে এই নীতিগুলির নিন্দা করেছেন। জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়াকে দাবিয়ে রেখে ওপরতলার অল্প কয়েকজনের স্বার্থে স্বৈরাচারী শাসনকে কায়েম রাখার এই নীতিসমূহকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিলো সেই জনগণের আত্মত্যাগের দ্বারা যাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্যে লড়াই করেছিলেন। সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্নের দ্বারাই তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্যেই তাঁরা দেখেছিলেন তাঁদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন এবং তাঁদের আশা আকাংখার পূর্ণতা। জাতির পিতা—যাঁর অতুলনীয় নেতৃত্বে দশ কোটি মুসলমান স্বাধীনতাব লড়াইয়ে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো-তিনি এই উৎপীড়িত জনগণের এমন একটি আবাসভূমির স্বপ্ন দেখে-ছিলেন যেখানে তারা জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় সব কিছু পেয়ে মানুষের মতো জীবন যাপন করবে।

কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বল্পকালের মধ্যেই সমস্ত প্রেরণা ধোঁয়ার মতো উড়ে যেতে লাগলো। সমস্ত উচচ আশা ও আকাংখা ছিন্ন ভিন্ন হতে শুরু করলো এবং জনগণ হতবুদ্ধি হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলেন কায়েদে আজমের স্বপ্নের পরিণতি কি দাঁড়ালো। মহান নেতা তাঁর জনগণের জন্যে এই পাকিস্তান নিশ্চয়ই চান নি। কিন্তু নেতা আর নেই এবং জনগণের ক্রন্দন এখন কে শুনবে?

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী ক্রমাগতভাবে করা হচ্ছে। যে সমস্ত 'ল্যাম্পপোষ্ট' দেরকে* পাকিস্তান প্রশ্নের ওপর নির্বাচনের মাধ্যমে পরিষদে পাঠানো হয়েছিলো তারা আর জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। বিভিন্ন

* ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিলো পাকিস্তান প্রশ্নের ওপর গণভোট। প্রার্থীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার না করে এমনকি মোসলেম লীগ 'ল্যাম্পপোষ্ট' কে মনোনীত করলেও তাদেরকে ভোট দানের জন্যে মুসলিম লীগ সভাপতি মহম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি নির্বাচনের সময় আহ্বান জানান।—অ. টি.

পরিষদের সদস্য থাকার অধিকার তাদের বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। পাকিস্তানকে একটি সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন ছিলো নোতুন একদল সৎ ও স্বাধীন, মুক্ত ও সচেতন ব্যক্তি। কিন্তু তা হলো না। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সম্ভব নিজেদের হাতে ক্ষমতা রাখার জন্যে সরকার জনগণের দাবীর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করে সেগুলিকে রাষ্ট্রবিরোধী বলে আখ্যায়িত করলো। সেই পুরাতন, অথর্ব ও অযোগ্য 'ল্যাম্পপোষ্টরাই' এখনো পর্যন্ত বহাল রয়েছে।

স্বাধীনতার পরই যে সংবিধান পরিষদ নির্বাচিত হয়েছিলো সেটা ছিলো একটা জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থা। এর কোন আইনগত অথবা প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র ছিলো না এবং যদিও মূলতঃ তা পাকিস্তানের জন্যে একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিলো তবু দীর্ঘ তিন বৎসরে এরা সে বিষয়ে কিছুই করে নি এবং সুবিধামতোভাবে সংশোধিত হয়ে ১৯৩৫ সালের সেই পুরাতন ভারত শাসন আইনই এখনো পর্যন্ত পাকিস্তানের সংবিধান হিসেবে চালু রয়েছে।

আমাদের এই তিন বৎসরের স্বাধীন জীবনে দেশ যে ভাবে উন্নতি করা উচিত ছিলো সেভাবে করে নি। যাঁরা উজ্জ্বল দিন এবং সূর্যালোকের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরা সম্পূর্ণভাবে মোহমুক্ত হয়েছেন। অনাহার ও মৃত্যুর মুখেও আশাবাদের যে গভীর চেতনা মানুষকে সজীব রেখেছিলো তার স্থান দখল করছে ভবিষ্যতের একটা হতাশাগ্রস্থ চিত্র এবং আশাভঙ্গের চেতনা। দেশের সব থেকে জরুরী ও গুরুতর সমস্যাসমূহ শুধু যে সমাধান হয়নি তাই নয়, উপরন্তু সেগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আরও প্রকট ও নিয়মিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের শিশুত্বের নামে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা এখনো পর্যন্ত যথাযথভাবে নেওয়া হয় নি যদিও বিপুল পরিমাণ জনগণের অর্থ প্রতিমাসে বিদেশে আনন্দ ভ্রমণের জন্যে ব্যয় হচ্ছে এবং তা দেশের কোন উপকারে আসছে না। আমাদের অশিক্ষিত জনগণের শিক্ষার জন্যে কোন অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না এবং শাসকদের অবহেলার কারণে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ধ্বসে পড়ছে। জনগণের সংহতির নামে একটি একদলীয় একনায়কত্বমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নিরাপত্তা আইন ও নিবর্তনমূলক অর্ডিন্যান্সসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তি স্বাধী-

নতা—যা প্রতিটি নাগরিকের একটি অত্যন্ত সম্মানজনক ও মূল্যবান অধিকার—তাকে সব রকম নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার দ্বারা শেষ করে দেওয়া হয়েছে। সাংবিধানিক ও আইনসঙ্গত বিরোধিতা সহ্য করা হচ্ছে না এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী অথবা অন্য কোন গণতন্ত্রই যে বিকাশ লাভ করতে পারবে না সেটাই স্বাভাবিক। রাষ্ট্র, সরকার ও ক্ষমতাসীন দলকে একাকার করে দেওয়া হয়েছে এবং কোন একজন মন্ত্রীর কোন বিশেষ কোন কাজের বিরুদ্ধে কিছু বললেই তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার জন্যে ক্ষতিকর। এবং এসব কিছুই রাষ্ট্রের নামে করা হলেও আসলে তা করা হচ্ছে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্যে।

অন্ততঃ একটি বিষয়ে আমাদের করাচীস্থিত শাসনকর্তারা অন্য সব কিছুর থেকে বেশী উদ্বেগ এবং উৎসাহ দেখিয়েছেন। ১৯৩৫ সালের আইনে প্রদেশের হাতে যেটুকু ক্ষমতা ছিলো তার সমস্তটাই কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্বের প্রধান প্রধান উৎসগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং এমনকি দৈনন্দিন প্রশাসনের সমস্ত ব্যাপারেই সরকারের হস্তক্ষেপের তাগিদ এত বেশী যে তার ফলে অনেক সময় এ সব ব্যাপারে কেন্দ্রের অনিচ্ছুক এজেণ্ট হিসেবে কাজ করা ব্যতীত প্রাদেশিক সরকারের আর কিছুই থাকে না। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রধান অবলম্বন পাটের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নিজের হাতে নিয়েছে এবং আমাদের কোটি কোটি বুভুক্ষু জনগণের জীবনে পাট নীতি কি পরিণাম ডেকে এনেছে সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চয়ই বেদনাদায়কভাবে সচেতন আছেন। আমাদের মেহনতী কৃষকেরা, যারা উৎপাদন করছে, তারা তাদের প্রাপ্য অংশ পাচ্ছে না, অথচ যাদের স্বার্থে উৎপাদনকারী এলাকার থেকে সমগ্র শিল্পটিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তারা উৎপাদকদেরকে বঞ্চিত করে যথেচ্ছভাবে স্ফীত হচ্ছে এবং উৎপাদকরা ইতিমধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে ধ্বংসের কিনারায়। আমাদের কোটি কোটি জনগণের ক্রন্দন ও বিলাপ অরণ্যে রোদনের মতো হয়েছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনকে ভালভাবে খর্ব করা হয়েছে এবং আমাদের জনগণের সমস্ত ন্যায্য দাবী দাওয়াকে প্রাদেশিকতার ধুঁয়ো তুলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে একটি সত্যিকার এক-

নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সর্বপ্রকার বিরোধী শক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করে বিরোধিতার কণ্ঠকে কার্যকরভাবে রোধ করা হয়েছে। এই মানসিক পরিবেশে জনগণের আশা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হলেও তা একেবারে শেষ হয়ে যায় নাই। আমরা মনে করেছিলাম যে, শাসকদের নেতৃত্ব একদিন ভেঙে যাবে কারণ জনমতের চাপে তা হতে বাধ্য এবং সব থেকে নিকৃষ্ট ডিক্টেটরকেও একসময়ে উপলব্ধি করতে হবে যে, সংবিধানহীন সরকার যে কোন দেশেই জনগণের সাথে প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়। আমরা মনে করেছিলাম যে পাকিস্তানের সংবিধান যখন প্রণীত হবে তখন সেই সাথে জনগণের মধ্যে আস্থার অভাবও দূরীভূত হবে এবং তা আবার এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতেব প্রতি বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করবে। সংবিধান প্রণীত হতে বিলম্ব হচ্ছে কেন, এই প্রশ্নের জবাবে আমাদের প্রধান-মন্ত্রী রূঢ়ভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে, এ বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয় এবং সংবিধান যখন দিনের আলোক দেখবে তখন দুনিয়ার মানুষ তার বৈশিষ্ট এবং নোতুনত্ব দেখে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হবে। আমরা খুব স্পষ্টভাবেই স্বীকার করবো যে তা আমাদেরকে সত্যি-সত্যিই স্তম্ভিত করেছে এবং সেই সাথে তা জনগণকে রূঢ়ভাবে আঘাত করে তাদের সুপ্তি ভঙ্গ করছে।"

এই প্রারম্ভিক মন্তব্যের পর সভাপতি আতাউর রহমান খান মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির রিপোর্টের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলির সমালোচনা করেন এবং সেই প্রসঙ্গে অন্যান্য দেশের সংবিধান ও সাংবিধানিক সমস্যাসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করে উপরোক্ত কমিটির সুপারিশ সমূহকে সম্পূর্ণভাবে গণবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর ভাষণের শেষ দিকে মূলনীতি কমি-টির সুপারিশ সম্পর্কে তাঁদের চূড়ান্ত মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন,

সংবিধান পরিষদ কর্তৃক প্রণীত মূলনীতি[৩] এবং সংবিধান পরিষদ কর্তৃক গৃহীত 'মৌলিক অধিকার' কোন রকম সংশোধিত আকারেও একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা বাতিল করতে হবে। আগামী অধিবেশনে মূলনীতি ও মৌলিক অধিকারের ওপর এই মহা সম্মেলনের সুপারিশসমূহ যদি সংবিধান পরিষদ কার্যকর করতে ব্যর্থ হয় তাহলে এই সুপারিশসমূহ কার্যকর করার জন্যে কি ধরনের কর্মকৌশল গ্রহণ করা দরকার হবে সেটা আপনাদেরকে বিবেচনা করতে হবে।

পরদিন সকাল ৯-৪৫ মিনিটে সম্মেলন আবার শুরু হয় এবং ১০টায় ফজলুল হক বক্তৃতা করেন। পাকিস্তান সংবিধান সভায় তাঁর নিজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার জবাব দানের চেষ্টা করেন। বেলা ২-৩০ মিনিট পর্যন্ত সম্মেলনের কাজ চলার পর বিকেল ৪টা পর্যন্ত তা মুলতুবী রাখা হয়। বিকেলে অধিবেশন শুরু হওয়ার পর রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তা স্থায়ী হয় এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাঠ সমাপ্ত হয়ে খসড়া মূলনীতি কিছুটা পরিবর্ত্তনেব পর চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।[৯]

৫ই নভেম্বরের এই শেষোক্ত অধিবেশনে 'গণ আজাদী লীগের' সাথে যুক্ত প্রতিনিধিদের সাথে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের মত-বিরোধ এবং খোলাখুলি বিরোধিতা ঘটে। রাত্রি ৮-৩০ মিনিটের দিকে তৃতীয় পাঠ শেষ হওয়ার পর সাংগঠনিক বিষয় আলোচনা শুরু হয় এবং পুরাতন সংগ্রাম কমিটি ভেঙে দিয়ে একটি নোতুন সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।[১০] কমরুদ্দীন আহমদ এই সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হওয়ার পরই এই বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করে।[১১] আওয়ামী মুসলিম লীগের শামসুল হক, আতাউর রহমান খান, মানিক মিয়া, রফিক প্রভৃতি এই নির্বাচনকে মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে সদলবলে বার লাইব্রেরী হল পরিত্যাগ করে চলে যান।[১২]

৪

জাতীয় মহা সম্মেলনে গৃহীত শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব

৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর, ১৯৫০, তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে 'গণতান্ত্রিক ফেডারেশন' এর কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকার মুখবন্ধে সম্মেলনের সুপারিশ-সমূহের ভিত্তি সম্পর্কে বলা হয়:

> ১৯৪৬ সনে অল ইণ্ডিয়া মুস্লিম লীগের কনভেনশনে যখন ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা গেল যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলেও আসাম প্রদেশ পাকিস্তানের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে না এবং বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে তখন কায়েদে

আজম মহম্মদ আলী জিন্নাহর অনুরোধে "স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের" (independant states) স্থলে "একটি রাষ্ট্র" (a state) এই সংশোধনটি সন্নিবেশিত হইল। যদিও নিখিল ভারত মুশ্লিম লীগের সাধারণ বার্ষিক সভা ছাড়া ইহার সংশোধন করিবার অধিকার সেই কনভেনশনের ছিল না কিন্তু যেহেতু পরবর্ত্তী অধিবেশনে ইহার বিরোধিতা করা হয় নাই সেই হেতু আমরা ইহাকে "লাহোর প্রস্তাবের" সংশোধন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও লাহোর প্রস্তাবের অন্য কোন সংশোধন করা হয় নাই। সুতরাং গণপরিষদের মুসলিম লীগের সদস্যদের সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার কোন আইনগত অধিকার নাই। ঢাকায় জাতীয় মহাসম্মেলন সেই কারণে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের মূলনীতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।[১]

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে জাতীয় মহাসম্মেলনে তাঁদের সুপাবিশগুলি প্রণয়ন করার কথা ওপরে বলা হলেও এই সুপারিশগুলি সাম্প্রদায়িক প্রভাবমুক্ত ছিলো। তবে সুপারিশগুলির সূচনায় (preamble) সার্বভৌমত্ব স্থষ্টিকর্ত্তা আল্লাহতায়ালার ওপর অর্পণ করার মধ্যে অবশ্য ধর্মীয় প্রভাব খুব সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায়।

জাতীয় মহাসম্মেলন যে শাসনতান্ত্রিক সুপারিশসমূহ পেশ করেন সেগুলি হলো নিম্নরূপ।

রাষ্ট্রের নাম : রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের দুটি অংশ থাকবে—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান।[২]

রাষ্ট্র প্রধান : পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন। তিনি কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। দেশদ্রোহিতা এবং অসদাচরণের জন্যে রাষ্ট্র প্রধানকে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে অপসারণ করা যাবে। রাষ্ট্র প্রধানের আকস্মিক মৃত্যু বা অপসারণের পর নোতুন রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পার্লামেণ্টের স্পীকার রাষ্ট্রপ্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হবেন। নোতুন রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন রাষ্ট্রপ্রধানের পদ শূন্য হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা ও দায়িত্ব হবে : (ক) তিনি ক্ষমা প্রদান করবেন (খ) তিনি হবেন পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (গ) তিনি নির্বাচন কমিশনার, সুপ্রীম কোর্টের জজ এবং

গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পরিষদ
কর্তৃক প্রকাশিত।

৪ঠা এবং ৫ই নভেম্বর তারিখে ঢাকায় জাতীয়
মহাসম্মেলনে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ
গঠন-তন্ত্র রচনার মূলনীতি ও
মৌলিক অধিকারের
প্রস্তাবাবলী—

O ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে
পাক গঠন-তন্ত্র চাই

O "মূলনীতি" ও "মৌলিক অধিকার"
কমিটীর সোপারেশ বাতিল কর

O ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনের
সোপারিশ মানিয়া লও

মূল্য ।০

গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত
৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর তারিখে ঢাকায় জাতীয় মহা সম্মেলনের
সুপারিশ সমূহ। পৃষ্ঠা ৪০০—৪০৩

১৩৩৩ বাংলা ১২৯ [illegible] আমরা এসেছ ২২। আমরা [illegible] [illegible] [illegible]
যাইবার খবর পাইয়া সংগে সংগেই আমি, রবিদাস, কাশেরন, উমেশ্বর চারি জন মহন
পুরের দিকে রওয়ানা হই। পং কৃষ্ণনগর গিয়া আমি অসুস্থ হইয়া নিজেদের কাছে থাকিতে [illegible]
মাওয়ার কারণ নাই। আমরা ফিরে যাই। কিন্তু রবিদাস আমাকে এখানে রাখিয়া [illegible]
অন্য উমেশ্বর, জালিজনকে নিয়া মহন পুরের দিকে রওয়ানা হয়। তখন আমি নিজে
গিয়ে যাই, এবং মহন পুর গিয়া পৌঁছেই দেখিতে পাই প্রাণধর মাস্টার [illegible] [illegible]
[illegible], বক্রিশ সাধু, [illegible] [illegible] ও আরও নাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহারা
আমাদিগকে বাজিজ [illegible] বসুন, আমরা প্রাণধর সমস্ত খোঁজ নিয়া আসি যাতে
জুটে গেল। তখন আমাদের ঐ প্রাণধর কর্মী উইহারা বাজিত প্রাণধর [illegible]
জানায় কারণ প্রাণধর মরণ দিগকে পাওয়া যাইতেছে না। দুই তিন বার বলার পর
আমি ও রবি দাস [illegible] [illegible] [illegible] যাই ও দেখিতে পাই [illegible] [illegible] দেখিতে পাইয়া
আমারা দুই জন মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলাম যাইবার পাশে [illegible] আক্রমণ করিব।
তখন এই সিদ্ধান্ত নিয়া চলে আসি মহন পুর আসার পর আবার আমাদের [illegible]
বাজিত প্রাণধর মরণ দিগকে পাওয়া যাইতেছে না। তখন আমরা দুই জন [illegible] [illegible] করিলেছি
আমি [illegible] [illegible] আমরা এখান থেকে চলে যাই। রবিদাস বলে এই পুলিশেরা আমাদিগকে
আক্রমণ করিবেনা আমি তখন বলি আমাদের মরণ এসেছে এই বলিয়া দুই জনে [illegible]
আরম্ভ হয় এই দুখের মাইঝাতে আমি বলিলাম যে অন্তত আমাদের দুই জন কর্মী আছে তাহারা
তাহার কথা সমর্থন করে এই বলিয়া [illegible] উপর আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] উপর
[illegible] তখন তাহারা আমার কথা সমর্থন করে ও [illegible] আমাকে [illegible] দিল। যখন
আমার [illegible] [illegible] তাহারা বাধ দেয় তখনই আমি বলিলাম যাও এখন [illegible] [illegible]
[illegible] মায়না [illegible] এখানে থেকে সরে যাও না [illegible] আমাদিগকে [illegible] — ও আমরা রওয়ানা
হই [illegible] [illegible] [illegible] মনীন্দ্রনাথের বাড়ী আমাদের জন্য খাদ্য করিয়াছে বলিল
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] যদি এখানে [illegible] [illegible] আমার

আশ্র। এবং তুমি আমার সন্তানের ন্যায় উদ্দেশ্যে জীবন [illegible] দিয়া ছাড়া নাহ —।
আমি তখন বলি আমরা দুইজন ও ছাড়া নাই। তখন রবিদাস বলে তুমি আমার
আমাদের উপর না আসিও যে ভাব নিজের রক্ষা করে না কিন্তু আমি বলিলাম যে ফাঁসী
দিয়া হইতে তুমি আসিয়াছ এক দিন খুব সাধ আমরা ঐ দিন দিয়া পলায়ন করি
কিন্তু আমার কথায় রাজী না হইয়া রবিদাস বলে যে ঐ সময়ে দিনের বেলায় হইবে
এই কথা বলিয়া আমরা সকলে পারিয়া নাই। রাত্র হৈতে অন্যদিগের ফাঁসিতে যাই
[illegible] [illegible] — [illegible] রাত্রে। রবিদাস [illegible] দাও কে। কাটিয়া সাড়ি বাহ — [illegible] — আরো।
উঠিবার বলি [illegible] আমি একটা বাঁশের কাটিয়া দিই আর রবিদাসের
[illegible] নাই — T [illegible] [illegible] [illegible] — পরে — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রক্ত মাখা হইল। এবং সাতরাত পার আমাদের
[illegible] — ৩০। ৩৫ জন লোকের [illegible] দিয়া আর দিয়া আমাদের সাথিতে আর
নিরাশ্রয় হইয়া বহু [illegible] [illegible] সময় আমাদের আক্রমণ হয়। আমি এবং
না পারিয়া আমি বলি আমাদের এই [illegible] T [illegible] আমাদের [illegible] হয় — ও আমাদের
সাথীদের অবস্থান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমি সাথে — কোন বাড়ীতে থাকিয়া
আমাদের [illegible] অবস্থায় [illegible] [illegible] উপনিবেশ [illegible] [illegible] — বাড়ী — তখন আমাদের
(তেমন [illegible] [illegible] আমি ও বলি আমাদের জল [illegible] — তখন আবার
বাড়ী যে [illegible] [illegible] নাই — এই — কথা বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
আমাদের [illegible] না হয় — [illegible] [illegible]। আর — এই — সময়ে [illegible] [illegible]
এখানে যে [illegible] হয়। [illegible]

২১শে ফেব্রুয়ারী

বাংলা ভাষার দাবীতে সাধারণ ধর্ম্মঘট।

- স্কুলে, কলেজে, বাজারে সাধারণ ধর্ম্মঘট পালন করুন।
- দলে দলে শোভাযাত্রায় যোগদান করুন।
- বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা এবং পূর্ব্ব বাংলার সরকারী ভাষা করণের দাবীতে পূর্ব্ব বাংলার সর্বত্র এক সঙ্ঘবদ্ধ এবং জাগ্রত আন্দোলন গড়ে তুলুন।
- আরবী হরফে বাংলা লেখার উদ্ভট সরকারী পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করুন।
- সংস্কার এবং ঐক্যিকতার নামে বাংলা ভাষাকে হত্যা করবার প্রচেষ্টাকে যুক্ত আন্দোলন দ্বারা ব্যর্থ করুন।
- বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে সাড়া দেন।

বন্ধুগণ!

পাকিস্তান অর্জনের পর আমরা আশা করেছিলাম মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দ আমাদের জন্য গড়ে তুলবেন এক সুখী, স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান হবে এমন এক আদর্শ রাষ্ট্র যেখানে থাকবে না স্বৈরাচারী শাসন মনোবৃত্তি, থাকবেনা দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতি।

কিন্তু আমাদের কল্পনা আজ পর্য্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত হলো না। আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ভুলে জন স্বার্থ বিরোধী কাজই আমাদের নেতৃবৃন্দ করে চলেছেন গঠনমূলক কাজ ছেড়ে দিয়ে গদি অর্জনের অগ্রিবান হিসেবে আজ মুসলীম লীগ মজলুম জন সমাজকে এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছেন। পূর্ণ নাগরীক হতে আজ আমরা বঞ্চিত, অশিক্ষা, দুর্ভিক্ষ দুর্নীতি আজ আমাদের জীবন যাত্রাকে প্রপীড়িত করে দিয়ে উর্দ্দুকে মাতৃভাষা বাংলাকে কবর দিয়ে উর্দ্দুকে আমাদের ঘাড়ে চাপানোর এক ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলেছে।

১৯৪৮ সালের গণ আন্দোলনের চাপে খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন যে তিনি বাংলা ভাষার ন্যায় সঙ্গত দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করবেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি পাকিস্তানের উজিরে আজম বাংলা ভাষা অস্বীকার করে এবং পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির খেলাপ করে সদম্ভে ঘোষণা করেছেন উর্দ্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে।

তাই জন সাধারণের কাছে আমাদের আবেদন উজিরে আজমের এই দম্ভোক্তির উচিত জবাব দেবার জন্য এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবীতে আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই আন্দোলনকে সাফল্য মণ্ডিত করুন।

পূর্ব্ব বাংলা সরকার ভাষা আন্দোলনে অন্যতম দরদী পত্রিকা "পাকিস্তান অবজার্ভার" এবং প্রকাশ অন্যায় ভাবে বন্ধ করে দিয়ে এবং সম্পাদককে গ্রেপ্তার করে ভাষা আন্দোলনকে ব্যর্থ করবার ষড়যন্ত্র করেছেন। এ ছাড়া বহু দেশ প্রেমিক যুবককে বিনা বিচারে কারাগারে আটক রেখেছে। এই সব অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন। ২১ ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্ম্মঘট পালন করুন।

"পাকিস্তান জিন্দাবাদ"

ভাষা আন্দোলন কমিটি।

অডিটার জেনারেল নিয়োগ করবেন (ঘ) পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন এমন একজনকে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো অন্যান্য মন্ত্রীরাও তাঁর দ্বারা নিযুক্ত হবেন। তিনি বিদেশী দূতদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করবেন এবং সকল আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করবেন।[৩]

কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট : পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেণ্টের একটি মাত্র পরিষদ থাকবে। পার্লামেণ্টের অধিবেশন পর্যায়ক্রমে একবার কেন্দ্রীয় রাজধানী এবং তারপর পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক অঞ্চল থেকে একই সংখ্যক লোকের ভোটে সার্বজনীন ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে পার্লামেণ্টের সদস্যেরা নির্বাচিত হবেন। প্রত্যেক এলাকার ভোটদাতারা তাঁদের প্রতিনিধিকে ইচ্ছে করলে পার্লামেণ্ট থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। পার্লামেণ্ট থেকে সকল অর্থ বিল রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে প্রেরিত হওয়ার তিন দিনের মধ্যে তাঁকে স্বাক্ষর দান করতে হবে। অন্যান্য বিলে তাঁকে স্বাক্ষর দান করতে হবে তিরিশ দিনের মধ্যে। নির্বাচন কমিশন, সুপ্রীম কোর্টের জজ ও পাকিস্তানের অডিটার জেনারেলকে দেশদ্রোহিতা ও অসদাচরণের জন্যে পার্লামেণ্ট দুই তৃতীয়াংশ ভোটে অপসারণ করতে পারবেন। পার্লামেণ্টের সদস্যেরা সরকারের অধীনে কোন লাভবান পদে বহাল হতে পারবেন না। কোন কোন জরুরী জাতীয় প্রশ্নে জনগণের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান পার্লামেণ্ট ভেঙে দিতে পারবেন। কোন ব্যক্তি বা দলই পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রীত্ব গঠন করতে পারছেন না এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার থাকবে পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়ার। এর ৪৫ দিনের মধ্যে নোতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।[৪]

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা : মন্ত্রী পরিষদের সদস্যেরা একক এবং যৌথভাবে পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী থাকবেন। পাকিস্তানের যে কোন নাগরিক পার্লামেণ্টের সদস্য থাকলে তিনি মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন। সদস্য নন এমন কোন নাগরিক যদি মন্ত্রী হন তাহলে মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব নেওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই তাঁকে পার্লামেণ্টের সদস্যরূপে নির্বাচিত হতে হবে।[৫]

সুপ্রীম কোর্ট : পাকিস্তানের একটি সুপ্রীম কোর্ট থাকবে এবং

তার সেশন পর্যায়ক্রমে কেন্দ্রীয় রাজধানী এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে।[৬]

রাষ্ট্রভাষা: পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা এবং উর্দু।[৭]

কেন্দ্রের আওতাভুক্ত বিষয়: দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকবে। দেশরক্ষা বাহিনীর দুটি ইউনিট থাকতে হবে যার একটি থাকবে পূর্ব এবং অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তানে। এই ইউনিটগুলি আঞ্চলিক অধিনায়কদের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং কেন্দ্রীয় রাজধানীতে অবস্থিত সর্বাধিনায়কের অধীনস্থ থাকবে। প্রত্যেক অঞ্চলের দেশরক্ষা বাহিনী সেই অঞ্চলের লোক দিয়েই গঠিত হতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে একটি আঞ্চলিক বৈদেশিক মন্ত্রনালয় থাকতে হবে। অন্যান্য সকল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে প্রদেশের হাতে।

কেন্দ্র কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের ওপর কর ধার্য করতে পারবে কিন্তু প্রদেশের অনুমতি ব্যতীত কেন্দ্র তা করতে পারবে না।[৮]

সংবিধানের সংশোধন: কেন্দ্রীয় সরকারেব সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সংক্রান্ত সংবিধানের যে কোন অংশ কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংশোধিত হতে পারবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যে কোন একটি বা প্রত্যেকটি আঞ্চলিক সরকারের সম্পর্ক সম্পর্কিত কোন অংশ প্রথমে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পার্লামেণ্টের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হয়ে তার পর কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হতে হবে। অন্য যে কোন সংশোধন হবে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পার্লামেণ্টের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে।[৯]

সংবিধান স্থগিত রাখার ক্ষমতা: কোন অবস্থাতেই সংবিধান স্থগিত রাখার ক্ষমতা কারো থাকবে না।[১০]

আঞ্চলিক সরকার: পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে দুটি পৃথক আঞ্চলিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সরকারের একজন আঞ্চলিক প্রধান থাকবেন এবং তিনি আঞ্চলিক পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা অথবা অসদাচরণের জন্যে তাঁকে অপসারণ করার জন্যে আঞ্চলিক পার্লামেণ্টের দুই তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হবে। যে কোন কারণে আঞ্চলিক প্রধান অপসারিত হলে তাঁর স্থলে আঞ্চলিক পার্লামেণ্টের স্পীকার সাময়িকভাবে আঞ্চলিক প্রধানের

দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এর নব্বই দিনের মধ্যে আঞ্চলিক পার্লামেণ্টকে নোতুন একজন আঞ্চলিক প্রধান নির্বাচিত করতে হবে। আঞ্চলিক পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন একজনকে আঞ্চলিক প্রধান আঞ্চলিক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করবেন। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্য মন্ত্রীরা তাঁর দ্বারা নিযুক্ত হবেন।

আঞ্চলিক পার্লামেণ্টের একটি মাত্র পরিষদ থাকবে এবং সেই পরিষদের সদস্যেরা সার্বজনীন ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে ৫ বৎসরের জন্যে নির্বাচিত হবেন। ৫ বৎসরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোন গুরুতর কারণে প্রয়োজন হলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী আঞ্চলিক প্রধান আঞ্চলিক পার্লামেণ্ট ভেঙে দিতে পারবেন। তবে এই ভাবে পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়ার ষাট দিনের মধ্যে আঞ্চলিক প্রধানকে নোতুন নির্বাচনের অনুষ্ঠান করতে হবে। মন্ত্রী পরিষদের সদস্যেরা একক ও যৌথভাবে আঞ্চলিক পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী থাকবেন।[১১]

পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের কতকগুলি বিশেষত্বের জন্যে সেখানে আঞ্চলিক সরকারের বাস্তব রূপ কি হবে তা নির্দ্ধারণের জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের একটি কনভেনশন আহ্বানের প্রস্তাব জাতীয় মহাসম্মেলনে করা হয়।[১২]

জাতীয় মহা সম্মেলনে গৃহীত মূলনীতি প্রস্তাবসমূহের সর্বশেষে নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কিত একটি প্রস্তাবে নিম্নলিখিত অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়:

ক. (১) আইনের চোখে সকল নাগরিকই সমান।

(২) আদালতে বিচার না করে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা চলবে না।

(৩) অপ্রকৃতিস্থ নয় এমন যে কোন নাগরিক ১৮ বৎসর বয়স হলে ভোট দানের ক্ষমতা লাভ করবে এবং ২১ বৎসর বয়স হলে পার্লামেণ্টের সদস্য হওয়ার জন্যে নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবে।

(৪) হেবিয়াস কর্পাস অধিকার রদ করার কোন ব্যবস্থা থাকবে না।

খ. প্রত্যেক নাগরিকের নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ থাকবে:

(১) জীবন

(২) শিক্ষা—একটা পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা

(৩) কাজ ও জীবিকা

(৪) চিকিৎসার সাহায্য
(৫) আশ্রয়
(৬) জীবিকার মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মজুরী
(৭) ট্রেড ইউনিয়ন ও ট্রেড সেক্রেটারিয়েট গঠন এবং যৌথ দর কষাকষির জন্যে ধর্মঘট

গ. রাষ্ট্র নিম্নলিখিত বিষয়ে নাগরিকদেরকে নিশ্চিত করবে:
(১) বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, চলাচলের স্বাধীনতা চিন্তা, কর্ম, সমিতি গঠন, ভাবপ্রকাশ, প্রার্থনা ও বিবেকের স্বাধীনত সহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমূহ।
(২) মর্যাদা ও সুযোগের সমানাধিকার
(৩) ব্যক্তির মর্যাদা
(৪) বার্দ্ধক্যের সংস্থান
(৫) মাতৃত্বের সুযোগ সুবিধা
(৬) উৎপাদনের শক্তিসমূহের সামাজিকরণ
(৭) কোন আইন পরিষদই এমন কোন আইন করতে পারবে ন যার দ্বারা শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষকে শোষণের সুবিধা হয়।[১১]

৫

১২ই নভেম্বরের বিক্ষোভ

গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে ১২ই নভেম্বর সভা সমিতি ও মিছিলের মাধ্যমে সারা পূর্ব বাঙলা ব্যাপী বিক্ষোভের জন্যে জনসাধারণ ও ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা ঐ দিন আর্মানীটোলা ময়দানে একটি জনসভার আয়োজন করেন।

আফতাবউদ্দীন খান এডভোকেটের সভাপতিত্বে বিকেল ৫টায় আর্মানী-টোলার সভা শুরু হয়। সভায় মৌলানা আব্দুল জব্বার, এম. এ. রহিম, আলি আহমদ খান, খয়রাত হোসেন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সভায় প্রায় পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত থাকেন এবং তা ঘণ্টাখানেক স্থায়ী হয়।[১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে ১২ই এপ্রিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল স্কুল, ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, আলীয়া মাদ্রাসা এবং বিভিন্ন স্কুল সমূহের ছাত্রেরা মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও ধর্মঘট করেন এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা মিছিল সহকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন। একটি মিছিল যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রবেশ করছিলো তখন প্রক্টার নির্দেশ দিয়ে গেট বন্ধ করে দেন। কিন্তু সমবেত ছাত্রদের প্রতিবাদ এবং সম্মিলিত দাবীর ফলে শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গেট উন্মুক্ত করে দিতে বাধ্য হন।[২]

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা একত্রিত হওয়ার পর এম. এ. সামাদের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি বিরাট ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতির প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন। বক্তারা মূলনীতি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পূর্ব বাঙলার মুসলিম লীগ নেতাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, মৌলানা আকরাম খান ও নূরুল আমীন লিয়াকাত আলীর সাথে আমেরিকা ও বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র জালে জড়িত হয়ে পড়েছেন।[৩]

সভা শেষে ছাত্রেরা দীর্ঘ এক মাইল ব্যাপী মিছিল করে শহর প্রদক্ষিণ করেন এবং 'লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করা হোক', 'দাসত্বসুলভ মূলনীতি কমিটি রিপোর্টের পতন হোক', এবং 'পাকিস্তানের প্রিয় জননেতা ভাসানীর মৌলানা আবদুল হামিদ খানের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক' প্রভৃতি আওয়াজ তোলেন।[৪]

ঢাকা ইডেন কলেজের মহিলা ছাত্রীরাও ১২ই নভেম্বর মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করেন এবং কলেজ প্রাঙ্গনেই এক ছাত্রীসভায় মিলিত হয়ে কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।[৫]

১২ই নভেম্বর পূর্ব বাঙলার অন্যান্য জায়গাতেও সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন সিলেটের গোবিন্দ পার্কে মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশ সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান প্রস্তুতের দাবী জানানো হয়। ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহা-

সম্মেলনে মূলনীতির বিকল্প প্রস্তাবগুলির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।[৮] মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের প্রতিবাদে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ ও সরকারী মহল কর্তৃক কুৎসা রটনারও তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।[৯]

মূলনীতি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা, ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল শুধু ১২ই নভেম্বরেই অনুষ্ঠিত হয় নি। রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সারা নভেম্বর মাস ধরেই পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় সংগঠিত হয়।

৬

শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ

মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির রিপোর্টের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব বাঙলার ওপর নির্যাতনমূলক শাসন চাপিয়ে দেওয়ার এবং শোষণকে প্রবল ও অব্যাহত করার চক্রান্ত এত সুস্পষ্ট ছিলো যে তা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের মধ্যে, বিশেষতঃ তাদের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভের সঞ্চার করে। এর ফলে মুসলিম লীগের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একান্ত অনুগত অংশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ অংশের মধ্যে বিরোধ ও আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ বেশ প্রকট ও খোলাখুলি আকার ধারণ করে। অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে অংশ গ্রহণ করেন।

মুসলিম লীগের কর্মীরা ঢাকা, কুমিল্লা, বগুড়া, পাবনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মূলনীতি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।[১] সিলেটে শুধু মুসলিম লীগ কর্মীরাই নয়, নেতৃত্বের একটা বিরাট অংশ এই প্রতিবাদকে যথেষ্ট সংগঠিত রূপ দান করেন।[২]

পূর্ব পাকিস্তানের পরিষদ সদস্য ও আসামের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মুনাওওর আলী এক প্রতিবাদমূলক বিবৃতি[৩] প্রসঙ্গে বলেন:

> পাকিস্তানের মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সুপারিশ গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করিয়াছে। ফেডারেল 'লেজিসলেচারে' ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যাকে অবহেলা করিয়া যে সমসংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের নীতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনমতকে চরমভাবে পদদলিত করিয়াছে। এই প্রকার শাসনতন্ত্রের নীতি বিশ্বের আরু

কোথাও দেখা যায় না—ইহা নিন্দা করিবার ভাষা আমরা পাইতেছি না।.. .. .. এই মূলনীতি কমিটির সুপারিশকে একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে একনায়কত্ব ও রাজতন্ত্রের আভাষ স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

মুনাওওর আলী তাঁর বিবৃতিতে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে যে সুপারিশগুলি করেন তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর নিম্নলিখিত সুপারিশ:

কতকগুলি বিশেষ কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান প্রয়োজনবোধে একে অন্য হইতে সরিয়া আসিয়া পৃথক আঞ্চলিক 'পাকিস্তান রিপাবলিক' গড়িয়া তুলিতে পারিবেন।

১৪ই নভেম্বর ১৯৫০ তারিখে সিলেটের জিন্নাহ হলে পূর্ব বাঙলা সরকারের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নাসিরউদ্দীন আহমদ মুসলিম লীগের কর্মী ও নেতৃবৃন্দসহ সিলেটের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনার জন্যে আহ্বান করেন। দেওয়ান আব্দুর রব চৌধুরী এম. এল. এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই আলোচনা সভায় নাসিরউদ্দীন বলেন যে, সামান্য কিছু সংশোধন করে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। মাহমুদ আলী, নূরুল হোসেন খান এম. এল. এ, আব্দুল লতিফ এম. এল. এ, আব্দুল মুহীত চৌধুরী, হাবিবুর রহমান, শাহ একরামুর রহমান প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন এবং সেই সভায় নাসিরউদ্দীন আহমদকে সিলেটবাসীদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, মূলনীতি কমিটির সুপারিশসমূহ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।[৪]

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকা মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির ১৩ জন সদস্য কর্তৃক মূলনীতি কমিটির সুপারিশ বিবেচনার জন্যে একটি সভা আহূত হয়। এই সভায় সদস্যেরা কমিটির সুপারিশসমূহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে কতকগুলি প্রস্তাবের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিজেদের বক্তব্য জানিয়ে দেন।[৫]

প্রস্তাবগুলিতে তাঁরা বলেন যে, মূলনীতি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক নীতি দেশবাসীর মনে গভীর শংকার কারণ ঘটিয়েছে। লাহোর প্রস্তাবের বিরোধী এই রিপোর্টটি ফেডারেশনের আদর্শ থেকে বিচ্যুত এবং এর সুপারিশ অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচিত হলে তা পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করবে। তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে একটি আঞ্চলিক শাসনতন্ত্র রচনা করে দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা

প্রভৃতি ফেডারেশনের হাতে ন্যস্ত রেখে অন্যান্য সমস্ত বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ন্যস্ত রাখা প্রয়োজন। আঞ্চলিক সমস্ত ব্যাপারই ফেডারেল সরকারের এখতেয়ার বহির্ভূত হতে হবে। বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাকেই রাষ্ট্র-ভাষা করতে হবে। কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এবং ফেডারেল কোর্টের অধিবেশন হবে ঢাকা এবং লাহোর উভয় স্থানে। পার্লামেণ্টারী পার্টির উপরোক্ত সদস্যেরা আরও দাবী করেন যে, পাকি-স্তানের শাসনতন্ত্র ১৯৫১ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রণীত হয়ে সেই শাসন-তন্ত্র অনুযায়ী ১৯৫২ সালেব প্রথম ভাগেই সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হতে হবে।

শুধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির মধ্যেই যে কেন্দ্র বিরোধী বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিলো তাই নয়। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মধ্যেও কেন্দ্র এবং প্রদেশে তাদের নির্বাচিত এজেণ্টদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ খুব দ্রুতগতিতে এ সময় দানা বাঁধছিলো। এই বিক্ষোভ এবং অসন্তোষের একটা উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১লা অক্টোবর, ১৯৫০, তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের একটি সভায়। নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সারা পাকিস্তান লীগ কাউন্সিলের আসন্ন অধিবেশন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং তাতে বলা হয় যে, করাচীতে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে যে কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হোক না কেন তা নিয়মতন্ত্র সম্মত বলে বিবেচিত হবে না। কাউন্সিলের ঐ সভায় লীগের কোন নোতুন গঠনতন্ত্র গৃহীত হলেও তা আইনসঙ্গত বলে গণ্য হবে না বলেও তাঁরা ঘোষণা করেন, কারণ করাচীর প্রস্তাবিত সম্মেলন হলো তাঁদের মতে 'স্বেচ্ছাচারমূলক' ও 'নিয়মতন্ত্রবহির্ভুত'। ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের এই সভায় আসন্ন করাচী সম্মেলনে যোগদান না করার জন্যে পূর্ব পাকিস্তানী কাউন্সিল সদস্যদের কাছে আহ্বান জানানো হয়।[৬]

ইতিপূর্বে করাচীর প্রস্তাবিত মুসলিম লীগ কাউন্সিল আহ্বান করে কেন্দ্রীয় সম্পাদক ইউসুফ খটক একটি বিবৃতির মাধ্যমে বলেন যে, মন্ত্রীরা মুসলিম লীগের কর্মকর্তা পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না বলে যে শাসন-তান্ত্রিক বিধিনিষেধ আছে আসন্ন অধিবেশনে তা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব কাউন্সিলে বিবেচিত হবে।[৭]

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মুসলিম লীগের মধ্যে অসংখ্য সৎ, দেশ-

প্রেমিক ও গণতান্ত্রিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি ও ছাত্র সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মুসলিম লীগ যে নীতিসমূহ অনুসরণ করছিলো এবং নোতুনভাবে জনগণের ওপর শোষণ ও নির্যাতন সংগঠিত করার যে বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করছিলো তার ফলে মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙন ১৯৪৭ সালেই শুরু হয়। এই ভাঙনের ফলে ছাত্র এবং কর্মীদের এক বিরাট অংশ দুতিন বৎসরের মধ্যেই মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করে রাজনীতিকে অন্যভাবে সংগঠিত করতে চেষ্টা করতে থাকেন। এর ফলেই সৃষ্টি হয় গণআজাদী লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, মুসলিম ছাত্র লীগ, যুব লীগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান।

১৯৫০ সালে মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটি যে শাসনতান্ত্রিক সুপারিশ সংবিধান পরিষদে পেশ করে এবং কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সেই সুপারিশ-সমূহকে যেভাবে সমর্থন করে তার ফলে মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙন আরও ব্যাপক ও ত্বরান্বিত হয়। সিলেটের মুনাওওর আলী ও মাহমুদ আলী, বরিশালের মহীউদ্দীন আহমদ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা মুসলিম লীগের সাথে সাংগঠনিকভাবে সম্পর্কচ্ছেদ না করলেও কার্যতঃ তাঁরা মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করেন। এমনকি মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত প্রাদেশিক সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমানও মূলনীতি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে প্রতিবাদ করে তার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের প্রচেষ্টা করেন। প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করার দাবীও তাঁরা জানান। প্রাদেশিক লীগ সভাপতি মৌলানা আকরাম খান অবশ্য তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে প্রাদেশিক সম্পাদ-কের এই প্রচেষ্টাকে বাধা দেন।

আকরাম খান এবং নূরুল আমীন দুজনের কেউই এই প্রতিকূল অবস্থায় প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিল অথবা পার্লামেণ্টারী পার্টির অধিবেশন আহ্বান করতে একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু অধিবেশন আহ্বানের চাপ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মধ্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করছিলো। এই অবস্থায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকাত আলী ঢাকা সফরের জন্যে আসেন এবং তাঁর উপস্থিতিতেই আকরাম খান ও নূরুল আমীন যথাক্রমে মুসলিম লীগ কাউন্সিল ও পার্লামেণ্টারী পার্টির অধিবেশন আহ্বান করেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, লিয়াকাত আলীর উপস্থিতিতে বিদ্রোহী মুসলিম লীগ সদস্যেরা অনেকখানি সংযত আচরণ করবেন এবং কোন প্রকার

"বেয়াড়া" দাবী লিয়াকাত আলীর উপস্থিতিতে উত্থাপন করতে পারবেন না।

তাঁদের আশা একেবারে মিথ্যা হয় নি। লিয়াকাত আলীর উপস্থিতিতে পালামেণ্টারী পার্টি ও লীগ কাউন্সিলের সদস্যেরা তাঁদের বিক্ষোভকে অনেকখানি সংযত রাখতে বাধ্য হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূলনীতি কমিটির সুপারিশকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য মনে না করে কতকগুলি পরিবর্ত্তনের সুপারিশ তাঁরা করেন।[৮]

এই সুপারিশগুলি হলো প্রথমতঃ, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে দূরত্ব অনেক বেশী এবং এই দুই অঞ্চলের মধ্যে যোগ-সূত্র নাই সেই কারণে পূর্ব বাঙলাকে বিশেষ স্বায়ত্ত্বশাসন দিতে হবে এবং শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাঙলার জন্যে একটি বিশেষ তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব বাঙলার যানবাহন যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্য সকল প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগহীন সেজন্যে তা পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকবে পূর্ব বাঙলার ওপর। তৃতীয়তঃ, আমদানী রপ্তানী ব্যবসায়ও যতদূর সম্ভব পূর্ব বাঙলা সরকার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। চতুর্থতঃ, শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ দুটি পূর্ব বাঙলা সরকারের ক্ষমতাধীনে রাখতে হবে। পঞ্চমতঃ, গঠনতন্ত্র সংশোধনের ব্যবস্থা আরও সহজ করতে হবে।

রাষ্ট্রপ্রধান ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা, কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের উচ্চ পরিষদ (হাউস অব ইউনিট্স্) বাংলা রাষ্ট্রভাষা, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁরা কোন প্রস্তাবই অবশ্য গ্রহণ করলেন না।

ডিসেম্বর মাসে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য মুনাওওর' আলী একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করে বলেন, তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতির সভায় মূল শাসনতন্ত্র নির্দ্ধারক কমিটির রিপোর্টের আলোচনা সম্পর্কে কোন অভিমত আপাততঃ না দিলেও ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহা সম্মেলনের সুপারিশসমূহকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন কারণ তার মধ্যে জনগণের সত্যিকার মুক্তির পথ নির্দেশিত হয়েছে।[৯]

মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সুপারিশ সম্পর্কে 'গণতান্ত্রিক ফেডারেশন' তাঁদের প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বলেন:

> পাক—বাংলার জনসাধারণ তাহাদের এই অপচেষ্টা দেখিয়া হাসিবেন কি কাঁদিবেন স্থির করিতে পারিলেন না—কারণ যাহা বলা হইয়াছে তাহা বাস্তবক্ষেত্রে বিগত তিন বছরে যাহা হইয়া গিয়াছে—প্রাদেশিক

স্বায়ত্ত্ব-শাসনকে পদদলিত করিয়া সকল বিষয় সমূহকে কেন্দ্রীয়করণ করা হইয়া গিয়াছে। আর সেই কারণে পাক-বাংলায় আজ ক্রন্দন-রোল উত্থিত হইয়াছে। কৃষকের পাট, ব্যবসায়ীর সুপারী, শ্রীহট্টের চা ইত্যাদি সমস্ত কাঁচামাল উৎপাদনকারীরা আজ মরণের মুখে। মধ্যবিত্ত আজ ত্রাহী ডাক ছাড়িয়াছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে—পাঠশালা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—চাকুরীর ক্ষেত্রে আজ বাঙ্গালীর দুয়ার বন্ধ। ৫৪ হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে আজ সাড়ে চার কোটি লোক অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীর মতো নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিবার উপক্রম করিয়াছে, অথচ তিন লক্ষ বর্গমাইলের পশ্চিম পাকিস্তানের সুযোগ সুবিধার তুলনায় আমরা কি পাইতেছি? ওখানে প্রতি ৬০ লক্ষ লোকের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়—তাছাড়া শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে তারা কত অগ্রসর হইতেছে—আর আমাদের টাকার অভাবে সকল পরিকল্পনা বন্ধ হইয়া আছে। বিক্রয় কর, আয় কর, আমদানী রপ্তানী শুল্কের উপর আমাদের হাত নাই, কে বা কাহারা আজ সব কিছু কেন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিল তাহা বাঙ্গালীর অজানা নয়—তবু আবার তাহারাই নাকি দেয় সংশোধনী প্রস্তাব।[১০]

প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিল মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির রিপোর্ট সংশোধনের জন্যে কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবের খসড়া তৈরীর উদ্দেশ্যে একটি সাব-কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন। ছয় দিন ব্যাপী আলোচনার পর উক্ত কমিটি তাঁদের রিপোর্টে[১১] এই মর্মে সুপারিশ করেন যে, পাকিস্তান মূলতঃ এক দেশ থাকবে তবে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করতে হবে এবং পূর্ব বাঙলা সরকারকে সর্বাধিক স্বায়ত্ত্বশাসন দিতে হবে। পূর্ব বাঙলার যে সমস্ত বিষয়ের সাথে পাকিস্তানের অবশিষ্টাংশের কোন সাধারণ সম্পর্ক নেই সেগুলি প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং যুক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি বহুল পরিমাণে কমিয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্র প্রধানের এবং অপরাপর উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে রাখতে হবে। হাই কোর্ট ও ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিদেরকে নিয়ে নির্বাচনী ট্রাইবুনাল গঠন করে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। জরুরী ক্ষমতার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করতে হবে। কার্যতঃ শত্রুতা ও বিদ্রোহ না

করলে কোন ব্যক্তির হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার ক্ষুন্ন করা কখনোই চলবে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে চাকুরীর ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে হার নির্দ্দিষ্ট করতে হবে এবং এমনভাবে করতে হবে যাতে বিভিন্ন শ্রেণীর চাকুরীর অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানী প্রার্থীদের দ্বারা পূর্ণ হতে পারে। এই হার দেশরক্ষা সংক্রান্ত চাকুরিতেও প্রযোজ্য হবে। কোন সরকারী চাকুরীয়া কোন আইন সভারই সদস্য হতে পারবেন না।

মুসলিম লীগ কাউন্সিলেব সাব-কমিটির উপরোক্ত সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার পর গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের কাউন্সিল ঢাকায় এক সভায় একত্রিত হয়ে সুপারিশগুলির প্রতারণামূলক চরিত্রের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁদেরকে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। একটি প্রস্তাবে তাঁরা এ সম্পর্কে বলেন:

> ২০-১-৫১ তারিখে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের কাউন্সিলের এই সভা সেই মূলনীতি কমিটিব রিপোর্টের ওপর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাব-কমিটির সুপারিশসমূহের সাথে দৃঢ় মতানৈক্য ব্যক্ত করছে যাতে কেন্দ্রের জন্যে একটি দ্বি-পরিষদ বিশিষ্ট আইনসভাব ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে উচ্চতর মর্যাদা দিয়ে তার হাতে ব্যবসা বাণিজ্য, আমদানী রপ্তানীর নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে লাহোর প্রস্তাবে যেভাবে নির্দেশিত হয়েছিলো তার খেলাফ করে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণতম স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অঞ্চলের মর্যাদা দানের সাধারণ দাবীর বিরুদ্ধে তাকে কেবলমাত্র একটি প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যাতে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি এবং যাতে এই অঞ্চলের জনগণের স্বার্থকে আরো কতকগুলি বিষয়ে পরিকল্পিতভাবে বিপন্ন করা হয়েছে। বিষয়টিকে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে বিপরীতপক্ষে এক্ষেত্রে প্রকৃত সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জনগণকে বিভ্রান্ত করার যে দৃষ্টিভঙ্গি এর মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে এই কাউন্সিল তার নিন্দা করছে।[১২]

৭

মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা স্থগিত

সারা পাকিস্তানে, বিশেষতঃ পূর্ব বাঙলায়, মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ শুরু হওয়া, এমনকি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের মধ্যেও সেই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ভীতিগ্রস্থ হয়ে ২১শে নভেম্বর, ১৯৫০, তারিখে উক্ত রিপোর্ট সম্পর্কে পরিষদীয় আলোচনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।[১] এই প্রসঙ্গে পাকিস্তান গণপরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকাত আলী খান বলেন যে, শাসনতন্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে যাঁরা সুপারিশ করতে চান তাঁদেরকে পূর্ণ সুযোগ দানের উদ্দেশ্যেই তাঁরা রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখছেন।

মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির আদর্শ প্রস্তাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সুনির্দ্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট প্রস্তাব পেলে তাঁরা সেগুলি বিবেচনা করবেন বলেও তিনি পরিষদকে জানান।

দেশব্যাপী যে সমালোচনা ও মন্তব্যের ঝড় উঠেছিলো তাকে তিনভাগে বিভক্ত করে লিয়াকাত আলী বলেন যে, প্রথমতঃ রিপোর্ট সম্পর্কে অজ্ঞতা। দ্বিতীয়তঃ, কেউ কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে এবং রিপোর্টে যা নেই তাই জনসাধারণকে বোঝাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা এই সুযোগে দেশের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে চাইছে। তৃতীয়তঃ, কিছু সংখ্যক ব্যক্তি রিপোর্টের মর্ম উপলব্ধি করতে পারছেন এবং অন্তবর্ত্তী-কালীন রিপোর্টে যা নেই সে রকম কিছু কিছু নীতি যোগ করতে চাইছেন। এইভাবে আলোচনা স্থগিত রাখার ফলে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে কিছু বিলম্ব ঘটবে কিন্তু সমস্ত শ্রেণীর সন্তোষ বিধানের প্রয়োজনেই সেটা তাঁরা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলেও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকাত আলী পরিষদকে জানান।

মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট আদর্শ প্রস্তাবের অনুসরণে প্রণয়ন করা হয় নি একথা অস্বীকার করে তিনি সমালোচকদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, কোথায় আদর্শ প্রস্তাব লঙ্ঘন করা হয়েছে তা সুনির্দ্দিষ্টভাবে নির্দেশ করতে। এর পর আদর্শ প্রস্তাব সম্পর্কে লিয়াকাত আলী বলেন যে, কিছু ব্যক্তির ধারণা এটা তাঁদের "চালাকী"। একথা অস্বীকার করে তিনি আদর্শ

প্রস্তাবের নীতিসমূহকে তাঁদের বিশ্বাসের ব্যাপার বলে অভিহিত করেন। ইসলামের নীতিসমূহের ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের গঠনতন্ত্র প্রণয়নকে তাঁদের গুরুদায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, প্রত্যেক খাঁটি পাকিস্তানীই সেই দায়িত্ব পালনে অংশ গ্রহণ করবেন।

মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা এইভাবে স্থগিত রাখা সম্পর্কে পূর্ব বাঙলার কেন্দ্রীয় পবিষদ সদস্যদের ভূমিকা প্রসঙ্গে 'কেন্দ্রীয় ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন কাউন্সিলের' আহ্বায়ক কমরুদ্দীন আহমদ ১৯৫০ এর ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি বিবৃতিতে[১] বলেন:

> বিগত গণ পরিষদ অধিবেশনে মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির রিপোর্টেব বিবেচনা সাময়িকভাবেই স্থগিত রাখায় পূর্ব বঙ্গের সদস্যগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু কেহই এই গণস্বার্থ বিরোধী মূলনীতি রিপোর্টটির সমূলে অগ্রাহ্য করিবার দাবী করেন নাই। ইহাতেই দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে পূর্ব বাঙলার গণ পরিষদেব সভ্যগণ আপন রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অগণিত জনসাধারণেব স্বার্থকে বলি দিয়া প্রভুদের তোষামোদের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকাত আলীর গণপরিষদ বক্তৃতার উল্লেখ করে কমরুদ্দীন আহমদ বলেন:

> তিনি জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে যাহারা কোন বিকল্প প্রস্তাব দিতে চাহেন তাহারা যেন আদর্শ প্রস্তাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রস্তাব প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রত্যেকেই দেখিয়াছেন আদর্শ প্রস্তাবের দাবী এমনভাবে রচিত হইয়াছে যে—যে কোন ব্যক্তি যে কোনভাবে ইহার ভাষ্য দিতে পারেন। মূলনীতি কমিটির রিপোর্টটি আদর্শ প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে বলিয়া দাবী করে তাহা না হইলে নিশ্চয় পরিষদে লিয়াকাত আলী খান তাহা উপস্থাপিত করিতেন না। প্রস্তাবে শুধু কতকগুলি সুললিত শব্দগুচ্ছ রহিয়াছে, সেখানে জনসাধারণের মত প্রকাশের ও সত্যিকারের গণতান্ত্রিক অধিকার ও রাষ্ট্র কর্ণধারগণের ধুরন্ধর চক্রের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার কোন পরিস্কার আভাষ নাই। অত্যাচার ও অবিচারের সনদটাই অনাদীকালের জন্য বাঁচিয়া থাকিবে। আমি এই বিশ্বাস করি যে, মূলনীতি কমিটির এই রিপোর্টটি গণপরিষদে সাময়িক স্থগিত রাখার পেছনে নিশ্চয়ই অসৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহা শুধু জনসাধারণের গতিশীল আন্দোলনকে বিপথগামী ও চাপা দিবার উদ্দেশ্যেই।

এ প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে কমরুদ্দীন আহমদ আরো বলেন:

আমি জনসাধারণকে অতীতের একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। ১৯৪৮ সালে যখন বাংলা ভাষার আন্দোলন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছিল, তখন খওয়াজা নাজিমুদ্দীন ভাষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সহিত একটি চুক্তি পত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে নির্লজ্জভাবে এই চুক্তির ধারাগুলি ভঙ্গ করিতে পরান্মুখ হন নাই এবং সেই সময়ে সরকার একটি ইস্তাহার বাহির করিয়া জানাইয়াছিলেন কোন বৈদেশিক ভাষা পূর্ব বাঙলাব জন্য চাপাইয়া দেওয়া হইবে না —কিন্তু পুনরায় পর মুহুর্ত্তে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সরকার পরীক্ষার নামে উর্দু ভাষা চাপাইয়া দিবার ফিকির করিতেছেন—এই সকল ভুরি ভুরি প্রমাণ আমাদের নিকট রহিয়াছে। আজ মি: লিয়াকাত আলীর প্রতিশ্রুতির পরিণতি এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখিতে হইবে।

এই বিবৃতিটির শেষে গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কমরুদ্দীন আহমদ জাতীয় মহা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহের ভিত্তিতে ব্যাপক ও সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে জনসাধারণের কাছে আহ্বান জ্ঞাপন করেন।

এই শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন এর পরবর্ত্তী পর্যায়ে স্তিমিত হয়ে অল্পকালের মধ্যেই সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায়। আন্দোলন এইভাবে স্থগিত হওয়ার মূল কারণ গণপরিষদে এ বিষয়ে আর কোন নোতুন প্রস্তাব উত্থাপন অথবা পুরাতন প্রস্তাবের ওপর কোন আলোচনা না হওয়া। বস্তুতঃ পক্ষে মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভ লক্ষ্য করে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগত মূলনীতি কমিটি শাসনতান্ত্রিক সুপারিশের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করে নোতুন একটি রিপোর্ট তৈরীর কাজে হাত দেন। সে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে—লিয়াকাত আলীর মৃত্যুর পর।[৩]

৮

শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন ও জনগণের চেতনা

১৯৫০ সালের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের চেতনায় একটা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্ত্তন সৃষ্টি হয়। এদিক দিয়ে এই আন্দোলন পূর্ব বাঙলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পথচিহ্ন।

১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মাস থেকেই বস্তুতঃপক্ষে পূর্ব বাঙলার জনগণের ওপর মুসলিম লীগ শাসনের শোষণ ও নির্যাতন শুরু হয় এবং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু ১৯৫০ সালের এই আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত সেই শোষণ ও নির্যাতনকে মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত হিসেবে না দেখার ফলে জনগণের বিক্ষোভ অনেক বেশী প্রাদেশিক সরকার ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে স্থাপিত হয়। আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধেও প্রথম থেকেই যথেষ্ট বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও তাকে মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের এজেণ্ট হিসেবে না দেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে অবাঙালী হিসেবে চিহ্নিত করেই লোকে ক্ষান্ত থাকতো। শুধু তাই নয়, তৎকালে প্রাদেশিক সরকার, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এবং প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে নির্যাতন, দুর্নীতি ইত্যাদির প্রতিকারকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানানো হতো। কারণ তখন তাঁরা সাধারণভাবে মনে করতেন প্রাদেশিক সরকারই মুসলিম লীগ ও আমলাতন্ত্রের সাহায্যে জনগণের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে তার তেমন কোন সম্পর্ক নেই।

১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদের মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন ঘটে। কারণ এই সুপারিশসমূহের মাধ্যমে পূর্ব বাঙলার ওপর শোষণ ও নির্যাতনকে কায়েম করার যে ব্যবস্থা ছিলো জনগণের দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং যেহেতু এই সমস্ত সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও তদারকীতেই মূলনীতি কমিটি প্রদান করেছিলো সেজন্যে এর সমস্ত দায়িত্ব যে কেন্দ্রীয় সরকারের সে বিষয়েও তাঁদের কোন সন্দেহ থাকে না।

এই চেতনার ফলেই প্রাদেশিক সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের এজেণ্ট হিসেবে বিবেচনা করে জনগণ তাঁদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধেই পরিচালনা করেন।

এর পর থেকে শুধু শাসনতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামই নয়, সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারকেই জনগণ মূল শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে পূর্ব বাঙলায় পাকিস্তানী শাসন শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে সংগঠিত করেন।

তথ্যনির্দেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব বাংলায় দুর্ভিক্ষ

১. দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি

১. মিল্লাত। ১৪.৩.১৯৪৭
২. ঐ।
৩. Peoples Age. 3.8.1947. vol. vi. No. 5
৪. Peoples Age. 3.8.1947. vol. v. No. 5
'স্বাধীনতা'র এই রিপোর্টটির ইংরেজী অনুবাদ পিপল্‌স্ এজ এর উপরোক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বর্তমান উদ্ধৃতিটি সেই ইংরেজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ।
৫. Peoples Age. 3.8.1947. vol. v. No. 5

২. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার খোলা চিঠি

১. Peoples Age (Fifteenth August Number). vol. vi. Nos. 6+7. Friday, August 15, 1947. P, 18

৩. কর্ডন প্রথা উদ্ভূত পরিস্থিতি

১. ইম্তিয়াজউদ্দীন খান (জেলা কর্ডনিং অফিসার, বরিশাল, অগাষ্ট—ডিসেম্বর, ১৯৪৭)।
২. কমরুদ্দীন আহমদ
৩. কমরুদ্দীন আহমদ
৪. তাজউদ্দীন আহমদ। ডায়েরী ১১.১.১৯৪৮
৫. ঐ। ১২.১.৪৮
৬. কমরুদ্দীন আহমদ, তফজ্জল আলী
৭. তাজউদ্দীন আহমদ। ডায়েরী ২০.১২.১৯৪৭
৮. ঐ। ২১.১২.১৯৪৭
৯. কমরুদ্দীন আহমদ, তফজ্জল আলী
১০. কমরুদ্দীন আহমদ
১১. Assembly Proceedings. 2nd Session, 1948. vol. II P. 123

৪. একটি উদ্বৃত্ত জেলার অবস্থা

১. নওবেলাল। ৪.৩.১৯৪৮
২. ঐ।
৩. ঐ।
৪. ঐ। ১১.৩.১৯৪৮
৫. ঐ। ১৯.৩.১৯৪৮
৬. ঐ। ১৫.৪.১৯৪৮
৭. ঐ। ২২.৪.৪৮, ৬.৫.৪৮
৮. ঐ। ১০.৬.৪৮
৯. ঐ। ২৪.৬.৪৮
১০. ঐ। ১৫.৭.৪৮

৫. পূর্ব বাঙলা পরিষদে খাদ্য পরিস্থিতির ওপর আলোচনা

১. The East Bengal Legislative Assembly Proceedings, Second Session, 1948 (June), vol. II, P. 90
২. ঐ। P. 90-91
৩. ঐ। P. 91
৪. ঐ। P. 91-92
৫. E.B. Legislative Assembly Proceedings First Session, 1948 (April), vol. I, No. 4, P. 5
৬. E.B. Assembly Proceedings, Second Session, 1948. vol. II, P. 92
৭. ঐ। P. 93
৮. ঐ। P. 93-94
৯. ঐ। P. 120, 122
১০. ঐ। P. 122
১১. ঐ। P. 122-25
১২. ঐ। P. 126-27
১৩. ঐ। P. 127
১৪. ঐ। P. 128-29
১৫. ঐ। P. 129
১৬. ঐ। P. 130
১৭. ঐ। P. 131
১৮. ঐ। P. 133

১৯. ঐ। P. 134
২০. ঐ।
২১. ঐ। P. 135-36
২২. ঐ। P. 136
২৩. ঐ। P. 138
২৪. ঐ। P. 129-30
২৫. ঐ। P. 140-42
২৬. ঐ। P. 142
২৭. ঐ।
২৮. ঐ। P. 142-43
২৯. ঐ। P. 145
৩০. ঐ। P. 148
৩১. কমরুদ্দীন আহমদ

৬. ১৯৪৯ সালে বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্য পরিস্থিতি

১. সাপ্তাহিক সৈনিক। ২৮.১১.১৯৪৮
২. ঐ।
৩. সৈনিক। ৫.১২.১৯৪৮
৪. আজাদ। ২৪.১.১৯৪৯
৫. আজাদ। ৩০.১.১৯৪৯
৬. আজাদ। ১২.২.১৯৪৯
৭. আজাদ। ২১.২.৪৯
৮. সৈনিক। ১৮.৩.৪৯
৯. সৈনিক। ২৫.৩.৪৯
১০. আজাদ। ১৫.৪.৪৯, ১১.৪.৪৯
১১. আজাদ। ৩.৫.৪৯, ৭.৫.৪৯
১২. আজাদ। ১৫.৫.৪৯
১৩. আজাদ। ১৮.৫.৪৯
১৪. আজাদ। ২১.৫.৪৯
১৫. ঐ।
১৬. আজাদ। ৮.৬.১৯৪৯
১৭. আজাদ। ২১.৫.৪৯
১৮. আজাদ। ২৪.৬.৪৯
১৯. উদ্ধৃত। সৈনিক। ২২.৭.৪৯

২০. সৈনিক। ২২.৭.৪৯
২১. সৈনিক। ৮.৮.৪৯
২২. নওবেলাল। ১.৯.৪৯
২৩. সৈনিক। ৯.৯.৪৯
২৪. সৈনিক। ১৬.৯.৪৯
২৫. নওবেলাল। ৩.১০.৪৯
২৬. নওবেলাল। ১০.১০.৪৯
২৭. সৈনিক। ২৮.১০.৪৯

৭. সরকারের নোতুন কর্ডন নীতি

১. নওবেলাল। ১৪.৭.৪৯
২. ঐ।
৩. ঐ।
৪. ঐ।

৮. দুর্ভিক্ষ রিলিফ কমিটি (Nil)

৯. সরকারী লেভী ব্যবস্থা

১. আজাদ। ৫.২.৪৯
২. আজাদ। ১৪.২.৪৯
৩. আজাদ। ২.৪.৪৯
৪.. আজাদ। ১৭.৫.৪৯
৫. নওবেলাল। ২৫.৮.৪৯
৬. ঐ।
৭. উদ্ধৃত নওবেলাল। ২৯.১২.৪৯
৮. নওবেলাল। ২৯.১২.৪৯
৯. নওবেলাল। ৯.২.১৯৫০

১০. অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি

১. উদ্ধৃত। নওবেলাল। ১.৭.১৯৪৮
২. নওবেলাল। ২৯.৭.১৯৪৮
৩. East Bengal Legislative Assembly Proceedings vol. I. No. 4, P. 29
৪. ঐ।

৫. ঐ। P. 184
৬. E.B.L.A. Proceedings, vol. II. P.28
৭. ঐ। P.27
৮. E.B.L.A. Proceedings, Fourth Session 1949-50 Vol. IV. No. I. P.7
৯. ঐ। P.6
১০. E.B.L.A. Proceedings Fourth Session, 1949 Vol. IV. No. 2. P.144
১১. ঐ। P. 168-69
১২. ঐ। P. 168-69
১৩. উদ্ধৃত। নওবেলাল। ১.১.১৯৫১। পৃষ্ঠা: ২

১১. খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ

১. আজাদ। ২.২.৪৯
২. আজাদ। ১০.২.৪৯
৩. আজাদ। ১৬.৬.৪৯
৪. আজাদ। ১৮.৬.৪৯
৫. আজাদ। ২৩.৬.৪৯
৬. আজাদ। ২৩.৬.৪৯
৭. আজাদ। ৮.[illegible].৪৯

১২. ১৯৫১ সালের খাদ্য সংকট

১. নওবেলাল। ১২.৪.১৯৫১। দৈনিক আজাদ থেকে উদ্ধৃত
২. ঐ।
৩. নওবেলাল। ৩.৫.১৯৫১
৪. ঐ।
৫. ঐ। ৭.৬.১৯৫১
৬. ঐ। ২১.৬.১৯৫১
৭. ঐ।
৮. সৈনিক। ২৪.৬.১৯৫১
৯. সৈনিক। ১৫.৭.১৯৫১
১০. নওবেলাল। ২.৮.১৯৫১
১১. নওবেলাল। ২৫.১০.১৯৫১

১২. আজাদ। ৮.১১.১৯৫১
১৩. আজাদ। ১৩.১১.১৯৫১
১৪. আজাদ। ১২.১১.১৯৫১
১৫. আজাদ। ১৪.১১.১৯৫১
১৬. আজাদ। ২০.১১.১৯৫১

১৩. লবন সংকট

১. নওবেলাল। ১৮.১০.১৯৫১
২. নওবেলাল। ১৮.১০.১৯৫১
৩. আজাদ। ১২.১০.১৯৫১
৪. আজাদ। ২৬.১০.৫১
৫. আজাদ। ২৮.১০.৫১ এবং নওবেলাল ১.১১.৫১
৬. উদ্ধৃত নওবেলাল। ১.১১.১৯৫১। পৃষ্ঠা: ২
৭. নওবেলাল। ১.১১.১৯৫১
৮. নওবেলাল। ৮.১১.১৯৫১
৯. E.B.L.A. Proceeding, Sixth Session, 1951 Vol. VI-No. 1 P. 157-58.
১০. E.B.L.A. Proceedings, Sixth Session, 1951 vol. VI-No. 2. P. 135-36
১১. ঐ। P.. 136-38
১২. ঐ। P. 140-41
১৩. ঐ। P. 141-42
১৪. ঐ। P. 142-43
১৫. ঐ। P. 143
১৬. ঐ। P. 143-44
১৭. ঐ। P. 144
১৮. ঐ। P. 145
১৯. ঐ। P. 147-48
২০. ঐ। P. 151
২১. ঐ। P. 152
২২. ঐ। P. 154-56
২৩. 'ঐ। P. 156-58
২৪. আজাদ। ৩.১১.৫১
২৫. ঐ।
২৬. আজাদ। ৭.১১.১৯৫১

২৭. আজাদ। ১৫.১১.১৯৫১
২৮. ঐ।
২৯. ঐ।
৩০. আজাদ। ২১.১১.৫১

১৪. Nil (দুর্ভিক্ষের কারণ)

১৫. দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন

১. নওবেলাল। ৩.১১.৪৯
২. ২ নম্বর মুদ্রিত সার্কুলার
৩. বরিশালের প্রতিরোধ সম্পর্কে এই তথ্য প্রধানতঃ স্বদেশ বসু ও আবদুশ শহীদ থেকে প্রাপ্ত
৪. 'পাকিস্তানের যুব সমাজের প্রতি' ঈশ্বরদীতে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিভাগীয় যুব সম্মেলনে গৃহীত ইস্তাহার। প্রকাশক—মোহাম্মদ একরামুল হক, সেক্রেটারী গণতান্ত্রিক যুব লীগ, রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটি। হোসেনগঞ্জ, রাজশাহী। সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ সাল। মূল্য তিন আনা।
৫. সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নওবেলাল পত্রিকায় এ সম্পর্কে অনেক রিপোর্ট আছে।
৬. নওবেলাল। ৩.৩.১৯৪৯
৭. সৈনিক। ২১.১০.৪৯। শওকত আলী, খোন্দকার মোস্তাক আহমদ
৮. সৈনিক। ২১.১০.৪৯
৯. শওকত আলী
১০. সৈনিক। ২১.১০ ৪৯
১১. শওকত আলী
১২. শওকত আলী
১৩. ক্যাপ্টেন শাহজাহান, মিসেস শাহজাহান
১৪. শেখ মুজিবর রহমান, ক্যাপ্টেন শাহজাহান
১৫. আজাদ। ১২.১০.১৯৪৯
১৬. আজাদ। ১৩.১০.১৯৪৯
১৭. আজাদ। ১৩.১০.১৯৪৯
১৮. আজাদ। ১৩.১০.১৯৪৯
১৯. আজাদ। ১৬.১০.১৯৪৯ এবং নওবেলাল ২০.১০.৪৯
২০. Pakistan Observer—20.6.1951

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব বাঙলা জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন

১. পূর্ব বাঙলা পরিষদে জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিলের প্রথম খসড়া পেশ

১. হামিদুল হক চৌধুরী: East Bengal Legislative Assembly Proceedings vol. I. No. 4. P.93
২. ঐ।
৩. ঐ।
৪. ঐ।
৫. ঐ।
৬. ঐ। P.94
৭. ঐ।
৮. ঐ।
৯. ঐ।
১০. ঐ। P. 94-95
১১. ঐ। P.95
১২. ঐ। P.95-96
১৩. ঐ। P.96
১৪. ঐ।

২. বিলের ওপর প্রাথমিক বিতর্ক

১. East Bengal Legislative Assembly Proceedings vol. I. No. 4. P.97-98
২. ঐ। P. 98
৩. ঐ।
৪. ঐ।
৫. ঐ।
৬. ঐ।

৭. ঐ। P.99
৮. ঐ।
৯. ঐ। P.100-101
১০. ঐ। P.101-102
১১. ঐ। P. 102-103
১২. ঐ। P. 104-105
১৩. ঐ। P. 107
১৪. ঐ। P. 110
১৫. ঐ।
১৬. ঐ। P. 111-112
১৭. ঐ। P. 114-115
১৮. ঐ।
১৯. ঐ। P. 116-117
২০. ঐ। P. 118
২১. ঐ। P. 118-119
২২. ঐ। P. 119
২৩. 'পাকিস্তানের বিপ্লবী যুব সমাজের প্রতি' ঈশ্বরদীতে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিভাগীয় যুব সম্মেলনে গৃহীত ইস্তাহার। পৃষ্ঠা: ১২-১৩

৩. স্পেশাল কমিটি রিপোর্ট

১. সৈনিক। ১২.৮.১৯৪৯; আজাদ। ৫.৮ ১৯৪৯
২. East Bengal Legislative Assembly Proceedings Fourth Session, 1949-50. vol. IV No. I. P.52
৩. ঐ।
৪. ঐ। P. 60
৫. ঐ। P. 202-203
৬. ঐ। P.60
৭. ঐ। P. 53
৮. ঐ। P. 87
৯. ঐ। P. 53
১০. ঐ। Vol. I No 4. P. 116-117
১১. ঐ। Vol. IV No. I P. 56
১২. ঐ। P. 54
১৩ ঐ। P. 56

৪. বিরোধী দলীয় সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর আলোচনা

১, East Bengal Legislative Assembly Proceedings vol. IV. No. I P. 56
২. ঐ। P. 56-57
৩. ঐ। P. 57
৪. ঐ। P. 58
৫. ঐ।
৬. ঐ।
৭. ঐ। P. 62
৮. ঐ। P. 202
৯. ঐ। P. 63
১০. ঐ। P. 64
১১. ঐ। P. 75
১২. ঐ। P. 76-77
১৩. ঐ। P. 76
১৪. ঐ। P. 77
১৫. ঐ। P. 80
১৬. ঐ। P. 60
১৭. ঐ। P. 81
১৮. ঐ। P. 83
১৯. ঐ। P. 84
২০. ঐ। P. 84
২১. ঐ। P. 87
২২. ঐ। P. 88-89
২৩. ঐ। P. 89
২৪. ঐ। P. 90
২৫. ঐ। P. 110-11
২৬. ঐ। P. 112
২৭. ঐ। P. 117
২৮. E.B.L.A. Proceedings vol. I. No. 4, P. 102-03
২৯. E.B.L.A. Proceedings, vol. IV. No. I. P. 117
৩০. ঐ। P. 120
৩১. ঐ। P. 112-116
৩২. ঐ। P. 123
৩৩. ঐ। P. 123

৩৪. ঐ। P. 127
৩৫. ঐ। P. 191
৩৬. ঐ। P. 191
৩৭. ঐ। P. 206-07
৩৮. ঐ। P. 207
৩৯. ঐ। P. 212-13
৪০. ঐ। P. 214
৪১. ঐ। P. 215
৪২. ঐ। P. 217
৪৩. ঐ। P. 217-18
৪৪. ঐ। P. 218
৪৫. ঐ। P. 219
৪৬. ঐ।
৪৭. ঐ।
৪৮. ঐ। P. 220
৪৯. ঐ। P. 221
৫০. ঐ। P. 221

৫. Nil

৬. নানকার প্রথার বিলোপ

১. E.B. Assembly Proceedings, vol. IV-No. 3, P. 73
২. ঐ। P. 74-75
৩. ঐ। P. 74
৪. ঐ। P. 74
৫. ঐ। P. 74-75
৬. ঐ। P. 75
৭. ঐ। P. 76
৮ ঐ। P. 77-78
৯. ঐ। P. 80
১০. ঐ। P. 80-81
১১. ঐ। P. 82-83
১২. ঐ। P. 85-86
১৩. ঐ। P. 86-87

৭. কোম্পানী আইন

১. E.B. Assembly Proceedings, vol. IV. No. 3, P.109-10
২. ঐ। P. 111
৩. ঐ। P. 125-27
৪. ঐ। P. 154
৫. ঐ। P. 156
৬. E.B. Assembly Proceedings, vol. IV, No. 4, P.4
৭. ঐ। P. 27
৮. ঐ। P. 28
৯. ঐ। vol. IV, No. 3, P.110
১০. ঐ। vol. IV, No. 4, P.31

৮. টঙ্ক প্রথার বিলোপ

১. E.B. Assembly Proceedings, vol. IV, No. 4 P.47-49
২. ঐ। P. 57-59
৩. ঐ। vol. IV. No. 6, P. 136

৯. জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন ও পূর্ব বাঙলার কৃষক

১. E.B.L.A. Proceedings vol. I, No. 4, P.96
২. Statistical Digest of East Pakistan, 1968
৩. E.B. Assembly Proceedings, vol. 1, No. 4, P.96
৪. ঐ।
৫. Statistical Digest of East Pakistan, 1968

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব বাঙলায় কৃষক আন্দোলন

১. ভূমি সংস্কার সম্পর্কে সারা ভারত কিষাণ সভার প্রস্তাব

১. Peoples Age (Supplement), February 8, 1948 P.10

২. পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি

১. Peoples Age (Supplement,) Feb. 8, 1948, P.10

২. এ সময় মনিসিং কৃষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন, কৃষ্ণবিনোদ রায় নয় (নগেন সরকার)। ১৮৯ পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে কৃষ্ণবিনোদ রায়ের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

৩. Agrarian struggle in Bengal 1946-47 by Sunil Sen. Peoples Publishing House,

৪. যে সংগ্রামের শেষ নেই—প্রমথ গুপ্ত। কালান্তর প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৭৮। পৃষ্ঠা: ১০৯

৫. ঐ। পৃষ্ঠা: ১১১

৬. ঐ।

৩. Nil

৪. সিলেট জেলায় জমিদারী ও নানকার প্রথা বিরোধী আন্দোলন

১. লালা শরদিন্দু দে

২. অজয় ভট্টাচার্যের লিখিত নোট

৩. ঐ। এবং লালা শরদিন্দু দে

৪. ঐ।

৫. ঐ।

৬. ঐ।

৭. ঐ।

৮. ঐ।

৯. ঐ।

১০. ঐ।

১১. ঐ।
১২. মনি সিং, লালা শরদিন্দু দে
১৩. অজয় ভট্টাচার্য (নোট), লালা শরদিন্দু দে
১৪. এই ঘটনার এই বিস্তৃত বিবরণ প্রমোদ দাসের স্বলিখিত নোট থেকে গৃহীত।
১৫. অজয় ভট্টাচার্য: নানকার বিদ্রোহ। পুঁথিপত্র প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা-১, ১৩৮০। পৃষ্ঠা: ১৩-১৪
১৬. ঐ। পৃষ্ঠা: ১৯-২০
১৭. ঐ। পৃষ্ঠা: ২২-২৩
১৮. অজয় ভট্টাচার্য, লালা শরদিন্দ দে
১৯. অজয় ভট্টাচার্য: নানকার বিদ্রোহ। পৃষ্ঠা: ১০৭
২০. ঐ। পৃষ্ঠা: ১১৩ এবং লালা শরদিন্দ দে
২১-৩২. অজয় ভট্টাচার্য
৩৩-৩৭. নওবেলাল। ১.১ ১৯৪৮
৩৮-৪০. অজয় ভট্টাচার্য
৪১. নওবেলাল। ৮.১.১৯৪৮
৪২. ঐ। ১৫.১.১৯৪৮
৪৩. অজয় ভট্টাচার্য।
৪৪. ঐ।
৪৫. নওবেলাল। ১ ৪ ৪৮
৪৬. ঐ। ১৫.১ ৪৮
৪৭. ঐ
৪৮. নওবেলাল। ৬ ৫ ১৯৪৮
৪৯ ঐ। ১৩.৫.৪৮
৫০. ঐ। ২৭.৫ ৪৮
৫১. ঐ। ১৬.১২ ৪৮
৫২. ঐ। ২৭.১.৪৯
৫৩. ঐ
৫৪. ঐ। ৩.২.৪৯
৫৫. ঐ। ১৭.২.৪৯
৫৬ ঐ।
৫৭. ঐ। ১০.২ ৪৯, ২৩ ২ ৪৯. ৩১ ৩.৪৯
৫৮. ঐ। ১০ ৩.৪৯
৫৯. ঐ। ২৮.৪.৪৯।
৬০. সুষমা দে (স্বলিখিত নোট)
৬১. নওবেলাল। ১.৯.৪৯
৬২. সুষমা দে (নোট)

৬৩. নওবেলাল। ১.৯.৪৯
৬৪. সুষমা দে (নোট)
৬৫. নওবেলাল। ১.৯.৪৯
৬৬. লালা শবদিন্দু দে, অজয় ভট্টাচার্য
৬৭. নওবেলাল। ১.৯.৪৯
৬৮. ঐ।
৬৯. ঐ।
৭০. ঐ।
৭১. E.B. Assembly Proceedings, 18th November, 1949. vol. IV-No. 1, P.151
৭২. ঐ। P.148-49 (যতীন্দ্রনাথ ভদ্রের রিপোর্ট)
৭৩. ঐ। P.152 (নীরেন্দ্রনাথ দেবের রিপোর্ট)
৭৪. ঐ। P.150-51 (যতীন্দ্রনাথ ভদ্রের রিপোর্ট)
৭৫. ঐ। P.151,153
৭৬. ঐ। P.151 (যতীন্দ্রনাথ ভদ্র)
৭৭. ঐ। P.153
৭৮. ঐ। P.165
৭৯. E.B. Assembly Proceedings, 18th November, 1949 vol. IV, No. I. P. 166-70
৮০. দৈনিক আজাদ। ১৪.৯.৪৯
৮১. নওবেলাল। ১৫.৯.৪৯, ১৩ ১০ ৪৯

৫. ময়মনসিংহ জেলায় জমিদারী ও টঙ্ক প্রথা বিরোধী আন্দোলন

১. প্রমথ গুপ্ত: যে সংগ্রামের শেষ নেই। পৃষ্ঠা: ৪৮-১০৭
২. E.B. Legislative Assembly Proceedings, 24th. March 1948, vol. I, No. 2. P.49
৩. যে সংগ্রামের শেষ নেই: প্রমথ গুপ্ত। কালান্তর প্রকাশনী, কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৭৮। পৃষ্ঠা ১১১-১২
৪. নগেন সরকার।
৫. ঐ।
৬. ঐ।
৭. নগেন সরকার। যে সংগ্রামের শেষ নেই, প্রমথ গুপ্ত, পৃষ্ঠা: ১১২
৮. নগেন সরকার
৯. প্রমথ গুপ্ত: যে সংগ্রামের শেষ নেই। পৃষ্ঠা: ১১২

১০. নগেন সরকার
১১. নগেন সরকার। প্রমথ গুপ্ত: যে সংগ্রামের শেষ নেই। পৃষ্ঠা: ১১২
১২. নগেন সরকার
১৩. E.B. Legislative Assembly Proceedings 10th. March 1950, vol. IV, No. 8 P.216-18
১৪. সত্যেন সেন: বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম। কালিকলম প্রকাশনী। ১৯৭৩ পৃষ্ঠা: ৮-১৭
১৫. নগেন সরকার
১৬. নগেন সরকার। সত্যেন সেন: বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম। পৃষ্ঠা: ৩০
১৭. সত্যেন সেন: কৃষকের সংগ্রাম। পৃষ্ঠা: ৩০
১৮. সত্যেন সেন: বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম: পৃষ্ঠা ৩৭-৪৪ এবং প্রমথ গুপ্ত: যে সংগ্রামের শেষ নেই। পৃষ্ঠা: ৮৬-৯০
১৯. প্রমথ গুপ্ত: যে সংগ্রামের শেষ নেই। পৃষ্ঠা: ৯৭-১০৪
২০. ঐ। পৃষ্ঠা: ১১৫
২১. ঐ। পৃষ্ঠা: ১১৫-১৬
২২. ঐ। পৃষ্ঠা: ১১৬-১৭
২৩. ঐ। পৃষ্ঠা: ১১৭-১৮
২৪. ঐ। পৃষ্ঠা: ১১৮-১৯
২৫. ঐ। পৃষ্ঠা: ১১৯-২০
২৬. ঐ। পৃষ্ঠা: ১২০-২৩
২৭. দৈনিক আজাদ। ১১.২.১৯৪৯
২৮. প্রমথ গুপ্ত: যে সংগ্রামের শেষ নেই। পৃষ্ঠা: ১২৪
২৯. দৈনিক আজাদ। ১৫.২.৪৯
৩০. ঐ। ১৬.২.৪৯
৩১. নওবেলাল। রাজধানী ঢাকার চিঠি, পৃষ্ঠা: ৬। ২৩.২.৪৯
৩২. ঐ।
৩৩. প্রমথ গুপ্ত: যে সংগ্রামের শেষ নেই। পৃষ্ঠা: ১২৪-২৫
৩৪. ঐ। পৃষ্ঠা: ১২৫-২৬
৩৫. ঐ। পৃষ্ঠা: ১২৬-২৭
৩৬. ঐ। পৃষ্ঠা: ১২৭-২৮
৩৭. ঐ। পৃষ্ঠা: ১২৭-২৯
৩৮. ঐ। পৃষ্ঠা: ১৩০-৩১
৩৯. ঐ। পৃষ্ঠা: ১৩১-১৩২
৪০. ঐ। পৃষ্ঠা: ১৩২
৪১. দৈনিক আজাদ। ১৩.৮.৪৯
৪২. প্রমথ গুপ্ত: যে সংগ্রামের শেষ নেই। পৃষ্ঠা: ১৩২-৩৩

৪৩. ঐ। পৃষ্ঠা: ১৩৩
৪৪. ঐ। পৃষ্ঠা: ১৩৪
৪৫. E.B.L.A. Proceedings 10th March, 1950, vol. IV, No. 8, P.213
৪৬. P. 216-17

৬. নাচোল কৃষক বিদ্রোহ

১. সত্যেন সেন: বাংলাদেশের কৃষকের আন্দোলন। পৃষ্ঠা: ৯২-১০১ এবং আজহার হোসেন, রমেন মিত্র
২. আজহার হোসেন, রমেন মিত্র
৩. দৈনিক আজাদ। ১২.১.১৯৫০
৪. ঐ। এবং আজহার হোসেন।
৫. আজহার হোসেন।
৬. দৈনিক আজাদ। ১২.১.১৯৫০
৭. আজহার হোসেন। এবং সত্যেন সেন: ঐ। পৃষ্ঠা: ১০৩
৮. সত্যেন সেন: ঐ। পৃষ্ঠা: ১০৪-৫। এবং আজহার হোসেন
৯. আজহার হোসেন।
১০. দৈনিক আজাদ। ১২.১.১৯৫০
১১. ঐ।
১২. সত্যেন সেন: ঐ, পৃষ্ঠা: ১০৫-০৬
১৩. ঐ। পৃষ্ঠা: ১০৬-০৮
১৪. আজহার হোসেন, আবদুল হক, রণেশ দাশগুপ্ত
১৫. আবদুল হক। এবং সত্যেন সেন: ঐ। পৃষ্ঠা: ১১০
১৬. আজহার হোসেন, আবদুল হক
১৭. সত্যেন সেন: ঐ। পৃষ্ঠা: ১১১-১২
১৮. আবদুল হক।
১৯. ঐ।
২০. ঐ।
২১. ঐ।
২২. E.B. Legislative Assembly Proceedings, Fourth Session 1949-50 vo. IV. No. 6, P.12, 6th Feb. 1950
২৩. ঐ।
২৪. ঐ।
২৫. ঐ।
২৬. ঐ।
২৭. ঐ। পৃষ্ঠা: ১৩-১৯
২৮. ঐ। পৃষ্ঠা: ১৫

২৯. ঐ। পৃষ্ঠা: ১৬
৩০. ঐ। পৃষ্ঠা: ১৯

৭. অন্যান্য অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন

১. কামাখ্যা বায় চৌধুবী (লিখিত নোট), নগেন সবকাব, খুলনা (লিখিত নোট)
২. ঐ।
৩. ঐ।
৪. কামাখ্যা বায় চৌধুবী (লিখিত নোট)
৫. নগেন সবকাব, খুলনা (লিখিত নোট)
৬. কামাখ্যা (নোট), নগেন (নোট)
৭. নগেন (নোট)
৮. কামাখ্যা (নোট)
৯. ঐ।
১০. কামাখ্যা (নোট), নগেন (নোট)
১১. দৈনিক আজাদ। খুলনা থেকে নিজস্ব সংবাদ দাতাব বিপোর্ট। ববিবাব ১ ৫ ৪৯
১২. E.B. Assembly Proceedings, 10th March, 1050, vol. IV, No. 8, P.183
১৩ কামাখ্যা চৌধুবী (নোট)
১৪. ঐ।
১৫. সইফ-উদ-দাহাব
১৬. ঐ।
১৭. ঐ।
১৮. শান্তি সেন।
১৯. ঐ।
২০. ঐ।
২১. ঐ।
২২. প্রমথ গুপ্ত: যে সংগ্রামেব শেষ নেই। পৃষ্ঠা: ১৩৪। সুখেন্দু দস্তিদাব, সুধাংশু বিমল দত্ত।

৮. পূর্ব বাঙলা সবকাবেব কমিউনিষ্ট বিবোধী নীতি ও প্রচাবণা

১. খাজা নাজিমুদ্দীন। E.B. Assembly Proceedings ; 24.3.1948 vol. I, No. 2, P.49
২. নওবেলাল। ১৩.৫.১৯৪৮
৩. দৈনিক আজাদ। ১১ ৩.১৯৪৯
৪. নওবেলাল। ১৭.৩.১৯৪৯
৫. দৈনিক আজাদ। ২৬.৮.১৯৪৯ এবং নওবেলাল ১.৯.৪৯ পৃষ্ঠা: ৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-১৯৫০

সূত্রপাত

১. E.B.L. Assembly Proceedings, 10th March, 1950, vol. IV, No. 8, P.183
২. দৈনিক আজাদ, ৩১.১২.১৯৪৯
৩. এ সম্পর্কে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসের 'যুগান্তর', 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' ইত্যাদি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।
৪. E.B.A. Proceedings 10th March, vol. IV. No. 8, 'দৈনিক আজাদ', ৩.১.৫০; নওবেলাল ১২.১.৫০
৫. ডিসেম্বর ২৫.১৯৪৯ থেকে ১৯৫০ সালের জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত পশ্চিম বাঙলার পত্র-পত্রিকা দ্রষ্টব্য।
৬. ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরের শেষার্ধের পত্রিকা দ্রষ্টব্য।
৭. দৈনিক আজাদ ও Morning News বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।
৮. দৈনিক আজাদ, ৪.১.১৯৫০
৯. ঐ।
১০. যুগান্তর, আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২.১.১৯৫০
১১. দৈনিক আজাদ ১৫.১.১৯৫০
১২. যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৬.১.১৯৫০
১৩. E.B.L. Assembly Proceedings, 10th, March, 1950; vol. IV, No. 8. P.184
১৪. ১৯৫০ সালের জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আজাদ, মর্নিং নিউজ প্রভৃতি পত্রিকা দ্রষ্টব্য।
১৫. নওবেলাল। ৩০.১১.১৯৫০, পৃষ্ঠা: ৭
১৬. E.B. Assembly Proceedings, 7th Feb. 1950, vol. IV, No. 6, P.46
১৭. নওবেলাল। ৯ ২ ১৯৫০, পৃষ্ঠা: ৫
১৮. E.B. Assembly Proceedings, Vol. IV, No. 8, P.184
১৯. দৈনিক আজাদ। ৪.২.১৯৫০
২০. E.B. Assembly Proceedings, vol. IV No. 8, P.184

২১. যুগান্তর, আনন্দ বাজার পত্রিকা। ৭.২.১৯৫০
২২. E.B. Assembly Proceedings, vol. IV, No. 8. P.185
২৩. E.B. Assembly Proceedings 6th Feb. 1950. vol IV No, 6, P.20-21
২৪. ঐ। P.21
২৫. ঐ। P.21-22
২৬. ঐ। P.37-41
২৭. ঐ। P.43-47
২৮. ঐ। P.47
২৯. যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা। ৯.২.১৯৫০
৩০. ঐ। ১০.২.১৯৫০
৩১. দৈনিক আজাদ। ১২.২.১৯৫০

২. পূর্ব বাঙলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

১. E.B.L.A. Proceedings, vol. IV. No. 8, P.186-87
২. Taya Zinkin : Reporting India, Chatto and Windus
৩. যুগান্তর, আনন্দবাজার, Hindustan Standard, Amrita Bazar Patrika : ২৪. ২. ১৯৫০
৪. E.B.L.A. Proceedings, vol. IV, No. 8, P.189
৫. দৈনিক আজাদ ১.৩.৫০; নওবেলাল ২ ৩.১৯৫০
৬. E.B.L.A. Proceedings, Vol. IV, No. 8, P.189
৭. ঐ

৩. দাঙ্গা ও আমলাতন্ত্র

১. Taya Zinkin : Reporting India. Chatto and Windus P.40
২. ঐ। P.41
৩. ঐ। P.47
৪. ঐ। P.43
৫. ঐ। P.53
৬. ঐ। P.54-55

৪. শান্তি আন্দোলন

১. তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ১১.২.৫০
২. ঐ। ১২.২.৫০

৩. ঐ। ২.৩.৫০
৪. নওবেলাল। ৯.৩.১৯৫০
৫. ঐ।
৬. নওবেলাল। ৬.৪.১৯৫০
৭. ঐ।
৮। ঐ।

৫. দাঙ্গার পরবর্ত্তী পর্যায়

১. প্রমথ গুপ্ত: যে সংগ্রামের শেষ নেই। পৃষ্ঠা: ১৩৯
২. ঐ। পৃষ্ঠা: ১৪০
৩. ঐ। পৃষ্ঠা: ১৪০-৪১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জুলুম ও প্রতিরোধ

১. সংবাদপত্র ও সরকার বিরোধী প্রচারপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও হামলা

১. নওবেলাল। ২৫.৫.১৯৫০ ও ২৩.২.১৯৫০
২. নওবেলাল। ২৪.৬.১৯৪৮
৩. ঐ।
৪. ঐ। ২৫.৫.১৯৪৯
৫. ঐ। ৯.১২.১৯৪৯
৬. ঐ। ৫.৫.৪৯
৭. ঐ। ১২.৫.৪৯
৮। ঐ। ১৯.৫.৪৯
৯. ঐ। ২.৬.৪৯
১০. ঐ।
১১. খাতক। ১২.৮.৪৯ এবং নওবেলাল। ১৮.৮.৪৯
১২. নওবেলাল। ১৮.৮.৪৯
১৩. ঐ। ১৫.৯.৪৯
১৪. ঐ। ১০.১১.৪৯
১৫. ঐ। ১৭.১১.৪৯
১৬. ঐ। ২৪.১১.৪৯

১৭. ঐ।
১৮. ঐ।
১৯. ঐ।
২০. ঐ। ২৬.১.১৯৫০
২১. ঐ। ২৫.৫.১৯৫০
২২. ঐ। ১৩.৭.১৯৫০
২৩. ঐ। ১৩.৪.৫০
২৪. ঐ।
২৫. ঐ। ২০.৪.৫০
২৬. ঐ। ২৭.৪.১৯৫০
২৭. ঐ। ২৫.৫.৫০
২৮. ঐ। ২৭.৭.৫০
২৯. ঐ। ১৫.২.১৯৫১

২. ছাত্র নির্যাতন ও প্রতিরোধ

১. তাজউদ্দিনের ডায়েরী। ৮.১.৪৯
২. নওবেলাল। ২০.১.১৯৪৯
৩. ঐ। ১৭.৩.৪৯
৪. ঐ। ৩১.৩.৪৯
৫. ঐ। ১৪.৯.১৯৫০

৩. জননিরাপত্তা আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি

১. Pakistan Observer : 6.11.1951
২. নওবেলাল। ৮.১১.১৯৫১
৩. নওবেলাল। ৮.১১.১৯৫১ এবং তাজউদ্দীনের ডায়েরী ২.১১.৫১
৪. E.B. Assembly Proceedings, vol. VI. No, 2, P.169 and 5th November, 1951. এবং নওবেলাল। ৮.১১.৫১
৫. E.B. Assembly Proceedings, vol. VI, No. 2, P.216
৬. নওবেলাল। ৮.১১.৫১
৭. নওবেলাল। ২৯.১১.৫১ (পৃষ্ঠা: ১,৫)
৮. ঐ।
৯. ঐ। পৃষ্ঠা: ৫
১০. ঐ। ২৯.১১.৫১
১১. ঐ। ১৩.১২.৫১
১২. ঐ। ২৭.১২.৫১
১৩. ঐ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি প্রস্তাব বিরোধী আন্দোলন

১. পাকিস্তান সংবিধান সভায় মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সুপারিশ

১. Report of the Basic Principles Committee Published by the Government of Pakistan, 1952, P.(i)
২. ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর তারিখে ঢাকায় জাতীয় মহাসম্মেলনে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র রচনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকারের প্রস্তাবাবলী। গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পরিষদের পক্ষে কমরুদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৫০, পৃষ্ঠা: ১-২
৩. নওবেলাল। ৫.১০.১৯৫০
৪. জাতীয় মহাসম্মেলনের প্রস্তাবাবলী। পৃষ্ঠা: ৩
৫. ঐ। পৃষ্ঠা: ৪—৫
৬. ঐ। পৃষ্ঠা: ৫
৭. নওবেলাল। ৫.১০.১৯৫০
৮. ঐ।
৯. ঐ।
১০. ঐ।
১১. জাতীয় মহাসম্মেলনের প্রস্তাবাবলী। পৃষ্ঠা: ৬

২. মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পূর্ব বাঙলায় বিক্ষোভ

১. নওবেলাল। ১২.১০.৫০
২. ঐ।
৩. ঐ।
৪. তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ৫.১০.১৯৫০
৫. ঐ। ১৩.১০.৫০
৬. নওবেলাল। অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৫০
৭. ঐ। ২৬.১০.৫০
৮. তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ২৭.১০.৫০
৯. নওবেলাল। ২৬.১০.৫০
১০. তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ৩১.১০.৫০

৩. জাতীয় মহাসম্মেলন

১. কমরুদ্দীন আহমদ
২. তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ১২.১০.৫০
৩. ঐ। ১৭.১০.৫০ থেকে ২৮.১০.৫০
৪. ঐ। ১.১১.৫০
৫. ঐ। ৪.১১.৫০
৬. নওবেলাল। ১৬.১১.৫০
৭. তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ৫.১১.৫০
৮. ঐ। ৪.১১.৫০
৯. ঐ। ৫.১১.৫০
১০. ঐ।
১১. কমরুদ্দীন আহমদ
১২. কমরুদ্দীন আহমদ। তাজউদ্দীনের ডায়েরী ৫.১১.৫০

৪. জাতীয় মহাসম্মেলনে গৃহীত শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব

১. ৪ঠা এবং ৫ই নভেম্বর তারিখে ঢাকায় জাতীয় মহাসম্মেলনে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র রচনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকারের প্রস্তাবাবলী। গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা: ৵০-।০
২. Constitution of Pakistan. Basic Principles as adopted in Grand National Convention, .Dacca. Published by Kamruddin Ahmed, Convenor, Central Committee for Democratic Federation. 4, Zindabahar 1st. Lane, Dacca. 1953 P.3
৩. ঐ। P.3-5
৪. ঐ। P.5-6
৫. ঐ। P.7
৬. ঐ। P.7
৭. ঐ। P.7
৮. ঐ। P.7-8
৯. ঐ। P.8
১০. ঐ। P.8
১১. ঐ। P.9-11
১২. ঐ। P.12
১৩. ঐ। P.12-13

৫. ১২ই নভেম্বরের বিক্ষোভ

১. তাজউদ্দীনের ডায়েরী। ১২.১১.৫০
২. নওবেলাল। ২৩.১১.৫০
৩. ঐ।
৪. ঐ।
৫. ঐ।
৬. ঐ। ১৬.১১.৫০

৬. শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ

১. গণতান্ত্রিক ফেডারেশন কর্তৃক প্রকাশিত মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলী। পৃষ্ঠা: ১১
২. নওবেলাল। ২৬.১০.৫০, ১৬.১১.৫০, ২৩.১১.৫০
৩. ঐ। ২৬.১০.১৯৫০
৪. ঐ। ১৬.১১.৫০
৫. ঐ। ২৩.১১.৫০
৬. ঐ। ১২.১০.৫০
৭. ঐ।
৮. গণতান্ত্রিক ফেডারেশন কর্তৃক প্রকাশিত মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলী। পৃষ্ঠা: ১১-১২
৯. নওবেলাল। ২১.১২.৫০
১০. গণতান্ত্রিক ফেডারেশন কর্তৃক প্রকাশিত মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলী। পৃষ্ঠা: ১২-১৩
১১. নওবেলাল। ১৮.১.১৯৫১; সৈনিক। ২১.১.১৯৫১
১২. Pakistan Observer. 21.1.1951

৭. মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা স্থগিত

১. নওবেলাল। ৩০.১১.১৯৫১
২. ঐ। ৭.১২.১৯৫০
৩. Report of the Basic Principles Committee. Published by the Govt. of Pakistan, Karachi, 1952

নির্ঘণ্ট

ই

খ

গ

প্রেস কনসালটেটিভ কমিটি (পূর্ব পাকিস্তান) ৩৬৩

হ

যাঁদের সাথে সাক্ষাৎ আলাপ হয়েছে

অজয় ভট্টাচার্য
অলি আহাদ
আজহার হোসেন
আব্দুল হক
আব্দুশ শহীদ
ইমতিয়াজউদ্দীন খান
কমরুদ্দীন আহমদ
তফজ্জল আলী
নগেন সরকার
মনি সিং
রমেন মিত্র
শরদিন্দু দে লাল।
শান্তি সেন
সইফ-উদ-দাহার
সুখেন্দু দস্তিদার
সুধাংশু বিমল দত্ত
স্বদেশ বসু
হাজী মহম্মদ দানেশ

যাঁদের লিখিত নোট ব্যবহৃত হয়েছে

অজয় ভট্টাচার্য
কামাখ্যা রায় চৌধুরী
নগেন সরকার (খুলনা)
প্রমোদ দাস
সইফ-উদ-দাহার
সুষমা দে